মন্মথ রায়

নাট্য গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড

একাঙ্ক

(প্রথম পর্ব)
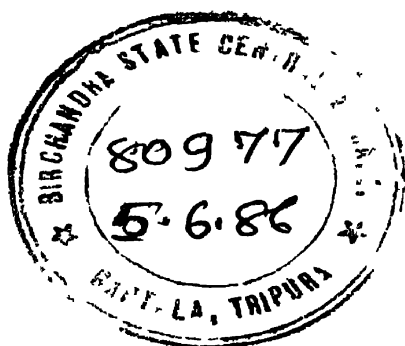
মনমথন প্রকাশন

২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬
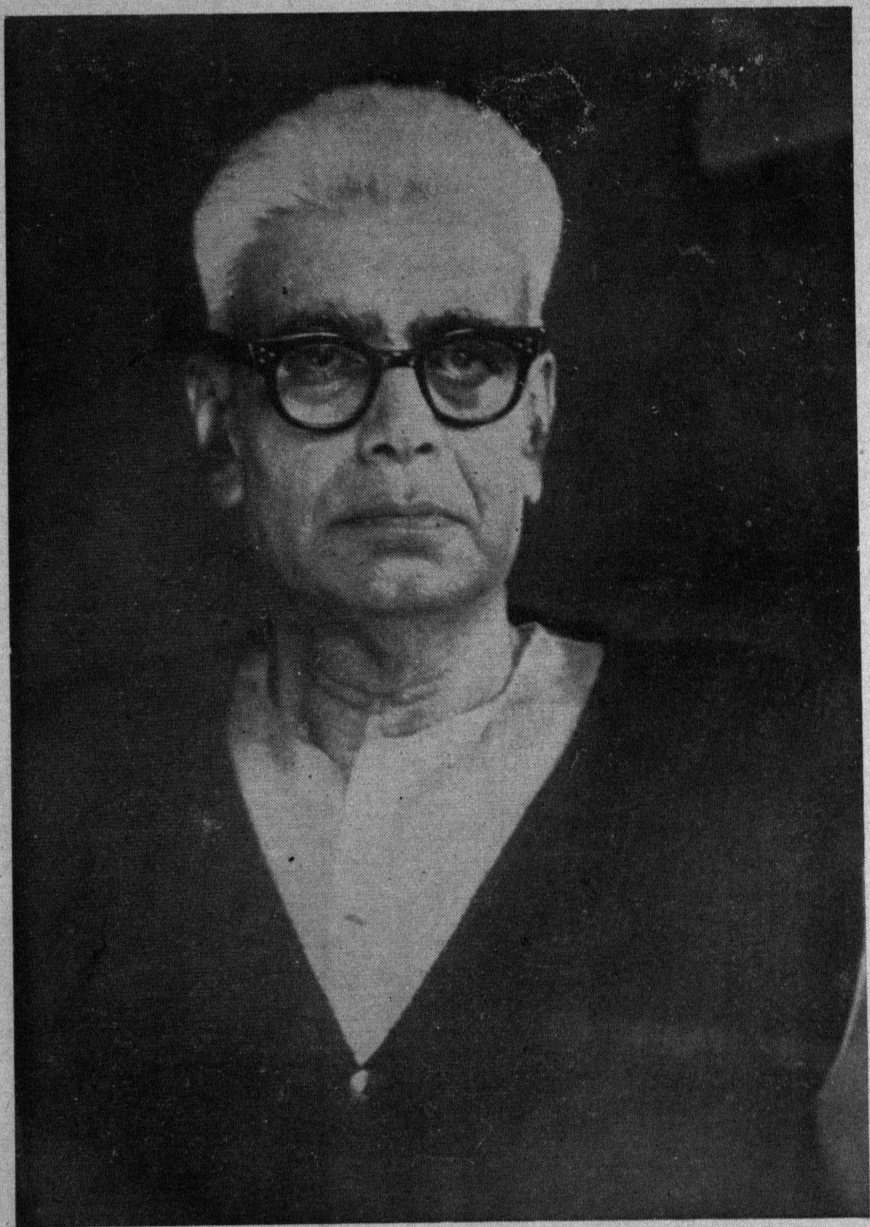
নিবেদন

বেলা পড়ে এল। এবার সান্ধ্যসম্ভাষণ।

আমার নাটকের বইগুলির বেশির ভাগই বেশ কিছুকাল আগে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয়নি। আজ কয়েক বছর আমার কিছু নাটক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. ও এম.এ. ক্লাসের পাঠ্য। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার নাটকাবলী নিয়ে গবেষণাও চলছে। কিন্তু আমার নাট্যরচনাবলী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তা ছাড়া নাট্যানুরাগী বন্ধুদের আক্ষেপ তো রয়েইছে।

আনন্দের বিষয়, লেখকদের জন্য অনুদান প্রকল্প অনুসারে গ্রন্থ প্রকাশনের ব্যয়ের সত্তর শতাংশ বহন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমার নাট্য-সমগ্রের পুনঃপ্রকাশন সম্ভাব্য করেছেন। আশাতীত এই সৌভাগ্যের জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

১৯২৩ সাল থেকে আমার নাট্য সাধনা আজও অব্যাহত থাকায় আমার নাট্য-সমগ্র একাধিক খণ্ডে বিন্যস্ত হতেই হবে। প্রথম ও অন্য আর এক খণ্ডে একাঙ্ক নাটক সন্নিবিষ্ট হবে। পরবর্তী অন্য খণ্ডগুলিতে আমার পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি প্রকাশিতব্য। হৃদরোগে আক্রান্ত ৮২ বছরের আমি, জীবদ্দশায় আমার রচনা-সমগ্র সংকলিত দেখে যেতে পারবো কিনা এ সন্দেহ ও আশঙ্কা অবশ্য সর্বদাই বিদ্যমান।

যাক্। আমার নাট্য গ্রন্থাবলীর এই একাঙ্ক প্রথম খণ্ড প্রকাশনে আমার পুত্র শ্রীমান চন্দন রায়ের অক্লান্ত কর্মতৎপরতা, 'বিশ্ববীণা' প্রেসের কর্তা শ্রী অমিতাভ ঘোষ-এর অপরিসীম সহৃদয়তা, মুদ্রণকলাকুশল শ্রী রাসবিহারী দত্ত ও শ্রী সমর সাহার অসাধারণ উদ্যম ও যত্ন এবং আমার পরম স্নেহাস্পদ আত্মীয় প্রকাশন বিশেষজ্ঞ শ্রী দীনেন্দ্র কুমার রায়ের সুপরামর্শ আমাকে অভিভূত করেছে। আমি তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক আশীর্বাদ জানাচ্ছি। যাঁদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে আমার আজীবন নাট্য সাধনা, এক্ষণে তাঁরা তৃপ্ত হলেই আমার সাধনা হবে সিদ্ধ, জীবন হবে ধন্য। নমস্কার।

সূচীপত্র

মুক্তির ডাক

আপনার প্রথম লেখা পড়ি—'মুক্তির ডাক'। আমার কেমন লাগে ইচ্ছে করেই লিখিনি। সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর মতো আলো ও অভিমান আমার নেই।

নজরুল ইসলাম

মুক্তির ডাক

উৎসর্গ-পত্র

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

এম-এ, ডি, এল

শ্রীচরণেষু

স্নেহধন্য

মন্মথ রায়

মুক্তি কাহিনী

১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও ল' ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয়ার্থে এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' রচনা করেছি শুনে আমাদের জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নাটকটি দেখতে নেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক করতে গেলে বহু ছাত্রকে পার্ট দিতে হবে বলে তিনি আমার নাটকটি না মঞ্জুর করলেও, বলেন—"নাটকটি খুবই নতুন ধরনের, আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি কলকাতা যাচ্ছি ভারতবর্ষ পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়া যায় কিনা দেখব।"

কলকাতা থেকে ফিরে এসে বললেন, "ছাপা হবে না। ভারতবর্ষ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কলকাতার ষ্টার থিয়েটারের পরিচালক আর্ট থিয়েটার লিমিটেডেরও অন্যতম ডিরেক্টর। তিনি নাটকটির অভিনবত্বে চমৎকৃত হয়ে ষ্টার থিয়েটারে আসচে বড়দিনে নাটকটি খোলবার ব্যবস্থা করেছেন।"

তদনুযায়ী, অপ্রত্যাশিতভাবে, ষ্টার থিয়েটারে ১৯২৩ সালের ২৫-এ ডিসেম্বর 'মুক্তির ডাক' মুক্তিলাভ করে। এজন্য আমি ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। বাংলার নাট্যজগতে তাঁরাই আমাকে ঠাঁই দিয়েছেন।

'মুক্তির ডাকে' ইতিহাসের অস্পষ্ট ছায়াপাত হলেও একে একটি কাল্পনিক চিত্ররূপে গ্রহণ করলে ঐতিহাসিকরাও নিরুদ্বেগে থাকতে পারবেন এবং আমিও বেঁচে থাকব। নিবেদন ইতি।

দোল-পূর্ণিমা : ১৩৩০ — **মন্মথ রায়**
জগন্নাথ হল।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

চরিত্র

শ্রীবুদ্ধ			
বিম্বিসার	...	...	মগধাধিপতি
সুন্দরক	...	...	হৃতসর্বস্ব শ্রেষ্ঠী যুবক
সুচিত্র	...	...	ভিক্ষু
অম্বা	...	...	বারাঙ্গনা-শ্রেষ্ঠা
পদ্মা	...	...	সুচিত্র-নন্দিনী (সুন্দরক পত্নী)

সংযোগস্থল : সুন্দরক শ্রেষ্ঠীর "বিলাস-কুঞ্জ"

মুক্তির ডাক

মগধ। বৌদ্ধযুগ। বিম্বিসারের রাজত্বকাল

[শ্রেষ্ঠী ভবন। বৃক্ষ পরিবেষ্টিত দ্বিতল প্রাসাদের নিম্নতলে মাঝখানে উপবেশন কক্ষ। তাহার দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন আর দুইটি কক্ষ। পশ্চাতে বিস্তৃত অলিন্দ। শেষোক্ত ক্ষুদ্র কক্ষ দুইটির দুইটি দরজা—একটি উপবেশন কক্ষে ও অলিন্দের সহিত যুক্ত। অলিন্দ হইতে দ্বিতলে যাইবার জন্য প্রশস্ত সোপান শ্রেণী। প্রাসাদের সম্মুখে পাষাণ বাঁধান আঁকা-বাঁকা পথের ধারে কুঞ্জবীথি।

গৃহস্বামী এক তরুণ শ্রেষ্ঠী যুবক। নাম 'সুন্দরক'।

গৃহস্বামিনী এক কিশোরী। নাম 'পদ্মা'।

প্রাসাদে কারুকার্যের অভাব নাই। বাসভবন হইলেও ইহা 'বিলাস-কুঞ্জ' নামে খ্যাত ছিল।

চৈত্রের সন্ধ্যারাত। পূর্ণিমার চাঁদ তালপাতার ফাঁকে ফাঁকে সবেমাত্র জ্যোৎস্না ছড়াইয়াছে। দখিন হাওয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছে।

ঐ প্রাসাদের নিম্নতলে একধারের একটি কক্ষে উন্মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বে পদ্মা মলয়-চঞ্চল তালপত্রের আড়ালে আড়ালে চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে-ছিলেন—আর গাহিতেছিলেন—]

গান

মম ব্যর্থ জীবন গতিহীন।
কাঁদে বন্ধন মাঝে নিশিদিন॥
হেথা ক্ষুন্ন দিগন্তর ঘেরি—
সদা মন্দ্রিত ক্রন্দন ভেরী॥
মম চিত্ত মুকুল ফুল কুঞ্জে
ব্যথা মর্মরি নির্মম গুঞ্জে,—
ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত প্রেম বঞ্চিত অন্তরে,
স্বপ্ন বিফল দুঃখ পুঞ্জে,—
গাহে আঁখিনীরে, ধীরে হৃদিবীণ॥

[উপবেশন কক্ষে দর্পণ সম্মুখে তাঁহার স্বামী 'সুন্দরক' প্রসাধনরত ছিলেন। তাঁহার ভাব-ভঙ্গীতে কি জানি একটা ব্যস্ততা লক্ষিত হইতেছিল।]

সুন্দরক॥ (প্রসাধনান্তে ধীরে ধীরে পদ্মার পাশে আসিয়া তাঁহার হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে আনিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে)···পদ্মা!

পদ্মা॥ কি?

সুন্দরক॥ রাগ করেছ?

পদ্মা॥ (সুন্দরকের দিকে তাকাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়াই মুখ ফিরাইয়া বাতায়ন পথে তাকাইয়া)—রাগ করে লাভ?

সুন্দরক ॥ (পদ্মার মুখোমুখি হইয়া) লাভ লোকসান বুঝিনে। রাগ করেছ কিনা সেইটে জান্‌তে চাই—

পদ্মা ॥ (আনত চক্ষে, ধীর স্বরে) যাও আর বিরক্ত করো না—

সুন্দরক ॥ (অবিচলিতভাবে) আমি কি তোমার চক্ষুশূল ?

[পদ্মা নীরব রহিলেন]

তবে আমাকে বিবাহ করেছিলে কেন পদ্মা ?

[পদ্মা তথাপি নীরব রহিলেন]

(পদ্মাকে ঝাঁকি দিয়া) বল বল—তোমায় বল্‌তে হবে—

পদ্মা ॥ জানো আমার শরীর ভাল নয়—

সুন্দরক ॥ তা আমি, বৈদ্য ডেকে আনছি…এখনি আনছি…তোমার সিন্দুকের চাবিটা দাও।

পদ্মা ॥ সিন্দুকের চাবি কেন ?

সুন্দরক ॥ বৈদ্যের দর্শনী, ঔষধের মূল্য…

পদ্মা ॥ আমার চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

সুন্দরক ॥ ও…তুমি তবে আমায় বিশ্বাস করছ না ?

পদ্মা ॥ বহুবার যে ঠেকে শিখেছে…বিশ্বাস যদি আজ সে না করতে পারে, তবে…

সুন্দরক ॥ বটে ! বেশ, তবে আমি খোলাখুলিই বলছি—আজ রাত্রেই আমার দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন—এ আমার চাই-ই চাই—না পেলে হবে না।

পদ্মা ॥ তা এ কথা আমাকে বলে লাভ ?

সুন্দরক ॥ এ অর্থ তোমাকেই দিতে হবে।

পদ্মা ॥ (সবিস্ময়ে) আমাকে দিতে হবে ?

সুন্দরক ॥ হ্যাঁ।

পদ্মা ॥ কেন ?

সুন্দরক ॥ আমি একজনকে নিমন্ত্রণ করেছি। শুধু আজ নয়—বহুদিনই করেছি—কিন্তু এতদিন সে তাতে কর্ণপাত করেনি—আজ আমার বহুভাগ্য যে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সম্মত হয়েছে—এ অর্থ তার অভ্যর্থনার জন্য প্রয়োজন—

পদ্মা ॥ কে সে যাঁর অভ্যর্থনার মূল্য দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ?

সুন্দরক ॥ তুমি না হয় নাই শুনলে।

পদ্মা ॥ মহারাজ বিম্বিসার ?

সুন্দরক ॥ মহারাজ বিম্বিসার তাঁর অভ্যর্থনার জন্য রাজসিংহাসন দক্ষিণা দান করেন—

পদ্মা ॥ কে সে ?

সুন্দরক ॥ বুঝে দেখ কে সে। আজ এইরূপ এক মহা সম্মানিত অথিতির জন্য আমি তোমার নিকট হাত পাতছি। স্ত্রী তুমি…স্বামীর মর্যাদা রক্ষা কর—

পদ্মা ॥ আগে বল কে সে ?

সুন্দরক ॥ তবে দেবে ?

পদ্মা ॥ হয়ত দেব—

সুন্দরক ॥ তার নাম অম্বা

পদ্মা ॥ সেই বেশ্যা—

সুন্দরক ॥ সেই বিশ্ব-বন্দিতা—

[পদ্মা নীরব রহিলেন]

দাও—

পদ্মা ॥ সে তোমার অতিথি—আমার নয়। আমি দেব না।

সুন্দরক ॥ কিন্তু আমি দেব কোথা হতে ? চরিত্রদোষে আমি আজ কপর্দকহীন—কিন্তু তোমাকে স্ত্রীরূপে পেয়েছি বলে আজো আমার লক্ষ্মীর সংসার—আমার বড় আশা, আমি নিরাশ হব না—

পদ্মা ॥ শুনেছিলাম অতি বড় যে কাপুরুষ সেও স্ত্রীধন গ্রহণ করে না।

সুন্দরক ॥ আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাইছি—পদ্মা। এ তোমায় দিতেই হবে—না দিলে আমি কিছুতেই ছাড়বো না—এ তুমি ঠিক জেনো।

পদ্মা ॥ দেখ তোমার ঐ ভিক্ষা চাওয়ার অত্যাচার আমার আর সহ্য হয় না—

সুন্দরক ॥ সহ্য না হলে কি করবে ?

পদ্মা ॥ মরতে ব'লছি—মরব

সুন্দরক ॥ মুখের কথায়—যদি মরা যেত তবে—

পদ্মা ॥ মুখের কথা ! তুমি কি বোঝ না যে আমি তিল তিল করে আজ জীবনের শেষ ধাপে পা বাড়িয়েছি। দুই বৎসর পূর্বে তুমি নিশীথে আমার পিতৃগৃহে অবৈধ প্রবেশের জন্য ধৃত হয়েছিলে—তোমার জীবন-মৃত্যুর সেই সন্ধিক্ষণে তোমার অশ্রুভারাবনত সেই তরুণ মুখশ্রী দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তারপর পিতার নিকট নতজানু হয়ে তোমার মুক্তি ভিক্ষা চেয়ে চোখের জলে পিতার সম্মতি অর্জন করে যেদিন তোমার কণ্ঠে আমি বরমাল্য অর্পণ করেছিলাম—সেই দিনই আমি আমার অজ্ঞাতেই বিষপান করেছি।—যাও, আর কথাতে কাজ নেই—তোমার উৎসবের সময় হয়ে এসেছে…(বাতায়নপথে তাকাইয়া) কি সুন্দর ঐ জ্যোৎস্না ! না সহ্য হয় না।

[অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন]

সুন্দরক ॥ যেতে বলছ…যাচ্ছি। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে না নিয়ে যে যেতে পারছি না পদ্মা—

পদ্মা ॥ আমি এক কপর্দকও দেব না।

সুন্দরক ॥ দেবে না ?

পদ্মা ॥ না।

সুন্দরক ॥ (ক্রুদ্ধ হইলেও আত্মসংবরণ করিয়া) দেবে না ?

পদ্মা ॥ কি স্বত্বে তুমি আমার নিকট এ অর্থ দাবী করছ ?

সুন্দরক ॥ তবে শোন ···লুকোচুরি করে লাভ নেই। সেই বিবাহ-বাসরে কি মন্ত্র পাঠ ক'রে তোমায় গ্রহণ করেছিলাম জানি না, কিন্তু যদি বিবাহই করে থাকি—তবে···তোমার দেহমনকে নয়—পিতার উত্তরাধিকারিনীরূপে তোমার ধনৈশ্বর্য যা কিছু ছিল···তাই।

পদ্মা ॥ (বিস্মিত হইয়া, পরে সহজভাবে) এই কথা ! (পালঙ্ক হইতে উঠিয়া) তা এটা এতদিন আমায় মুখ ফুটে বলনি কেন ?

সুন্দরক ॥ অন্ততঃ তোমার পিতার প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর, আমার কথায়, কাজে, আমার ভাবে, ভঙ্গিমায় এ কথা তোমার আপনা হতেই বোঝা উচিত ছিল।

পদ্মা ॥ তা বটে ! হাঁ তবে—না···আচ্ছা, আজকের মত তুমি যা চাইছ—আমি দিচ্ছি। কিন্তু, তারপর কি করব বলতে পারি না।—

[অলিন্দ-সংলগ্ন সোপানপথে দ্বিতলে প্রস্থান]

সুন্দরক ॥ (প্রস্থানপরায়ণা পদ্মার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পদ্মা প্রস্থান করিলে পর) কি করব ! উপায় নেই। সে যখন আমার নিকট স্বর্ণ-মুদ্রার এই দক্ষিণা চেয়েছে—আমাকে দিতেই হবে—আমি দেব। তাকে আমি আমার প্রণয় নিবেদন করেছি—সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এর পূর্বে কতদিন নিমন্ত্রণ করেছি—সে গ্রহণ করেনি। আজ যখন আমার উপর তার অনুগ্রহ হয়েছে . সে অনুগ্রহ আমি বরণ করব···অন্ততঃ একটি রাত্রির জন্যও আমি সেই বিশ্ববাঞ্ছিতা নারীকে পূজা করবার সৌভাগ্য ক্রয় করব। আমি তাকে যখন আমার অর্ঘ্য দান করব--সে কি সস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে একটি-বার চাইবে না ? আমি তাকে যখন আমার নৈবেদ্য দান করব--সে কি আবেগে একটি গান গাইবে না ?

[বাহিরের দ্বারে মৃদু করাঘাত]

সুন্দরক ॥ (ত্বরিৎ পদে দ্বারদেশে গিয়া)·· কে ?

(উত্তর আসিল) . 'আমি'।

সুন্দরক ॥ (বিচলিত হইয়া)—অম্বা ?

(নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল)—'দোর খুলেই দেখ না—'

সুন্দরক ॥ (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা—এস।

[দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন—মহার্ঘ সাজসজ্জা ভূষিতা বারাঙ্গনা-শ্রেষ্ঠা অম্বা প্রবেশ করিলেন]

সুন্দরক ॥ (সাগ্রহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সানুনয়ে) আমার একি সৌভাগ্য ! গিয়ে আনতে বড় বিলম্ব হয়ে গেছে—না ?—আমি এখনি যাচ্ছিলাম—

অম্বা ॥ গৃহে নব যুবতী স্ত্রী—বিলম্ব যে হবে তা আমি জান্‌তাম। কাজেই ব্যর্থ প্রতীক্ষার ব্যথা সইনি—নিজেই চলে এলাম।

সুন্দরক ॥ কিন্তু নিমন্ত্রিত অতিথিরা . বিশেষ, মহারাজ বিম্বিসার—

অম্বা ॥ তাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। তারা এখন নেশায় রঙীন হয়ে স্বপ্নলোকে খেলা করছে। অভিসারের আনন্দ বহুদিন পাইনি—আমি চুপিচুপি তোমার এখানে চলে এলাম।

সুন্দরক ॥ বেশ হয়েছে। তবে এসো অম্বা, আজ এই দরিদ্রের ভবনই তোমার নূপুর গুঞ্জনে—তোমার কলহাস্যে মুখরিত হোক্—তোমার চরণরেণু বুকে নিয়ে এই কক্ষের পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হোক—

[অম্বার হাত ধরিলেন]

অম্বা ॥ কিন্তু আমার মুখে যে আর কথা ফুটছে না সুন্দরক! এখানে যে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে বন্ধু!

সুন্দরক ॥ কেন অম্বা?

অম্বা ॥ (বিস্ফারিত নেত্রে) পায়ের তলের ঐ পাষাণ·· ও তো শীতল নয়...নীচে কি আগুন জ্বলছে? চারিদিকের এই প্রাচীর—ও তো অচল নয়···সুন্দরক! সুন্দরক! ওরা কি আমায় গ্রাস করতে আস্‌ছে?

সুন্দরক ॥ সে কি?

অম্বা ॥ তাইতো! তাইতো! একি!

সুন্দরক ॥ তুমি আজ নেশায় ভরপুর দেখছি!

অম্বা ॥ (চমকিয়া উঠিয়া) তাই কি? (পরে তাঁহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া) ঠিক বলেছ। হাঃ হাঃ হাঃ···

সুন্দরক ॥ চল, আমার প্রমোদ কক্ষে চল—

অম্বা ॥ তোমার স্ত্রী কোথায়, সুন্দর?—তাকে আমায় একবার দেখাতে পার?—দেখতে চাই···কি সে যার জন্য তুমি আমায় নিমন্ত্রণ করেও আমার অভ্যর্থনা করে আনতে যাও নি! সে কি এতই সুন্দর?—আমারো চেয়ে?

সুন্দরক ॥ তা বোধ হয় তোমারো চেয়ে—

অম্বা ॥ আমার মত তার মুখ? আমার মত তার চোখ?

সুন্দরক ॥ ঠিক তোমার মত তার মুখ—ঠিক তোমার মত তার চোখ—

অম্বা ॥ তবে তুমি আমার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াও কেন সুন্দরক?

সুন্দরক ॥ তুমি যে অম্বা—আর সে যে পদ্মা··· !

অম্বা ॥ অর্থাৎ?

সুন্দরক ॥ এর আর অর্থাৎ নেই। যদি থাকতো, তবে পতঙ্গ প্রদীপের আগুনে ঝাঁপ দিত না ছুটে, ঐ নীলাকাশে চাঁদের পানে ছুটতো—

অম্বা ॥ হুঁ! সুন্দর, আমি অতিথি, অতিথির দক্ষিণা দাও।

সুন্দরক ॥ অবশ্য দেব···একটু অপেক্ষা কর অম্বা।

অম্বা ॥ না এখনি চাই। আমি আর বিলম্ব করতে পাচ্ছিনে...।

সুন্দরক ॥ এখনি?

অম্বা ॥ এখনি। এই মুহূর্তে। তোমার প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেছে সুন্দরক।

সুন্দরক ॥ এই জন্যই কি আমি স্ত্রী পর্যন্ত ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছি?

অম্বা ॥ এই কথা ! (শ্লেষ পরিপূর্ণ হাস্তে) সুভদ্রকে এ কথা ব'লো না কিন্তু—সে আমার জন্য, তার স্ত্রীর খাদ্যে গোপনে বিষ মিশিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হয়েছিল ।···জানো ?

[সুন্দরক মাথা নত করিয়া নীরব রহিলেন]

দেখো···কুলীরক যেন তোমার এই অপূর্ব আত্মত্যাগের কথা না জানতে পারে ! তবে সে বড়ই লজ্জা পাবে। সে আমার জন্য তার বৃদ্ধ পিতা কর্তৃক নিত্য তিরস্কৃত হওয়াতে তার বুকে নিজহাতে ছুরি বসিয়েছিল ।···জানো ?

[সুন্দরক নীরব রহিলেন]

আর আমি আমার প্রথম প্রণয়াস্পদের জন্য কি করেছিলাম জানো ?

সুন্দরক ॥ তুমি !

অম্বা ॥ হাঁ, আমি। তিনি ছিলেন এক নিঃসহায় দরিদ্র রাজপুত্র। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁর সিংহাসন লাভের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তাঁর ঐ অনিশ্চিত সিংহাসনকে সুনিশ্চিত করবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এদিকে আমার পিতার প্রতিশ্রুতি অনুসারে পিতৃবন্ধুর এক পুত্রের সঙ্গে নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন আমাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হল, তখন, বিবাহের পূর্ব থেকেই যাঁকে হৃদয়-মন ইহকাল-পরকাল সমর্পণ করে-ছিলাম—আমার সেই জীবন-দেবতার সাহায্যের জন্য আমার বিবাহিত স্বামীর ধনরত্নের বিপুল ঐশ্বর্য, প্রতি নিশীথে ক্রমে ক্রমে চুরি করে, তাঁর হাতে তুলে দিয়ে শেষে একদিন স্বামীর হাতে ধরা পড়ি।

সুন্দরক ॥ (রুদ্ধ নিঃশ্বাসে)—তারপর ?

অম্বা ॥ বিজয়িনী অম্বার মনোবাসনা ষোলকলা পূর্ণ হলো। স্বামী মনো-দুঃখে গৃহত্যাগ করলেন। আমি আমার প্রণয়াস্পদকে দুই সিংহাসনেই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম···এক সিংহাসন রাজসভায়—আর এক সিংহাসন আমার শয়নকক্ষে।

সুন্দরক ॥ আর তোমার স্বামী ? তাঁকে কি তুমি···হত্যা··?

অম্বা। না, প্রয়োজন হয় নি। যে মনোদুঃখে গৃহত্যাগ করে সে কৃপার পাত্র—হত্যার নয়।

সুন্দরক ॥ অম্বা স্ত্রীকে ভালবাসি কিনা জানি না—কিন্তু তবু আমি মুক্ত-কণ্ঠেই বলব—সে আমার সতী-সাধ্বী স্ত্রী। আদর যত্ন সোহাগ,—সে আমার কাছে কিছুই পায়নি—যদি কিছু পেয়ে থাকে তবে সে শুধু নির্যাতন। তবু স্ত্রী হয়েও আমার মনস্তুষ্টির জন্য আমার পাপ-প্রবৃত্তির ঘৃতাহুতির মূল্য এতদিন সেই-ই যুগিয়ে এসেছে—আজও—

[পদ্মার প্রবেশ]

পদ্মা ॥...না, আজ আর নয়।

[ইহারা সচকিত হইয়া উঠিলেন]

সুন্দরক ॥ ছিঃ পদ্মা···

পদ্মা ॥ নির্লজ্জ! লম্পট! লজ্জা করে না—তোমার পিতৃ-পিতামহদের এই পুণ্যপূত দেবায়তনে এক বারবিলাসিনীকে…

অম্বা ॥ সুন্দরক—

[চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল]

সুন্দরক ॥ সাবধান পদ্মা…। উনি অতিথি—অতিথির অপমান আমি সইব না। ভাল চাও তো দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা রেখে চলে যাও—

পদ্মা ॥ আমি এক কপর্দকও দেব না।

সুন্দরক ॥ আবার

পদ্মা ॥ হাঁ, আমি দেব না—

সুন্দরক ॥ অবশ্য দিতে হবে। কেন তুমি দেবে না?

পদ্মা ॥ তুমি না শুধু আমার বিভব সম্পদ বিবাহ করেছ? স্বীকার করলাম অধিকার আছে তোমার তার উপর,—যেখান হতে পার তুমি তা গ্রহণ কর। কিন্তু যখন আমার দেহ-মনকে বিবাহ কর নি, তখন আমার দেওয়া না দেওয়ার ইচ্ছার উপর তোমার কি হাত আছে?

সুন্দরক ॥ এই কি স্ত্রীর কর্তব্য?

পদ্মা ॥ আর একটা গণিকাকে স্ত্রীর পবিত্র অন্তঃপুরে এনে তার সম্মুখে স্ত্রীকে চোখ রাঙ্গানই কি স্বামীর কর্তব্য—দূর করে দাও—দূব করে দাও ওকে—

[বাহিরের দরজার প্রতি হস্ত নিদেশ করিলেন]

অম্বা ॥ (তাহার দুই চোখ হইতে আগুন বাহিব হইতেছিল)—সুন্দরক—আমি না তোমার নিমন্ত্রিত অতিথি? তুমি কি আমাকে এই অপমানের জন্যই এখানে অপেক্ষা করতে অনুরোধ কবেছিলে?—বল—বল—

সুন্দরক ॥ অম্বা। কিছু মনে কোর না। তোমার এ অপমানের প্রায়শ্চিত্ত আমি এখনি করব। আজ আমি আমার এই প্রাসাদ-ভবন ঈশ্বর সাক্ষী করে তোমাকে নিবেদন করছি। আজ থেকে আমি এর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করলাম। তুমি এখন এ গৃহের অধিশ্বরী—আমায় ক্ষমা কর অম্বা—

অম্বা ॥ (বিজয়দৃপ্তা হইয়া সগৌরবে পদ্মার প্রতি) এখন যদি তোমাকে আমার গৃহ থেকে দূর করে দিই?

পদ্মা ॥ (অম্বার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) কি! বেশ! (সুন্দরকের প্রতি সহজভাবে) তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ?

অম্বা ॥ যাঁর গৃহ—তিনি দিচ্ছেন বটে।

পদ্মা ॥ স্বামী তুমি,—তুমি আমায় এই ঘৃণিত অপমান থেকে রক্ষা করবে না? তোমার নিকট আমার মাথা রাখবার ঠাইটুকুও কি মিলবে না?

অম্বা ॥ সে প্রার্থনা যদি এখন কারো কাছে করতে হয় তবে ওখানে নয়—এইখানে—আমার কাছে—

পদ্মা ॥ (তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া—সুন্দরকের প্রতি) তুমি আমার কথার উত্তর দাও—

[সুন্দরক নীরবে রহিলেন]

অম্বা ॥ উত্তর তুমি পেয়েছ।

[পদ্মার আর বাক্য স্ফুরণ হইল না—হঠাৎ ঘুরিয়া দ্বিতলের পথে চলিয়া গেলেন। সুন্দরক ও অম্বা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—পরে অম্বা সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন]

অম্বা ॥ ঠিক বলেছ সুন্দরক। এ নারী আমারই প্রতিবিম্ব। দেখে আমারই ভুল হয়েছিল···কি আশ্চর্য !

সুন্দরক ॥ শুধু চোখে মুখে, চেহারায় ও তোমার প্রতিবিম্ব নয়—তেজে, অভিমানে—ও তোমারই ছবি।

অম্বা ॥ কিন্তু ওকে যে আমার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে সুন্দরক ! কৈ, সুরা কৈ ?—সুরা আনো। আজ এ আমার দুঃখের রাত—কি আনন্দের রাত বুঝতে পাচ্ছি না !—আমায় তুমি মাতাল করে রাখ বন্ধু !

সুন্দরক ॥ এস পালঙ্কে এসে বস—

[তাঁহাকে পালঙ্কে লইয়া বসাইলেন]

অম্বা ॥ উঃ ! আমার চোখ ঝলসে গেছে। আমার চোখ ঝলসে গেছে। উঃ কি আলো ! কি দীপ্তি !

সুন্দরক ॥ কোথায় অম্বা ?

অম্বা ॥ তার চোখে,—তার মুখে (সহসা প্রকৃতিস্থ হইয়া)—না না, এই কক্ষে। উঃ, প্রদীপ নিবিয়ে দাও—নিবিয়ে দাও—

সুন্দরক ॥ দিচ্ছি।

[দীপ নির্বাণ। বাতায়নপথে সমুজ্জ্বল চন্দ্রালোক কক্ষ পরিপ্লাবিত করিল।]

অম্বা ॥ কি সুন্দর জ্যোৎস্না ! (বাহিরে চাহিয়া) তাই তো ! (চন্দ্রের পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে) চাঁদের মুখে কি আজ জয়ের হাসি ? (হঠাৎ পালঙ্ক হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সুন্দরক ! সুরা আনো, বীণা আনো . ঐ লতাকুঞ্জে চল···(সুন্দরকের হাত ধরিয়া) আর—আর—বিম্বিসারকে একবার খবর দাও। শোন সুন্দরক—আজ রূপে···রসে···গানে···গন্ধে আকাশের ঐ চাঁদকেও আমি হারিয়ে দেব।

গান

শুধু গাও ঢেলে দাও প্রাণে ভালবাসা।
জাগায়ে তোল প্রাণে আকুল পিয়াসা ॥
যামিনী যে আজ উল্লাসে হাসে—
বিশ্ব বিহ্বল আনন্দে ভাসে
বহে মন্দ সমীরণ মুগ্ধ ত্রিভুবন
কানন কুসুম গন্ধে।—
আনো সুরা আনো শুধু নাচ গাও,
নিখিল চরাচর লুপ্ত করে দাও—
জাগাও জীবনে ছন্দে ;—
ঢেলে দাও যৌবন মিলন দুরাশা ॥

[গাহিতে গাহিতে সুন্দরকসহ কুঞ্জান্তরালে প্রস্থান। অলিন্দপথে পদ্মা ও তাঁহার দাসীর প্রবেশ]

পদ্মা ॥ (দাসীর প্রতি) এই মুহূর্তে আমার পিতৃভবনে গিয়ে এই পত্রখানি আমার বৃদ্ধা ধাত্রীর হাতে দাও—

[পত্র লইয়া অভিবাদনান্তে দাসীর প্রস্থান। অন্য দ্বারপথে নৃপতি বিম্বিসারের মত্তাবস্থায় প্রবেশ]

বিম্বিসার ॥ তুমি আমাকে নেশায় অজ্ঞান দেখে আমাকে ফেলে রেখে এখানে চলে এসেছ !

পদ্মা ॥ (সবিস্ময়ে) মহারাজ !

বিম্বিসার ॥ (সবিস্ময়ে) এ কি ! এ কি অপূর্ব মূর্তি ! আজ এই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঐ আলো-ছায়ার মাঝখানে একি এক অস্পষ্ট রহস্যে আবার তুমি সেই তরুণী মূর্তিতে আমার চোখের সামনে উদয় হয়েছ অম্বা, যেমন ঠিক চতুর্দশ-বর্ষ পূর্বে---

পদ্মা ॥ এ কি মহারাজ ! আপনিও আমায় অপমান করছেন ? এই বুঝি আপনার মনুষ্যত্ব ? এই কি রাজধর্ম ?

বিম্বিসার ॥ আজ আবার তোমার একি খেলা প্রেয়সী ?

পদ্মা ॥ রাজা—রাজা—আমি পরস্ত্রী—

বিম্বিসার ॥ হাঁ, তা জানি—তুমি আজ সুন্দরক শ্রেষ্ঠীর প্রিয়তমা প্রেয়সী। কিন্তু---

পদ্মা ॥ এ কথা জেনেও আপনি আমায় অপমান করছেন ? হা ভগবান---

[বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন]

বিম্বিসার ॥ (সবিস্ময়ে) কাঁদছ ! সে কি !—কে তোমায় অপমান করেছে ?

পদ্মা ॥ (আনত মুখে) কে না করেছে !

বিম্বিসার ॥ তবু শুনি,—কে ?

পদ্মা ॥ শুনে আর কি হবে ? প্রতিবিধান তার কি আছে ? যখন মহারাজ নিজে—

বিম্বিসার ॥ হাঁ, আমি রাজা, আমি বিচার করব !

(পদ্মা নীরব রহিলেন)

বিম্বিসার ॥ বল—আমি বিচার করব···

পদ্মা ॥ করবেন ?

বিম্বিসার ॥ শপথ করছি, করব। বল—কে তোমায় অপমান করেছে ?

পদ্মা ॥ প্রথম—সুন্দরক।

বিম্বিসার ॥ সাক্ষী ?

পদ্মা ॥ ঈশ্বর—

বিম্বিসার ॥ কোথায় সুন্দরক ?

[অম্বা ও সুন্দরকের প্রবেশ। দীপ জ্বলিয়া উঠিল]

পদ্মা ॥ ঐ—

সুন্দরক ॥ কে ?

বিম্বিসার ॥ আমি। এ কি! এ আবার কি! তুমি অম্বা—ওর সঙ্গে—(পদ্মার পানে তাকাইয়া) তবে—তাইতো! এ কি ?

অম্বা ॥ কে ? রাজা ?

বিম্বিসার ॥ হাঁ, রাজা। কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম ? এও কি সম্ভব ?

পদ্মা ॥ বিচার যে সম্ভব নয় রাজা—শপথের যে কোনও মূল্য নেই—তা আমি জানতাম রাজা।

বিম্বিসার ॥ (পদ্মার পানে তাকাইয়া) না, না, আমি বিচার করব—বিচার করব। তোমার চোখের জল এখনও জলজ্বল করছে···আমি ও জল মুছে দেব।—কেন জানিনে, আমার মনে হচ্ছে যেন তুমি আমার—তুমি আমার—

পদ্মা ॥ (বিম্বিসারের কথা শেষ না হইতেই তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া)—প্রজা—নিঃসহায়া, নির্যাতিতা প্রজা।

বিম্বিসার ॥ হাঁ, আমি রাজা···প্রজার পিতৃতুল্য রাজা·· আমি বিচার করব।—শোন সুন্দরক—আজ থেকে তুমি আমার রাজ্য হতে নির্বাসিত।

অম্বা ॥ (উন্নত গ্রীবায় দৃপ্ত কণ্ঠে) কেন ?

বিম্বিসার ॥ বিচার।

অম্বা ॥ (শ্লেষপূর্ণ স্বরে)—বিচার ?

বিম্বিসার। বেশ!—না হয় রাজ-আজ্ঞা!

অম্বা ॥ (চোখ রাঙ্গাইয়া)—রাজা, সাবধান—

বিম্বিসার ॥ কাকে চোখ রাঙ্গাচ্ছ অম্বা ?

অম্বা ॥ তোমাকে।

বিম্বিসার ॥ কি স্পর্ধায় ?

অম্বা ॥ (ধীর স্থির স্পষ্ট স্বরে) তোমার ওপর আমার অধিকারের স্পর্ধায়—

বিম্বিসার ॥ (উত্তর শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। পরে ধীর গম্ভীর স্বরে) ঠিক। তোমার অধিকার আমি অস্বীকার করি না।—কেমন করে করব! আজ পর্যন্ত আমার ক্ষীণ রাজশক্তিকে তুমিই তোমার কৃপাদত্ত অর্থে পুষ্ট করে রেখেছ। তোমার ঘৃণ্য দানের উপরই আমার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। তুমি তোমার রূপ-যৌবন দিয়ে আমার শত্রু-মিত্র সবাইকে বশীভূত করে রেখেছে।---কিন্তু আর নয়। পাপ যথেষ্ট হয়েছে। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আহ্বান এসেছে। এখন এই ঘৃণ্য কলুষিত রাজত্ব ত্যাগ করে আমাকে সেই আহ্বান মান্য করতে হবে।

অম্বা ॥ (বিদ্রুপ স্বরে) প্রায়শ্চিত্তের আহ্বান এসেছে ?—কোথা থেকে এলো ?—কে আনলো ?

বিম্বিসার ॥ (হঠাৎ পদ্মার হাত ধরিয়া)—এনেছে এই বালিকা। অম্বা এই নাও তোমার দান—আমার রাজদণ্ড।

সুন্দরক ॥ মহারাজ! এ কি!

পদ্মা ॥ (সুন্দরকের প্রতি) পুরুষ হয়ে তুমি জন্মেছিলে কেন? যদি পুরুষ হয়ে জন্মেছিলে—তবে বিবাহ করে এক স্ত্রীর দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিলে কেন—কাপুরুষ?

অম্বা ॥ (বিম্বিসারের প্রতি) বিম্বিসার—তুমি যা বলছ—আমাকে কি তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে? আমি পরিহাস ভালবাসি না রাজা—

বিম্বিসার ॥ আর রাজা নই—সে স্বপ্ন ভেঙ্গেছে। এই মুহূর্তে আমি রাজদণ্ড ত্যাগ করছি।

অম্বা ॥ এই বালিকার জন্য—রাজ্য তুমি ত্যাগ করছ?

বিম্বিসার ॥ (অবিচলিতভাবে) হাঁ,—করছি।

অম্বা ॥ বুঝে দেখ, জীবনের কতখানি ইতিহাস এর সঙ্গে জড়ানো! কত যুদ্ধ,—কত আত্মত্যাগ—

বিম্বিসার ॥ অন্ধ নারী—তুমি বুঝে দেখ। আমি ঠিক বুঝেছি -ঠিক ধরেছি।

অম্বা ॥ (অবিচলিত স্বরে, দৃঢ় হৃদয়ে) কাপুরুষ—তবে দাও, রাজদণ্ড আমার হাতে দাও—

বিম্বিসার ॥ নাও—(অম্বার হাতে রাজদণ্ড তুলিয়া দিলেন। পরে পদ্মাকে কহিলেন) এস লক্ষ্মী—আমার সঙ্গে এস।

অম্বা ॥ সাবধান বিম্বিসার। এখনও সংযত হও। রক্ষী—

[রাজরক্ষীগণের প্রবেশ]

(পদ্মাকে দেখাইয়া) ঐ নারীকে বন্দী কর (রক্ষীগণ ছুটিয়া গিয়া পদ্মাকে শৃঙ্খলিত করি[illegible]। বিম্বিসারের প্রতি) রাজা! এইবার পার তো ঐ নারী—যার জন্য রাজত্ব ত্যাগ করলে—তাকে তোমার সঙ্গে নাও। চলে এস—সুন্দরক।

[সুন্দরকেব হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অলিন্দসংলগ্ন দ্বিতলেব সোপান শ্রেণীতে পা দিলেন]

বিম্বিসার ॥ জান না—জান না অম্বা তুমি কি করছ! উন্মাদিনী—এখনো নিবৃত্ত হও—নইলে একদিন এর জন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।

অম্বা ॥ (থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বিম্বিসারের দিকে ঘুরিয়া বলিলেন)—অনুতাপ! (শ্লেষহাস্যে) প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে বন্দী করব—তার জন্য অনুতাপ! —অনুতাপ করবে সে—যে নূতন প্রেমের পূর্ণপাত্র মুখে ধরেও পান করতে পারল না

[বলিয়াই পুনরায় সগর্বে উপরে উঠিতে লাগিলেন]

বিম্বিসার ॥ দাঁড়াও প্রগল্‌ভা নারী। এখনো বলছি সাবধান।—বরং আমায় বন্দী করে এই বালিকাকে মুক্ত করে দাও—শোন—

অম্বা ॥ (বিম্বিসার কথা বলিতেই তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কান পাতিয়া তাহা শুনিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইতেই দুই ধাপ নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন) বটে! এত প্রেম! এত দরদ! (সহসা সম্রাজ্ঞীর মত

আদেশসূচক স্বরে)—সুন্দরক, আমার হাতে এই রাজদণ্ড—এই রাজদণ্ড হাতে নিয়ে মগধের অধিশ্বরী আমি—আমি আদেশ করছি—আমার শত্রু ঐ রমণীকে এখনি হত্যা করে আমার নিকট ওর ছিন্নশির নিয়ে এস।

[আদেশ দিয়াই সদর্পে উপরে উঠিতে লাগিলেন]

সুন্দরক ॥ আমি হত্যা করব!

অম্বা ॥ হাঁ, তুমি।

সুন্দরক ॥ আমি হত্যা করব!

অম্বা ॥ হাঁ, তুমি।—যাও, যদি আমাকে চাও—ওকে নিয়ে যাও—ছিন্ন শির—ছিন্ন শির—আমি ওর ছিন্ন শির চাই—

[দ্বিতলে প্রস্থান। স্তম্ভিতভাবে সুন্দরক দাঁড়াইয়া রহিলেন। রক্ষীগণ শাণিত ছুরিকা কোষযুক্ত করিল।]

বিম্বিসার ॥ (চীৎকার করিয়া) অম্বা—অম্বা!—আদেশ প্রত্যাহার কর! ফের—ফের, দেখে যাও কক্ষগাত্রে কার ঐ চিত্র! তারপর পার তো আদেশ কোরো। অম্বা—অম্বা—দেওয়ালের এই ছবির দিকে তাকাও, দেখ কার ঐ প্রতিমূর্তি...দেখে, তারপর আদেশ কোরো—

পদ্মা ॥ (কক্ষগাত্রে সংলগ্ন প্রতিমূর্তির পানে চাহিয়া) পিতা!—আজ তোমার কন্যা আর জামাতাকে দেখে তোমার ছবি হেসে উঠেছে—না—চোখের জল ফেল্‌ছে? (সহসা সুন্দরকের প্রতি) তুমি কি বল স্বামী?

সুন্দরক ॥ (সুন্দরক এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিয়া বিচলিত হইলেন, রক্ষীগণের প্রতি কহিলেন)—ক্ষণেক অপেক্ষা কর। (দ্রুত উপরে উঠিতে লাগিলেন- কিন্তু মাত্র দুই ধাপ উঠিয়াই পরে ঘুরিয়া নামিয়া একেবারে পদ্মার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন). পদ্মা—একটা কথা—শুধু একটা কথা—

পদ্মা ॥ বল—

সুন্দরক ॥ বিবাহ-বাসরে যেরূপ পরিপূর্ণ নির্ভয়ে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলে, আজো কি তেমনি অকম্পিত অবিচলিত হৃদয়ে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করতে পার?

পদ্মা ॥ আমার শ্মশানে দাঁড়িয়ে আজ আবার সে কথা কেন?

সুন্দরক ॥ কথা নয়—পার তুমি?

পদ্মা ॥ জীবনে যদি তোমার হাত ধরতে পেরেছিলাম তবে মরণে পারব না কেন স্বামী—?

সুন্দরক ॥ চুপ্‌। আর কথাটি কয়ো না—চলে এস—(রক্ষীগণের প্রতি) আমাকে অনুসরণ কর—

[বিম্বিসার ব্যতীত সকলে বাহিরের দুয়ার দিয়া প্রস্থান করিলেন।]

বিম্বিসার ॥ (মুখ নত করিয়া কি ভাবিলেন—পরের ধীরে ধীরে মুখ

তুলিয়া কক্ষগাত্রস্থ প্রতিমূর্তির পানে তাকাইয়া)…হে ক্ষমাশীল মহাপুরুষ—তুমি আমায় ক্ষমা কোর না—তুমি আমায় অভিশাপ দাও।—আমার সকল বীভৎসতা, সকল ব্যভিচার তোমার ঐ প্রতিমূর্তির মধ্য দিয়ে তোমার মর্মস্পর্শ করেছে—তবু তুমি মূক—স্থির—অচঞ্চল। তোমার এ ক্ষমার দয়া যে আর সইতে পারি না—তুমি আমায় অভিশাপ দাও যে—(সোপানে পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিয়া)—কে ?

[ধীরে ধীরে অম্বা সোপানপথে অবতরণ করিতেছিলেন]

অম্বা ॥ মগধের রাণী। বিম্বিসার—

বিম্বিসার ॥ আদেশ কর—

অম্বা ॥ আদেশ কর ! এতদূর !—ভালো, পারবে আদেশ পালন করতে ?

বিম্বিসার ॥ যে এতদিন আদেশ করে এসেছে, সে আদেশ পালন করতেও শিখেছে। কি আদেশ বল—

অম্বা ॥ বেশ, আদেশ করব…কিন্তু এখন নয়,—একটু পরে—আগে তার ছিন্ন শির আসুক—

বিম্বিসার ॥ আমার একটি অনুরোধ রাখ—এখনো তারা বধ্যভূমিতে পৌছেনি—সে বালিকা,—সম্পূর্ণ নিরপরাধা—তার প্রাণভিক্ষা দান কর—তোমার আদেশ প্রত্যাহার কর…আমি মুক্তির বারতা নিয়ে অশ্বারোহণে ছুটে যাই…

অম্বা ॥ অম্বা যা এ :বার আদেশ করে তা আর প্রত্যাহার করে না। আর, হত্যা এতক্ষণ শেষ ! আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে সেই শোণিত উৎস দেখতে পাচ্ছি—কি রক্ত ! কি রং ! কি লাল ! বিম্বিসার ও তো রক্ত নয়…ও যে আগুন.. সরে দাঁড়াও—আগুন আমাদের গ্রাস করতে আসছে—

বিম্বিসার ॥ নারী…তোমার এই অবিবেচনার জন্য তোমাকে জীবন ভ'রে অনুশোচনা করতে হবে—আর সে অনুশোচনা আরম্ভ হয়েছে—

অম্বা ॥ মিথ্যা কথা। অনুশোচনা নয়—এ আমার জয়োল্লাস ! হাঃ হাঃ হাঃ ! অকৃতজ্ঞ রাজা ! স্পর্দ্ধা তোমার, আমার সম্মুখে ঐ বালিকাকে… ওঃ মানুষের স্মৃতি কি এতই ক্ষীণ—তার চিত্ত কি এতই দুর্বল ? বিম্বিসার—আজ একবার—শুধু একবার মনে কর দেখি তোমার শৈশবের সাথী—সেই স্বরূপাকে মনে পড়ে ?

বিম্বিসার ॥ না পড়ার কারণ ত' কিছু দেখি না।

অম্বা ॥ শিশু স্বরূপা যখন কিশোরী হ'ল তখন অন্যের সঙ্গে বিবাহ হবে শুনেই সে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দূর বনান্তে পালিয়ে যাবার জন্য নিশীথে এসে তোমার দুয়ারে করাঘাত করে ছিল—মনে পড়ে ? সেদিনও চাঁদনী রাত ছিল—

বিম্বিসার ॥ মনে পড়ে। আমি দুয়ার খুলতেই তুমি মূর্তিমতী জ্যোৎস্নার মত আমার কক্ষখানি উদ্ভাসিত করে দিলে—

অম্বা ॥ তোমার সিংহাসন লাভের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী,—তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পক্ষীয় সভাসদগণকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল—তা তোমার না থাকায় তুমি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে সেই রাত্রে চোখের জল ফেলেছিলে—মনে আছে?

বিম্বিসার ॥ আছে।

অম্বা ॥ (শ্লেষহাস্যে)—আছে? তারপর বুঝি আর কিছু মনে নেই?

বিম্বিসার ॥ কেন থাকবে না—অম্বা? তুমি আমার চোখের জল সইতে পারতে না—সেদিনও পারনি। তুমি আমার চোখের জল মুছে দিয়ে বলেছিলে অর্থের জন্য আমার কোন ভাবনা নেই।

অম্বা ॥ তুমি তখন অবিশ্বাসেব হাসি হেসেছিলে ভেবেছিলে—এক হৃতসর্বস্ব বণিকের কন্যার মুখে ও-কথা—শুধু একটা মিথ্যা আশ্বাস মাত্র। যাক—তারপর কি হ'ল?

বিম্বিসার ॥ তারপর—না, সে কথা থাক।

অম্বা ॥ না—না—থাকবে কেন? আজ নূতন প্রেমের আস্বাদ পেয়ে সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? তবে আমি বলি—তুমি শোন! তারপর সেই প্রৌঢ় ধনকুবের সুচিত্র শ্রেষ্ঠীকে হঠাৎ আমি বিবাহ করতে সম্মত হলাম। তখন সকলের চেয়ে বিস্মিত হয়েছিলে তুমি—বাগ করে আমার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে আর দেখাই করনি—

বিম্বিসার ॥ কখনই যদি আর না করতাম!

অম্বা ॥ (শ্লেষহাস্যে) কেন বিম্বিসার?

বিম্বিসার ॥ তবে আজ বিবেকের এই দারুণ কষাঘাত থেকে রক্ষা পেতাম।

অম্বা ॥ (শ্লেষপূর্ণ স্বরে) কিন্তু—সিংহাসন—

বিম্বিসার ॥ তুচ্ছ সিংহাসন—যার জন্য—

অম্বা ॥ যার জন্য,—বল—বল

বিম্বিসার ॥ যার জন্য তুমি তোমার পতিব ধনভাণ্ডার শূন্য করে পূর্ণ করেছ আমার ধনভাণ্ডার।

অম্বা ॥ বিম্বিসার—

বিম্বিসার ॥ শুধু তাই নয়, যার জন্য তোমার স্বামী—তোমার এই নিষ্ঠুর কৃতঘ্নতা দেখে অভিমানে তাঁর সাধের সংসার ত্যাগ করে হলেন সন্ন্যাসী।

অম্বা ॥ বিম্বিসার···

বিম্বিসার ॥ হাঁ, তুমি সেই পাপিষ্ঠা স্বরূপা—যে তোমার স্বামীর সেই প্রব্রজ্যা কালে আমার এক জারজ কন্যা গর্ভে ধারণ করেছিলে—তারপর ভগবান বুদ্ধের আদেশে তোমার স্বামী যখন গৃহে প্রত্যাবৃত হলেন—তখন তাঁর ভয়ে সেই কন্যাকে বৃদ্ধা ধাত্রীর ক্রোড়ে ফেলে নির্মমা রাক্ষসীর মত কুলত্যাগ করে

পরে—'অম্বা' নামে রূপ-যৌবনের পসরা নিয়ে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করলে।

অম্বা॥ নির্লজ্জ বিম্বিসার! কুণ্ঠা হল না তোমার ও কথা বলতে? (হঠাৎ তাঁর মুখোমুখি হইয়া) ভালো—কার জন্য আমি আমার দেহ বিক্রয় করেছিলাম?

বিম্বিসার॥ স্বীকার করি—তুমি নগরের সকল ধনবান শ্রেষ্ঠী যুবকের রক্ত-শোষণ করে ধনরত্নে আমার দীন ভাণ্ডারই পূর্ণ করে এসেছ—কিন্তু তবু...

অম্বা॥ (রোষে ও ক্ষোভে) কিন্তু তবু দুঃখ এই যে তোমার প্রতি আমার আজীবন একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতিদানে আজ তুমি আমাকে ঘৃণায় পরিত্যাগ করেছ। বিম্বিসার—বিম্বিসার—আমার আত্মার সেই একনিষ্ঠ সতীত্বের অপমান করতে তোমার আজ এতটুকুও দ্বিধা দেখলাম না। কিন্তু বারাঙ্গনা হলেও আমি নারী। আমার সতীত্ব—সে কি এতই তুচ্ছ?

বিম্বিসার॥ সতীত্ব! তোমার সতীত্ব!

অম্বা॥ হাঁ, আমার সতীত্ব। চমকে উঠো না রাজা। সতীত্ব শুধু দেহের ধর্ম নয়—আত্মার একনিষ্ঠাই তার প্রকৃত প্রাণ। শৈশবে আর সকল খেলার সাথী ছেড়ে যার সঙ্গে খেলা করতে ছুটতাম—কৈশোরে আর সকলের প্রণয় উপেক্ষা করে যাকে ভাল বেসেছিলাম—যৌবনে পরস্ত্রী হয়েও যাকে আমার জীবন-মন ইহকাল-পরকাল কায়মনোবাক্যে নিবেদন করেছিলাম—আমার সেই একমাত্র আরাধ্য দেবতার মুখে হাসিটি দেখবার জন্য, আমার সেই হৃদয়েশ্বরকে রাজ্যেশ্বর রূপে অধিষ্ঠিত করবার জন্য—আমি কি না করেছি। আমি আমার এক ঘৃণিত প্রৌঢ়ের গলে বরমাল্য দান করেছি—সিংহাসন ক্রয় করবার জন্য সেই স্বামীর ধনাগার লুণ্ঠন করেছি—পরে তাঁকে সংসার থেকেই বিতাড়িত করেছি। তারপর—প্রিয়তমের সিংহাসন সুদৃঢ় করবার জন্য অগণিত অর্থের প্রয়োজন দেখে আত্ম-সম্মান, মনুষ্যত্বের মর্যাদা সমস্ত বিসর্জন দিয়ে হাস্য-মুখে এই দেহ, এই রূপ-যৌবন বিক্রয় করে কত পশুর রাক্ষসী ক্ষুধা তৃপ্ত করেছি! যখন দুঃখে হাসি পেয়েছে—তখন অভিমানের অশ্রু চোখ থেকে জোর করে নিংড়ে বের করতে হয়েছে। যখন কষ্টে কান্না পেয়েছে—তখন হাসির অভিনয়ে তাদের সুখী করতে হয়েছে। এই যে নরকের যন্ত্রণা—কেন? কার জন্য? কেমন করে এ ব্যথা আমি সয়ে থাকি?—কার হাস্যমুখের দীপ্ত ছবিখানি হৃদয়ের গুপ্ততম কক্ষে এঁকে কষ্টকে কষ্ট মনে করি না—দুঃখকে উপেক্ষা করি? বল—বল বিম্বিসার—কে—কে সে?

বিম্বিসার॥ সে কি জীবনের এক মুহূর্তের তরেও ভুলেছি অম্বা?

অম্বা॥ (চীৎকার করিয়া) তুমি ভুলেছ.. তাই আজ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করছ—'তোমার সতীত্ব! সে কি!' তাই আজ আমার ধ্রুবতারার মত একনিষ্ঠ প্রেম নিয়েও আমি অসতী, আর—সুন্দরকের সেই কুলবধূ মনে মনে তোমাকে আত্মসমর্পণ করেও সতীত্বের ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে স্বর্গলাভ করতে গেছে।

বিম্বিসার॥ সে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করেনি—করেছে তার নিষ্ঠুর

স্বামীর নিকট। অবলীলাক্রমে সে তার জন্মদাতা পিতাকে ফেলে তার স্বামীর সঙ্গে চলে গেল—তার শাণিত ছুরিকা বুকে পেতে নিতে—

অম্বা ॥ তার পিতা! তার পিতা এসে পড়েছেন? কোথায় তিনি?

বিম্বিসার ॥ এইখানে—

অম্বা ॥ এইখানে?

বিম্বিসার ॥ এই কক্ষে—

অম্বা ॥ এই কক্ষে?—বিম্বিসার, তুমি কি জ্ঞান হারিয়েছ?

বিম্বিসার ॥ জ্ঞান আমি হারাইনি—হারিয়েছ তুমি। হারিয়েছে সেই মা—যে তাব নিজের গর্ভের সন্তানকেও চিনতে পারে না।

অম্বা ॥ বিম্বিসার—তার অর্থ?

বিম্বিসার ॥ (অম্বাকে কক্ষাগাত্রস্থিত প্রতিমূর্তির কাছে টানিয়া লইয়া) তার অর্থ এই—তুমি তবে একেও চিনতে পার নি।

অম্বা ॥ এ কি! এ যে সুচিত্র। হাঁ, তাইতো! ঐ তো তাঁর সেই ক্ষমাময় —বৈরাগ্যময় চক্ষু (চিৎকার করিয়া) বিম্বিসার—বিম্বিসার—পদ্মা তবে আমারই কন্যা? আমি তবে নিজের গর্ভের সন্তানকে হত্যা করেছি! তুমি কি করেছ? তুমি কি করলে? এ কথা তুমি পূর্বে আমায় বললে না কেন?

বিম্বিসার ॥ তার মুখের উপর আমি তাকে জারজ সন্তান বলে পরিচিত করতে পারি না অম্বা।

অম্বা ॥ (অপ্রকৃতিস্থভাবে) ছিন্ন শির। ছিন্ন শির। কোথায় তার ছিন্ন শির?

বিম্বিসার ॥ তার স্বামী তোমার মনস্তুষ্টির জন্য নিজ হাতে তা তোমার চরণে ডালি দিতে নিয়ে আসছে।

অম্বা ॥ পালাই—পালাই—না—কোথায় সুন্দরক…কোথায় সে?

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থানোদ্যম। সুচিত্রর প্রবেশ। সুচিত্রকে দেখিয়াই অম্বা থমকিয়া দাঁড়ালেন এবং স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইযা রহিলেন]

সুচিত্র ॥ (অম্বাকে) আপনিই কি আর্যা অম্বা?

[অম্বা প্রশ্ন শুনিয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

বিম্বিসার ॥ আপনার অনুমান সত্য।

সুচিত্র ॥ (অম্বার প্রতি) বেণুবনে পেলাম আমাব কন্যার ধাত্রীর হাতে তার লেখা একখানা চিঠি। তাতে সে আমাকে জানিয়েছে যে তার স্বামী আপনাকে গৃহস্বামিনী করে তাকে গৃহনির্বাসিতা করেছে। কোথায় সে? সে যে আমার বড় স্নেহের—বড় কষ্টের ধন। দয়া করে বলুন কোথায় সে—

অম্বা ॥ (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াই) বিম্বিসার—বিম্বিসার—কোথায় সে?

সুচিত্র ॥ (বিম্বিসারের নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন—পরে রাজাকে চিনিতে পারিয়া) মহারাজ বিম্বিসার! আপনি? এখানে!

বিম্বিসার ॥ আর আমি মহারাজ নই। ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ, আজ রাজ্য নয়—আজ আমি শুধু শান্তি চাই—শান্তি চাই—যে শান্তি আপনার ঐ ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে ভাসছে—ঐ শান্তির এক কণা আমি ভিক্ষা চাই। পাবো? ভিক্ষুবর! বলুন পাবো? জ্বলে গেল—দেহ-মন জ্বলে গেল—

[রাজপথ দিয়া সশিষ্য বুদ্ধদেব বেণুবনে গমন করিতেছিলেন। শিষ্যগণের জয়ধ্বনি ঠিক এই সময়ে শোনা গেল—সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।]

সুচিত্র ॥ (সেই ধ্বনিতে যোগ দিলেন) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

বিম্বিসার ॥ (সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

সুচিত্র ॥ (রাজাকে জয়ধ্বনিতে যোগদান করিতে দেখিয়া—চমকিত হইয়া তাঁহার পানে তাকাইয়া বাহিরের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে) ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

বিম্বিসার ॥ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

সুচিত্র ॥ সংঘং শরণং গচ্ছামি।

বিম্বিসার ॥ সংঘং শরণং গচ্ছামি।

সুচিত্র ॥ (বিম্বিসারকে) বুঝেছি—তবে আপনারও ডাক এসেছে। তবে চলুন রাজা—ভগবান বুদ্ধ সশিষ্যে বেণুবনে চলেছেন—সেখানে গিয়ে একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করি।

বিম্বিসার ॥ চলুন—শীঘ্র চলুন—

সুচিত্র ॥ (অম্বার প্রতি) পদ্মা কোথায়—বলুন, শীঘ্র বলুন—আমার যে আর দাঁড়াবার সময় নেই—

অম্বা ॥ (ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতেছিল)

সুচিত্র ॥ ওকি আর্যে?

বিম্বিসার ॥ ভিক্ষুবর সংক্ষেপে শুনে রাখুন—সে স্বর্গে।

সুচিত্র ॥ (স্তম্ভিত হইয়া পরে প্রশান্তভাবে)—যাক আজ তবে মুক্তি। প্রথম যখন শ্রীবুদ্ধের চরণতলে আশ্রয় নিলাম—কিছুদিন পরে তিনি বললেন—'সংসারে তোমার প্রয়োজন হয়েছে—গৃহে যাও।' দুই বৎসর পরে গৃহে গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী একটি কন্যাসন্তান প্রসব করে আমার গৃহে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্বে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন! সেই মাতৃহারা শিশুকে ভগবানের দান মনে করে, ফেলতে পারলাম না—কি কষ্টেই না তাকে আমার লালন-পালন করতে হল—তারপর সে বিবাহ-যোগ্যা হলে তাকে তারই মনোনীত স্বামীর হাতে সমর্পণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলাম—কিন্তু মায়ামুক্ত হতে পারিনি! আজ আমার জীবনের সেই একমাত্র স্নেহের মায়াবন্ধন খসে গেল।

[সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন—পরে সুচিত্র সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন]

চলুন মহারাজ—

[ধীর পদক্ষেপে উভয়ে যাইতেছিলেন এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অম্বা বিম্বিসারকে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন।]

অম্বা ॥ বিম্বিসার, দাঁড়াও।

[বিম্বিসার এবং সঙ্গে সঙ্গে সুচিত্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন]

(বিম্বিসারের প্রতি) তুমি আমার আদেশ পালন করবে বলেছিলে—সেই আদেশ আমি এখন করব।

বিম্বিসার ॥ এখন! এখন যে তুমি আদেশ করবে শুনে ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে অম্বা—

অম্বা ॥ তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর—

বিম্বিসার ॥ হুঁ। বেশ···কি আদেশ ?

অম্বা ॥ এই রাজদণ্ড গ্রহণ করে আমায় মুক্তি দাও—

বিম্বিসার ॥ অম্বা—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর অম্বা—

অম্বা ॥ (অবিচলিত হৃদয়ে দৃঢ়স্বরে) নাও, আমার আদেশ, নাও—

বিম্বিসার ॥ কিন্তু—

অম্বা ॥ আর কিন্তু নেই। নাও—আমার আদেশ পালন কর---

বিম্বিসার ॥ (রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া) তবু—

অম্বা ॥ বৃথা অনুনয়। নৃপতি বিম্বিসার—তুমি তোমার সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে আমাকে দিয়ে আমার কন্যাকে হত্যা করিয়েছ—এ তারই প্রতিশোধ। হাঃ হাঃ। (পরে হঠাৎ শান্ত হইয়া) চলুন ভিক্ষুবর—

সুচিত্র ॥ কোথায় ?

অম্বা ॥ আপনি যেখানে চলেছেন।

সুচিত্র ॥ আমি বেণুবনে যাচ্ছি।

অম্বা ॥ আমিও বেণুবনে যাব।

সুচিত্র ॥ বেণুবনে ? কেন যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

অম্বা ॥ রাজা বিম্বিসার যাচ্ছিলেন কেন ?

সুচিত্র ॥ বোধ হয় তাঁর আহ্বান এসেছিল—

অম্বা ॥ আমারও আহ্বান এসেছে। শুধু একজনের আহ্বান নয়—দু'জনের। আমার ভুল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য স্বর্গ হতে ডাকছে পদ্মা—আর স্বর্গ কি নরক জানি না—সেখান হতে মায়াবিনীর স্বরে ডাকছে সুরূপা। কোথায় যাব ঠিক করতেই বেণুবনে চলেছি।

সুচিত্র ॥ একি! তবে তুমিই সেই ..এতক্ষণে বুঝলাম। হুঁ—এমন পরীক্ষায় আর কখনো পড়িনি। (কি ভাবিলেন—পরে অবিচলিত চিত্তে) বেশ, এসো।

বিম্বিসার ॥ শুনুন ভিক্ষুবর—আজ আমার জীবনের বজ্রপাত। [illegible]ক
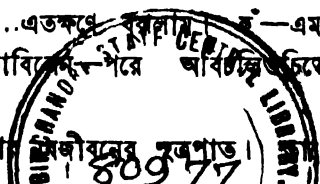
পুণ্য-পূত করতে চাই ভগবান তথাগতের মঙ্গলাশিসে। আমি তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ করছি—

সুচিত্র ॥ বেশ—আমি তাঁর নিকট গিয়ে এ নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করছি। তিনি বোধ হয় সশিষ্যে এই গৃহের সম্মুখেই এসে পড়েছেন। তবে আমি আসি—

অম্বা ॥ (বিম্বিসারের প্রতি) আমিও আসি রাজা।

[উভয়ের প্রস্থান। বিম্বিসার তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য বাতায়ন পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অলিন্দ-সংলগ্ন দ্বারপথে সুন্দরকের প্রবেশ]

সুন্দরক ॥ রাজা! অম্বা কই?

বিম্বিসার ॥ (চমকিয়া উঠিয়া) কে! সুন্দরক! পদ্মা…(মুখ ঘুরাইয়া) না, যাও, তুমি আমায় মুখ দেখিয়ো না—যাও—দূর হও—

সুন্দরক ॥ (কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া) হাঁ, যাব, কিন্তু একটু প্রয়োজন আছে। একবার অম্বার সঙ্গে দেখা করে তবে যাব।

বিম্বিসার ॥ (তাঁহার দিকে না তাকাইয়া) আমার সম্মুখে তার ছিন্ন শির বের কোরো না—সাবধান, যাও সেই রাক্ষসীর চরণে ডালি দিয়ে এস—

সুন্দরক ॥ রাজা—রাজা—আমি সেই রাক্ষসীর চরণে ছিন্ন শির ডালি দেব বলে এসেছি—তবে সে ছিন্ন শির পদ্মার নয়—আমার।

বিম্বিসার ॥ সে কি!

সুন্দরক ॥ রাজা—যে প্রাণে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতাম—সেই প্রাণকে সে-ই একদিন মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছিল—তার-ই দেওয়া প্রাণে তাকে আঘাত করবার কতটুকু শক্তি থাকে রাজা? আমি তাকে হত্যা করিনি। রাজ-আজ্ঞা অমান্য করে তাকে আমি মুক্তি দিয়েছি। মুক্তি দিয়ে ফিরে এসেছি—রাজ-আজ্ঞা অমান্যের জন্য—শাস্তিস্বরূপ এই লম্পট হতভাগ্যের ছিন্ন মুণ্ড তাঁর চরণে ডালি দিতে।

বিম্বিসার ॥ বটে! বটে! সুন্দরক—(ছুটিয়া সুন্দরকের হাত ধরিয়া) সে বেঁচে আছে? তবে সে বেঁচে আছে?

সুন্দরক ॥ শুধু বেঁচে নেই—জীবনে রসে ভরপুর হয়ে আছে। ঐ বুদ্ধদেবের শিষ্যদলের পুরভাগে সে তার দিব্য দীপ্তিতে পথ আলোকিত করে চলেছে।

বিম্বিসার ॥ সুন্দরক! আমায় ক্ষমা কর তুমি—তুমি জানো না সে আমার কে?

সুন্দরক ॥ কে?

বিম্বিসার ॥ সে আমার—সে আমার কন্যা।

(বাহিরের দ্বারপথে পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা ॥ (বিম্বিসারের নিকট ছুটিয়া গিয়া) শুনতে পেলাম এখানে পিতা এসেছিলেন—তিনি কোথায় রাজা?

বিম্বিসার ॥ তিনি এইমাত্র তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান বুদ্ধদেবকে এখানে নিমন্ত্রণ করে আনতে গিয়েছেন—

পদ্মা ॥ মা! আমার মা!

বিম্বিসার ॥ হাঁ, তোমার মা—

পদ্মা ॥ যে আমার পিতাকে বঞ্চনা করেছিল—সেই মা?

বিম্বিসার ॥ তবু তোমায় গর্ভে ধরেছিল পদ্মা!

পদ্মা ॥ কৃতার্থ করেছিল —

বিম্বিসার ॥ জননী অশ্রদ্ধার পাত্রী নয় মা।

পদ্মা ॥ গর্ভধারণেই নারী সন্তানের পূজ্যা হয় না রাজা। অসহায় সন্তানকে লালন-পালন করে বলেই মা সন্তানের দেবতা—যে তা না করে—সে মা নয়—রাক্ষসী। কোথায় সে?

(সোল্লাসে অম্বার প্রবেশ)

অম্বা ॥ (ছুটিয়া বিম্বিসারের সম্মুখে গিয়া) শোন রাজা—ভগবান বুদ্ধ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন—কি অর্ঘ্য দেব জান?

সুন্দরক ॥ (পদ্মাকে জনান্তিকে) পদ্মা—পালাও—পালাও।

পদ্মা ॥ কেন পালাব স্বামী?

অম্বা ॥ (ঐ কথা শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিয়া তাকাইয়া দেখেন—পদ্মা) পদ্মা—তুই? (ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন) এ কি স্বপ্ন না সত্য? সুন্দরক! তবে তুমি একে হত্যা করনি?

সুন্দরক ॥ (অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া) না। বিনিময়ে নিজের শির দিতে এসেছি।

অম্বা ॥ আমার কান্না পাচ্ছে—আমার কান্না পাচ্ছে! সুন্দরক—যদি একে হত্যা করতে—তবে তোমাকে কি করতাম জান? (উত্তর না পাইয়া কটি হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া—রোষকষায়িত নয়নে) তাহলে তোমায় আমি স্বহস্তে হত্যা করতাম। (আবেগে) আনন্দে আমার কান্না পাচ্ছে। আয় মা—আমার বুকে আয়।

[এই বলিয়া পদ্মাকে জড়াইয়া ধরিলেন]

পদ্মা ॥ (তাঁহার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে করিতে) ছাড়ো—আমায় ছেড়ে দাও তুমি—

অম্বা ॥ (হঠাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে) আমায় ক্ষমা কর্ মা—আজ ভাগ্যদোষে আমি অম্বা—কিন্তু—

[পদ্মার কানে কানে কি কহিলেন]

পদ্মা ॥ বটে! তুমিই সেই রাক্ষসী? স্বীকার না হয় করলাম তুমি আমাকে গর্ভে ধরেছিলে—কিন্তু তোমার লালসার ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে

আমাকে গর্ভে ধরেছিলে বলেই মায়ের গৌরব লাভ করতে তোমার কি অধিকার আছে ? মায়ের কাজ তুমি কি করেছ ? তুমি আবার মা !

(সুচিত্রর প্রবেশ)

সুচিত্র ॥ (পদ্মার প্রতি) মা—ভগবানের নিকট শুনলাম তুই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে গিয়েছিলি—আমি জানতাম তুই আমাকে মায়ামুক্ত করে জন্মের মত চলে গেছিস্।

পদ্মা ॥ বাবা—বাবা—(ছুটিয়া তাঁহার বুকে পড়িয়া—অম্বাকে দেখাইয়া) দেখছ ? দেখছ ? ঐ রাক্ষসীকে দেখছ ?—চল এখান থেকে পালাই।

সুচিত্র ॥ রাক্ষসী নয় মা—তোর জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী। পদ্মা, এই তোর মা।

পদ্মা ॥ (সুচিত্রের প্রতি) বাবা—ও মা নয়—ও রাক্ষসী—

সুচিত্র ॥ যখন ওকে আমি ক্ষমা করতে পেরেছি, তখন তুই কেন পারবি না মা। স্বরূপা এই নাও তোমার মেয়ে নাও।

[পদ্মাকে অম্বার হাতে সঁপিয়া দিলেন]

অম্বা ॥ (আনত মুখেই ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পরে মুখ তুলিয়া) আমায় তুমি স্পর্শ কোরো না মা। আমি অন্য জগতের—

[মুখ নামাইলেন। দ্বারে করাঘাত হইল]

সুচিত্র ॥ (শশব্যস্ত) ভগবান—ভগবান।

[বিম্বিসার ত্বরিৎপদে গিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। শান্ত সৌম্য প্রসন্ন নয়ন পুণ্যদর্শন বুদ্ধদেব দৃষ্টিগোচর হইলেন। কি এক স্বর্গীয় আভায় কক্ষ দীপ্যোজ্জ্বল হইল। অম্বা ব্যতীত সকলে আবৃত্তি করিলেন।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি

সংঘং শরণং গচ্ছামি

আবৃত্তি অন্তে সকলে প্রণত হইলেন। ভগবান তাঁহার কর-কমল সম্মুখে প্রসারিত করিয়া প্রসন্ন-হাস্যে সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। একমাত্র অম্বা বিদ্রোহিণীর মত একধারে উন্নত গ্রীবায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

বিম্বিসার ॥ আজ আমি ধন্য। আজ আমার গৃহ ভগবানের পদরজ স্পর্শে সার্থক হল।

অম্বা ॥ (ধীরে অথচ সুস্পষ্ট স্বরে—বিম্বিসারের প্রতি বক্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া) গৃহ আমার—তোমার নয় রাজা।

বিম্বিসার ॥ (স্তম্ভিত হইয়া, পরে) বেশ। ভগবান, আগামী প্রভাতে আমার রাজপ্রাসাদে সশিষ্য আপনার নিমন্ত্রণ

অম্বা ॥ (প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে) ভগবান সপ্তাহকাল এ গৃহে অবস্থান করবেন—আমাকে কথা দিয়েছেন।

বিম্বিসার ॥ (নিষ্ফল রোষে) এক পতিতার কুটিরে—

অম্বা ॥ এ আর পতিতার কুটির নয়—এ এখন পতিত-পাবনের আশ্রম। আমার যথাসর্বস্ব আমি সঙ্ঘে দান করেছি—এ এখন সঙ্ঘের সম্পত্তি।

সুচিত্র ॥ (অম্বাকে) আর তুমি?

অম্বা ॥ আমি—আমি আমার ধ্রুবতারার পানে চেয়ে থাকব।

বুদ্ধদেব। (দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন) স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি—

[সমবেত গীত]

শ্রীঘন মুনীন্দ্র জয় সুগত জয় হে।
প্রচার প্রেম যার কোটি বিশ্বময় হে ॥
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ভিক্ষু জন শ্রমণগণ শরণ পাপহারী।
সংঘরাজ সিদ্ধবাক ধর্ম প্রেমচারী ॥
মোক্ষ বিধান পূত পাদপদ্মদ্বয় হে।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি ॥
উদার গান তৃপ্ত প্রাণ, সত্য ধ্যানধারী।
মহান নির্বাণ দান ও দুঃখ ত্রাণকারী ॥
বুদ্ধ অমিতাভ হব ক্রুদ্ধ মার ভয় হে।
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

যবনিকা

20 May Fair, Ballygunge
13/7/24

সবিনয় নিবেদন,

আপনি শুনে খুসি হবেন যে 'মুক্তির ডাক' আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে এখানি যথার্থই একখানি drama। বাঙলা সাহিত্যে ও-জিনিষ একান্ত দুর্লভ। নাটককে আমরা দৃশ্যকাব্য বলি। কিন্তু যা যথার্থ নাটক তা শুধু দেখবার বস্তু নয়, পড়বারও জিনিষ। সত্য কথা বলতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ নাটক আমরা পড়বার বই হিসেবেই জানি, acting piece হিসেবে জানি নে। আমরা চোখে না দেখলেও মানসচক্ষে সে সব নাটকের অভিনয় দেখতে পাই। 'মুক্তির ডাকে'র অভিনয়ও আমি মানসচক্ষে দেখেছি এবং তাই দেখেই বলছি যে 'মুক্তির ডাক' একখানি যথার্থ drama।

বাঙলা সাহিত্যে নাটক এক রকম নেই বল্লেই হয়; আশা করি আপনি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

মুক্তির ডাক

প্রসঙ্গে

"একাঙ্ক নাটকের ইতিহাস অনুশীলন করলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এই ধরনের নাটকের প্রথম প্রকাশ হয়। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন একাঙ্কিকা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ইংলণ্ডে বার্ণার্ড শ, বেরী এবং গলস্ওয়র্দী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের আশীর্বাদে একাঙ্কিকা ধন্য হয়নি। Curtain raiser রূপে একাঙ্ক নাটক তখন প্রায় উপহাসের বস্তু ছিল। সিন্জ ইয়েটেস্ এবং লেডী গ্রেগরী প্রভৃতি আইরিশ লেখক এবং লেখিকাবৃন্দ ও তাঁদের আইরিশ 'লিটারারী থিয়েটার' এবং ডাবলিন 'আবে থিয়েটার এবং পরবর্তী কালে ম্যাঞ্চেষ্টারে মিস্ হর্নিম্যানের 'গেয়েটি থিয়েটার' ও গ্লাসকো 'রিপারেটরী থিয়েটার' ইংলণ্ডে একাঙ্ক নাটকের প্রসারের পথে গভীর সহায়তা করে। এই ভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে একাঙ্কিকা সাহিত্য সমাজে তার পূর্ণ আসন লাভ করেছে। উপস্থিত ইংলণ্ডে B. D. L. অর্থাৎ ব্রিটিশ ড্রামা লীগ এবং S. C. D.A স্কটিশ কম্যুমিউনিটি ড্রামা এসোসিয়েশনের বাৎসরিক প্রতিযোগিতা এবং নানারূপ প্রচেষ্টা একাঙ্কিকাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে। আমেরিকা এই নাট্যসাহিত্যের উজ্জীবনের পথে আজ শ্রেষ্ঠ অবদান রেখে চলেছে।"

যখন হর্নিম্যানের ও গ্লাসগোর রিপারেটরী থিয়েটারের হাতে এই একাঙ্কিকা সাহিত্যের নব নব রূপ পরিগ্রহ করে চলেছিল ঠিক সেই সময়েই বাংলা সাহিত্যে এর অনুপ্রবেশ হয়। ১৯২৩ সালে শ্রীমন্মথ রায়ের "মুক্তির ডাক" এই পথের প্রথম পথিকৃৎ। ইতিপূর্বে একাঙ্ক নাটক যে আদৌ লিখিত হয় নি তা নয়, যে মুষ্টিমেয় কয়েকখানি লিখিত হয়েছিল তা farce নামে আখ্যাত হতে পারে; তদুপরি আবার সেইগুলি বহু দৃশ্যে সমৃদ্ধ থাকায় নীরবচ্ছিন্ন একাঙ্কিকা হয় নি। স্বল্প পরিসরের মধ্যে শক্তির যে বিক্ষুব্ধ আলোড়ন দেখা দেয় তার অভাব এই জাতীয় নাটিকায় অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা যায়। শ্রীমন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। এই নাটিকা পাঠ করে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'মুক্তির ডাক আমার খুব ভাল লেগেছে এখানি যথার্থই একখানি ড্রামা। বাংলা সাহিত্যে ওই জিনিস একান্ত দুর্লভ।' বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, 'এক বুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক দিঘি পদ্ম দেখলে দু' চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দু' চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়।'

গ্রন্থম্ প্রকাশিত 'একাঙ্ক নাটক সংকলন' গ্রন্থে
নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী লিখিত ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত

বাংলা একাঙ্ক নাটকের সুবর্ণজয়ন্তী

আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, ১৯২৩ সালের বড়দিনে কলিকাতার স্টার থিয়েটার নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত একদৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্ক 'মুক্তির ডাক' অভিনয় দ্বারা বাংলার নাট্যসাহিত্যে এবং নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন। বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক গবেষকগণ 'মুক্তির ডাক' রচয়িতা নাট্যকার মন্মথ রায়কে বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রবর্তকের সম্মান দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের বীরবল, সমালোচক-শ্রেষ্ঠ প্রমথ চৌধুরী 'মুক্তির ডাক' নাটকটিকে 'যথার্থই একখানি ড্রামা' রূপে আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর হইতে বাংলা একাঙ্ক নাটক পরম জনপ্রিয়তায় অভিষিক্ত হইয়াছে। এখন শুধু মহানগরীতে নয়, গ্রামে গ্রামেও একাঙ্ক নাটক অভিনীত হইতেছে। দৃশ্যপটের আড়ম্বর আবশ্যক হয় না এবং প্রযোজনার ব্যয়ও কম বলিয়া একাঙ্ক নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ক্রমবর্ধমান। উন্নত মানের একাঙ্ক নাটক আজ আর দুর্লভ নয়। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার অভিযানে একাঙ্ক নাটক আজ অনন্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 'মুক্তির ডাক' আমাদের নাট্যজগতে যে রাজপথের সন্ধান দিয়াছিল, এই বৎসর তাহার সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান সঙ্গত মনে করি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পেশাদার ও অপেশাদার থিয়েটার এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আগামী বড়দিন ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ হইতে অন্ততঃ ছয়মাসকাল এই উৎসবের জন্য চিহ্নিত রাখিয়া নাট্য উৎসবের মাধ্যমে একাঙ্ক নাটকের জয়যাত্রাকে অভিনন্দিত করিবেন, আমাদের এই আশা এবং আকাঙ্ক্ষা।

স্বাক্ষর ঃ

রমেশচন্দ্র মজুমদার	সত্যজিৎ রায়	নীহাররঞ্জন রায়
সত্যেন বোস	মৃণাল সেন	বিজন ভট্টাচার্য
সুকুমার সেন	ঋত্বিক ঘটক	তরুণ রায়
অন্নদাশঙ্কর রায়	উত্তমকুমার	দেবনারায়ণ গুপ্ত
প্রেমেন্দ্র মিত্র	আশুতোষ ভট্টাচার্য	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
মনোজ বসু	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	অজিতকুমার ঘোষ
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	দক্ষিণারঞ্জন বসু	শুদ্ধসত্ত্ব বসু
রমা চৌধুরী	সুশীল রায়	জীবেন্দ্র সিংহ রায়
কালীশ মুখোপাধ্যায়	উৎপল দত্ত	বিনয় সরকার

একাঙ্কিকা

একাঙ্কিকা

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়,

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, এম-এ, বার-এট-ল,

শ্রীচরণকমলেষু।

আমার প্রথম একাঙ্ক-নাটক 'মুক্তির ডাক' পাঠ করিয়া সম্পূর্ণ অখ্যাত অজ্ঞাত আমাকে আপনি ১৩-৭-২৪ তারিখে প্রথম পত্র লেখেন। সেই পত্রে যে উৎসাহ পাইয়াছিলাম, যে আশীর্বাদ ছিল, তাহাই আমাকে আত্ম-বিশ্বাসী করিয়াছে, দুঃসাহসী করিয়াছে, নাটক লেখায় সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। এ-কথাটি কেহই হয়ত জানেন না, আপনিও না, এই কথাটি জানাইয়া আমার 'একাঙ্কিকা' আপনাকে প্রণাম করিল।

নিবেদন ইতি

স্নেহধন্য

মন্মথ রায়

১০ই নভেম্বর, ১৯৩১

'বরদাভবন'

বালুরঘাট (দিনাজপুর)

প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের কথা

(উদ্ধৃতি)

আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে নাট্যকারের প্রশংসাপত্র লিখতে বসিনি। সে ধৃষ্টতা আমার নেই। যাঁর ঢাকায় ছাত্রাবস্থায় লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তোমার টেক্‌নিক্ Perfect, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী যাঁর লেখা পড়ে তারিফ করেছেন ও নজরুল যাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি কিন্তু তাকে অধিকতর উজ্জ্বল করে দেখানোর মত আলো ও অভিমান আমার নেই—তাঁব সম্বন্ধে নতুন করে আর কি বলব।

বঙ্গসাহিত্যে এই একাঙ্ক নাটিকাগুলি মন্মথ রায়েব এক অভিনব দান। মাসিকের পাতায় যেগুলি ছড়িয়েছিল তাই কুড়িযে নিয়ে একাঙ্কিকার জন্ম।

আজ দীপান্বিতা পূজার দিনে নাট্যকাবেব একাঙ্ক নাটিকার দীপালী সাজিয়ে বাণীর পবিত্র অঙ্গনে প্রবেশ করলুম—জানি. আবতি করবার যোগ্যতর উপকবণ আব আমার জুটবে না।

শ্রীঅখিল নিয়োগী

দীপান্বিতা, ১৩৩৮

পরিবর্ধিত সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

এই একাঙ্কিকায় গ্রথিত নাটিকাগুলির বচনাকালের ব্যাপ্তি হচ্ছে ১৩৩২ সাল থেকে ১৩৬১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ উনত্রিশ বছর। [বর্তমান সংস্করণে প্রত্যেকটি রচনা শেষে পত্রিকাব নামসহ তাব প্রথম প্রকাশেব তারিখও দিয়ে দেওয়া হয়েছে।) কিন্তু তবুও পডবার সময় পাঠকবা গ্রন্থকারের তরুণ ও পরিণত উভয়কালেব রচনার মধ্যে গুণগত বিশেষ কোন পার্থক্য দেখতে পারেন না। অর্থাৎ বত্রিশ বছব আগে যখন তিনি লিখতে নেমেছিলেন তখনও তিনি কাঁচা হাত নিযে লিখতে নামেন নি। প্রথম থেকেই রচনাগুণেব দিক দিয়ে তিনি প্রবীণ লেখক ' অথচ উদার, দরদী মনটি তাঁর বরাবরই যে অতি-আধুনিক, তাব প্রমাণ এই একাঙ্কিকার বিভিন্ন রচনার মধ্যেই মিলবে।

মহালয়া, ১৩৬২

মনোমোহন ঘোষ

রাজপুরী

[কোশল-রাজধানী শ্রাবস্তী। রাজা প্রসেনজিৎ-এর রাজপ্রাসাদ-মধ্যস্থ মহাসমারোহে-সজ্জিত উদ্যান-ভবন। বাহিরে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-স্নাত কুঞ্জবীথি। সম্মুখে শ্বেত পাথরের অঙ্গনে ঝর্ণা। কক্ষ মধ্যে সহস্র প্রদীপের পূর্ণদীপ্তি।

চৈত্র মাসের বসন্ত-উৎসব। আজ কনিষ্ঠ কুমার রাজশেখরের তৃতীয় বার্ষিক জন্মতিথি বলিয়া বসন্তোৎসবের বিচিত্র গরিমা সমধিক বর্ধিত।

কুঞ্জবীথির অন্তরালে, ঝর্ণার চারিপাশে, প্রাসাদকক্ষের মধ্যে আবির কুমকুম ও রং লইয়া রাজান্তঃপুরের নরনারী উৎসবমত্ত।

দৃশ্য-পট উত্তোলিত হইলে দেখা গেল সেই পরিপূর্ণ উৎসবের উন্মত্ত বিশৃঙ্খলতা—আর শোনা গেল অজস্র কণ্ঠের বিচিত্র কলগান। সহসা ভেরী ও দামামা বাজিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ পুরুষগণ 'রাজা' এবং নারীগণ 'রানী' 'রানী' বলিয়া চীৎকার করিয়া সকলে কক্ষমধ্যে যথাশীঘ্র সমবেত হইলেন।

কক্ষের তিনটি দরজা দক্ষিণের ও বামের দরজা দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র.. কিন্তু মধ্যের দরজাটি সুবিশাল। মধ্যের এই সুবিশাল দরজাটি ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। এই দরজা দিয় রানী বাসবক্ষত্রিয়া, তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশু-পুত্র কুমার রাজশেখরকে দুইহস্তে ঊর্ধ্বে ধারণ পূর্বক নাচাইতে নাচাইতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতেই ছিলেন রাজা প্রসেনজিৎ। তাঁহার হাতে ছিল একটি স্বর্ণ-পেটিকা। রাজা ও রানী কক্ষে প্রবেশ করিলেই তাঁহাদের এক পাশে পুরুষগণ ও অন্য পাশে নারীগণ রং-এর পিচকারী হস্তে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রং-ছোঁড়া করিতে করিতে গান করিতে লাগিলেন।

গান শেষ হইলে সকলেই আভূমি নত হইয়া রাজা-রানীকে অভিবাদন করিলেন।]

রাজা॥ [দুই হস্ত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া] স্বস্তি। স্বস্তি! স্বস্তি! [তাহার পর] উৎসব এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। তোমাদের জন্য ভগবান বুদ্ধের শ্রীচরণে আবির-কুঙ্কুম নিবেদন করে সেই চরণাশিষের ডালি নাও···সবার কপালে এই মঙ্গল-ধূলির টিপ্ দিয়ে দাও

রানী॥ [চমকিয়া উঠিয়া] আমি!

রাজা॥ হাঁ, তুমি।

রানী। না রাজা,—তুমিই দাও চেয়ে দেখ রাজশেখর এই রং-এর খেলা দেখে কেমন খুশি হয়ে উঠেছে। ওর এই পদ্ম আঁখি দুটিতে কেমন হাসি ফুটে উঠেছে! কি চোখ! কি সুন্দর! [কুমারের চোখে চুম্বন করিতে লাগিলেন।]

পুরুষগণ॥ দিন···আমাদের মাথায় ভগবানের চরণ-ধূলি দিন..

নারীগণ॥ রানীমা! আমাদের কপালে ভগবানের ঐ চরণ-ধূলির টিপ্ পরিয়ে দিন

রাজা॥ রানী। কুমারকে আমার হাতে দিয়ে এই ডালি ধর

রানী ॥ রাজা—রাজশেখর আমার পানে চেয়ে আছে...অপলক চোখে চেয়ে আছে! চরণ-ধূলি তুমিই বিলিয়ে দাও...শেখর! আমার সোনা! আমার মাণিক!

[কুমারকে পুনরায় চুম্বন-বন্যায় ভাসাইয়া দিলেন]

রাজা ॥ কিন্তু রানী, এ মঙ্গলাশিস তোমার পুণ্য-হস্তেই বিতরিত হয় .. স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা।

রানী ॥ আমার পুণ্য-হস্তে! কাঁপিয়া উঠিলেন। সংযত হইয়া কুমারের পানে অপলক দৃষ্টিতে] না রাজা। আমাকে ক্ষমা কর। আমি পারবো না...আমার মানিক আমার পানে তাকিয়ে আছে...আমার এটুকু তৃপ্তি...থাক না!

রাজা ॥ কিন্তু তুমি যে রানী শাক্য-কুল-দুহিতা! ভগবান বুদ্ধের পুণ্য-বংশের পূত-রক্তে তোমার জন্ম। ভারতবর্ষের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শাক্য-বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ বলে ভগবান বুদ্ধের প্রসাদ বিতরণের জন্য সকলে যে তোমার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে।

রানী ॥ আর এই শেখর! সে কি আমার দিকে চেয়ে নাই? না রাজা শেখর ভয় পেয়েছে সে কেঁপে উঠেছে তার আঁখিতারা ভয়ে মিট্ মিট্ করছে ...ও কেঁদে উঠবে। আমি ওকে নিয়ে বাইরে ঐ ঝর্ণার ধারে চললাম শেখর! আমার সোনা! আমার মানিক! আমার লক্ষ্মী!

[তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে অঙ্গনের পথে ঝর্ণার দিকে প্রস্থান।]

রাজা ॥ রানী কুমারকে নিয়েই পাগল। আমি এ চরণাশিস তুলে রাখলাম ..রানী অন্য সময় তোমাদের এ প্রসাদ দিবেন। চল আমরা কলা-ভবনে যাই। কুমারের জন্ম-তিথি উপলক্ষে রানী কপিলাবস্তু হতে তাঁর পিতা শাক্যরাজার সভাকবি কবিশেখরকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। তাঁর গীতিকাব্য, তাঁর গান· সুন্দর·· অতি সুন্দর। যাও, তোমরা সেই সঙ্গীত-সুধায় স্নান করে ধন্য হয়ে এস...রানীকে সঙ্গে নিয়ে আমিও এখনি যাবো।

[অঙ্গনের পথে রাজা ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

[রাজা ধীরে ধীরে অঙ্গনের পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রানীকে ডাকিবেন, কি, নিজে রানীর নিকট যাইবেন চিন্তা করিতে করিতে রানীকে ডাক দিলেন...] রানী!

রানী ॥ [প্রাঙ্গণ হইতেই] আমায় ডাকছো?

রাজা ॥ ডেকে কি কোন দোষ করলাম?

[এমন সময় কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া রানী রাজার নিকট কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

রানী ॥ [রাজার প্রতি] রাগ করেছ বুঝি? কিন্তু, র'সো ,— মল্লিকা! [দক্ষিণের দ্বারপথে রানীর সহচরী মল্লিকার প্রবেশ] জলতরঙ্গের

বাদ্য এনে বাজা...শেখরের চোখে ঘুমের পরী উড়ে এসে চুমো দিক...[কুমারকে চুম্বন করিয়া মল্লিকার ক্রোড়ে দিলেন। মল্লিকা তাহাকে লইয়া দক্ষিণের দ্বারপথে পার্শ্বস্থ কক্ষান্তরে চলিয়া গেল এবং শীঘ্রই জলতরঙ্গের বাদ্য আরম্ভ হইল। সেই মৃদু সুর-লহরীর মধ্যেই রাজা-রানী কথোপকথন করিতে লাগিলেন] খুব রাগ করেছ, না?

রাজা॥ আমি হয় ত রাগ করিনি. কিন্তু, পুরবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়েছে। তোমার ঐ কল্যাণহস্তের মঙ্গসম্পর্শ হতে তাদের বঞ্চিত করলে কেন রানী?

রানী॥ রাজা। আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।—ঠিক উত্তর দেবে?

রাজা॥ কি রানী?

রানী॥ আমাকে তুমি কি ভাবো? আমি মানুষ, না দেবী?

রাজা॥ তুমি দেবী...স্বয়ং ভগবানের পূত-রক্ত তোমার শিরায়··ধমনীতে প্রবাহিত...

রানী॥ এবং সেই জন্যই, বৌদ্ধসঙ্ঘে কৌলিন্যলাভের সহজ পন্থাস্বরূপ তুমি তোমার সামন্ত শাক্যরাজকে তোমার রক্তচক্ষুতে বশীভূত করে আমাকে তোমার সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করেছ,—কেমন?

রাজা॥ ঠিক।

রানী॥ বেশ। কিন্তু, এই আমি যদি ঐ শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ না করতুম, তবে...আমার এই সাধারণ রূপসম্পদ নিয়ে এ জীবনে হয়ত তোমার দৃষ্টিই আকর্ষণ করতে পারতুম না...

রাজা॥ পদ্ম কি তার নিজের রূপ নিজে উপলব্ধি করতে পারে?

রানী॥ ও উত্তরে আর কাউকে ভোলাতে পার কিন্তু, তোমার সত্যিকার উত্তর আমি বেশ জানি। তবে তোমার এ সংসারে আমার জন্মের ভিত্তিটুকুর উপরই আমি দাঁড়িয়ে আছি। সেই জন্যই আমি দেবী সেই জন্যই আমি সহধর্মিণী। কিন্তু রাজা, এমনি করেই কি আমাকে দূরে ঠেলতে হয়?

রাজা॥ তার অর্থ?

রানী॥ আমাকে কি তুমি শুধু মানুষ বলে ভাবতে পার না? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ...জন্ম আমাদের যা-ই হোক না কেন।

রাজা॥ কিন্তু তোমার এই জন্ম-গৌরবের উপরই যে বৌদ্ধ-সঙ্ঘে আমার সকল সম্মানের প্রতিষ্ঠা। আজকে সেই পুরানো কথাটি মনে পড়ছে। ষোল বছর পূর্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের সঙ্ঘে আমি তাঁদের জন্য আহার্য পাঠাতাম। কিন্তু দেখতাম, তাঁরা তা শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতেন না। এক দিন আমি নিজে স্বয়ং ভগবানের নিকট গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। ভগবান বল্লেন "জ্ঞাতির দান ভিন্ন আমরা অন্য দান গ্রহণ করি না।" শুনলাম 'জ্ঞাতিবন্ধুই শ্রেষ্ঠ বন্ধু।'

রানী॥ তারপর আমাকে গ্রহণ করে সেই জ্ঞাতিত্ব অর্জন করেছ। কিন্তু

রসাতলে যাক সেই সমাজ…যে সমাজে বন্ধুত্ব জ্ঞাতিত্বের চোরাবালির উপর নির্ভর করে !

রাজা ॥ রানী ! তুমি হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে উঠচ কেন ?

রানী ॥ [রাজার প্রতি অতি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া] আমি এখন রাত্রিতে ঘুমুতেও যে পারি না রাজা !

রাজা ॥ সে আমি দেখেছি । কিন্তু কেন রানী ?

রানী ॥ আমি ভাবি…সারাক্ষণ ভাবি। আমি ভয় পাই…ইচ্ছা হয় . ইচ্ছা হয়—

রাজা ॥ কি ইচ্ছা হয় রানী ?

রানী ॥ আমি হয়তো পাগল হব। হব কি, হয়ত হয়েছি—না রাজা ?

রাজা। তোমার কি ইচ্ছা হয় রানী ?

রানী ॥ হাসবে না ?

রাজা ॥ হাসবো কেন ?

রানী ॥ কাঁদবে না ?

রাজা ॥ কাঁদবো কেন ! ছিঃ রানী !

রানী ॥ রাগ করবে না ?

রাজা ॥ [রানীর হাত দুখানি ধরিয়া] তোমার কি ইচ্ছা হয় রানী ?

রানী ॥ [অপ্রকৃতিস্থ ভাবে] আমি আমার এই বসন-ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলব…

রাজা ॥ [হাসিয়া] আমার এক রাজ্যখণ্ড-মূল্যে এর চাইতে সহস্রগুণে গরিমাময় বসন-ভূষণ তোমায় আমি পরিয়ে দেব।

রানী ॥ না রাজা। সে দিন কাশী হতে এক নর্তকী এসে আমাদের সম্মুখে নৃত্য করেছিল—নৃত্য করতে করতে সে বিবসনা হয়ে পড়েছিল। আমি তার সেই অসভ্যতার জন্য তোমার চোখের সম্মুখেই তার মস্তক মুণ্ডন করে দিতে আদেশ দিয়েছিলাম। মনে পড়ে ?

রাজা ॥ হাঁ, তুমি তাকে কিছুতেই ক্ষমা করলে না…

রানী ॥ [নিম্নস্বরে চারিদিকে চাহিয়া] এখন আমার ইচ্ছা হয়…আমিই তার সেই নগ্ন নাচ নাচি…দেহের এই মিথ্যা আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলি আমার উলঙ্গ মূর্তি নিয়ে তোমার চোখের সম্মুখে দাঁড়াই। রাজা ! রাগ করলে ?

রাজা ॥ রানী। রাজসভায় চল তোমার পিত্রালয়ের সভা-কবি কবিশেখর এসেছেন—তিনি গান করবেন…হয়ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন ।

রানী ॥ [রাজার মুখে কবিশেখরের নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণপূর্বক, সহজ সংযত স্বরে] কবিশেখর। হাঁ, সে

আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে। এসেছে, —না? কিন্তু, আমি যে আমার বিরূধকের প্রতীক্ষা করছি...তারও তো কবিশেখরের সঙ্গেই শ্রাবস্তীতে ফিরে আসার কথা ..

রাজা ॥ কুমার বিরূধক আর কবিশেখর একসঙ্গেই কপিলাবস্তু হতে রওনা হয়েছিলেন! কিন্তু, সৈন্যদলের নদী পার হতে একটু বিলম্ব হওয়াতে যুবরাজের পুরপ্রবেশও একটু বিলম্ব হবে। তবু খুব সম্ভবতঃ সে আজ রাত্রিতে এসে পড়বে।

রানী ॥ আমি বিরূধকের সঙ্গে দেখা না করে কোনখানে যেতে পারবো না···

রাজা ॥ এলেই দেখা হবে···

রানী ॥ না, কারো সঙ্গে তার দেখা হওয়ার পূর্বে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রাজা ॥ বেশ···তাই ক'রো। এখন চল।

রানী ॥ না, আমি যাব না। আমি তার সঙ্গে সবার আগে গোপনে দেখা করব।

রাজা ॥ কেন রানী?

রানী ॥ [হাসিয়া] কৌতূহল শুধু কৌতূহল। ছোটবেলাতে সে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করতো—'মা, আর সব রাজপুত্রদের মামার বাড়ি থেকে কত উপহার উপঢৌকন আসে। আমার আসে না কেন?' আমি বলতাম—'তোমার মামার বাড়ি, সেই কপিলাবস্তু—কতদূ—র! তাই তোমার দাদামশায় বা দিদিমা কিছু পাঠাতে পারেন না।' তারপর এই ষোল বছর বয়সে যুবরাজ হয়েই সে জিদ্ ধরল সে কপিলাবস্তুতে যাবে। আমি বাধা দিতে পারলাম না—

রাজা ॥ বাধা দেবেই বা কেন। তোমার বাবা মা তাকে দেখে না জানি কত খুশী-ই হয়েছেন···কত আদর-যত্নই না জানি তাকে করেছেন।

রানী। সেই কথা শোনবার জন্যই তো আমি ছট্‌ফট্ করছি—তুমি যাও রাজা। রাজশেখর একলাটি ঘুমিয়ে রয়েছে তাকে ফেলে আমি যেতে পারবো না।

রাজা। কিন্তু তোমাকে রেখে আমি একলাটি সভায় গেলে কবিশেখরের গান জমবে তো?

[বাসবপাল হাসিতে হাসিতে বামপার্শ্বের দরজা দিয়া প্রস্থান। রানীও দক্ষিণের দরজা দিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিতেছিলেন এমন সময় সহসা বাহিরে অতি উচ্চভাবে ভেরীবাদ্য হইতে লাগিল। রানী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জলতরঙ্গের বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল।]

রানী ॥ মল্লিকা···

[মল্লিকার প্রবেশ]

মল্লিকা ॥ মা!

রানী ॥ [উত্তেজিতভাবে] অকস্মাৎ এই ভেরীবাদ্য কেন?

মল্লিকা ॥ তা তো জানি না মা…

রানী ॥ [ভয়-মিশ্রিত চাঞ্চল্য ও উত্তেজনায়]—হয়তো বিরূধক এসেছে। নিশ্চয়! নিশ্চয়…

[কবিশেখরের প্রবেশ]

কবি ॥ না, সে এখনো আসেনি—

রানী ॥ [ক্রমে, চেষ্টা করিয়া সংযত ও শান্ত হইয়া সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থভাবে] তবে ও বুঝি তোমারই অভিনন্দন?

কবি ॥ আমার অভিনন্দন তোমার ঐ দৃষ্টি-প্রসাদে।

রানী ॥ [অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া] বটে। হুঁ। [ভেরীবাদ্য] তবে ও কি?

কবি ॥ যুদ্ধের আশঙ্কা।

রানী ॥ যুদ্ধ?

কবি ॥ হাঁ, খণ্ডযুদ্ধ। আজ বসন্তোৎসব আর কুমারের জন্মতিথি উপলক্ষে নগরবাসী প্রমোদোন্মত্ত জেনে গুপ্ত বিদ্রোহ মাথা তুলে দাড়াবে খবর পাওয়া গেছে। সেনাপতির এই সংবাদে এইমাত্র রাজা স্বয়ং দুর্গে চলে গেলেন। তোমার সঙ্গে দেখা করবার আর সময় না পেয়ে আমাকে দিয়ে তিনি তোমাকে এ খবর পাঠিয়ে দিলেন—

রানী ॥ [পরিপূর্ণ ঔৎসুক্যে] শেখর!—আমার বিরূধক?

কবি ॥ ভয় নেই। সে নিরাপদ। তার নিকট খবর গেছে। নগরের বাইরে সে সুগুপ্তভাবে অবস্থান করবে।

রানী ॥ কিন্তু সে নগরে প্রবেশ করবার পর—

কবি ॥ রাজা বলে গেলেন কোনোই আশঙ্কা নেই। বিদ্রোহীরা ঐ ভেরী-বাদ্যে রাজধানী সতর্ক রয়েছে বুঝতে পেরে খুব সম্ভবতঃ আর আত্মপ্রকাশই করবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক…

রানী ॥ [দারুণ উত্তেজনায়] সম্মুখে বিরূধক তবু আমি নিশ্চিন্ত! কবি এবার কি তবে শুধু ব্যঙ্গ করতেই এসেছ?

কবি ॥ কেন রানী?

রানী ॥ আমি মাঝে মাঝে বিস্মিত হই তোমার স্পর্ধা দেখে আবার পরক্ষণেই তোমার ঐ চোখের দিকে যেই চাই—আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ি।

কবি ॥ আমি তোমাকে রাজার খবর দিতে এসেছিলাম, এইবার তবে কলা-ভবনে যাই

রানী ॥ দাঁড়াও…

কবি ॥ বল…

রানী ॥ কাছে এস আরো কাছে। এস…

কবি ॥ [অনিচ্ছা সত্বেও কাছে আসিয়া]—বল...

রানী ॥ [চারিদিকে চাহিয়া নিম্ন-স্বরে] বিরূধক কি কিছু জেনে এসেছে ?

কবি ॥ সে পথ তো তুমি পূর্ব হতেই রুদ্ধ করে রেখেছিলে—

রানী ॥ তবু—যদি কারো বিন্দুমাত্র অসাবধানতায়—

কবি ॥ না, তা হয় নি। হ'লে আমি শুনতে পেতাম।

রানী ॥ কবিশেখর !

কবি ॥ রানী !

রানী ॥ আর যে আমি পারি না !—এ যে অসহ্য।

কবি ॥ চল, আমি গান গাইব···তুমি শুনবে

রানী ॥ কিন্তু, তার পূর্বে আমার গানখানি শোন···শুনবে ?

কবি ॥ গাও

রানী ॥ তোমার সেই কালো পাখিটি ভালো আছে ?

কবি ॥ কালো পাখি ?

রানী ॥ তোমার বৌ···সেই 'কোকিল'··

কবি ॥ তার নাম ত কোকিল নয়··

রানী ॥ ও···তবে, তবে···হাঁ, 'কাক' না ?

কবি ॥ তার নাম 'কাকলি'। আমি চললুম

[প্রস্থানে উদ্যত]

রানী ॥ না না, রাগ ক'রো না। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। হাঁ তার চোখ ভালো হয়েছে ?

কবি ॥ সে এখন সম্পূর্ণ অন্ধ

রানী ॥ এখনো তুমি তাকে তেমনি ভালোবাসো না ?

কবি ॥ [পরিপূর্ণ বিরক্তিতে চলিয়া যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া] তোমার কি মনে হয় ?

রানী ॥ কি জানি—জানিনা। হাঁ, ভালো কথা, তোমার মেয়ে ভালো আছে ?

কবি ॥ আছে।

রানী ॥ সে কেমন দেখতে হয়েছে কবি ?

কবি ॥ কালো হলেও সে আমাদের কুটীরখানি আলো করে রেখেছে রানী।

রানী ॥ কবি। আর একটি প্রশ্ন তোমায় জিজ্ঞাসা করবো। রাগ করবে না ?

কবি ॥ বল রানী···

রানী ॥ তোমার মেয়ে দেখতে কার মত হয়েছে কবি ?

কবি ॥ [একটু ভাবিয়া] কেমন করে বলব !

রানী ॥ এই ধর, তোমার মতো . কি তার মা কাকলির মতো···কিম্বা ···

কবি ॥ কিম্বা—

রানী ॥ [একটু ইতস্ততঃ করিয়া] এই আমার মতো···

কবি ॥ তার রং হয়েছে তার মার মতো· ·আর মুখ হয়েছে বোধহয় কতকটা আমারই মতো ..

রানী ॥ শেখর ! শেখর ! আমার মত কি তার কিছুই হয় নি এতটুকুও না ?

কবি ॥ অপরূপ তোমার রূপ। সে রূপসী হয় নি রানী।

রানী ॥ হুঁ। তার চোখ দুটি ঠিক তোমারই মতো হয়েছে, না ?

কবি ॥ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু, একরত্তি ঐ মেয়েটির উপর তোমারই বা এত আক্রোশ কেন ?

রানী ॥ তোমার ঐ চোখ ও যে অতুল ! অনুপম ! এখন কি ভাবি জানো ?

কবি ॥ কি ভাব রানী ?

রানী ॥ প্রকৃতির প্রতিশোধ।

কবি ॥ কিরূপ ?

রানী ॥ আমি তোমার ঐ চোখ দুটির পানে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম ; কিন্তু তুমি আমার পানে ফিরেও তাকাও নি আজ তোমার ঐ কাকলিই তার শোধ নিয়েছে···

কবি ॥ আজ আর সে পুরানো কথা কেন ?

রানী ॥ আজ নয়ই বা কেন ? আজ একটা শেষ বোঝা-পড়া হয়ে যাক।···তোমার ঐ চোখ দুটি আমার বড়ই ভাল লাগতো মনে করে দেখ সেই কিশোর কালের কথা। আমাদের রাজসভায় তুমি গান গাইতে·· আমি কখনো বা নাচতাম কখনো বা বীণা বাজাতাম।···আমার নৃত্যের তালে তালে তোমার গান অগ্নিশিখার মতো খেলতো আমার সুরের ঝঙ্কারে তোমার চোখে মুখে বিদ্যুৎ চমকাতো···

কবি ॥ মনে আছে। তুমিই আমার কণ্ঠে সুর দিয়েছিলে, প্রাণে গান দিয়েছিলে ··

রানী ॥ [শ্লেষ হাস্যে] দিয়েছিলাম···সত্যি ? কিন্তু তার চাইতেও তো আরো বেশী কিছু দিতে চেয়েছিলাম তবে আমার সে বরমাল্য প্রত্যাখ্যান করলে কেন কবি ?···তোমার সেই বালিকা-বধূ সেই গ্রাম্যবালা ···সেই দৃষ্টিহীন-কালো বৌটি—সে কি

কবি ॥ রানী, ক্ষমা কর ·আমি আসি···

[প্রস্থানোদ্যত]

রানী ॥ [হঠাৎ আদেশসূচক স্বরে) না যেতে পারবে না···দাঁড়াও ·

কবি ॥ [চমকিয়া উঠিয়া· ·সবিস্ময়ে] এ কি ! ও হাঁ তুমি রানী · কি আদেশ ?

রানী ॥ হাঁ আমি রানীই বটে এ মণিমুকুট আমি চাই নি· আমি চেয়েছিলাম তোমার ভাঙ্গা-ঘরের চাঁদের আলো। আমি তো রাজশক্তির দিব্যদৃষ্টি চাই নি আমি তোমার ঐ পদ্ম-চক্ষুর দৃষ্টিপ্রসাদ চেয়েছিলাম। তুমি বলেছিলে, কাকলি কি মনে করবে। আমি বলেছিলাম—কাকলি যে আকাশের তলে বাস করে সেই আকাশে চাঁদ ওঠে সূর্যও ওঠে ওঠে না ? বল তুমি·

কবি ॥ ওঠে। কিন্তু সে ছিল কালো, তার উপর সে ছিল দৃষ্টিহীনা তারও উপর সে ছিল শিক্ষাশূন্যা। তার এই অনন্ত দৈন্যকে আমি তো একদিনও তার দৈন্য মনে করতে দিই নি সে তাই পরিপূর্ণ নির্ভয়ে আমার উপর নির্ভর করেছিল। রাজকন্যাকে তার পাশে এনে দাঁড় করালে সে মনে করতো জীবন তার ব্যর্থ আমি তার রিক্ততা ঐ রাজকন্যাকে দিয়ে পূর্ণ করে নিলাম

রানী ॥ ·তাকে দয়া করে গেলে, কিন্তু আমাকে দয়া করতে তোমার হাত উঠলো না। আমিও প্রতিশোধ নিলাম। তারা যখন জোর করে আমার মাথায় কোশলের রাজমুকুট তুলে দিলে, আমি আপত্তি করলাম না। আজ আমি তো সেই রানী ?

কবি ॥ কল্পনা··ত সুখেই তো রয়েছ রানী।

রানী ॥ সুখে আছি ! আর যদি কেউ এই কথা আমায় বলতো আমি স্বহস্তে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতাম।

কবি ॥ এ পক্ষপাত আমার উপর নাই করলে !

রানী ॥ তোমার ঐ চোখ তোমার ঐ চোখ আমি সব ভুলে যাই। [বলিয়াই যেন লজ্জা পাইলেন। পরে সংযত হইয়া] আমি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছি শেখর ?

কবি ॥ অপ্রকৃতিস্থ হবে কেন রানী ?

রানী ॥ আচ্ছা কবি, আমার এই নতুন রূপ দেখে কি বুঝছ ?

কবি ॥ তুমি বসন্তের রানী বাসন্তী।

রানী ॥ রংএ লাল হয়েছি, না ? মূর্খ। এ রং নয়। এ রক্ত ! তাজা রক্ত। টাটকা রক্ত ! এ আমার দৈনন্দিন ক্ষরণ। আর কত যুদ্ধ করবো আর কতদিনই বা যুদ্ধ করতে পারি ! শেখর। আমায় বাঁচাও আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল আমাকে মুক্তি দাও আমার হাত ধরে নিয়ে ·ইরে চল—

[কবির প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন]

কবি ॥ [বিচলিত হইয়া] কিন্তু রানী, সে যে এখন সম্পূর্ণ অন্ধ। আঘাত যদি সে পায়, তবে এখনি যে সে সব চাইতে বেশী পাবে।

রানী ॥ [করুণ নেত্রে] শেখর।

কবি ॥ শোন রানী। জীবনের পুরানো পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলে নতুন পাতায় নতুন পুঁথি লেখ শান্তি পাবে মুক্তি পাবে—

রানী ॥ কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। না শেখর, আমার এই প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করে সত্যের সম্মান রক্ষা কর

কবি ॥ ভুলে যাও ভুলে যাও রানী আমাকে ভুলে যাও।

রানী ॥ অসম্ভব। অসম্ভব। ভুলে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেমন করে ভুলি। আমার রক্তমাংসে তুমি জড়িয়ে রয়েছ। আমার এই নগ্ন সত্যকে মিথ্যার আবরণে আর কত দিন ঢেকে রাখতে পারি ?

কবি ॥ মনে কর আমি মৃত। আর তা-ও যদি না পারো রানী, ঐ হাতে একখানি অস্ত্র এনে দাও এখনি। আমি তা সাগ্রহে গ্রহণ করে আমার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সত্যকে তোমার চোখের সম্মুখে ধরি।

রানী ॥ [কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া] তুমি জান না। তুমি দেখ নি! তা-ই। কবি। ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমার কুমার হয়ত জেগে উঠে কাঁদছে আমি তাকে নিয়ে আসি। তুমি তাকে দেখ নি, না কবি ?

কবি ॥ দেখতে আর অবসর পেলাম কই রানী ?

রানী ॥ এই সময় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, আমি এখানেই তাকে নিয়ে আসি। [প্রাঙ্গণে কে গান গাহিয়া যাইতেছিল] তুমি ততক্ষণ গান শোন

কবি ॥ ও কে গাইছে রানী ?

রানী ॥ ও বলে ও 'চৈত্র রাতের উদাসী' দেখো এখন এখানেই আসবে।

[দক্ষিণের দ্বার দিয়া প্রস্থান। কবি উঠিয়া অঙ্গনের সম্মুখে গেলেন। উদাসী গান গাহিতে গাইতেছিল…তাহাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। উদাসী গাহিতে গাহিতে অঙ্গনে প্রবেশ করিল। গাহিতে গাহিতে উদাসী [illegible] চলিয়া গেল [illegible] তাকাইয়া রহিলেন। [illegible] রানী কুমারকে কোলে লইয়া কবির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

রানী ॥ কবি !

কবি ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] রানী !

রানী ॥ বল দেখি এ কে ? [কুমারকে কবির সম্মুখে ধরিলেন]

কবি ॥ তোমার কুমার

রানী ॥ এ তুমি। এই পরিপূর্ণ দীপালোকে এস [এক হাতে দিয়া কবিকে প্রদীপের সম্মুখে টানিয়া আনিলেন।] এই আমার সন্তান। কিন্তু এ কার মুখ ? রাজার নয়…আমারও নয়… তোমার। এ কার চোখ ? রাজার

নয়, আমার নয়.. তোমার। কার মতো এর রং? রাজার মতো নয়, আমারও মতো নয়…ঠিক তোমার মতো। তোমার। তোমার ঐ নাক…তোমার ঐ ভ্রূ পরিপূর্ণভাবে এই মুখে আত্মপ্রকাশ করেছে। তোমার চোখের মধ্য-মণিতে একটি তিল আছে…দেখ এর চোখেও সেটি বাদ যায় নি ..

কবি ॥ [দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া] রানী! রানী! এ আমি কি দেখছি! এ আমি কি দেখলাম!

রানী ॥ দেখলে সত্যের নগ্ন-মূর্তি। রাজার সন্তান আমার গর্ভে ছিল . তুমি আমার মনের সকল চিন্তা জুড়ে ছিলে ..সে তোমার রূপ ধরে আমার নিকট মূর্তিমান হয়ে এল! এর নাম রেখেছি কি জানো?

কবি ॥ [স্বপ্নাবিষ্টভাবে] কি?

রানী ॥ 'শেখর'! 'রাজশেখর'! তুমি কবিশেখর ··এ আমার রাজশেখর।

কবি ॥ নরক! নরক! আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! আমার চোখ জ্বলে গেল!

রানী ॥ আমারও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!—আমার হাত ধরো . চল বাইরে চল…

কবি ॥ না রানী…এ চোখে আর তোমার দিকে চাইবো না ..ঐ শিশুর পানে চেয়ে আমার চোখ জলে যাচ্ছে আমি চললাম…কারো সাধ্যি নেই আমাকে ধরে রাখে! .

[অঙ্গনের পথে কবির প্রস্থান। রানী আরক্তিম চোখে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন ..অন্তরে মনিতে কি সঙ্কল্প আঁটিয়া লইলেন।]

রানী ॥ মল্লিকা! [দক্ষিণের দ্বারপথে মল্লিকার প্রবেশ।] কুমার [মল্লিকার ক্রোড়ে কুমারকে দিলেন ও তাহাকে চলিয়া যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। মল্লিকা চলিয়া গেল।] দাসী! [বামপার্শ্বের দরজা পথে দাসীর প্রবেশ] ··আমার সেই মূক কৃতদাস [দাসী চলিয়া গেল। পাদ-চারণা করিতে করিতে] হা, শুধু তার ঐ চোখ দুটি যদি না থাকতো! কি সুন্দর ঐ চোখ দুটি। ঐ পদ্ম-আঁখির মণি-তারা আমার সমস্ত জীবনটাকেই মিথ্যা করে দিয়েছে!…ঐ চোখ দুটি ঐ চোখ দুটি [ভেরীবাদ্য] ঐ যুদ্ধ বাদ্য! প্রতিহিংসার ঐ রুদ্র-আহ্বান!—কৃতদাস! কৃতদাস! [বামপার্শ্বের দরজা দিয়া বিকট-দর্শন কৃষ্ণবর্ণ মূক কৃতদাস ছুটিয়া আসিয়া রানীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে লুণ্ঠিত হইল। প্রচণ্ড শক্তিমান· ভীতিব্যঞ্জক, অতিকায় তাহার শরীর। এক হস্তে সুদীর্ঘ শাণিত ছুরিকা। রানী তাহাকে দেখিয়া কি এক অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ সরিয়া গেলেন ··ও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন] না না, প্রয়োজন নেই···আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাও· ·[কৃতদাস উঠিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিল] যা—ও…[কৃতদাস তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া] না, যাক। বিশ্বের সে এক অপরূপ সৌন্দর্য! অক্ষয় হোক …অমর হোক…[ধীরে ধীরে, আবেগে] ঐ চোখ দুটির পানে কতদিন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছি তবু তৃপ্তি পাই নি। ঐ আঁখিপাতে শুধু একটি চুম্বন-রেখা এঁকে দিতে চেয়েছি কিন্তু পাইনি, পারিনি [ভেরীবাদ্য—ভেরীবাদ্য শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন]—ঐ আবার! [বিষম উত্তেজনায় যেন নাচিয়া উঠিলেন] আবার আবার সেই আহ্বান [সপদদাপে] কৃতদাস—[পূর্ববৎ কৃতদাস ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল।] ওঠো· [কৃতদাস উঠিয়া দাঁড়াইল] এসো—[তাহাকে লইয়া প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইলেন] কিন্তু আবার পা টলে কেন। বুক কাঁপে কেন!—দাসী! [দাসীর প্রবেশ।] জলতরঙ্গ বাজাও দেখি দাসী। আমি তার তরঙ্গের তালে তালে অগ্রসর হব· [দাসী চলিয়া যাইয়াই জলতরঙ্গ বাজাইতে লাগিল। সহসা কৃতদাসের দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া] এইবার এসো তুমি [তাহাকে লইয়া অঙ্গনের এক কুঞ্জবীথির ধারে গেলেন এবং নিম্নস্বরে তাহাকে কি আদেশ দিতে লাগিলেন। কৃতদাস ইঙ্গিতে তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবে আভাস দিল এবং পরে তাঁহার চরণধূলি লইয়া দৃপ্ত পদে দৃশ্যের অন্তরালে চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় রানী ঐ কুঞ্জবীথির পার্শ্ব হইতেই চাপা গলায়, কিন্তু জোরে বলিয়া উঠিলেন]—চিনেছ? [কৃতদাস ইঙ্গিতে বুঝাইল চিনিয়াছে।] তার নাম? [কৃতদাস নাম বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না]—'শেখর' 'শেখর'·· যাও—[কৃতদাস চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল। রানী দৃপ্তচরণে অঙ্গন হইতে কক্ষমধ্যে উঠিয়া আসিলেন এবং ইঙ্গিতে জলতরঙ্গ বাদ্য বন্ধ করিয়া দিলেন। বামপার্শ্বের দরজা হইতে কে ডাকিল 'মা']

রানী॥ কে-? [উত্তর আসিল 'প্রতিহারী'।]—ভেতরে এস। কি খবর ·

প্রতিহারী॥ মহারাজ খবর পাঠালেন, বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজসৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে—তিনি আজ রাত্রি দুর্গে যাপন করবেন

রানী॥ উত্তম। যাও—[প্রতিহারী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।] তবে আজ কি প্রলয়ের রাত্রি! আজ না বসন্তোৎসব! আজ না রং-এর খেলা!—রং-এর খেলাই খেলব। জমাট রক্তের আবির দিয়ে, টাটকা রক্তের পিচকারিতে আমার হোরি-খেলা, হাঃ হাঃ হাঃ [বিকট হাস্য কিন্তু পরক্ষণেই অঙ্গনের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাহাকে দেখিলেন তাহাকে দেখিয়া] এ কি! কে? —তুমি! [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।]

[কবিশেখরের প্রবেশ]

কবি॥ হাঁ, আমি! তুমি আমার চোখ চেয়েছ রানী?

রানী ॥ [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াই রহিলেন।]

কবি ॥ যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে! আমি তোমার এখান হতে চলে গিয়েই খবর পেলাম, একদল বিদ্রোহী তোমার এই প্রাসাদ-উদ্যানের দিকে গুপ্তভাবে অগ্রসর হচ্ছে—তোমাকে সতর্ক করতে ছুটে এলাম এসে দেখি, আমার পাশের এক কুঞ্জবীথিতে তুমি তোমার এক ক্রীতদাসকে আমার এই চোখদুটি উপড়ে নিতে আদেশ দিচ্ছ আমি থমকে দাড়ালাম সব শুনলাম ·অপলক দৃষ্টিতে তোমাকে শেষ দেখা দেখে নিলাম তারপর তোমার ক্রীতদাস ছুটে চলল· · আমার সম্মুখ দিয়েই সে ছুটে গেল আমাকে দেখল···কিন্তু আমাকে চিনতে পারল না।

রানী ॥ [ছুটিয়া আসিয়া কবির হাত দুখানি ধরিয়া] শেখর! সে তবে তোমায় চেনে নি?

কবি ॥ না, সে আমাকে চিনতে পারে নি···

রানী ॥ আমি তাকে পূজা করব···আমি তাকে রাজ্য দেব·· আমি তাকে—আমি তাকে—[আবেগে আর বাক্যস্ফুরণ হইল না]

কবি ॥ আমি ভাবলাম সে ভুল করেছে·· তার সেই ভুল ভেঙে দিতে আমিও তার পশ্চাতে পশ্চাতে চললাম। গিয়ে কি দেখলাম জানো?

রানী ॥ কি শেখর!

কবি ॥ সে তোমার ঐ দক্ষিণের শয়নকক্ষের বাতায়নে.. প্রথমে তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না পরে হঠাৎ মনে পড়ে গেল—তার নামও তুমি শেখরই রেখেছ

রানী ॥ [আর্তনাদ করিয়া] শেখর! শেখর!—ঠিক ঠিক হো-হো-হো তবে আমি কি করলাম! এক্ষণে বুঝি সব শেষ! [মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন]

কবি ॥ দাসী—দাসী—[দাসীর প্রবেশ] রানী মূর্চ্ছিত তাঁর জ্ঞানসঞ্চার কর···

[দক্ষিণের বাতায়পথ দিয়া দক্ষিণ শয়নকক্ষের দিকে প্রস্থান। দাসী জল আনিয়া চোখে জল দিল ও বাতাস করিতে লাগিল। ক্রমে রানীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।]

রানী ॥ না, সরে যাও · আমার কিছু হয় নি—আমি হোলি খেলছি! জমাট রক্তের আবির দিয়ে, টাটকা রক্তের পিচকারিতে, আজকে আমার বসন্তোৎসব। উঃ পিপাসা! বড় পিপাসা। রক্তের জন্য আমার জিহ্বা লক্‌লক্ করছে। [দাসী জল দিল। পানপাত্র সম্মুখে ধরিয়া] এ কি জল! না রক্ত? হোক্ রক্ত, আমি খাব। [জল পান করিলেন।] উঃ বাঁচলাম···যাও দাসী··· আমায় বিরক্ত করো না···আমি সম্পূর্ণ সুস্থ! আমি নাচতে পারি, থিয়া তাথৈ···থিয়া তাথৈ···থিয়া তাথৈ .আমি হাসতে পারি হাঃ হাঃ হাঃ

[দক্ষিণের দ্বারে মল্লিকার প্রবেশ ।]

মল্লিকা ॥ দাসী !…

দাসী ॥ কি ঠাকরুণ !

রানী ॥ [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া বসিয়াছিলেন—মল্লিকার স্বর শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও একদৃষ্টে মল্লিকার পানে তাকাইয়া রহিলেন ।]

মল্লিকা ॥ আমি কি এখন রানীমার সম্মুখে আসতে পারি ?

রানী ॥ [অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, সভয়ে] না-না-না কথখনো না—

[মল্লিকার প্রতি এক হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়া অন্য হস্তে তাহার চোখমুখ আবৃত করিলেন

মল্লিকা ॥ কিন্তু, না এসেও যে পারি না মা…

রানী ॥ [তদ্রূপ অবস্থাতেই]—দূর হও তুমি ·

মল্লিকা ॥ আমি তাকে নিয়ে এসেছি ··

রানী ॥ [বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া বাহিরে তাকাইয়া]…দাসী ! শুনে যা [দাসী নিকটে আসিল] শোন্…[কানে কানে কি কহিলেন । দাসী মল্লিকার পাশে যাইয়া দরজাপথে উঁকি দিয়া কি দেখিল · ও পরক্ষণেই রানীর নিকট ছুটিয়া গেল পরিপূর্ণ ব্যাকুলতায়] কে ? ও দাসী ?

দাসী ॥ শেখর…

রানী ॥ [রাগিয়া উঠিয়া, সপদদাপে] কোন শেখর ··?

দাসী ॥ কুমার ।

রানী ॥ তার চোখের দিকে চেয়েছিলি ?

দাসী ॥ হা, সেই পদ্মচক্ষু অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে ··

রানী । [ছুটিয়া মল্লিকাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে কুমারকে তুলিয়া আনিয়া তাহার চক্ষু চুম্বন-বন্যায় ভাসাইতে লাগিলেন ।]

মল্লিকা ॥ [রানীর সম্মুখে আসিয়া] ওকে দাসীর কোলে দিন দাসী ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখুক । বাইরের ঐ ভেরীবাদ্যে কুমার ভয় পাবেন ।

রানী । যাও মানিক দাসীর কোলে ঘুমিয়ে পড় [দাসীর হস্তে কুমারকে দিলেন । দাসী কুমারকে লইয়া দক্ষিণের দ্বার দিয়া চলিয়া গেল] কিন্তু মল্লিকা, একটা কথা…।—জিজ্ঞাসা করতে শিউরে উঠ্ছি ।

মল্লিকা ॥ কি কথা বলুন মা…

রানী ॥ [সভয়ে, অতি সন্তর্পণে] সে কোথায় ?

মল্লিকা ॥ কে !

রানী ॥ কবিশেখর !

মল্লিকা ॥ তিনি দেশে চলে গেছেন ।

রানী ॥ চলে গেছে !

মল্লিকা ॥ হাঁ, আপনাকে তার জন্মের মত বিদায় জানিয়ে চলে গেছেন···

রানী ॥ ঘৃণায় হয়তো দেখাটি পর্যন্ত করে গেল না,···না ?

মল্লিকা ॥ ও কথা বলবেন না মা···তিনি দেবতা···আপনার পাপ হবে .

রানী ॥ হুঁ।···আর সেই ক্রীতদাস ?

মল্লিকা ॥ তিনি তাকে বধ করে তবেই ত কুমারকে রক্ষা করেছেন ! কুমারকে রক্ষা করে আমার হাতে সঁপে দিয়েই তিনি আপনাকে তাঁর শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করে চলে গেলেন ·

রানী ॥ অর্ঘ্য !

মল্লিকা ॥ হাঁ, অর্ঘ্য । আমি রেখে দিয়েছি ।

রানী ॥ আমি দেখব · আমি এখনি তা দেখব ·

মল্লিকা ॥ আসুন

[মল্লিকার সঙ্গে রানী চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অঙ্গনের পথ দিয়া রাজা কক্ষপথে প্রবেশ করিলেন ।]

রাজা ॥ রানী !

রানী ॥ [চমকিয়া উঠিল] কি রাজা !

[অঙ্গনে জনতার বিরাট কোলাহল শোনা যাইতে লাগিল ।]

রাজা ॥ রানী ! বাইরে ঐ উন্মত্ত প্রজাপুঞ্জ । গুপ্ত-বিদ্রোহ দমন করে এসেছি । কিন্তু এদের দমন কর তুমি ।

রানী ॥ আমি !

রাজা ॥ হাঁ, তুমি । তাদের এক অভিযোগ আছে ।

রানী ॥ কি অভিযোগ ?

রাজা ॥ আর সে অভিযোগ তোমারই বিরুদ্ধে

রানী ॥ আমার বিরুদ্ধে !

রাজা ॥ হাঁ, তোমার বিরুদ্ধে ।

রানী ॥ কিন্তু অভিযোগ শোনবার কি এই সময় ? বেশ । তবু শুনি দেনা-পাওনা না হয় চুকিয়েই যাই···

রাজা ॥ তারা বলে, তা এ রাজ্যে আজকে এই যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে···এ শুধু আজ রাত্রে এই প্রাসাদে ভগবানের চরণধূলির অমর্যাদা করার দরুন .

রানী ॥ কি অমর্যাদা হয়েছে শুনি···

রাজা ॥ তুমি ভগবানের জ্ঞাতিকন্যা হয়েও তাঁর চরণধূলি স্পর্শ করনি। ভগবদ্বংশে তোমার জন্ম . বংশ-গৌরবে তুমি মহামহিমময়ী । সদাচারের মধ্যে তোমার শিক্ষা-দীক্ষা ধর্মক্রিয়ায় তোমার শ্রেষ্ঠ অধিকার—তুমি আমার রাজ-পুরীর সেই শ্রেষ্ঠ পূজারিণী হয়েও স্বধর্মে অশ্রদ্ধা দেখিয়েছ

রানী ॥ তা আমাকে কি করতে হবে ?

রাজা ॥ সেই চরণধূলি তুমি এখন ঐ উন্মত্ত জনসঙ্ঘের ললাটে স্পর্শ করাবে..

রানী ॥ [ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তাহার পর—] কিন্তু তার পূর্বে আমার এক অভিযোগ আছে . তার বিচার কর···

রাজা ॥ আমার আপত্তি নেই। কি তোমার অভিযোগ ?

রানী ॥ ব্যভিচারের অভিযোগ।

রাজা ॥ কার বিরুদ্ধে ?

রানী ॥ সুবিচার পাবো ?

রাজা ॥ কবে না পেয়েছ ?

রানী ॥ কিন্তু আজ যার নামে অভিযোগ করছি—সে তোমারই এক প্রেয়সী·· তাইতেই আশঙ্কা হয়···

রাজা ॥ আমার বিচারকে পক্ষপাত দোষে কলঙ্কিত করেছি···শত্রুও তো এ কথা বলে না···

রানী ॥ তবে শোন রাজা এই রাজপুরীতে তোমারই এক প্রেয়সী রক্ষিতা অতি গুপ্তভাবে আমাদের এই সুখের সংসারকে তার বিরাট ব্যভিচারে কলঙ্কিত করেছে···সে এক দাসীকন্যা। কিন্তু সে কথা গোপন রেখে উচ্চকুলজাত বলে তার পরিচয় দিয়ে তোমার অন্তঃপুরে এসেছিল পরে সে তোমার প্রীতির জন্য, আমাকে দিয়ে ধর্মানুষ্ঠান যা কিছু করিয়েছ··সে সবই করেছে। ধর্মের, আচারের এত বড় অনিয়ম আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। আর সেই জন্যই আজকে ঐ চরণধূলি বিতরণ করবার মাঙ্গালিক-অনুষ্ঠানে আমার হাত ওঠে নি। রাজা, আমার বিচার করতে ছুটে এসেছ। কিন্তু কর দেখি এইবার তোমার সেই রক্ষিতার বিচার।

রাজা ॥ কে সে ?

রানী ॥ নাম আগে বলব না। আগে দণ্ড উচ্চারণ কর—

রাজা ॥ আমি তার নির্বাসন-দণ্ড বিধান করলাম—আজ রাত্রিতেই সে এ নির্বাসন গ্রহণ করুক।

রানী ॥ রাজবিধান জয়যুক্ত হোক। আমি এখনি গিয়ে তাকে তার এই দণ্ড জ্ঞাপন করে আসি—[প্রস্থানোদ্যত]

রাজা ॥ কিন্তু প্রজাসঙ্ঘ ভগবানের চরণধূলির জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

রানী ॥ আগে রাজপুরী পবিত্র হোক শুদ্ধ হোক সত্য হোক তার পর—

[দক্ষিণের দ্বার দিয়া প্রস্থান। বাহিরে প্রজাসঙ্ঘ 'ভগবানের চরণ-ধূলি' বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল।]

বাজা ॥ [একটি আলো লইয়া বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া আলোটি নিজেব মুখেব সম্মুখে ধবিয়া]—প্রজাগণ।

প্রজাসঙ্ঘ ॥ 'বাজা' 'বাজা' 'চুপ্ চুপ্'—'সকলে চুপ কব' 'শোন' ইত্যাদি।

বাজা ॥ প্রসাদেব জন্য আব একটু অপেক্ষা কব।

প্রজাসঙ্ঘ ॥ কেন ?

বাজা ॥ আগে বাজপুবী পবিত্র হোক।

প্রজাসঙ্ঘ ॥ [সমস্বরে] পবিত্র হোক---

বাজা ॥ শুদ্ধ হোব।

প্রজাসঙ্ঘ ॥ [সমস্বরে] শুদ্ধ হোক।

বাজা ॥ সত্য হোক।

প্রজাসঙ্ঘ ॥ [সমস্বরে] সত্য হোক।

বাজা ॥ তোমবা বাজপ্রাসাদেব সম্মুখে গিয়ে অপেক্ষা কব। আমি বানীকে নিয়ে আসছি। বুদ্ধেব জয় হোক—ধর্মেব জয় হোক সংঘেব জয় হোক।

প্রজাসঙ্ঘ ॥ বুদ্ধং শবণং গচ্ছামি
ধর্মং শবণং গচ্ছামি
সংঘং শবণং গচ্ছামি

[জয় ধ্বনি ... নেপথ্যে ... পুনরায় ... বাদ্য।]

বাজা। ঐ শুন শঙ্খ— যুবরাজ পুর-প্রবেশ কবেছে। দাসী! [দাসীব প্রবেশ] বানী এলে তাঁকে বলো। আমি এখনি ফিবে আসছি।

[রাজার প্রস্থান।

দাসী ॥ কুমার জেগে উঠে দুধেব জন্য কাঁদছেন বানীমা। আসছেন না কেন! —ঐ যে—

[দাসীর ... বানীব প্রবেশ ... সম্ভবতঃ স্বর্ণ-পেটিকায় ... আসিতেছেন। পাশে মল্লিকা ...]

বানী ॥ [পেটিকা হইতে দৃষ্টি অপসাবিত না কবিয়াই] এই তাব অর্ঘ্য ?

মল্লিকা। হাঁ, ঐ তাঁব অর্ঘ্য।

বানী ॥ [মল্লিকাব মুখেব দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া] পদ্মফুল, না ?

মল্লিকা। [নীবব বহিল।]

বানী ॥ এই পদ্ম দুটি আমি উপড়ে নিতে চেয়েছিলাম। পাবি নি। আজ সে তা আমাকে স্বেচ্ছায় দিয়ে গেল। কেন, কেন মল্লিকা ?

মল্লিকা ॥ জানি না মা।

বানী ॥ ভালো।—না জানা ভালো। জীবনেব এই প্রহেলিকা চিবন্তন

হয়ে থাক। চলে আয় ·তুই আমার সঙ্গে চলে আয়···এ চোখের দিকে চাইব পরে —·আগে পবিত্র করি শুদ্ধ করি সত্য করি।

[মল্লিকার দেহে ভার দিয়া ধীরে ধীরে বাম দরজা দিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন—এমন সময় দাসী তাহাকে ডাক দিল]

দাসী ॥ মা!

রানী ॥ [তাহার দিকে না তাকাইয়া] কে মল্লিকা?

মল্লিকা ॥ দাসী।

রানী ॥ কি চায়?

মল্লিকা ॥ কি চাস দাসী?

দাসী ॥ কুমার জেগে উঠেছেন, কাঁদছেন—দুধ চান

রানী ॥ [হঠাৎ বিকট হাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ দুধ—আগে রাজপুরী পবিত্র হোক—শুদ্ধ হোক সত্য হোক [বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টবৎ সচকিত হইয়া হঠাৎ মল্লিকার হাত ধরিয়া এক টান দিয়া চকিতে বাম দরজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

দাসী ॥ [বিস্ময়াস্তে] এ কি। রানীমার আজ হয়েছে কি! [বাম দরজা-পথে তাকাইয়া রহিল।]

[যুবরাজ বিরূধকসহ প্রাঙ্গণের পথে রাজার প্রবেশ]

রাজা ॥ বিরূধক—তুমি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছ?

বিরূধক ॥ না পিতা, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। মাতামহ আমাকে খুবই সমাদর করে কপিলাবস্তুতে অভ্যর্থনা করে নিলেন। কিন্তু, আমার মাতামহীকে দেখতে পেলাম না—শুনলাম তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন—

রাজা ॥ কই, আমরা তো সে খবর পাই নি—

বিরূধক ॥ আমিও তাঁদের সেই কথাই বললাম। উত্তর পেলাম, মা সে খবর পেলে শোকাতুরা হবেন বলে কৌশলে তা গোপন রাখা হয়েছে—

রাজা ॥ তারপর?

বিরূধক ॥ তারপর দেখলাম, রাজপুরীতে আমাকে প্রণাম করবার জন্য আমার বয়ঃকনিষ্ঠেরা কেউ নেই—শুনলাম তারা সপ্তাহকাল পূর্বে মৃগয়ায় গেছে। তখনো আমার মনে কোন সন্দেহ হয় নি—

রাজা ॥ তারপর—

বিরূধক ॥ তারপর কোশলে ফিরে আসবার দিন আমরা হাতীতে উঠেছি এমন সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আমার শয়নকক্ষে আমার মাতৃদত্ত অঙ্গুরীয়ক ফেলে এসেছি·· কক্ষে ফিরে যেয়ে দেখি এক বৃদ্ধা দাসী দুধ-জল দিয়ে আমার সেই কক্ষের যাবতীয় আসবাব ধুয়ে ফেলছে আমি তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম সে আমাকে চিনতে না পেরে বললো, এক দাসীপুত্র—আমাদের রাজার নাচওয়ালীর নাতি—এই ঘরে বাস করে গেছে · তাই দুধ-জলে এই ঘর ধুয়ে ঘর শুদ্ধ করছি।

রাজা ॥ বিরূধক ! বিরূধক ! সে যে মিথ্যা বলে নি···বা পরিহাস করে নি···তার প্রমাণ ?

বিরূধক ॥ তখনি আমি ঘর হতে ছুটে বের হয়ে রাজপুরীর বাইরে এসে গ্রামে গ্রামে সন্ধান নিলাম। দেখলাম সব শাক্যই এ খবর জানে। তারা বললে৷ 'কোশলরাজ তরোয়ালের জোরে শাক্যবংশের মেয়ে বিয়ে করে কুলীন হবার ফন্দী এঁটেছিলেন· একটা নাচওয়ালীর মেয়ে দিয়ে তাকে খুব ঠকানো গেছে ·'

রাজা ॥ এতদূর ! এতদূর !

বিরূধক ॥ আমিও তখনি তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলাম, 'ঐ দুধ-জল আমি শাক্যদের রক্ত দিয়ে মুছে ফেলব। মিথ্যাবাদী শঠদের রক্ত দিয়ে ঐ মিথ্যা পুরীকে সত্য আর শুদ্ধ করব।'

রাজা ॥ কিন্তু, আমি ভাবছি রানীর কথা। মিথ্যা মূর্তিমতী হয়ে একদিন নয়, দুদিন নয়, এই ষোলটি বছর আমার চোখে ধূলি দিয়ে আছে। অথচ আজ এখনি একটি পুরনারীর বিরুদ্ধে সে ঠিক এমনি এক অভিযোগ এনে নিজে তাকে নির্বাসন-দণ্ড দিতে গেছে স্পর্ধা তার !—দাসী, কোথায় সে ডাকো তাকে

[দাসীর বাম দরজা দিয়া প্রস্থান।]

বিরূধক ॥ ঐ নির্বাসন-দণ্ড তাকে দিন আজই এই মুহূর্তে।

রাজা ॥ অবশ্য দেব, অবশ্য দেব।

বিরূধক ॥ ও শাক্যদের ভার নিলাম আমি। জানেন পিতা, পুর প্রবেশ করেই আমি সেই শঠকুলচূড়ামণি শাক্যমুনি বুদ্ধের আশ্রম শাক্যের রক্তে ভাসিয়ে দিতে আদেশ দিয়ে এসেছি হত্যাকাণ্ড হয়তো এতক্ষণ আরম্ভ হয়েছে।

রাজা ॥ না না সে কি করেছ !—ভগবান যে স্বয়ং শাক্য—

বিরূধক ॥ তাঁর ছিন্ন মস্তক আমি আজ রাত্রেই স্বর্ণ-পাত্রে নিয়ে আসতে আদেশ দিয়েছি।

রাজা ॥ না না সে হয় না, সে হবে না

বিরূধক ॥ অবশ্য হবে। সেই হবে আমার প্রথম ও প্রধান গৌরব।

রাজা ॥ আগে রানীর নির্বাসন-দণ্ড ব্যবস্থা কর রাজপুত্র—তারপর !

[বাম দরজা-পথে মল্লিকার প্রবেশ]

এই যে মল্লিকা !—রানী কোথায় শীঘ্র বল· ·

মল্লিকা ॥ তিনি রাজপুরী হতে নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করে শ্রীবুদ্ধের আশ্রমে চিরপ্রস্থান করেছেন—

রাজা ॥ আমি তো এখনো তাকে সে দণ্ড বিধান করিনি···

মল্লিকা ॥ আপনি বহু পূর্বেই, স্বয়ং তাঁকে সে দণ্ডদান করেছেন—

রাজা ॥ কিরূপ !

মল্লিকা ॥ তিনি আপনার নিকট এক পুরনারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনয়ন করেছিলেন···

রাজা ॥ তবে সে পুরনারী রানী স্বয়ং ! [মল্লিকা নীরব রহিল] এখন বুঝছি কি নিদারুণ ঝড় এই ষোলটি বছর তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে—বিরূধক ! বিরূধক ! সে শেষে রাত্রে ঘুমাতেও পারতো না—আমি আজ বুঝতে পারছি তার সেই অন্তর্যুদ্ধের গভীরতা। কিন্তু সে তবে সেই যুদ্ধে শেষকালে জয়লাভ করেছিল। বিরূধক ! আর আমার ক্ষোভ নেই—আমি তাকে ক্ষমা করেতে পারবো।

বিরূধক ॥ নিজের বিরুদ্ধে নিজে অভিযোগ এনে স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছেন ! পিতা, আমি আশ্রমে চললাম আমার সেই সত্যকুলজাতা ·সেই সত্যাশ্রয়ী মাকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে তার সেই রাজলক্ষ্মীর আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করব।

[অঙ্গনের দ্বারপথে প্রতিহারীর প্রবেশ]

কি সংবাদ ?

প্রতিহারী ॥ [অভিবাদনান্তে] যুবরাজের এক দেহরক্ষী স্বর্ণপাত্রে এক ছিন্ন মস্তক নিয়ে যুবরাজের দর্শন-প্রার্থী··

বিরূধক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—সেই শাক্য-মুনির ছিন্ন মস্তক ! যাও, অবিলম্বে তাকে এখানে উপস্থিত কর—

[অভিবাদনান্তে প্রতিহারীর প্রস্থান]

*　　　*　　　*　　　*

[সহসা ঝড় উঠিল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল]

রাজা ॥ বিরূধক ! বিরূধক ! ঝড় উঠেছে—এ কি প্রলয়ের কাল-বৈশাখী ? ঐ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—ঐ—ঐ—

[প্রাঙ্গণে বজ্রপাত হইল]

উঃ উঃ [চোখ বুজিয়া কানে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।]

[দেহরক্ষীর প্রবেশ—হাতে তাহার এক স্বর্ণথালা.. তাহার উপর এক ছিন্ন মস্তক। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল - ......।

বিরূধক ॥ [বিদ্যুতালোকের সুতীব্র দীপ্তিতে সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিলেন —] এ কি ! মা ! আমার মা !

[দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া পিছাইয়া আসিলেন]

দেহরক্ষী ॥ আশ্রমের প্রথম হত্যা।

বিরূধক ॥ আশ্রমের শেষ হত্যা। প্রথম এবং শেষ। মা ! মা ! [সেই ছিন্ন মস্তকের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন। সম্মুখে পুনরায় বজ্রপাত হইল।]

যবনিকা

ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৩২

বহুরূপী

[মৃত্যুশয্যায় শয়ান সুধীর রায়। সুধীর অচেতন। পার্শ্বে ডাক্তার, শিয়রে সুধীরের স্ত্রী তরলা। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে।]

তরলা ।। কেমন বুঝছেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার ।। শুধু লক্ষ্য রাখবেন কোন কারণেই যেন মনে এতটুকু আঘাত উনি না পান···ওঁর খেয়াল মত চলবেন, যখন যা চান...দেবেন।

তরলা ।। যখন জ্ঞান হচ্ছে তখনই শুধু জিজ্ঞেস করছেন, মা কই, খোকা কোথায় ? রানীকে আসতে লিখেছ ? বিরজা কি ভুলেই গেল ? এই সব। কি হবে ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার ।। খোকাকে নিয়ে আপনার শাশুড়ীর আজ রাত্রেই তো পৌছবার কথা ছিল। এখনো এলেন না কেন ?

তরলা ।। ট্রেন ফেল করেছেন হয়তো ! কিন্তু সে কথা ওঁকে এখনো জানাইনি। রাত দু'টোর গাড়ীর অপেক্ষায় বসে আছি।

ডাক্তার ।। খোকা বুঝি আপনাদের ঐ একই সন্তান ?

তরলা ।। হাঁ ডাক্তারবাবু, সে তার ঠাকুরমার সঙ্গে দেশের বাড়ীতে থেকে পাঠশালায় পড়াশুনো করে, ওরা দুজনে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারেনা। শাশুড়ীও বাড়ী ছেড়ে এখানে আসতে চাননা, দেশে গৃহদেবতা ঠাকুর-সেবা নিয়ে পড়ে আছেন।

ডাক্তার ।। রানী কে ?

তরলা ।। ওঁর দেশের বাড়ীতে এক প্রতিবেশিনীর মেয়ে। সে অনেক কথা।···ছোটবেলার খেলার সাথী। দু'জনে বর-কনে সেজে খেলতেন। কিন্তু পরে আর সত্যিকার বিয়ে হওয়া ঘটল না। রানীর বাবা টাকার মায়ায় এক বুড়ো জমিদারের হাতে রানীকে সপে দিলেন। আর উনি রাগ করে বিনা পণে বিনা যৌতুকে এক কালো মেয়ে বিয়ে করে বসলেন। আমি ওঁর সেই বৌ। কিন্তু সেই রানী বিয়ের বছরেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এল। উনি চাকরি নিয়ে পাটনায় চলে এলেন।

ডাক্তার ।। আর ঐ বিরজা ?

তরলা ।। জানিনা ডাক্তারবাবু, জানিনা [ক্ষণেক থামিয়া] জানি ডাক্তারবাবু, জানি। কিন্তু ঐ যে আবার বুঝি জ্ঞান হচ্ছে।

সুধীর ।। তরলা।

তরলা ।। [সুধীরের হাত দুখানি হাতে লইয়া সস্নেহে] কি ?

সুধীর ॥ ও কে ?

তরলা ॥ ডাক্তারবাবু !

সুধীর ॥ আমি ওষুধ খাব না। ডাক্তার, তোমার ওষুধ আমি ফেলে দিয়েছি। তুমি এখান থেকে পালাও বলছি।

[ডাক্তার বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন]

মাকে ডাক।

তরলা ॥ এখনো তো দুটো বাজেনি।

সুধীর ॥ কত বাকী ?

তরলা ॥ আরো আধ ঘণ্টা। এখন না হয় ঘুমোও, ঘুম থেকে জেগে উঠলেই তাঁদের দেখতে পাবে, তাঁরা এলেন বলে।

সুধীর ॥ কারা ?

তরলা ॥ মা আর খোকা খোকার কথাটি বুঝি ভুলেই গেছ ?

সুধীর ॥ আমার দুষ্টু খোকা ·আমার পাজী খোকা···আসবে ? সেও আসবে ?

তরলা ॥ বাঃ সে আসবে না ? বল কি ?

সুধীর ॥ ওরে সে যদি ট্রেনের জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখতে গিয়ে চলতি গাড়ী থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যায় ! সে যেন আসেনা···সে যেন আসেনা না···না···না।

তরলা ॥ মা তাকে কড়া পাহারা দিয়ে আনছেন, কোন ভয় নেই। তাকে কিন্তু চুমু খাবো আগে আমি . হ্যাঁ।

সুধীর ॥ আমার দুষ্টু খোকা···আমার পাজী খোকা, ছুটে এসে লাফিয়ে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুমি তখন মাকে প্রণাম করতে ব্যস্ত থাকবে। পাবে না . পাবে না খোকাকে পাবে না।

তরলা ॥ মাকে তবে আমিই আগে প্রণাম করছি, তুমি পাচ্ছ না।

সুধীর ॥ সেই ফাঁকে যদি রানী আসে তবে, সেই ফাঁকে রানী আমারই কাছে আগে চলে আসবে···আসবে কি না ?

তরলা ॥ [নীরব রহিলেন]

সুধীর ॥ কি ? রানী কি তবে আসছেনা ?

তরলা ॥ [নীরব রহিলেন]

সুধীর ॥ রানীকে তবে আসতে লেখোনি ?

তরলা ॥ লিখেছি।

সুধীর ॥ তবে সে আসবে। আসবে, সে আসবে। নিশ্চয় আসবে। আসবেই আসবে। হ্যাঁ, সে না এসে পারে না।

তরলা ॥ একটু বেদানার রস দিই ?

সুধীর ॥ ওরে রানী···ঘোষেদের বাগানে লিচু যা পেকেছে ! দেখলে

তোর মুখ জলে ভরে যাবে—কথাটি কইতে পারবিনা—আয় আয় চলে আয়।

[তরলা পাখা করিতে লাগিলেন।]

স্থধীর॥ আর তোর জন্য এই জামরুল এনেছি। পদ্ম? আজ পারিনি ভাই, কাল যাব। দীঘির মাঝখানে নীলপদ্ম আছে স্বপ্ন দেখেছি…নিবি ভাই নিবি? যাবি ভাই যাবি? আয় রানী আয়! চল রানী চল! ছুটে আ—য়! (বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িলেন)

ডাক্তার॥ [কক্ষান্তর হইতে প্রবেশ করিয়া] ঘুমিয়ে?

তরলা॥ বুঝছিনা!

ডাক্তার থাক। কিন্তু আপনি একলাটি আর কত রাত জেগে থাকবেন?

তরলা। এ তো আজ নতুন নয় ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার দুটো বাজতেও তো আর দেরি নেই, যাব আমি ষ্টেশনে?

তরলা॥ কেউ গেলে ভালো হ'ত, কিন্তু আপনাকে তাই বলে যেতে বলতে পারিনা—যেতে দিতেও পারিনা।

ডাক্তার তার মানে আপনার বড় ঈর্ষা। আপনার স্বামীকে আর কেউ সেবা করুক বা তার বিপদে তার কাজে লাগুক এটা আপনি সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু দেখুন, স্থধীর আমার প্রতিবেশী বন্ধু—আপনার সঙ্কোচের কোনই আবশ্যক নেই। আমি চললাম। আলোটা কমিয়ে দিন। ওর চোখে ওটা বড্ড বেশী লাগে। নমস্কার।

[ডাক্তার চলিয়া গেলেন।…তরলা উঠিয়া বাদাপটি খুব ছোট করিয়া দূরে রাখিয়া আসিলেন। একটা জানালা দিয়া খানিকটা জোৎস্না মেঝেতে ঝাপাইয়া পড়িল। আলোছায়ার আবহাতে মৃত্যু-শয্যা রহস্যময় হইয়া উঠিল। তরলা আর একটা জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানটা অন্ধকার। তরলাকে ভাল করিয়া দেখাই যাইতেছিল না।]

স্থধীর॥ কে বিরজা?—এসেছ?—এসো!—কিন্তু—কেন এলে তুমি? তরী যে এখনো ঘুমায়নি!—তার ওপর মা এসেছেন! পালাও তুমি পালাও। না গো না—ভালবাসি—সত্যি, এই মরতে বসেও সে কথা বলছি। কিন্তু—তরী কি বলবে—কি?—চুমো? শুধু একটি চুমো? তবে চট্ করে চলে এস—তরী ও-ঘরে রয়েছে—এই ফাঁকে দাও একটি চুমো দাও…একটি চুমো দাও…মরণের পথে ঐ একটি চুমো আমার বড় ভাল লাগবে। হ্যাঁ, আমার চোখে তোমার ঐ পাতলা ঠোঁটে একটি ছোট্ট চুমো দাও। [চুম্বন শব্দ] আঃ আঃ, আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। এ কি! তুমি কি কাঁদছো? কেঁদোনা, শব্দ করোনা পালাও, পালাও, শীগ্গীর পালাও।

[ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল]

ঐ দুটো বাজল। মা। মা! কোথায় আমার মা···ওগো আমার মা! কোথায়, মা, তুমি কোথায়? শীগ্‌গীর এস কোলে নাও আমায়—আমার হয়ে এসেছে—বড় জ্বালা—কোথায় তুমি! একটি চুমো দাও মা—একটি চুমো দাও। কই? কোথায় তুমি? আমি যে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! গেলাম মা, গেলাম। তোমার একটি চুমো পেলে আমি বেঁচে যাব—আবার বেঁচে উঠব আবার সারবো—আবার হাসবো—আবার অফিস করব—আবার টাকা রোজগার করবো—আবার তোমার পায়ে টাকা ঢেলে দেব। কোথায় তুমি—তবে কি তুমি আসোনি! তবে কি—তবে কি—আমি স্বপ্ন দেখছি। ও—হো—হো—কোথায় তুমি কোথায়! তোমার হাত দুখানি—কোথায় তোমার মুখখানি—কোথায় তোমার ঠোঁট দুটি—কোথায় তোমার আদরের একটি চুমো? [চুম্বন শব্দ] আঃ···ওগো আমার লক্ষ্মী মা। একটি চুমো দিয়ে—তুমি আমায় আজ বাঁচালে। আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। আমার ঘুম পাচ্ছে—খোকা আসেনি? দেখো—তাকে সামলে রেখো—ঘরেব নিচেই পুকুর—কিন্তু ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। ত—র—লা! আমি ঘুমালাম—তুমি শুধু খোকাকে নিয়েই থেকোনা—মার কাছেও থেকো—ওরে খো—কা, তুই এখন ঘু—মি—য়ে পড—কাল সকালে জেগে দু'জনে গল্প করব! বাঘের গল্প—চোরের গল্প—তেপান্তরেব মাঠে ডাকাতের গল্প—সাত ভাই চম্পার গল্প, আমাব রানীর গল্প—সেই ঘু—মি—য়ে প—ডা রা—জা—রানীর গল্প! [আবার অচেতন হইলেন।]

[দরজায় মৃদু করাঘাত হইতে লাগিল। আলো বাড়াইয়া দিয়া তরলা দরজা খুলিলেন। ডাক্তাব ঘরে ঢুকিলেন।]

তরলা ॥ খোকা কই? মা কই?

ডাক্তার ॥ বলছি—

তরলা ॥ বলুন—শীগ্‌গীর বলুন।

ডাক্তার ॥ সুধীর আর জেগেছিল?

তরলা ॥ আপনি বলুন শীগ্‌গীর—তাঁবা কোথায়?

ডাক্তার ॥ সুধীর আর জেগে-ছি-ল?

তরলা ॥ জেগেছিলেন। কিন্তু—তবে কি তাঁরা এ ট্রেনেও আসেননি!

ডাক্তার ॥ সুধীর জেগে কি তাঁদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলো?

তরলা ॥ ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার ॥ তারা—আসেনি।

তরলা ॥ আসেন—নি?

ডাক্তার ॥ না।

তরলা ॥ সর্বনাশ! তবে উপায়? এবার জাগলে—বিশু—ভোর হলে কি বলব? আমি কি বলব?

ডাক্তার ॥ এর পরের গাড়ী ক'টায় ?

তরলা ॥ সকালবেলায়। ডাক্তারবাবু—আপনি এই মুহূর্তে আপনার বাড়ী ফিরে যান। আমার কথা রাখুন।...যদি আপনার রোগীকে অন্ততঃ এই রাতটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চান—তবে আপনি এখুনি বাড়ী ফিরে যান।

ডাক্তার ॥ সে কি! আপনি একলা!

তরলা ॥ হ্যাঁ, আমি একলা—একা—ঐ মুমূর্ষুকে শান্তি দিতে পারবো। আপনি তাতে বাধা দেবেন না, আপনি যান, আমি আলো নিবিয়ে দিলাম—

[দীপ নির্বাণ। আর তাহার সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তরলা সশব্দে দুয়ার বন্ধ করিলেন।]

সুধীর ॥ মা!

[উত্তর হইল "এই যে আমি"]

ভারতবর্ষ—কার্তিক, ১৩৩৪

লক্ষহীরা

চন্দন দত্ত ॥ এই তার অভ্যর্থনা কক্ষ।

অদিতি ॥ অথচ আজ আমি এই প্রাসাদের সম্মুখ দিয়ে কতবারই না যাতায়াত করেছি! আমার মনেই হয়নি, আমি ধারণাই করতে পারিনি যে এ প্রাসাদ, রাজপ্রাসাদ না হয়ে...

চন্দন দত্ত ॥ কোন বারবিলাসিনীর প্রণয়ের পণ্যশালা হতে পারে!

অদিতি ॥ আমি ভেবেছিলাম এ রাজপ্রাসাদ।

চন্দন দত্ত ॥ বিদেশী সকলেই এমনই ভুল করেছে। রাজপ্রাসাদের চাইতে এ প্রাসাদ সুন্দর। এ প্রাসাদ অনুপম। এই প্রাসাদ দেখে রাজার হিংসা হওয়াতে...রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রাজা এই প্রাসাদেই দিবস যামিনীর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন।

অদিতি ॥ রাজকার্য ?

চন্দন দত্ত ॥ এই সুন্দরীর চরণপদ্মে অর্ঘ্যদান। রাজার ধর্ম, অর্থ কাম মোক্ষ এই সুন্দরী।

অদিতি ॥ পৃথিবী সুন্দর হ'ত, আরও সুন্দর হ'ত...সংসার সার্থক হ'ত, যদি এই প্রেম বিবাহের ফুলটি হয়ে ফুটে উঠত।

চন্দন দত্ত ॥ পৃথিবী সুন্দর হয়নি, আরো কুৎসিত হয়েছিল, সংসার অসার্থক হ'ল...যেদিন এই প্রেম বিবাহের বন্ধনে কারারুদ্ধ হ'ল। এই নারী এ কথা

মর্মে মর্মে অনুভব করে। তার নিজের মুখেই শুনেছি মানবের প্রিয়া, বিধিবদ্ধ জায়া নয়—সে কথা যাক। তোমার স্বামী কি ঘুমিয়েই আছেন ?

অদিতি ॥ হাঁ ঘুমিয়েই রয়েছেন।...কেন, লক্ষহীরা দেবীর কি দর্শন-দানের সময় উপস্থিত ?

চন্দন দত্ত ॥ না, এখনও প্রাসাদে ফিরে আসেনি। সে যখন ফিরবে রাজপথ জয়ঘণ্টায় মুখরিত হবে। সে প্রত্যহ রাজার সঙ্গে বৈকালে নদীবক্ষে নৌকা বিহারে যায়। ঐ—প্রাসাদশীর্ষে প্রদীপ জ্বলে উঠল !...ঐ সন্ধ্যাদীপের আলোতে প্রাসাদগাত্রের লক্ষ হীরা ঝলমল করছে ! . জানো এই লক্ষ হীরার প্রাসাদ থেকেই এর অধিশ্বরীর নাম লক্ষহীরা দেবী ?

অদিতি ॥ হীরা আজ আমি এই প্রথম দেখলাম।

চন্দন দত্ত ॥ অদিতি ! তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকোনা। তুমি তোমার রুগ্ন স্বামীকে সারাটি দিন পিঠে বহন ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ ! ঝোলাটি না হয় এখন নামাও !

অদিতি ॥ না। তাতে তিনি জেগে উঠতে পারেন !...এখন আর অনর্থক জাগাবো না। জাগলেই তাঁর যন্ত্রণায় আগুন জ্বলে উঠবে ব্যথাটা আজ বেশী বলছিলেন, আজ সারাটা দিন বড়ই কষ্ট ভোগ করেছেন।

চন্দন দত্ত ॥ কিন্তু তোমারও বিশ্রাম আবশ্যক ভগিনি।

অদিতি ॥ উনি ঘুমাচ্ছেন। আমার এত ভালো লাগছে। ঘুমের মধ্যে ওঁর আর কোন ব্যথা বোধ নেই। শুধু এই শান্তিটুকু উনি পান সেই জন্যেই আমি কত কামনা করি। ওর এই শান্তিতে আমার মনে হচ্ছে আমিই যেন ঘুমিয়ে পড়েছি ! আমার আর এতটুকু অবসাদ নেই।.. আমি যেন স্বপ্ন দেখছি লক্ষহীরা দেবী ওকে গ্রহণ করেছেন। ওঁর ঘুমন্ত মুখে হাসি ফুটে উঠেছে !...আজ আমার এত ভালো লাগছে।

চন্দন দত্ত ॥ ঘুমিয়ে থাকা ভালো।...স্বপ্ন দেখা আরো ভালো !...আমার ঘুম হয়না।...কতকাল স্বপ্ন দেখিনা তোমার স্বামীর সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ, ঘা... পুঁজ।...আমারো মনে অমনি জ্বালা !...কিন্তু, আমার চোখে ঘুম নেই।

অদিতি ॥ আমিও সারাটি দিন সারাটি রাত্রি প্রায় চেয়েই থাকি। চেয়ে না থাকলে মাছি পোকার দৌরাত্ম্য থেকে ওঁকে রক্ষা করতে পারিনা। হাঁ, আমি ওঁর পানে চেয়ে রাত কাটাই। সে আমার বেশ লাগে ..আমি ওঁর ঘুম মনে মনে প্রাণে প্রাণে অনুভব করি উনি তা' পারেন না। ঘুম যে সুন্দর। সে কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বোঝা যায় ?

চন্দন দত্ত ॥ গুরুদেব যখন তোমাদের ভার আমার হাতে সপে দিলেন তখন তোমার পরিচয়ে বলেছিলেন—তুমি দেবী। আমি আজ সাক্ষাৎ দেবী দর্শন করলাম।

অদিতি ॥ আমি দেবী নই। আমিও তাঁরই মন্ত্রশিষ্যা। আপনি আমার গুরু ভ্রাতা। দেবীই যদি হ'তাম, তবে কি উনি এত কষ্ট পান? দেবীই যদি হ'তাম, তবে আমার মনের চক্ষুতে ওঁর যে রূপটি দেখে আমি মুগ্ধ, সেই রূপটি ওঁর দেহে ফুটিয়ে বলতাম—দেখ তুমি কি সুন্দর! লক্ষহীরা দেবীকে দেখে উনি পাগল হয়েছেন, আমার দেওয়া ওঁর সে রূপ দেখলে এই লক্ষহীরা দেবীই আজকে ওঁর জন্যে আমারই মত পাগল হ'তেন। হ্যাঁ,…হতেন, আমি জোর গলাতেই বলতে পারি।…না, না আমি দেবী নই। দেবী হ'লে কি দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে, দাসীবৃত্তি করে কোনদিন না খেয়ে, কোনদিন শুধু জল খেয়ে লক্ষহীরা দেবীর দর্শনী এক শত মুদ্রা সংগ্রহ করতে হয়?

চন্দন দত্ত ॥ তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ…বড়ই ভাবিয়ে তুলেছ। আমার বড় ভয় হচ্ছে! আমি শুধু প্রার্থনা করছি, তোমার স্বামীর খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য তোমার এই দেহপাত সফল হোক…সার্থক হোক।

আদিতি ॥ ওর খেয়াল! কিন্তু খেয়াল তো আমারও কম নয়! শত স্বর্ণ মুদ্রা ওকে লক্ষহীরা দেবীর চরণে দর্শনী দিতে হবে—সে তো আমার আঁচলেই বাঁধা রয়েছে! এলেই খুলে দেব।…কিন্তু তারপর কি দেখব!—দেখব, উনি রোগ যন্ত্রণা ভুলে গেছেন! মনের আনন্দে লক্ষহীরা দেবীর গান শুনছেন! তাঁর নৃত্য দেখছেন! এক রাত্রির জন্য আমার ঐ দরিদ্রনারায়ণ রাজরাজেশ্বরীর সেবা পাচ্ছেন!…আনন্দে ওর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! আর আমি? আমি চুরি করে দেবতার সেই আরতি দেখব।

চন্দন দত্ত ॥ কিন্তু অদিতি! আমার বড় ভয় হচ্ছে! ভগবান তোমার এই অপূর্ব সেবা, অভূতপূর্ব নিষ্ঠা জয়যুক্ত করুন।

অদিতি ॥ আপনি বারবার ঐ সেবা আর নিষ্ঠার কথা বলে আমাকে অবাক করছেন! শুনুন। আপনি এই বয়সেই সংসার-বিরাগী হয়ে ভালো করেননি। আপনি বিবাহ করলে আমারই মত আর একটি নারী সেবা করে সুখী হ'ত, ভালবেসে ধন্য হ'ত।

চন্দন দত্ত ॥ আমার কথা থাক অদিতি। হ্যাঁ, সে থাক। তুমি শত স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করেছ বললে। কিন্তু লক্ষহীরা দেবীর দর্শনী এক শত এক স্বর্ণমুদ্রা।

অদিতি ॥ সেকি—তবে উপায়? আমি যে শত স্বর্ণমুদ্রার কথাই শুনেছিলাম!

চন্দন দত্ত ॥ ভুল শুনেছ।

অদিতি ॥ সর্বনাশ!

চন্দন দত্ত ॥ কিন্তু আমি সে কথা ভাবছিনা! আমি ভাবছি

অদিতি ॥ বেশ, আমি একশত এক স্বর্ণমুদ্রাই দেব। আমি আর এক স্বর্ণমুদ্রা এখনই নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, আমি আনতে পারব—সেই সজ্জাকরের কথায় আমি তখন সম্মত হইনি—এখন হব। আপনি দয়া করে এখানে

অপেক্ষা করুন, আমি যথাশীঘ্র ফিরে আসব। সেই সজ্জাকর আমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দেবে।

চন্দন দত্ত ।। শোন অদিতি !

অদিতি ।। না, আর কোন কথা নয়। [প্রস্থান]

চন্দন দত্ত ।। চলে গেল ! পতিভক্তির ঐ গঙ্গাকে গোমুখীতে রুদ্ধ করা দেবতারও অসাধ্য। পৃথিবী ধন্য হোক—সংসার পবিত্র হোক—সমাজ শিক্ষা লাভ করুক। কিন্তু কী আশা.এই নারীর ! অথবা দুরাশা ? লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দর্শনী দিলেও সেই যৌবন-মদ-মত্তা লক্ষহীরা ঐ কুষ্ঠ রোগীকে দর্শন দান করবেনা। আমি তাকে চিনি—জানি। কিন্তু তবু গুরুর আদেশ। ঐ তার জয়ঘণ্টার জয়ধ্বনি বাতাসে ভেসে আসছে ! ঐ—ঐ—সে ! পাশে রাজা ! ঐ—রাজা সোপান পথে দ্বিতলে বিশ্রাম কক্ষে উঠে গেলেন। সে একা এখানে আসছে—কতদিন পরে আজ তাকে দেখছি !…আজও তার ঐ রূপচ্ছবি আমাকে মুগ্ধ করছে ! কি অপরূপ ঐ রূপ ! কিন্তু, কিন্তু, আজ তার মুখখানি অর্ধ-অবগুণ্ঠনে আবৃত কেন ? না, না,—মুখের ঐ অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর দেবী !

লক্ষহীরা ।। জানি, এ স্পর্ধা শুধু এক তোমারই হ'তে পারে। কিন্তু সন্ন্যাসীপ্রবর, হে যোগেশ্বর ! সুন্দরীর মুখ-পদ্ম দর্শন সন্ন্যাসের কোন স্তর ? যোগের কোন অঙ্গ ?

চন্দন দত্ত ।। তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে ?

লক্ষহীরা ।। কিন্তু সে আজ নয়।

চন্দন দত্ত ।। আমি সেদিন না এসে আজ এলাম !

লক্ষহীরা ।। আজ আর তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

চন্দন দত্ত ।। কিন্তু তোমাকে আজ আমার প্রয়োজন আছে।

লক্ষহীরা ।। শোন। আমি তোমার উপদেশ শুনব না। আলাপ করতে পার, কিন্তু দোহাই—কোন উপদেশ দিও না।

চন্দন দত্ত ।। এসো, গল্প করি।

লক্ষহীরা ।। সে মন্দ হবেনা, কিন্তু সাবধান—নীতিমূলক গল্প করছ বুঝলেই আমি শপথ করে বলছি—উপর থেকে রাজাকে নিচে আনিয়ে, তোমারই সম্মুখে দুইজন একপাত্রে সুরাপান করে মাতাল হ'ব। হাঁ ?

চন্দন দত্ত ।। আমি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ব না। কিন্তু তোমার স্বরে সে উচ্ছাস কই ? তোমার চোখে মুখে অবসাদের আভাস পাচ্ছি ! কেন ? কুশলে আছ তো ?

লক্ষহীরা ।। অর্থাৎ দোকানদারি কেমন চলছে, এই কথা তো ?

চন্দন দত্ত ।। দোকানদারি !

লক্ষহীরা ।। সাধু ভাষায়, গণিকাবৃত্তি।

চন্দন দত্ত ॥ তাতে তোমার জয়জয়কার। প্রাসাদগাত্রে ঐ লক্ষ হীরা তার জ্বলন্ত বিজ্ঞাপন, আর উপরে প্রতীক্ষমান রাজা তার জয়-নিশান। কিন্তু আমি তো সে কথা জিজ্ঞাসা করিনি! আমি তোমার কুশল প্রশ্ন করেছিলাম।

লক্ষহীরা ॥ গণিকার জন্য অতখানি দরদ কি সংসার-বিরাগী সাধুর শোভা পায়?

চন্দন দত্ত ॥ ভেবে দেখ একদিন তুমি আমার—একান্তই আমার ছিলে। তোমার আত্মা, তোমার সত্তা, তোমার দেহ-মন সকল সম্পদ আমার অধিকারে ছিল। পুরোহিত অগ্নি সাক্ষী রেখে ঘোষণা করেছিল, আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী!

লক্ষহীরা ॥ মানুষ তখনো সভ্য হয়নি। অসভ্যদের মধ্যেই 'স্ত্রী' পুরুষের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিল। বিবাহের অনুষ্ঠান পুরুষের সেই সম্পত্তি লাভ ঘোষণা করত। এখনকার বিবাহ আদিম যুগের সেই অসভ্য প্রথার স্মৃতি।

চন্দন দত্ত ॥ তবু ভালো, সেই স্মৃতিটুকুও বিস্মৃত হওনি!

লক্ষহীরা ॥ না, তা হইনি বটে!—ঐ স্মৃতিটুকুর মূল্য আছে। ঐ স্মৃতিটুকু আছে বলে আজ পরিমাপ করতে পারি, যুগ থেকে যুগান্তরে আমরা কতখানি এগিয়ে চলেছি! কিন্তু আমি আর পারছিনা, বড়ই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। বাইরে জ্যোৎস্নায় আমার পদ্ম-কুঞ্জ স্নিগ্ধ শান্তিতে লুটিয়ে পড়ছে! যাবে?

চন্দন দত্ত ॥ না।

লক্ষহীরা ॥ কোন আবেদন আছে?

চন্দন দত্ত ॥ আছে।

লক্ষহীরা ॥ নিবেদন কর।

চন্দন দত্ত ॥ এক হতভাগ্য তোমার রূপ দে'খ মোহার্ত হয়েছে।

লক্ষহীরা ॥ লক্ষহীরার রূপ দেখে লক্ষ্য হতভাগ্য কামার্ত হয়েছে।

চন্দন দত্ত ॥ কিন্তু এর বিশেষত্ব আছে।

লক্ষহীরা ॥ উন্মত্ততা? না বিকার? না আত্মহত্যার জন্য অভিমানে ছুরিকা গ্রহণ? কি?

চন্দন দত্ত ॥ তুমি তা' শুনলে শিউরে উঠবে!

লক্ষহীরা ॥ কি! বিষ ভক্ষণ? না—জলে ঝম্প প্রদান?

চন্দন দত্ত ॥ সে কুষ্ঠ রোগী। গলিত কুষ্ঠ। সর্বাঙ্গে ঘা, পুঁজ!

লক্ষহীরা ॥ হাঁ, বিশেষত্ব আছে বটে! তা আমাকে কি করতে হবে?

চন্দন দত্ত ॥ তুমি ঐ হতভাগ্যকে গ্রহণ ক'রে আদরে আলিঙ্গনে অভিষিক্ত করবে।

লক্ষহীরা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

চন্দন দত্ত॥ কল্পনা কর এ সেই আদিম অসভ্য যুগ। মানুষ তখন কামকে

জয় করতে শেখেনি! মনে কর আমি স্বামী, তুমি আমার স্ত্রী! আমার সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হয়েছে!…নারী! তখন?

লক্ষহীরা॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

চন্দন দত্ত॥ ও অট্টহাস্য শ্মশানেই শোভা পায় নারী! যখন শ্মশানে ঘুরে বেড়াই, তখন আমি নিজেই ঐ অট্টহাস্যে শৃগাল শকুনিকে চমকিত করে মড়ার মাথার খুলি কেড়েনি। সে যাক। মণিমালিনীকে মনে পড়ে?

লক্ষহীরা॥ একদিন সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিল বটে! যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনীই ছিল!

চন্দন দত্ত॥ রাজা তাকে কি ভালই না বেসেছিল। তার প্রেমার্ত হয়ে কত কবি কত কাব্যই না রচনা করেছে!

লক্ষহীরা॥ আমরা রয়েছি বলেই তো কবিরা বেঁচে আছে!

চন্দন দত্ত॥ একদিন রাজা লক্ষ্য করলেন তাঁর প্রিয়তমা সেই প্রেয়সীর কপালের চর্ম কুঞ্চিত!

লক্ষহীরা॥ চন্দন দত্ত! তারপর?

চন্দন দত্ত॥ তার পরদিনই লোলচর্ম মণিমালিনীর সকল মণিমাণিক্য আঁধার করে নগরীর আর এক কুটিরে লক্ষ হীরা জ্বলে উঠল। সেই থেকে তুমি "লক্ষহীরা।"

লক্ষহীরা॥ আমার সুরাপানের সময় হয়েছে, আমাকে ক্ষমা কর।

চন্দন দত্ত॥ কিছুদিন পরে আমি শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দেখলাম গলিত শব নিয়ে শৃগাল আর শকুনিতে কি নিদারুণ যুদ্ধ! সহসা মনে পড়ে গেল— তোমাদের নিয়ে মানুষে মানুষে যুগে যুগে এমনি লড়াই-ই হয়েছে বটে। যাক —খোঁজ নিয়ে পরে জানতে পারলাম—মণিমালিনী—

লক্ষহীরা॥ সুরা! সুরা! সুরা আনো, পেয়ালা আনো—

চন্দন দত্ত॥ শুনলাম বারবিলাসিনী নগরনটী মণিমালিনীর শবদাহের জন্য নগরীর লক্ষ নাগরিকের এক নাগরও শোকার্ত বা কামার্ত হয়নি

লক্ষহীরা॥ চন্দন দত্ত! চন্দন দত্ত!

চন্দন দত্ত॥ হ্যাঁ কোন কুষ্ঠ রোগীও না।

লক্ষহীরা॥ [চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শিহরিয়া উঠিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন] উঃ উঃ [সহসা] হাঃ হাঃ হাঃ—আমি কি মাতাল হয়েছি! আমি কি পাগল? এ যে স্বপ্ন! দুঃস্বপ্ন? [কপালে ঘাম মুছিয়া] কে তুমি?

চন্দন দত্ত॥ আমি চন্দন দত্ত। আমি তোমার সেই আদিম অসভ্য যুগের স্বামী।

লক্ষহীরা॥ সে যুগের স্বামীরা স্ত্রী নিয়ে কি করতো?

চন্দন দত্ত॥ সম্পত্তিরূপে পরম আদরে রক্ষা করতো। ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করতো! সভ্যতাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য, মানবের জয়যাত্রায় সৈন্য

সরবরাহ করবার জন্য বংশবৃদ্ধি করতো। ভালবাসতো। জীবন যাত্রার বিষ এবং মধু, সুখ এবং দুঃখ, সমভাগে ভাগ করে নিয়ে জীবনযাত্রাকে সহজ সরল সুন্দর করতো। পরস্পরের অক্ষমতার দিনে পরস্পরকে সাহায্য করতো, সেবা করতো, লালন-পালন, ভরণ-পোষণ করতো। জরাতে বার্ধক্যে, এবং মৃত্যুতেও কেউ কাউকে পরিত্যাগ করতো না। তাদের শবদেহ সৎকার করতেও লোকের অভাব হ'ত না। মৃত্যুর পরও তাদের জন্য মর্ত্যে চোখের জল পড়তো।

লক্ষহীরা॥ উপদেশ! উপদেশ! উপদেশ! তুমি আমাকে তোমার সদুপদেশ শোনাচ্ছ? আমি আমার শপথ রক্ষা করব। আমি এখনি আমার মদের ভাণ্ডারীকে ডাকব।

চন্দন দত্ত॥ ক্ষণেক অপেক্ষা কর। শোন নারী, গত বসন্তপূর্ণিমায় তুমি কামদেবের মন্দিরে আলুলায়িত কুন্তলা হয়ে বেদীমূলে প্রণাম করেছিলে। পাশেই ছিলাম আমি। মুগ্ধনেত্রে আমি তোমার সেই কৃষ্ণ-কেশদাম দর্শন করছিলাম।

লক্ষহীরা॥ সে তো প্রণাম নয়, সে আমার কৃষ্ণ কেশদামের বিজ্ঞাপন। আমরা এ [illegible] ফাঁদ পাতি। কিন্তু সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে।

চন্দন দত্ত॥ কেন?

লক্ষহীরা॥ তুমি আমার পাশে ছিলে আমি জানতাম না। প্রণাম করছি, এমন সময় পাশে এক অস্ফুট আর্তনাদ শুনলাম। আমি চমকে উঠে তাকাতেই তোমাকে দেখলাম। ভাবলাম আর্তনাদ স্বাভাবিক। তবু, এক সুযোগে তোমাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তুমি কিন্তু কারণ বললেনা।

চন্দন দত্ত॥ হ্যাঁ, বলিনি। কিন্তু আজ বলব?

লক্ষহীরা॥ বল।

চন্দন দত্ত॥ না থাক।

লক্ষহীরা॥ আমার লতাকুঞ্জে চারুদত্ত এক মর্মর ঝর্ণা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই জ্যোৎস্না রাত্রে সেই ঝর্ণার নৃত্য ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে। স্বপ্নমধুর সেই দৃশ্য…যাবে?

চন্দন দত্ত॥ না, আমি তোমার পরিণাম ভাবছি।

লক্ষহীরা॥ আবার পরিণামের কথা? না, আমি রাজাকে ডাকি—সুরা আর পানপাত্র আসুক!

চন্দন দত্ত॥ যে মুহূর্তে রাজা এই কক্ষে পদার্পণ করবেন সেই মুহূর্তে—

লক্ষহীরা॥ হ্যাঁ, সেই মুহূর্তে?

চন্দন দত্ত॥ আমি সেদিন কেন আর্তনাদ করে উঠলাম, তার কারণ বলব।

লক্ষহীরা॥ বেশ, তখনো না হয় ব'লো, এখনো না হয় একবার ব'লো। ওগো বলো না শুনি! কি বলবে তুমি রাজার কাছে?

চন্দন দত্ত॥ বলব 'দেবী! তোমার ঐ অর্ধ অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর।'

লক্ষহীরা ॥ ওহো-হো ! [আর্তনাদ করিয়া সুখাসনে লুটাইয়া পড়িলেন]

চন্দন দত্ত ॥ ভয় নেই। তোমার অসভ্য যুগের সেই স্বামী তোমাকে হাত ধরে—যেখানে জরা-মৃত্যুর ভয়ে মানুষ কেঁপে ওঠে না, যেখানে লোলচর্মের বা তোমার অর্ধ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে লুকায়িত সেই একগুচ্ছ শুক্ল কেশের জন্য আশঙ্কা নেই, উদ্বেগ নেই, আমি তোমাকে আমার সেই সংসার আশ্রমে নিয়ে যাব। তুমি আমার পুনর্ভূ বধূ হবে। আমার বধূকে অবগুণ্ঠন দিয়ে তার শুক্ল কেশ লুকিয়ে রাখতে হবে না। সংসারে কেশ যত শুক্ল হয়, প্রেম তত শুভ্র হয়, তোমার ঐ শুক্ল কেশগুচ্ছ, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় যে কত দীর্ঘকালের তারই সুপ্রাচীন সাক্ষী। ভয় কি ? ক্ষোভ কেন ?

লক্ষহীরা ॥ আমার হাত ধর—আমায় নিয়ে চল।

চন্দন দত্ত ॥ কিন্তু তার পূর্বে তোমাকে দিয়ে দাম্পত্যপ্রেমের আর একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে রেখে যেতে চাই। পতিভক্তি যে কত উর্ধ্বে উঠতে পারে তা যদি দেখতে চাও, তবে, আমার অনুরোধটি রক্ষা কর।

লক্ষহীরা ॥ বল, শীঘ্র বল। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। তুমি আমায় নিয়ে চল—তুমি আমায় নিয়ে চল।

চন্দন দত্ত ॥ নিয়ে যাব, আজই, এই রাত্রিতেই। কিন্তু তার পূর্বে তোমাকে সেই কুষ্ঠ রোগীর সর্ব কামনা পূর্ণ করতে হবে।

লক্ষহীরা ॥ তাতে কার কি লাভ ?

চন্দন দত্ত ॥ সংসারের লাভ। সংসারাশ্রমে—পতিভক্তির এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা !

লক্ষহীরা। সে তুমি ভাল জানো। কিন্তু দেহমনের এই দোকানদারি থেকে আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও॥ এ সাজসজ্জা ক'রে মুখে রং মেখে শুভ্র কেশগুচ্ছ অবগুণ্ঠনে ঢেকে ঢেকে আমি এত ক্লান্ত,—এত শ্রান্ত —যে আমি তাই মদ ধরেছি। কোথায় তোমার সেই কুষ্ঠ রোগী ? শেষ কর—ইতি কর—আঃ তারপর মুক্ত জীবন। তোমার সেই শান্ত স্নিগ্ধ সংসার! সেখানে আবার আমি সেই বধূটি ! যৌবন গেল, তাতে কিবা এল গেল! স্বামী! প্রভু! প্রিয়ে!—সত্যি ? আমার যে আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। কোথায় তোমার সেই কুষ্ঠ রোগী ? আমি আমার সেই বিলাস কক্ষে চললাম—তুমি তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিও! হাঁ, এ জ্বালাময় জীবনের শেষ হোক, ইতি হোক, তুমি এইখানেই আমার জন্য অপেক্ষা কর—যেমন যুগে যুগে করে এসেছ! আমি ফিরে এলে তোমার চরণ দুখানি এগিয়ে দিয়ো ! হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়ো ! [প্রস্থান]

চন্দন দত্ত ॥ চলে গেল, মনে হচ্ছে রাত্রি শেষে চন্দ্রমা অস্ত গেল। তার পরই কি নব জীবনের প্রভাত-সূর্য উঠবে !—ও কে আসে ? অদিতি ? হাঁ

অদিতি ! অদিতি। ভগিনি, সার্থক তোমার স্বামী সেবা ! সার্থক নিষ্ঠা ! লক্ষহীরা তোমার স্বামীকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু এ কি !

অদিতি ॥ কি ভদ্র ?

চন্দন দত্ত ॥ তোমার কেশপাশ কই ? তুমি মুণ্ডিত মস্তক কেন ভগিনী ?

অদিতি ॥ ঐ সেই সজ্জাকর জানো —হাত দিয়েও তো ওঁর পা ধুয়ে তৃপ্তি পেতামনা, পাখা দিয়ে বাতাস করেও আশ মিটতোনা। ওঁর পা ধুয়ে মাথার চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দিয়েছি, মুখে চোখে বাতাস করেছি। তাই সজ্জাকরের স্বর্ণ-মুদ্রার প্রলোভনেও আমি ভুলিনি।—কিন্তু আজ এল আমার সব চাইতে বড় পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এলাম। এই সেই সজ্জাকরের দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা।

চন্দন দত্ত ॥ আজ যদি সত্যযুগ হ'ত, তবে তোমার ঐ মুণ্ডিত মস্তকে স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হ'ত ! কিন্তু সে যাক।—আর বিলম্ব নয়—দর্শনী সে নেবেনা—সে তার বিলাস-কক্ষে তোমার স্বামীর অপেক্ষা করছে। ঐ সোপানপথ দিয়ে উঠে—নির্ভয়ে তোমার স্বামীকে সেখানে রেখে এসো।

অদিতি ॥ ওগো ! জাগো ! জাগো ! জা—গো জা—গো !

[অদিতির তথাকরণ]

*　　*　　*　　*

চন্দন দত্ত ॥ সবাই চলে গেল ! পড়ে রইলাম আমি ' সে সত্যই বলেছে, যুগে যুগে আমি তার জন্য এমনি করেই প্রতীক্ষা করেছি। আজ আমার সেই প্রতীক্ষার অব. ন হবে।—অদিতি। দেবী। তুমিই আজ আমাদের এই নব জীবনের প্রাতষ্ঠা করেছ। তোমার পাতিব্রত্যের ভিত্তির উপর লক্ষহীরার নতুন সংসার গড়ে উঠুক—যুগে যুগে সীতা সাবিত্রীর মত তোমার জয়গান হোক—কে ! তুমি— !

লক্ষহীরা ॥ হ্যাঁ, আমি। জয়গান হবে কার ?

চন্দন দত্ত ॥ জয়গান হবে সীতার ! জয়গান হবে তোমার—তুমি রাজ-রাজেশ্বরী হয়েও অদিতির অলৌকিক পাতিব্রত্যকে জয়মণ্ডিত করেছ, তার কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত স্বামীকে আলিঙ্গন দিয়ে।

লক্ষহীরা ॥ না—না—না—

চন্দন দত্ত ॥ সে কি !

লক্ষহীরা ॥ এই বা কি ? সঙ্গে তার স্ত্রী ! স্ত্রী নিজে দেহপাত ক'রে স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করেছে তার স্বামীর অবাধ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে ! এই তোমাদের সতীত্ব ? এই 'সংসারের আদর্শ' ?—তুমি সরে দাঁড়াও—তুমি চলে যাও—আমি বমি করব !—রাজা কোথায় ? সুরা কই, পেয়ালা আনো—ঢালো।

———

ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৩৩

উইল

—ডাক্তার ডেকে আনি—

—না মুখার্জি। অনর্থক ডাক্তারকে টাকা দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। এ যন্ত্রণাটুকু আমি সহ্য করতে পারব।

—মুখে বলছেন বটে সহ্য করবেন, কিন্তু যন্ত্রণা সে কথা মেনে নিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে না। দেখুন, আপনি আর টাকার মায়া করবেন না। চিরটাকাল কুমারই থেকে গেলেন। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, আপনার অবর্তমানে আপনার অগাধ সম্পত্তি বারো-ভূতে লুটে পুটে খাবে—অথচ আজ ডাক্তারের ওষুধটুকু খেতে আপনার টাকার মায়া! ছিঃ—

—টাকার মায়া করব না আমি। তুমি জানোনা মুখার্জি, যে যত কষ্টে টাকা রোজগার করে, টাকা খরচ করা তার পক্ষে তত কষ্ট। ও আমার কষ্টের ধন বলেই ওর ওপর আমার মায়া মমতার অন্ত নেই। উঃ কী দিনই গেছে। জন্মে অবধি মা বাপের মুখ দেখতে পাইনি, জীবনে দুটো স্নেহের কথা শুনতে পাইনি মামার বাড়ীতে মামার গলগ্রহ হয়ে ছিলাম, মামী তাড়িয়ে দিলেন—একবস্ত্রে চলে এলাম রানীগঞ্জে। কুলীর কাজে যোগ দিলাম, তারপর—তারপর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধীরে ধীরে তোমাদের কারবারের বড়বাবু হয়ে আজ কেমন করে আমি লক্ষপতি হয়েছি সে ইতিহাস তোমরা না জানো এমন নয়। আমার সেই রক্ত-জল করা টাকা। তারই মায়ায় বিয়ে করিনি, তারই মায়ায় স্ত্রী-পুত্রের মায়া ত্যাগ করেছি।

—কিন্তু আপনার অভাবে এই অগাধ সম্পত্তি ভোগ করবে কে, সে কথা অন্ততঃ আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

—এসেছে, শুধু আমার নয়—আরো বহু লোকের। নিচের ঘরে সেই ভাবনা নিয়ে কত মহাত্মাই না বসে রয়েছেন খবর পেলাম। কী হবে এই সম্পত্তির, আমি মরলে কী হবে এই সম্পত্তির—এই ভাবনায় আজ দেখছি দেশের লোকের ঘুম নেই। দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের তো কথাই নেই, আবার শুনছি নানা পার্টির লোক, সভা-সমিতির সভ্য—তাঁরাও এ কথা ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলেন!

—আপনার মামাতো ভাই আজকে সকালের ট্রেনে এসেছেন। আপনার অসুখের সংবাদে তিনি বড়ই চিন্তিত হয়ে ছুটে এসেছেন।

—এসেই আমায় কি বলে জানো? বলে 'ঘুমের ভেতর নাকি দৈব স্বপ্নাদ্য ওষুধ মেলে' মা বলে দিয়েছেন। আমি বললাম হ্যাঁ ভাই, সেইটে একবার চেষ্টা

করে দেখ দেখি। বড় সুবোধ আমার ভাইটি! কখনও কথার অবাধ্য নয়। ছুটে চলে গেল ঘুমুতে। ঐ শুনছ না—ও ঘরে তার নাকের ডাক!—সে যাক। একটু জল দিতে বল দেখি।

· দিচ্ছি।

—না, তুমি না। তুমি আপিসে যাও—বড় কর্তারই না হয় অসুখ, কিন্তু ছোটকর্তাও সেই সঙ্গে আপিসে না গেলে কাজ চলবে না মুখার্জি।

—সে আপনি ভাববেন না। আমি কাজ শেষ করেই এসেছি—এই নিন জল।

—আঃ, লখিয়া কোথায়?

—লখিয়া কে?

—আঃ, সেই কুলি মেয়েমানুষটা!

—তাকে দিয়ে কি হবে?

—আমাকে জল দেবে। ওরাই যে আমায় দেখছে শুনছে!

—কেন, আমিই তো আছি।

—না মুখার্জি, তুমি আর দেরী করো না—আপিসে যাও—তাকে যদি ডাকতে পার ডেকে দাও—না হয় চলে যাও।

—লখিয়া বারান্দায় পড়ে ঘুমুচ্ছে। এই যে সর্দার কুলি, ডেকে দাও তো লখিয়াকে।

—সর্দার এসেছে?—মুখার্জি! তুমি ভাই নিচে গিয়ে ভদ্রবৃন্দকে সহানুভূতি জানিয়ে বিদায় [illegible] তো ভাই! ওদের চাঁদার খাতাগুলি আমার মানসপটে ভেসে উঠছে—আর আমার মাথা ঘুরছে!

—বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনার জ্বরটা কি আবার বেগ দিল? একবার ডাক্তারকে খবর দিলে—

—আমার হার্টফেল করবে—বুঝলে মুখার্জি! ডাক্তারকে ষোল মুদ্রা দর্শনী দিতে গেলেই আমার হার্টফেল হবে—বড় হিতৈষী দেখছি তোমরা আমার!

—আমি চললাম। নমস্কার।

—সর্দার।

—মহারাজ!

—মুখার্জি চলে গেছে, না?

—হ্যাঁ মহারাজ।

—আমায় জল দেবে কে?

—কেন, লখিয়াকেই তো পেয়েছেন!

—ওকে দেখলাম। ও নয়। সে যে কোথায় জানিনা, হঠাৎ যদি এক মিনিটের জন্যও একটিবার দেখতে পেতাম, চিনতাম, নিশ্চয়ই চিনতাম—কিন্তু কোথায় সে!

—কে ?

—আমার চোখের ঘুম !—ঘুম নেই, ঘুম নেই, আমার চোখে ঘুম নেই আজ একটি মাস ব্যারাম হয়ে পড়ে আছি, কিন্তু এক মিনিট ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না !

—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না মহারাজ ! কি চান আপনি ?

—শান্তি ভাই, শান্তি। জানো, আমার কত টাকা ?

—লাখ লাখ।

—প্রায় দশ লাখ। আমি আর দু'এক দিনের মধ্যেই মরব—এই দশ লাখ টাকা আমায় ধরে রাখতে পারবে না—কিন্তু তারপর ? তারপর ?

—মহারাজ !

—যখের কথা শুনেছ সর্দার ? আমাকে সেই যখ হয়ে আমার এই দশ লাখ টাকা আগলাতে হবে—আমার মুক্তি নেই, পরিত্রাণ নেই। আমার কি হবে সর্দার ?

—আপনি ঘুমোন মহারাজ !

—ঘুম নেই, চোখে ঘুম আসে না। এই টাকা আমার বোঝা হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে আমায় পিষে মারছে।

—কিছু না হয় বিলিয়ে দিন।

—বিলিয়ে দেব ! বিলিয়ে দেব ! কাকে বিলিয়ে দেব ? তোমাকে ? ওরে হারামজাদা তোকে ?

—আমি চাইনা মহারাজ।

—তবে ?

—কোনো ধরমশালাকে দিয়ে দিন।

—তোকে আমি জেলে দেব পাজী।

—তবে কি হবে মহারাজ ? যখ হলে তো বড়ই মুস্কিল হবে।

—যখ হতে হবে ভয়েই তোরা বিয়ে করিস, না ? তোরা মরলে তোদের ছেলেরা বিষয় পায় তোদের আর ভাবনা থাকেনা ! আঃ এ কথাটা তখন মনে হয়নি তাই আজ—আঃ, গলাটা শুকিয়ে গেল—জল দেবে কে ?

—দেব ?

—খবরদার।

—সখিয়াকে ডাকব ?

—না।

—তবে ?

—তোদের পাড়ার আর কেউ আসেনি আমার কাছে ?

—কেউ আর আসতে চায় না।

—আসতে চায় না সে বহুদিন শুনেছি। কিন্তু টাকা পেয়েও আসতে চায় না সে কথা আজ শুনছি!—টাকা পেয়েও আসতে চায় না···আগে এমন ছিল না! তখন যাকে বলেছি সেই উপরি রোজগারের লোভে আসতে চাইতো, এসেও ছিল কয়েক জন—কিন্তু—

—কিন্তু?

—কিন্তু এখন তারা সন্দেহ করে। মেয়েমানুষ কিনা? ওদের সন্দেহটা একটু বেশী। আমি তো ওদের কোন অনিষ্ট করিনা। শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখি। থাকে, খাওয়া করে, জল দেয়। একদিন থেকেই চলে যায়—এই তো কাজ!—এতেও আপত্তি?

—হ্যাঁ মহারাজ।

—ঐ লখিয়া তো এল।

—সবার মানা না মেনে এসেছে।

—এসে আবার ঘুমুচ্ছে। ওকে তুলে আন সর্দার।

—এই হারামজাদী।

—চুপ। হারামজাদা! এসো লখিয়া, আমার সমুখে এস। কোন ভয় নেই —হ্যাঁ—এস। এগিয়ে এস।

—আমার লাল টুকটুকে শাড়ী?

—দেবো লখি দেবো। সর্দার। আমি চোখেও আর ভালো দেখিনা—তুমি দেখ তো—লখিয়ার চোখের মণি দুটি কেমন?

—কালো—আলকাতরার ফোঁটা।

—তিল নেই? ও মণিতে তিল নেই?

—না। যে ঘুবঘুটি অন্ধকার—তিল থাকলেও হারিয়ে গেছে।

—তিল নেই! তবে তো ওর চোখ ভালো নয়। তবুও ওর গর্বের অন্ত নেই! হারামজাদী আবার শাড়ী চায়!··সর্দার! ওকে পাচ জুতি মেরে তাড়িয়ে দে—

—মহারাজের জয় হোক চল হারামজাদী! আবার শাড়ী পরতে সাধ! চল পেত্নী! আরে, তিল কি সবার চোখের মণিতে থাকে! তিল দেখবি তো আমার মেয়ের চোখ দেখগে যা ·হ্যাঁ...চোখ বটে। পুটপুট করে যখন চেয়ে থাকে!···তখন—

—সে কি সর্দার! তোমার মেয়ের চোখের মণিতে তিল আছে?

—আছে মহারাজ।

—সেই খুকী?

—মঙ্গলি।

—অতটুকু মেয়ের..

—সাত বছর বয়স হ'ল মহারাজ।

—একটু জল দাও সর্দার। লখিয়া পালিয়েছে ?

—ছুটে পালিয়েছে মহারাজ।

—তুমিই দাও।

—[জল এনে] নিন্।

—আঃ ··জুড়িয়ে গেল ! কি তেষ্টাই পেয়েছিল ! আঃ। আচ্ছা সর্দার। তুমি এমন বাঙলা কথা শিখলে কোথায় ?

—আমি যে মহারাজ কলকাতায় ছিলাম।

—কবে ?

—সে অনেক দিন হবে। বিয়ে করে নাকি আমি বৌ-পাগলা হয়ে গেলাম। বাবা একদিন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলে বৌকে বললাম চল্···কিন্তু গেলনা। একাই গেলাম কলকাতায়—সেইখানেই আমার কাজকর্ম শেখা তাইতো আজ মহারাজের দয়ায় আমার এই উন্নতি।

—বৌ গেলনা কেন ?

—বাবার ভয়ে। ভারী ভীতু ঐ মঙ্গলির মা।

—মঙ্গলিকে ফেলে কলকাতায় মন টিকতো ?

—তখন মঙ্গলি হয়নি মহারাজ। ফিরে এসে দেখি দুবছরের একটি মেয়ে ···তখন আরো ফুটফুটে ছিল যেন গোবরে পদ্মফুল বাবা বললেন, তোর মেয়ে মঙ্গলবারে হ'ল তাই নাম রেখেছি মঙ্গলি। এই বলে আমার কোলে তুলে দিলেন।

—মঙ্গলিকে দেখেছি, বেশ মেয়ে সর্দার কিন্তু, মঙ্গলির মাকে কি আমি কোনও দিনই দেখিনি ?

—সে যদি আগে দেখে থাকেন। আমি কলকাতা থেকে ফিরে আসবার পর তার যা দেমাক হ'ল মাটিতে পা পড়ে না আর কি ! বলে আমি খাটতে পারবোনা···আমি মঙ্গলিকে নিয়ে শুধু খেলে দিন কাটাব।

—মঙ্গলিকে বড্ড বেশী ভালোবাসে সে।

—হ্যাঁ মহারাজ। আমি জ্বালাতন হয়ে উঠেছি মেয়ে নিয়ে এমন অস্থির য আমার দিকে তার তাকাবারও ফুরসৎ নেই

—তাই বুঝি আর ঘরেরও বের হয় না ?

—ঘরের বের তো আমাদের মধ্যে এখন অনেকেই হয়না। যার অবস্থা ভালো সেই তার বৌ-ঝি ঘরেই রাখে। কয়লার খনির বাবুদের স্বভাব চরিত্রের তা আর সুবিধের নয়।

—নয়ই বটে। হ্যাঁ, সে কথা বুঝি। কিন্তু সর্দার, তোদের দেশের মানুষদের

মনে দয়া মায়া নেই…হ্যাঁ, নেই, নইলে…

—নইলে ?

—এই আমি বিদেশের একটি মানুষ…মরতে বসেছি, কেউ তো একবার উঁকিও দিয়ে যায় না যে আমার কি লাগবে…এককোঁটা জল…কি এক দাগ ওষুধ…কি একটু পথ্য !

—কেন, আপনার দাসদাসীরা তো রয়েছে !

—সেতো আমার রয়েছে। কিন্তু তোমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে।

—আমি তো রাত্তির-দিন হাজির।

—কিন্তু তোর বৌ ?

—না মহারাজ।

—তবেই দেখ ! আমাদের দেশে ওটি হ'ত না। অমন স্নেহ, অমন মায়া অমন মমতা, তোদের ওরা ভাবতেও পারেনা। সে যাক। সর্দার, আমার জ্বরটা খুবই বাড়লো। সর্দার, আর বুঝি বাঁচিনা !…সর্দার ! আমার কাছে কেউ নেই ! কেউ নেই ! একটা ছেলে নেই যে জড়িয়ে ধরবে, স্ত্রী নেই যে সেবা করবে, আমার ভালো লাগবে !…সর্দার, তোর বৌ আর মঙ্গলিকে আমার এখানে একবার নিয়ে আসবি ? শুধু দেখবো…চোখের দেখা দেখবো ! ওদের দেখলেও আমি শান্তি পাবো। আজ এই বিদেশে মরতে বসে আমার দেশের কথা মনে পড়ছে…মেয়েদের কাজল চোখের কালো ছায়ায় আমার ডুবে যেতে ইচ্ছে করছে ! কোথায় পাবো ? কোথায় পাবো ?

—আপনি ঘু ন মহারাজ !

—কাকে দেবো ? আমি আমার এই অগাধ সম্পত্তি—দশ লাখ টাকা কাকে —দেবো !

—ধরমশালাকে…

—খবরদার সর্দার। রক্ত জল করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা রোজগার করেছি সে টাকা দান করতে পারবোনা, খয়রাত করতে পারবোনা—যে টাকা আমি নিজে ভোগ করতে কষ্ট পেয়েছি, পরকে দিতে পারবোনা—না—না—কখখনো না…

—কিন্তু, আপনারও তো আর কেউ নেই !

—তা ঠিক। কেউ নেই…তবু।…সর্দার, টাকা নেবে ?

—মহারাজ আপনি ভালো হয়ে উঠুন—

—না সর্দার, আমি জানি আমি মরলে তোমরা খুশী হবে…আমি যে কৃপণ ! কিন্তু সর্দার, খুশী আমি বেঁচে থেকেই তোমাকে করে যাচ্ছি, এই দেখ আমার হাতে হাজার টাকার নোট…নেবে ?

—মহারাজ !

—নেবে সর্দার ?…শুধু একটি কাজ করতে হবে।

—কি মহারাজ ?

—ঐ মঙ্গলির কথা আমার আজ বড় বেশী মনে পড়ছে ! কি সুন্দর মেয়েটি ! ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কালো দুটি চোখ, মুখে আধো আধো বুলি। ওকে একটিবার আমার এখানে নিয়ে আসবে ? আমি ওকে বুকে নেব !

—মঙ্গলির মা মঙ্গলিকে ছেড়ে দেবে না।

—বেশ তো ! তাকেও সঙ্গে আনো !

—আমাদের দেশের নিষেধ আছে !

—দেশের নিষেধ কি আমার আদেশের চাইতেও বেশী ওজন সর্দার !

—মহারাজ !

—আসবে না সে ?

—না।

—না ? শোন সর্দার···আমার আদেশ কয়লার খনির মালিকের হুকুম তাকে তুমি এখানে এখনি আনবে···বুঝলে ?···সর্দার ! সর্দার !

—······

—সর্দার তো নেই দাদা ! সর্দার যে এইমাত্র ছুটে বের হয়ে গেল !

—কে ? বিমল ?

—হ্যাঁ দাদা। এত চেষ্টা করলাম স্বপ্নও দেখলাম, কিন্তু ওষুধ পেলাম না !

—টাকার স্বপ্ন কোনদিন দেখেছ ?

—দেখেছি।

—কত টাকা পর্যন্ত একসঙ্গে দেখেছ ?

—এক হাজারও একবার দেখেছিলাম কিন্তু

—কি ?

—কিন্তু সেই সঙ্গে জেলে চাবুক খাচ্ছি সেটাও দেখা বাদ যায়নি ·

—বেশ। চাবুক খেতে হবে না হাজার টাকাই মিলবে যদি একটা কাজ করতে পারো।

—বলুন, আমি তো আপনার শেষ দশায় শেষ কাজ করতেই এসেছিলাম।

—হ্যাঁ ভাই, আমার শেষ দশায় শেষ কাজ কর, ঐ জানলা দিয়ে নিচে দেখতে পারছো কুলী-সর্দারদের কুটীর-পল্লী ? দেখছ ?

—ঐ তো দেখছি !

—কাছে এসো···আরো কাছে। . পরিহাস নয় ভাই, যা বলবো এর চাইতে গুরুতর কথা আমি জীবনে বলিনি। যদি টাকা চাও যদি এই হাজার টাকার চকচকে নোটখানি চাও তবে···

—তবে ?

—তবে ঐ কুটীর-পল্লীতে এই মুহূর্তে আগুন দিয়ে এসো। আর আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তখন আগুন নেভাবার ছল করে চেঁচিয়ে বলবে···যদি বাঁচতে চাও, ছেলে পুলে নিয়ে বড়কুঠীতে যাও... বুঝলে ?

—দাদা সত্যি ?

—সত্যি···সত্যি ·সত্যি। এই নোটখানি যেমন হাজার টাকার সত্যি, তেমনি সত্যি।

—হাজার টাকা! কিন্তু দাদা একখানা মোটর গাড়ীর বড় সখ ছিল আমার।

—বেশ, যদি আমার মনস্কামনা পোরে তাও হবে, তাও হবে

—মোটর! মোটর! মোটর! ভ্যস ·ভ্যস্···ভ্যস্·

—মোটরের শব্দ মুখে করে আর কি করবে, মোটর নিজেই ও শব্দ করবে। তুমি আর বিলম্ব করো না কোন ভয় নেই, যাও· ·

—গেলাম।..ভ্যস্ ভ্যস্·· ভ্যস্··

—বিমল!

—.. ...

—বিমলবাবু আমাদের ঘরে আগুন দিতে ছুটে গেল···

—কে? তুমি কে?

—আমি সর্দার। আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনলাম। আমিও চললাম বিমলবাবুকে বাধা দিতে· ·কিন্তু যাবার আগে বলে যাই ·যদি ওই আগুনে আমার বৌ কি মঙ্গলি পুড়ে মরে···তবে

—তারা পুড়ে মরবে কেন! মরবেনা·· মরবেনা শুধু ঘর থেকে বের হয়ে এসে আমার কুঠিতে সবাই আশ্রয় নেবে ·আমি তাদের শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখব

—মঙ্গলিকে বুকে নিয়ে মঙ্গলির মা ঘুমিয়ে আছে। সেই ঘরেই যদি আগুন লাগে পড়ে···তবে···আচ্ছা, সে ফিরে এসে হবে—

—সর্দার! সর্দার!

—· ··· · ··· ···

—সর্দার ছুটে চলে গেল মহারাজ! কিন্তু আমার লাল টুকটুকে শাড়ী কই?

—কে! লখিয়া?

—হ্যাঁ লখিয়া!···আমার লাল টুকটুকে শাড়ী কই মহারাজ?

—ওরে লখিয়া! দেখ দেখি তোদের পাড়ায় কি আগুন লেগেছে?

—আগুন! সে কি মহারাজ!···আগুন নয়, আমি চাই সেই লাল টুকটুকে শাড়ী! হ্যাঁ, আগুনের মত লাল টকটকে।

—বড়কর্তা! বড়কর্তা!

—কে! মুখার্জি? এসো···শীগগীর এস···

—কি হয়েছে বড়কর্তা ? সর্দার কুলী বিমলবাবুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে আসছে ! কি হয়েছে বড়কর্তা ?

—কুলী পাড়ায় কি আগুন লেগেছে ?

—কই, না !

—সর্দার কুলীকে তবে এখানে নিয়ে এস

—আমি এসেছি মহারাজ।

—বিমল কোথায় ?

—নিচের ঘরে পড়ে আছেন।

—সর্দার ! তোমায় আমি এই হাজার টাকার নোট দান করলাম। নাও।

—কেন ? আমি তো আর মামলা মোকদ্দমা করব না ! তবে কেন এই ঘুষ !

—ঘুষ নয়। আমি খুশী মনে তোমায় দিলাম—তোমার মঙ্গলি বেঁচেছে, মঙ্গলির মা মরে নি সেই আনন্দে দিলাম।

—আমি চাইনা মহারাজ !

—তবে তোমার মঙ্গলিকেই দিয়ো।

—সেও নেবেনা। তার মা তাকে নিতে দেবেনা।

—আচ্ছা সর্দার ! মঙ্গলির মার চোখ দুটি কেমন ? তার চোখের মণিতেও একটি তিল আছে ?

—সে তো আমি অত ভালো করে দেখিনি। আর তাতে আপনার কি ?

—আমার আছে কি না, তাই।

—কই ? দেখি ?

—এই দেখ।

—হাঁ, তাই তো।

—দয়া কর—দয়া কর —দয়া কর সর্দার---মঙ্গলিকে একটিবার আমার বুকে এনে দাও---

—লখিয়া, তোর মেয়েটা কই ? মহারাজের বুকে তুলে দে।

—না না সর্দার, আমি কাউকে চাইনা আর কাউকে চাইনা, চাই মঙ্গলিকে।

—হাঃ হাঃ হাঃ—কুলীপাড়ার কোন মেয়ে আপনার কাছে আসবে না। আপনি তাদের ঘরে আগুন দেওয়াচ্ছিলেন সে কথা আর যেই ভুলুক আমি ভুলবোনা।

—মুখার্জি ! সর্দারকে ডিসমিস করো···এই মুহূর্তে।

—তাই হবে বড়কর্তা। সর্দার···তুমি অন্যপথ দেখ।

—মুখার্জি !···আমার যেন কেমন করছে !

—ডাক্তার ডাকি ?

—ডাক্তারকে পয়সা দিতে পারবো না।

—আচ্ছা, আপনি না দিলেন।

—না, ও কিছুতেই হবেনা। নিচের ঘরে বড় গণ্ডোগোল হচ্ছে।

—তাঁরা সব চাঁদার খাতা নিয়ে আবার এসেছেন।

—তাড়িয়ে দাও · তাড়িয়ে দাও ওদের।

—বেশ, আমি যাচ্ছি· ·কিন্তু ডাক্তার·· !

—ডাক্তারকে পয়সা দেবনা। ওদের বলে দাও···ওদেরও আমি একটি পাই পয়সা দেবনা . আর শুনিয়ে দাও যে আমি এখনই আমার সম্পত্তির উইল করব।

—কি উইল করবেন বড়কর্তা ? বিমলবাবুকে বুঝি···

—বিমলবাবুকে নয়। একলা কাউকেই নয়। যাকে দিতাম, আমি যে খুঁজে তাকে বের করতে পারলামনা। সর্দার চলে গেছে ?

—হাঁ চলে গেছে।

—কে ? লখিয়া ?···মঙ্গলি কোথায় রে লখিয়া ?

—ওরা সব ভিনগাঁয়ে পালিয়ে গেছে। আমাকে ধরে এনেছিস খবর শুনে মরদরা সব মেয়েদের ভিনগাঁয়ে চালান দিয়েছে। আমি পড়ে আছি আমার লাল টুকটুকে শাড়ী নেব বলে।

—মুখার্জি ! চ'ল না ! আমার অমনি এক মঙ্গলি অমনি এক মঙ্গলির মা ঐ কুলী-পাড়া মাঝে লুকিয়েছিল, এখন হারিয়ে গেছে, খুঁজে আর বের করতে পারলাম না। উইল লেখ মুখার্জি—আমি আমার সম্পত্তি ঐ কুলীদেরই দিয়ে গেলাম। যদি আমার মঙ্গলি বেঁচে থাকে, জনগণের মধ্যে দিয়ে সে তা ভোগ করবে। লখিয়া একটু জল। আঃ···আর ভাল কথা ঐ লখিয়াকে একখানা লাল টুকটুকে শাড়ী দিতে হবে—উইলে লিখতে ভুলো না।

ভারতবর্ষ. আশ্বিন ১৩৩৪

মাতৃ-মূর্তি

[গৌড়পতি মহাপাল দেবের রাজপ্রাসাদ-মধ্যস্থ শিল্পভবন। শিল্পভবনের অঙ্গনে প্রস্তর নির্মিত ছয়টি নারী-মূর্তি পাশাপাশি সাজানো রহিয়াছে, এবং তাহার পরেই অসমাপ্ত সপ্তম মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট একটি শূন্য বেদী রহিয়াছে। মূর্তিগুলি মহারানীর প্রতিমূর্তি, প্রত্যেকটির মূলতঃ একই রূপ কিন্তু ভঙ্গি বিভিন্ন। মূর্তি-শিল্পী এই ভাস্করের নাম শ্রীমান, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য ধীমানের এক বিখ্যাত তরুণ শিষ্য।

সবে মাত্র জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। আকাশে মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা চলিয়াছে, অদূরবর্তী 'রূপসাগরের' জলে তাহারই আলো-ছায়া এক স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিতেছে। এই আলো এবং আঁধারের মধ্যে ঐ মূর্তিগুলি রহস্যময়ীর মতো অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অঙ্গনের মধ্যভাগে শ্বেত পাথরের গোল বেদীর উপর স্থাপিত একটি ফোয়ারা। বেদীর উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া শ্রীমান দূরের ঐ মূর্তিগুলির পানে তাকাইয়া কি ভাবিতেছেন। নিঝরের মৃদু কলগান এবং দূরাগত ঝিল্লিরব ঐ আলোছায়া, ঐ নীরব নিথর মূর্তিগুলি শিল্পীর অন্তর বাহিরকে স্বপ্নময় করিয়াছে।

শ্রীমান তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছেন, তাহার সেই তন্ময়তা দূর করিল কাহার পায়ের নূপুর-ধ্বনি। শ্রীমান পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন রাজদাসী অঞ্জনা। অতিক্রান্ত যৌবনের আবাধনা-লব্ধ রূপসম্পদ গরিমাময়ী অঞ্জনা চোখেমুখে কি এক শঙ্কা এবং উদ্বেগ বহন করিয়া আনিয়াছে আজ।]

অঞ্জনা ॥ শেষ হয়নি? আজো শেষ হয়নি!

শ্রীমান ॥ কি?

অঞ্জনা ॥ কি, সে কি তুমি বুঝছ না? না, জান না?

শ্রীমান ॥ শেষ তো অনেক কিছুই হয়েছে, হচ্ছে—

অঞ্জনা ॥ তার মানে আমার বয়স গেছে, এই বলতে চাও তো? তা দেখে নেব সহজে মরছি না—দেখে নেব কার রূপ-যৌবনই বা চিরকাল থাকে হ্যাঁ—

শ্রীমান ॥ আমি বুঝি তাই বলতে গেছি? তুমি ত বেশ!

অঞ্জনা ॥ দর্প চূর্ণ হবে গো, দর্প চূর্ণ হবে। শোন, আর রসিকতায় কাজ নেই। রাজার আদেশ এনেছি আমি—হ্যাঁ।

শ্রীমান ॥ সে আমি জানি। জানি না শুধু এত রাতে মাথাল হয়ে কে কার কুঞ্জে অভিসারে চলেছে।—সত্যি।

অঞ্জনা ॥ আসিনি গো, আসিনি, তোমার কুঞ্জে অভিসারে আসিনি।—তাই বা কেন। আমি যে অভিসারে যাই, দেখেছ? দেখেছ? দেখেছ তুমি কোনদিন? তবে! বলে দেব আমি রানীকে তুমি এমন করে আমায় যা-তা বল।—আর তোমারই বা লুকিয়ে লাভ কি? যার মনে যা, জগৎশুদ্ধ তা—সে আমি বেশ বুঝি। নিজেই যাবে না কেউ আসবে?

শ্রীমান ॥ সে তো এসেছে—

অঞ্জনা ॥ কে?

শ্রীমান ॥ তুমি !

অঞ্জনা ॥ এই করে তুমি আমায় ভুলিয়ে দাও, রাজার আদেশ শুনবেনা এই বুঝি তোমার মতলব ? শোন গো শোন, তোমাকে যেতেই হবে।

শ্রীমান ॥ কোথায় ?

অঞ্জনা ॥ আমার সঙ্গে।

শ্রীমান ॥ তোমার সঙ্গে ? দোহাই তোমার—চেয়ে দেখ অঞ্জনা, কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে ! দেখেছ অঞ্জনা, ঐ অমন যে চাঁদ—কালো মেঘের আড়ালে তাও ঢাকা পড়লো। ঘোমটার আড়ালে অমনি করেই চাঁদমুখ ঢাকা পড়ে। সেই জন্যই তো বলি ঘোমটা খোল—খোল ঘোমটা !

অঞ্জনা ॥ [মুখে ঘোমটা টানিয়া] তুমি আমার মুখ দেখো না—হ্যাঁ—

শ্রীমান ॥ কিন্তু এতক্ষণ তো দেখছি। একটিবার দেখতে পেলেই জীবন ভরে দেখা হয়, জন্মজন্মান্তর মনে থাকে—ঐ তো তোমাদের রানীকে প্রতি মাসে শুধু একটিবার দেখতে পাই, তাতেই প্রতি মাসে তাঁর এক একটি করে ছয়টি প্রতিমূর্তি গড়েছি,—হয়নি ঠিক ?—হয়নি ?

অঞ্জনা ॥ ভাল কথা মনে করে দিয়েছ। রাজার কথা শোন। রাজা জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন রানীর সপ্তম প্রতিমা শেষ হয়েছে কি ?

শ্রীমান ॥ [শূন্য বেদীর প্রতি হস্ত নির্দেশ করিয়া] ঐ সপ্তম বেদী।

অঞ্জনা ॥ শূন্য ! এখনো শেষ হয় নি ?—সর্বনাশ !

শ্রীমান ॥ বড্ডই কঠিন যে অঙ্গনা ! এইবার সর্বনাশটা কি শুনি ?

অঞ্জনা ॥ আজ তোমার সপ্তম প্রতিমা শেষ হওয়ার কথা শিল্পবর !

শ্রীমান ॥ তা বেশ মনে আছে। প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় তার জন্য তাগিদ এসেছে। শুধু তাই নয়, আজ এই সপ্তম প্রতিমা শেষ হবে এই ব্যবস্থায় রাজা আগামী কাল বাসন্তী পূর্ণিমায় রানীর সপ্তম প্রতিমা উন্মোচন-উৎসবের বিরাট আয়োজন করেছেন। সেই উপলক্ষে তিনি দেশ-বিদেশের বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করেছেন। আমি সব জানি। এও জানি যে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের সেই উপলক্ষে আজ রাজধানীতে উপস্থিত। আমি না জানি কি ? সব জানি।—জানি না ?

অঞ্জনা ॥ [চঞ্চল হইয়া উঠিয়া] তবে ? কেন তবে ঐ সপ্তম প্রতিমা শেষ করনি ? কেন জেনে শুনে এই সর্বনাশ বরণ করলে ?

শ্রীমান ॥ মহা সর্বনাশটা যে কি, তাই তো এখনো জানলাম না অঞ্জনা !

অঞ্জনা ॥ তুমি এখনো সহজ ভাবে কথা কইতে পারছ ? বুঝতে পারছনা যে তোমার অদৃষ্টে আজ কি নিদারুণ অমঙ্গল লেখা ?

শ্রীমান ॥ অঞ্জনা ! অঞ্জনা ! তবে তুমি কি রানীর ঐ ছয়টি মূর্তির একটি মূর্তিরও মুখপানে চেয়ে দেখনি ? দেখনি কি তার চোখ দুটি ?

অঞ্জনা ॥ ও মূর্তি দেখতে হয় পথের লোকে দেখুক, আমি দেখতে যাব কেন ? আমি তো তাঁকে রক্তে মাংসেই দেখছি !

শ্রীমান ॥ তবে আমার চোখ নিয়ে তুমি দেখনি অঞ্জনা। আমি ঐ পাথরের মূর্তিতেও দেখি কি অপরূপ স্নেহ-স্নিগ্ধ চোখ দুটি ! যেন এই পৃথিবীর সকল আনন্দ ঐ চোখ দুটি থেকেই ঝর্ণার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ! যেন বিশ্বের সকল মঙ্গল, সকল কল্যাণ ঐ চোখ দুটিতেই জন্ম নিয়েছে। ঐ চোখের দৃষ্টির প্রসাদে আমি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি অঞ্জনা, আমার হবে সর্বনাশ ?

অঞ্জনা ॥ সর্বনাশ ! সর্বনাশ ! আজ তোমার মহা সর্বনাশ ?

শ্রীমান ॥ তুমি আমার ঐ কল্যাণী রানীর অপমান করো না অঞ্জনা—

অঞ্জনা ॥ বীরভদ্র খবর নিয়ে গিয়েছে তোমার সপ্তম প্রতিমা গড়া শেষ হয়নি। রাজা শুনে বললেন, যদি না হয়ে থাকে তবে শিল্পী শির দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে, আর হয়ে থাকলে

শ্রীমান ॥ আর, হয়ে থাকলে ?

অঞ্জনা ॥ তুমি যে পুরস্কার চাইবে, সেই পুরস্কারই পাবে।

শ্রীমান ॥ যে পুরস্কার চাইব, সেই পুরস্কার ?

অঞ্জনা ॥ কি আশ্চর্য ! রানীও যে রাজাকে হেসে ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন !

শ্রীমান ॥ বটে ! [মুহূর্তকাল থামিয়া] রাজা কি উত্তর দিলেন ?

অঞ্জনা ॥ রাজা গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুহূর্তকাল ভেবে বললেন অবশ্য সে পুরস্কার যদি অসম্ভব না হয়।”

শ্রীমান ॥ তারপর ?

অঞ্জনা ॥ তারপরই আমার দিকে চেয়ে বললেন, অঞ্জনা, তুই গিয়ে দেখে আয়। যদি সপ্তম প্রতিমা শেষ না হয়ে থাকে, তবে, শিল্পীকে এখনি আমার বিচারশালায় ডেকে আনিস। সঙ্গে সঙ্গে [বিষম বিচলিত হইয়া] তুমি কি করবে ! তুমি এখন কি করবে।—আমি যে সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম !

শ্রীমান ॥ কি কথা অঞ্জনা ?

অঞ্জনা ॥ [চারিদিকে চাহিয়া, ভয়ে] তুমি পালাও ! তুমি পালাও !

শ্রীমান ॥ পালাব কেন ?

অঞ্জনা ॥ কথা নয়, এখনো সময় আছে, তুমি পালাও—

শ্রীমান ॥ তবে কি সঙ্গে সঙ্গে ঘাতকের আহ্বানও শুনে এসেছ অঞ্জনা ?

অঞ্জনা ॥ [আতঙ্কে] হ্যাঁ…হ্যাঁ…[সম্মুখ দিকে কাহাকে আসিতে দেখিয়া] ও কে ? [চিনিতে পারিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল] ও-হো-হো !

শ্রীমান ॥ কে ?

অঞ্জনা ॥ বীরভদ্র !

শ্রীমান ॥ সে কি ?

অঞ্জনা ॥ ঘাতকের সর্দার !

[বীরভদ্র শ্রীমানের সম্মুখীন হইল]

বীরভদ্র ॥ [শ্রীমানের প্রতি] সপ্তম প্রতিমা ?

শ্রীমান ॥ হয়নি ।

বীরভদ্র ॥ [তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া] চলে এস ।

[অঞ্জনা ভয়ে আতঙ্কে আর্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল ।]

শ্রীমান ॥ কোথায় ?

বীরভদ্র ॥ রাজা তোমার প্রতীক্ষা করছেন, বিচারশালায় ।

শ্রীমান ॥ আর রানী ?

বীরভদ্র ॥ দেখা যদি তাঁর নিতান্তই চাও, তোমার বধ্যভূমিতে দেখা হতে পারে । জানাবো তাঁকে তোমার প্রার্থনা ?

শ্রীমান ॥ হ্যাঁ, সেটা নিতান্তই প্রয়োজন । রাজার পুরস্কার তো মিলল ভাই, কিন্তু রানীর পুরস্কার

বীরভদ্র ॥ জীবনের পরপারে ।

শ্রীমান ॥ হ্যাঁ ভাই, জীবনের পরপারে । তুমি শুধু আমায় ঐ দয়াটুকু কর, আর কিছু না । দাঁড়াও আমার বাঁশী নিতে হবে—[বেদীর উপর হইতে বাঁশীটি তুলিয়া নিলেন] এইবার চল ।

বীরভদ্র ॥ বাঁশীটিও কি তোমার পরপারের সাথী ? [অগ্রসর হইল]

শ্রীমান ॥ হ্যাঁ ভাই । শুধু পরপারের নয়, জন্ম-জন্মান্তরেরও । কিন্তু ঘাতকের সর্দার হয়ে এত কথা তুমি জানলে কেমন করে ভাই ?

বীরভদ্র ॥ [প্রস্থান কালে] জানি, জানি, জানি । জীবন-মরণের কথা আমরা যত জানি, তোমার রানীও জানেন না —হ্যাঁ—

[উভয়ের প্রস্থান]

* * * *

[আকাশে বিশাল একখণ্ড কালো মেঘ চাঁদকে পরিপূর্ণ ভাবে ঢাকিয়া ফেলিল । তাহারই অন্ধকারে চোরের মতো এক রমণীমূর্তি আত্মপ্রকাশ করিল । রমণীমূর্তি কাহাকে খুঁজিতে লাগিল । পরে চঞ্চল হইয়া ডাকিল "অঞ্জনা !"]

অঞ্জনা ॥ [ভয়জড়িত স্বরে] কে ?

রমণীমূর্তি ॥ [তৎক্ষণাৎ তাহার পাশে গিয়া] অঞ্জনা ! তুই !

অঞ্জনা ॥ [অর্ধোত্থিত হইয়া] কার স্বর ? কে তুমি ?

রমণীমূর্তি ॥ না, না, এটা শ্মশান নয় । কিন্তু, তার বুঝি আর বিলম্বও নেই অঞ্জনা !

অঞ্জনা ॥ রানী ! [উঠিয়া দাঁড়াইল]

রমণীমূর্তি ॥ চুপ !…চুপ !

অঞ্জনা ।। তুমি ! এখানে ! এত রাত্রে !

রানী ।। [কাঁপিতে কাঁপিতে] হয়নি, আমার সপ্তমমূর্তি হয়নি, না ?

অঞ্জনা ।। না . তাকে ধরে নিয়ে গেছে রানী !

রানী ।। আমি জানতাম, সে শেষ করবে না। গত মাসে যখন সে ষষ্ঠমূর্তি গড়বার সময় আমাকে দেখছিল, তখন বলেছিল যে, আর আমার সপ্তম প্রতিমা গড়বেনা,—আমি জানতাম, তখনি জানতাম।

অঞ্জনা ।। কেন—কেন গড়েনি তোমার সপ্তম প্রতিমা ?

রানী ।। পাগল, পাগল ঐ শিল্পী। সপ্তম প্রতিমা গড়া শেষ হলে সে আর আমার দেখা পাবেনা, সেই ছিল তার ভয়। আমি এত করে তাকে বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু পাগল পাগল সে। পাগলের মতো শুধু প্রলাপ বকে যেতে লাগলো। বললে সে যতই মূর্তি গড়ছে যতই দিন যাচ্ছে ততই আমি নাকি তার চোখে তার ধ্যানে তার কল্পনায় আরো—আরো অপরূপ-আরো অপূর্ব হয়ে উঠছি। আমার পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ মূর্তি সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দানে গড়ে তুলবে এই ছিল সেই পাগলের প্রতিজ্ঞা—

অঞ্জনা ।। রাজাকে তুমি বলনি কেন সে কথা রানী।

রানী ।। তার মানে কি এই নয় অঞ্জনা, যে রাজাকে কেন বলিনি ঐ শিল্পী আমাকে পাগল হয়ে ভালবাসে ?

অঞ্জনা ।। এখন উপায় ?

রানী। কি যে উপায় জানিনা। রাজা গেছেন বিচারশালায়। আমি পালিয়ে এসেছি তোর খোঁজে।…অঞ্জনা তার শিল্পশালা কোথায় জানিস ?

অঞ্জনা ।। [অদূরবর্তী শিল্পশালা দেখাইয়া] ঐ তার শিল্পশালা। কিন্তু সে তো সেখানে নেই।

রানী ।। জানি, নেই। জানি সে এতক্ষণ বধ্যভূমিতে চলেছে। কে না জানে রাজার ক্রোধ। কিন্তু তা নয়, তা নয় ··অঞ্জনা, ঐ বুঝি সেই শূন্য সপ্তম-বেদী ?

অঞ্জনা ।। হ্যাঁ।

রানী ।। ঐ যে আর ছয় মূর্তি। [এক মূর্তির কাছে গিয়া] অবগুণ্ঠন নেই , সে আমায় বলেছে যে, অবগুণ্ঠন সে ভালোবাসে না।

অঞ্জনা ।। শুধু কি অবগুণ্ঠনঃ নেই রানী ? বুকেই বা বসন কই ?

রানী ।। সে বলেছে, সে আমায় বলেছে, সন্তান যেমন জননীকে ভালো-বাসে এমন ভালোবাসা আর কেউ বাসে না। প্রিয়তম সন্তান প্রিয়তমা জননীর বুকের বসন টেনে ফেলে দেয়। সে বলেছে এও তাই। এও তাই ! .. যাক সে কথা। ·হ্যাঁ, আমি দেখে নিয়েছি। ··শোন অঞ্জনা, দোহাই তোর আমার কথা রাখ—

অঞ্জনা ॥ কোন দিন রাখিনি ?

রানী ॥ রেখেছিস, চিরদিন রেখেছিস, কিন্তু আজ চিরদিনের মধ্যে একটি বিশেষ দিন, বিশেষ রাত্রি !···আমি শিল্পশালায় চললাম। এক মুহূর্তে আমি ঐ সপ্তম প্রতিমা গড়ব। গড়ব . আমি গড়ব ! তুই শুধু ছুটে রাজার কাছে যা। গিয়ে বল···শিল্পী সপ্তম প্রতিমা গড়ে রেখে এসেছে, রাজা, এসে এখুনি দেখুন। শিল্পী পাগল তার মাথার ঠিক নেই কথার ঠিক নেই—

অঞ্জনা ॥ তোমারও আছে আমার তো তা মনে হচ্ছে না রানী !

রানী ॥ [ক্রুদ্ধ হইয়া] যা···তুই যা [পুনরায় মিনতিতে] যা অঞ্জনা যা—দোহাই তোর, যা—

[অঞ্জনা চলিয়া গেল। রানীও পথ খুঁজিতে খুঁজিতে শিল্পশালায় চলিয়া গেলেন। তখন অন্ধকার আরো গাঢ় হইতেছে। হঠাৎ সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দূর হইতে কাহার আকুল-করা বাঁশীর ধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমেই সেই মুরলী-ধ্বনি নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। ক্রমে বংশীবাদক প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। বংশীবাদক আর কেহ নহে—শ্রীমান। সঙ্গে বীরভদ্র]

বীরভদ্র ॥ শিল্পী ! বাঁশী বাজানো তো শেষ হল, এইবার মৃত্যুর পূর্বে তোমার হাতে-গড়া, ঐ রানীর ছয় মূর্তি শেষ দেখা দেখে নেবে বলেছিলে, দেখে নাও—কিন্তু দেখবেই বা কেমন করে ! আলো কই !

শ্রীমান ॥ আলো আমার চোখে।···ঐ দেখ সেই আলো···ঐ আকাশের কালো মেঘ সরিয়ে দিচ্ছে . ঐ দেখ ক্রমে চাঁদের চাঁদমুখ ফুটে উঠছে··· প্রাণভরে বাঁশী বাজালাম কিন্তু, সপ্তম প্রতিমা যদি গড়তে পারতাম, তবে··· তবে তো আমার প্রাণ ভরতো বীরভদ্র !

[অঞ্জনাসহ রাজার প্রবেশ]

রাজা ॥ অঞ্জনা ! অঞ্জনা ! হয় তুই পাগল, না হয়, সেই শিল্পী পাগল

অঞ্জনা ॥ রানী বলেছেন সেই শিল্পীই পাগল। সে সপ্তম প্রতিমা গড়েও মিথ্যা বলেছে—

রাজা ॥ কোথায় শিল্পী তোমার প্রতিমারাজি ? কোথায় তোমার সপ্তম প্রতিমা ?

শ্রীমান ॥ আমি গড়িনি···আমি গড়িনি !

রাজা ॥ এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—

অঞ্জনা ॥ [চীৎকার করিয়া উঠিল] ঐ সাত—

রাজা ॥ সাত ! তাই তো ! পাগল, সত্য সত্যই পাগল ঐ শিল্পী। বীরভদ্র, শিল্পী মুক্ত। কাল থেকে স্বয়ং রাজ-ধন্বন্তরি যেন ওর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। অঞ্জনা, তোরই কথায় বিশ্বাস করে ভাগ্যিস আমি এখানে এসেছিলাম, তাই এক নিরপরাধকে হত্যা করার পাপ থেকে অব্যাহতি পেলাম ! এই নে তোর পুরস্কার—

[কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া অঞ্জনার হাতে দিতে গেলেন—কিন্তু অঞ্জনা তাহা গ্রহণ করিতে পারিলনা, শুধু "রাজা !...রাজা !" বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গেল

রাজা॥ তবে এ হার তুমি নাও বীরভদ্র, তুমি আমাকে ঐ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্যের অন্তিম প্রার্থনা পূর্ণ করতে অনুরোধ করেছিলে, তার ফলে ঐ নিরপরাধ হতভাগ্যের জীবনহরণের পাপ থেকে আমি অব্যাহতি পেয়েছি—এইবার ঐ সম্পূর্ণ সপ্তম মূর্তি আজ রাত্রেই আমার উদ্যান-ভবনে স্থানান্তরিত কর, কাল প্রভাতেই মূর্তি উন্মোচন উৎসব। স্মরণ থাকে যেন—

[বীরভদ্র সম্মতি জানাইল]

শ্রীমান॥ [তিনি কিন্তু এ সব কথায় কান না দিয়া সপ্তম প্রতিমা দর্শন মাত্র, পরিপূর্ণ বিস্ময়ে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া, বিস্ময়বিমূঢের মতো তাকাইয়া তাহা দেখিতে দেখিতে প্রতিমাটি স্পর্শ করিবামাত্র ভয়ে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন এবং তখনি ছুটিয়া আসিয়া রাজার চরণে পড়িয়া বলিলেন] আমি গড়িনি, আমি গড়িনি···ও মূর্তি আমি গড়িনি—[কিন্তু এই কথাতে কি এক বিষম অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিয়া দেহ-মনের পরিপূর্ণ আকুলতায় কহিতে লাগিলেন] না—না, গড়েছি, আমিই গড়েছি, ওর প্রতিটি অণু পরমাণু আমি গড়েছি, আমার জীবনের শেষ দিন বলে আমারই মানসী-প্রতিমা মূর্তিমতী হয়েছে আজ।··তুমি যাও রাজা, তুমি যাও—আমার এই নিভৃত অঙ্গনে তোমরা কেন? কেন তোমরা? যাও, যাও, যাও তোমরা যাও—

রাজা॥ ওরে উন্মাদ। সরে দাঁড়া। বীরভদ্র, নিয়ে চল ঐ সপ্তম প্রতিমা আমার রাজোদ্যানে—

শ্রীমান॥ না—না—না! [রাজার পা জড়াইয়া ধরিলেন]

রাজা॥ ছিঃ শিল্পী!

শ্রীমান॥ [রাজার চরণে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে] আমি গড়েছি, সপ্তম প্রতিমা আমিই গড়েছি, আমার পুরস্কার কই? দাও—দাও—আমায় আমার পুরস্কার দাও—

রাজা॥ সেদিকে দেখছি ভুল নেই! পুরস্কার [হাসিয়া]···কি পুরস্কার তুমি চাও শিল্পবর?

শ্রীমান॥ তোমার প্রতিজ্ঞা তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর রাজা, রক্ষা কর—

রাজা॥ কি তোমার পুরস্কার? শুনি।

শ্রীমান॥ শুধু একটি প্রার্থনা।

রাজা॥ প্রার্থনা? কি প্রার্থনা?

শ্রীমান॥ মূর্তি সম্পূর্ণ হলে শিল্পী তাকে পূজা করে। আমার সেই মূর্তিপূজা হয়নি রাজা! আজ রাত্রে, নিশীথে আমি মূর্তিপূজা করব। পূজা শেষে, কালপ্রভাতে ঐ মূর্তি স্থানান্তরিত করো। আজ নয়, আজ এই রাত্রে নয়—শুধু। শুধু এই!

রাজা॥ শুধু এই? অর্থ নয়, মণি-মাণিক্য নয়, শুধু এই?

শ্রীমান॥ [পরম মিনতিতে] শুধু এই! শুধু এই।

রাজা॥ বেশ তাই হোক! এস বীরভদ্র, অতিথিনিবাসে নিরাশ

রাজন্যবৃন্দের নিকট সপ্তম প্রতিমা সম্পূর্ণ হবার শুভ সংবাদ আমি স্বয়ং বহন করব।

[বীরভদ্রসহ রাজার প্রস্থান। শ্রীমানও তখনি সপ্তম প্রতিমার দিকে অগ্রসর হইলেন। অঞ্জনা, রাজা ও বীরভদ্র অঙ্গনের বাহিরে গিয়াছেন কিনা চোরের মতো চুরি করিয়া দেখিয়া লইয়া, ছুটিয়া আসিয়া শ্রীমানের হাত ধরিল]

অঞ্জনা ।। শিল্পী!

শ্রীমান ।। [চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দেখেন অঞ্জনা] অঞ্জনা?

অঞ্জনা ।। হ্যাঁ। — শীগগীর আমার সঙ্গে এস।

শ্রীমান ।। কোথায়?

অঞ্জনা ।। তোমার শিল্পশালায়।

শ্রীমান ।। কেন?

অঞ্জনা ।। কথা নয়, কথা নয়, কোন কথা নয়। রানীর বিষম বিপদ। যদি তাকে বাঁচাতে চাও, আমার সঙ্গে এস। দেরি নয়, এক মুহূর্ত দেরি নয়—

[শিল্পশালার দিকে ছুটিল]

শ্রীমান ।। রানী কোথায় আমি জানি।

[ছুটিয়া সপ্তম প্রতিমার সম্মুখে গিয়া তাঁহার চরণে মাথা রাখিয়া]

এ তোমার কি খেলা দেবী!

[সপ্তম প্রতিমা কাঁপিয়া উঠিল]

তুমি পালাও—তুমি পালাও! রাজা এখনো শয়নাগারে ফেরেননি, তিনি গেছেন অতিথি-নিবাসে, এই অবসরে তুমি পালাও! নামো, নামো, ঐ বেদী থেকে নেমে এস!

সপ্তম প্রতিমা ।। [শ্রীমানের সম্মুখে হস্ত দু'খানি প্রসারিত করিল] আমার হাত ধর [শ্রীমান হাত ধরিলেন] এইবার চল।

শ্রীমান ।। কোথায়?

সপ্তম প্রতিমা ।। রাজার শয়নাগারে নয়, তোমার কুঞ্জে। তোমার যন্ত্রপাতি নাও, তোমার বাঁশী নাও। তারপর চল দূরে—দূ—রে, আ—রো দূরে! সমুদ্রের পারে কিংবা পাহাড়ের ধারে—যেখানে রাজা নেই, প্রাচীর নেই, অবগুণ্ঠন নেই, আবরণ নেই—

শ্রীমান ।। [হাত ছাড়িয়া দিয়া] তোমার মুখে একি কথা! তোমার চোখে ও কিসের আগুন?

সপ্তম প্রতিমা ।। লোভের আগুন। কি লোভেই লুব্ধ করেছ তুমি শিল্পী যে আমার অবগুণ্ঠন খসে গেছে, পাষাণেও কথা ফুটেছে?

শ্রীমান ॥ লুব্ধ করেছি ! আমি ?—তোমায় ?

সপ্তম প্রতিমা ॥ হ্যাঁ, তুমি !—আমায়। জানি আমি সুন্দর, কিন্তু কে আমায় সুন্দর করেছে ? রাজা নয়, তুমি। তোমার চোখের—তোমার হাতের—তোমার বুকের আলো, আমার চোখে মুখে বুকে আলো জেলেছে। সেই আলোর মদে মাতাল হয়েছি আমি। আলো কই ? আলো দাও। আরো আলো—আরো—আরো !

শ্রীমান ॥ হ্যাঁ, দেবো, কিন্তু আজ নয়, এ জন্মে নয়— পরজন্মে।

সপ্তম প্রতিমা ॥ পরজন্মের কথা মিথ্যা। কে তার খোঁজ রাখে ! আমি জানি—শুধু আজ। আজ আমাকে রূপ দাও, রস দাও, গান দাও, গন্ধ দাও—আজ আমার মাঝে তোমার মনের কামনা মূর্তিমতী হোক, সপ্তম প্রতিমা সার্থক হোক।

শ্রীমান ॥ পরজন্মে, পরজন্মে। আমার এ জন্মের কাজ শেষ হয়েছে, ক্ষমতা শেষ হয়েছে। মূর্তির পর মূর্তি গড়ে তোমার যে রূপের পরিকল্পনা করেছি, ছ'টি মূর্তিতে তার এক বিন্দুও আভাস দিতে পারিনি। গড়বো, আমি তোমার সপ্তম প্রতিমা গড়বো, কিন্তু আজ নয়। সেইদিন—যেদিন তুমি আমি এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ হ'ব—সে আজ নয়—আজ তুমি যাও।

সপ্তম প্রতিমা ॥ এক দেহ ! এক মন ! এক প্রাণ !

শ্রীমান ॥ হ্যাঁ এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ। সেইদিন, যেদিন তোমাতে আমাতে কোন ব্যবধানই রইবেনা, রাজা না, প্রাচীর না, অবগুণ্ঠন না, বুকের বসন, দেহের আবরণও না। কিন্তু সে আজ নয়, আজ নয়, আজ তুমি যাও।

সপ্তম প্রতিমা ॥ [আকুল আবেগে] আজ। আজ—এখনি।

[বেদী হইতে নামিয়া ব্যগ্র বাহুতে শ্রীমানকে আলিঙ্গনোদ্যত হইলেন। দেখা গেল সপ্তম প্রতিমা রানী স্বয়ং]

শ্রীমান ॥ না—না—না। [সরিয়া গেলেন] তুমি যাও—তুমি তোমার শয়নাগারে যাও। আর মুহূর্তের বিলম্ব বিষম বিপদ ডেকে আনবে। দোহাই তোমার, তুমি যাও—যাও—যাও—যাও

রানী ॥ হ্যাঁ, বৃথা সময় যায়। তারা কেউ এলেই দেখবে সপ্তম বেদী শূন্য। তখনি তখনি মহা সর্বনাশ। এসো, তার পূর্বেই আমরা

[হাত বাড়াইয়া দিলেন]

শ্রীমান ॥ [শেষ চেষ্টায়] আমি তবে এখনি চীৎকার করে রাজাকে ডাকব !

রানী ॥ সাবধান। শোন। এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে কেন তুমি আমায় চেয়েছিলে ?

শ্রীমান ॥ আমি তোমাকে চাইনি রানী !

রানী ॥ চাও নি ?

শ্রীমান ॥ না।

রানী ॥ মিথ্যা কথা। নারী সব ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু ভুল বোঝে না শুধু ঐখানে। ঐখানে কেউ কোনদিন তাকে ফাঁকি দিতে পারেনি। তুমি আমায় চেয়েছো, তুমি আজও আমায় চাও।

শ্রীমান ॥ হ্যাঁ, চাই। কিন্তু তোমার ও মূর্তি নয়। তোমার যে মূর্তি আমি চাই, সে মূর্তি আমি এ জীবনে চেয়ে দেখতে পারবোনা বলেই আমি সে মূর্তি গড়িনি।

রানী ॥ তার অর্থ ?

শ্রীমান ॥ তোমারে সেই-পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিমা যে-চোখে দেখতে হয় আমি সে চোখ হারিয়েছি। হারিয়েছি বলেই সে মূর্তি গড়িনি—গড়ব না।

রানী ॥ সেই হেঁয়ালিই রয়ে গেল শিল্পী! তুমি আমায় পাগল করলে! তুমি আমায় মাতাল করলে! [আবেগে] শিল্পী! শিল্পী! আমার সে মূর্তি কি তোমার চোখ ঝল্‌সে দেবে ?

শ্রীমান ॥ না রানী, না। আজ যদি তোমার সে মূর্তি গড়তাম, তবে তা চোখ ঝল্‌সে দিতো না, আমার দেহ মনে আগুন জ্বালতো।

রানী ॥ অলঙ্কার না হয় তাতে নাই দিতে!

শ্রীমান ॥ অলঙ্কার সে মূর্তির কলঙ্ক। অলঙ্কার নয়, অলঙ্কার নয়···

রানী ॥ একটি মাত্র কণ্ঠহার, একজোড়া বলয়, এক জোড়া চরণপদ্ম—তাও না ?

শ্রীমান ॥ [বিরক্ত হইয়া] না—না না!

রানী ॥ কিন্তু এই অবগুণ্ঠন ?

শ্রীমান ॥ অবগুণ্ঠন দূরে থাক, কোন আবরণই না।

রানী ॥ [এইবার বোধ হয় বুঝিয়া উঠিয়া] বুঝেছি, বুঝেছি, তবে কি—তবে কি ।

শ্রীমান ॥ চুপ!

রানী। [আকুল আবেগে] তাই হোক—তাই হোক। ওগো শিল্পী তাই হোক।

শ্রীমান ॥ [পরিত্রাহি চীৎকারে] রাজা!

রানী ॥ বটে!

শ্রীমান ॥ হ্যাঁ।

রানী ॥ [স্তম্ভিত হইলেন। ওদিকে শ্রীমান দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠে রানীর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাতে তাকাইয়া আছেন] উত্তম!—তবে একবার রাজাকে ডাকব আমি। রাজা! রাজা!

[দূর হইতে অঞ্জনার কণ্ঠ শোনা গেল]

অঞ্জনা ॥ রাজা! রাজা! এই দিকে—ঐ—রানীর কণ্ঠস্বর···

রানী ॥ এইবার? [শ্রীমানের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইলেন।]

শ্রীমান ॥ [পরম মিনতিতে] পালাও! এখনো পালাও! এখনো সময় আছে!

রানী ॥ [হাত দু'খানি পুনরায় তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া] হাত ধর—নিয়ে চল···

শ্রীমান ॥ [মুখ ফিরাইলে]

রানী ॥ না!

[রাজা ও বীরভদ্রসহ আলো হস্তে অঞ্জনার প্রবেশ]

রানী ॥ [সেদিকে দৃষ্টি না দিয়া শ্রীমানকে] আমার সপ্তম প্রতিমা?

অঞ্জনা ॥ রানী, রানী! তুমি এখানে।

রাজা ॥ এখানে, এ অসময়ে কেন রানী? অঞ্জনা তোমাকে কোনখানে খুঁজে না পেয়ে আমার কাছে ছুটে গেছে অতিথি-নিবাসে। অতিথি-নিবাসেই শুনতে হ'ল, রানী এই নিশীথে রাজান্তঃপুরে নেই। এ কি লজ্জার কথা রানী?

রানী ॥ [রাজার কথায় কান না দিয়া শ্রীমানের প্রতি] আমার সপ্তম প্রতিমা? কোথায় আমার সপ্তম প্রতিমা?

[উত্তর না পাইয়া রাজার প্রতি ক্ষোভে রোষে কাঁদিয়া ফেলিলেন। সকলে তাকাইয়া দেখেন সপ্তম বেদী শূন্য।]

রাজা ॥ [শ্রীমানের প্রতি] সপ্তম প্রতিমা?

শ্রীমান ॥ [নির্বাক]

রাজা ॥ [ক্রুদ্ধ স্বরে] কোথায় সেই সপ্তম প্রতিমা?

শ্রীমান ॥ [অন্তর যুদ্ধে কাতর হইয়া] রানী! রানী!

রাজা ॥ এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, কোথায় রানীর সপ্তম প্রতিমা?

শ্রীমান ॥ রানীকেই জিজ্ঞাসা করুন রাজা।

রাজা ॥ [রানীর প্রতি জিজ্ঞাসু নেত্রে] রানী!

রানী ॥ শয়নাগারে খবর পেলাম ঐ উন্মাদ আমার সপ্তম প্রতিমা—ঐ রূপসাগরের জলে নিক্ষেপ করেছে—খবর পেয়েই আমি—

[বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ অসি কোষমুক্ত করিল]

রাজা ॥ বীরভদ্র, ঐ দুর্বৃত্তকে বধ কর—এখনি···এই মুহূর্তে···

রানী ॥ [রাজার সম্মুখে নতজানু হইয়া] না—না।

রাজা ॥ বধ কর বীরভদ্র, বধ কর···

রানী ॥ না রাজা, না···

[রাজার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন]

শ্রীমান ॥ না রাজা, না—আমায় বধ কর। যদি রানীর সপ্তম প্রতিমা চাও তবে আমায় বধ কর।

রানী ॥ উন্মাদ! উন্মাদ! শিল্পী আজ উন্মাদ! রাজা! রাজা! কোনো দিন কি শুনেছ শিল্পীর মৃত্যুতে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়?

শ্রীমান ॥ হয়! সপ্তম প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। কেন হবেনা! [রানীকে] দুটি আত্মার প্রতি-মুহূর্তের কামনায় তোমারই গর্ভে হবে আমার স্থান, তুমি হবে আমার মা!

রাজা। উন্মাদ! পরিপূর্ণ উন্মাদ!

রানী ॥ শিল্পী! শিল্পী!

শ্রীমান ॥ পুত্র হয়ে সন্তানের চোখ দিয়ে শিল্পী তোমার সপ্তম প্রতিমা গড়বে!—প্রাণভরে দেখবে। সেই মূর্তি, যাঁর কোন অলঙ্কার নেই, আভরণ নেই, আবরণ নেই।

রাজা ॥ নগ্নমূর্তি?

শ্রীমান ॥ হ্যাঁ, নগ্নমূর্তি, মাতৃমূর্তি।—কিন্তু এ জন্মে তো তা পারব না রানী! তাই চাই মৃত্যু, দাও মৃত্যু। ওগো রানী, তোমার শূন্য বুকে আমায় তুলে নিও, অমৃত দিও, স্নেহ দিও—

রাজা ॥ [বীরভদ্রের প্রতি] মায়াবী ঐ শিল্পী—বধ কর—

[বীরভদ্র অসি হানিল, রানী নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া সে ছয় মূর্তির পাশে এক অপরূপ মহিমায় মর্ম[illegible]ত দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

কল্লোল. কার্তিক, ১৩৩৫

অপরাজিতা

পরিচয়:

সূর্যকান্ত চৌধুরী এবং বিশ্বজিৎ চৌধুরী দুর্গাদহ পরগণার জমিদারদ্বয়। প্রত্যেকের আট আনা অংশ। সম্বন্ধে জ্ঞাতি ভ্রাতা। সূর্যকান্ত বড় তরফ এবং বিশ্বজিৎ ছোট তরফ নামে আখ্যাত। পূর্বপুরুষদের একই বাড়ী ছিল, এক্ষণে তাহা বিভক্ত। সূর্যকান্তের স্ত্রীর নাম অপরাজিতা দেবী। সূর্যকান্তের একমাত্র পুত্র, নাম চন্দন। বয়স সাত। ব্লাড-প্রেসারে সূর্যকান্ত চৌধুরী মরণাপন্ন কাতর। বিশ্বজিতের পরিবার দার্জিলিং-এ, কিন্তু তিনি নিজে পূজা-উপলক্ষে বাড়ীতেই আছেন। সূর্যকান্তের শয়ন-কক্ষ। কক্ষ-সংলগ্ন সুবিস্তৃত বারান্দায় অর্কিড ঝুলিতেছে। গৃহপার্শ্বে শেফালি গাছে অজস্র শেফালিকা ফুটিয়া শরতের আগমনী ঘোষণা করিয়াছে। বারান্দার রেলিং বাহিয়া একটি মাধবীলতা কাছে আসিতে চায়। দুর্গাপূজা আসন্ন। আজ শারদীয়া পঞ্চমী। কাল: সন্ধ্যা। বারান্দায় ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান সূর্যকান্ত চৌধুরী, জীবন সংশয়কাতর। পার্শ্বে স্ত্রী অপরাজিতা দেবী। দূরে দাসী মল্লিকা, আদেশের অপেক্ষায় আছে। জমিদারবাড়ীর স্বাভাবিক কোলাহল ডাক্তারের আদেশে স্তব্ধ।]

অপরাজিতা ॥ [স্বামীকে ঔষধ খাওয়াইলেন] সন্ধ্যা হ'ল আর বাইরে নয়, ঘরে চল।

সূর্যকান্ত ॥ ঘরে আমার ভালো লাগেনা। বাইরে বেশ লাগছে। আজ আমি ভাল বোধ করছি। হয়তো এ যাত্রা বেঁচেও যেতে পারি। তুমি কি মনে কর বৌ ?

অপরাজিতা ॥ যে রকম তোমার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে—[থামিয়া গেলেন।] ·সিন্দুক থেকে সব গয়না টেনে বের করেছিলাম।

সূর্যকান্ত ॥ কেন ?

অপরাজিতা ॥ গায়ে দিয়ে ঠাকুরপোকে দেখালাম। যে রকম তোমার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তা'তে মনে হল ঠাকুরপোর চোখ ঝল্‌সে দেবার সুযোগ হয়তো আর মিলবে না।

সূর্যকান্ত ॥ দেখে কি বলল ?

অপরাজিতা ॥ দেখলই না। মুহূর্তে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে আকাশ পানে চেয়ে রইল।

সূর্যকান্ত ॥ তুমিই পরাজিতা হলে অপরাজিতা !

অপরাজিতা ॥ না, সে। আমাকে চেয়ে দেখবার ক্ষমতাই কি তার হল ?

সূর্যকান্ত ॥ আমার অসুখে সে খুবই সুখী, কি বল অপরাজিতা ?

অপরাজিতা ॥ চন্দন থাকতে সে কথা আর কি করে ওঠে ! যখন চন্দন ছিলনা, তখন তোমার সম্পত্তির লোভে ঐ জ্ঞাতি শকুন উডতো, কিন্তু ঐ চন্দন, সে শকুন তাডিয়েছে।

সূর্যকান্ত ॥ ঠাকুবপোকে অনেক সম্বোধনেই আপ্যায়িত কবেছ, কিন্তু শকুন—

অপরাজিতা ॥ ঠাকুরপো শকুন নয়, শকুন হচ্ছে তোমার সম্পত্তিব ওপর তার লোভটা।

সূর্যকান্ত ॥ কিন্তু তবু, চন্দনকে একটু চোখে রেখো। কোথায় সে ?

অপরাজিতা ॥ তার সম্বন্ধে আমি নির্ভয়। সে খেলা কবছে।

সূর্যকান্ত ॥ অতটা নির্ভয় হওয়া—

অপরাজিতা ॥ মায়ের চেয়েও যে তোমার বেশি দরদ দেখছি !

সূর্যকান্ত ॥ ও যে আমাব কী তপস্যার ধন, তা' তো তোমার অজানা নেই। কিন্তু নতুন করে সেকথা মনে করতে ইচ্ছে হচ্ছে অপরাজিতা। নিঃসন্তান ছিলাম বলে মনের দিক দিয়ে যে খুব রিক্ত ছিলাম, তা নয়। মনের সকল কামনাকে তুমিই পূর্ণ করেছিলে। কখন কখন এমন খেলাও তোমার সঙ্গে খেলেছি যেন তুমিই আমার সন্তান। সন্তানের মত তোমায় আদর করতে গিয়ে তোমার হাতে যে লাঞ্ছনা পেয়েছি, চন্দনের তা' সাধ্যও নেই। একটু জল দাও অপরাজিতা। [জল পান করিয়া] তোমার হাতে সেই লাঞ্ছনার সুখ পুত্রহীনতার সকল দুঃখ দূর করেছিল। কিন্তু অপরাজিতা, পুত্র চাই বলে আমার সকল মন প্রাণ কেঁদে উঠল সেইদিন—যেদিন তোমার ঠাকুরপো

আমার মুখের ওপর শুনিয়ে গেল, 'মোকদ্দমা জিতে লাভ কি? চোখ বুজলেই তো ও সম্পত্তি আমার!'

অপরাজিতা॥ এইবার ঘরে চল। বাইরের এ হাওয়া তোমার সইবে না।

সূর্যকান্ত॥ সেদিনও এমনি সন্ধ্যা ছিল, দমকা হাওয়ার মতোই আমি ঘরে ঢুকলাম। তুমি পিছু পিছু ছুটে এলে। আমি তোমার হাত দু'খানি চেপে ধরলাম, বললাম···

অপরাজিতা॥ মল্লিকা, দেখে আয়, মন্দিরের আরতি এখনো শুরু হ'ল না কেন?

মল্লিকা॥ আরতি তো হচ্ছে মা!

সূর্যকান্ত॥ আমি তোমার হাত দু'খানি চেপে ধরে বললাম—

অপরাজিতা॥ [মল্লিকাকে] হচ্ছে হোক, তবু তুই দেখে আয়।

সূর্যকান্ত॥ হচ্ছে হোক তবু তুই দেখে আয়?

অপরাজিতা॥ চন্দন যে এতক্ষণেও ফিরল না সে খেয়াল কি তোর নেই মল্লিকা? [মল্লিকা চলিয়া গেল]

সূর্যকা ॥ তোমার হাত দু'খানি বুকে নিয়ে আমি তোমায় সব বললাম। তুমি কাঁদতে লাগলে।

অপরাজিতা॥ সেই জন্যে আমি কেঁদেছিলাম?

সূর্যকান্ত॥ ত ?

অপরাজিতা॥ ক কাজ আজ সে কথায়? তুমি কি ঘরে যাবেনা?

সূর্যকান্ত॥ না অপরাজিতা, সেদিনকার কথা আমি ভুলিনি। তুমি পোষ্যপুত্র নিতে বললে। কিন্তু অপৌরুষের অত বড় জয়ধ্বজা আমার মাথায় তুলে দিতে চেয়েছিলে! ভেবে আজ কি তোমারই লজ্জা হচ্ছে না অপরাজিতা?

অপরাজিতা॥ লজ্জা যে কার, তোমার না আমার—সে কথা এক শুধু ভগবানই জানুন। [ক্ষণকাল নীরব] হঁ্যা, আজ আমার দুঃখই হচ্ছে—কেন আমি তোমাকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে বারণ করেছিলাম। [ক্ষণকাল নীরব] লজ্জা যে কার সেই দ্বিতীয় পক্ষই তোমায় ভালো করে বুঝিয়ে দিতো।

সূর্যকান্ত॥ তাই নাকি! রাগের মাথায় আজ তোমার মুখে কিছুই বাধছে না দেখছি! কিন্তু সেদিন অত দুঃখেও আমার মাথা ঠিক ছিল। দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে গিয়েও, করবো না ঠিক করলাম। শুধু তোমার মুখের দিকেই চেয়ে। দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করলেই যে তোমায় একতিল কম ভালবাসতাম তা নয় অপরাজিতা, সে সন্দেহ বোধ করি তোমারও ছিলনা। কিন্তু···

অপরাজিতা॥ কিন্তু?

সূর্যকান্ত॥ তাহলে তোমার বন্ধ্যাত্বের অপবাদটাই সংসারময় রাষ্ট্র হত।

তোমায় আমি সেই অপমান থেকেই বাঁচিয়েছিলাম অপরাজিতা এবং ভুল যে আমি করিনি, পরে তো তা বুঝেছ ?

অপরাজিতা ॥ ভুল যে তুমি করনি, তোমার এই ধারণাই অক্ষয় হোক, অটুট থাক। হাঁ, ঐ গৌরব তোমায় দিতে আজ আমার এতটুকু আপত্তি নেই, কারণ—

সূর্যকান্ত ॥ কারণ ?

অপরাজিতা ॥ দেখছি ঐ জয় গৌরব কবিরাজের কস্তুরীর মতই তোমার মুমূর্ষু দেহে ক্রিয়া করছে !

[মল্লিকা আসিয়া দাঁড়াইল]

মল্লিকা ॥ মা, সর্বনাশ।

সূর্যকান্ত ॥ কি—কি সর্বনাশ ?

মল্লিকা ॥ দাদাবাবু যে কোথায় কেউ বলতে পারছে না।

অপরাজিতা ॥ ছোট তরফ দেখে এসেছিস ?

মল্লিকা ॥ না মা, তা তো দেখিনি ?

অপরাজিতা ॥ আজ সেখানে পূজোর সং এসেছে। চন্দন শোনা অবধি ছটফট করছিল। সেখানে দেখে আয়।

[মল্লিকা ছুটিয়া গেল]

সূর্যকান্ত ॥ ছোট তরফে গেছে চন্দন! আজ আমি ঝি-চাকর সব ডিসমিস করব।

অপরাজিতা ॥ কোন ভয় নেই—কোন ভয় নেই।

সূর্যকান্ত ॥ ভয় নেই, তুমি বল কি অপরাজিতা ?

অপরাজিতা ॥ না, ভয় নেই। অনর্থক তুমি উত্তেজিত হয়ে ব্লাড-প্রেসারটা বাড়িও না, নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়ে শোও দেখি।

সূর্যকান্ত ॥ তুমি—তুমি জানোনা বৌ, ছোট ওর জন্যে ওৎ পেতে আছে। বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে দার্জিলিং পাঠিয়েছে, কিন্তু তবু নিজে যায়নি। কেন ? আমার সেবা-শুশ্রূষার জন্যে ?

অপরাজিতা ॥ হতেও পারে। সেদিন তো সেই কথাই বলে পাঠিয়েছিল, আমি আসতেও বলেছিলাম।

সূর্যকান্ত ॥ এসেছিল ?

অপরাজিতা ॥ না।

সূর্যকান্ত ॥ জলের গ্লাসে টুক করে এককৌটা বিষ মিশিয়ে দেবার এমন সুবর্ণ সুযোগটা—।

অপরাজিতা ॥ কেন যে পায়ে ঠেলল, সেই জানে।

সূর্যকান্ত ॥ উপরিউপরি দু-দুটো পাপ করতে ওর ভয় বুঝলে ? এ মরার ওপর তাই ও খাড়ার ঘা দেয়নি। ওর লক্ষ্য ঐ চন্দন। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন] কই চন্দন ? কোথায় চন্দন ?

[ছুটিয়া ভৈরব চাকর আসিয়া দাঁড়াইল]

ভৈরব ॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে] তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না মা!

সূর্যকান্ত ॥ চন্দন—চন্দন—[অপরাজিতা তাঁহাকে ধরিলেন]

অপরাজিতা ॥ ছোট তরফ—ছোট তরফ—

[ছুটিয়া মল্লিকার প্রবেশ]

মল্লিকা ॥ সেখানেও তাকে পেলাম না মা।

সূর্যকান্ত ॥ চ—ন্—দ—ন! [মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।]

অপরাজিতা ॥ ডাক্তার—ডাক্তার—

[ভৈরব 'ডাক্তার ডাক্তার' চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল। চীৎকারে অন্তঃপুরের লোকজনেরা ছুটিয়া আসিল। একজন ডাক্তারও আসিলেন। সকলেরই মহাব্যস্ততা। কোলাহল। ক্রন্দন ডাক্তারের কথা মত রোগীকে ধরাধরি করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে পথেই রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইল]

ভৈরব ॥ [চীৎকার করিয়া সকলকে জানাইল] জ্ঞান হয়েছে—জ্ঞান হয়েছে।

ডাক্তার ॥ চুপ। সকলে একেবারে চুপ। এখানে ভিড় করলে চলবে না।

[ভৈরব আগন্তুকদিগকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। এদিকে রোগীকে ঘরে শোয়াইয়া দিয়া অন্য লোকেরাও চলিয়া গেল। ঘরে শুধু ডাক্তার, অপরাজিতা এবং মল্লিকা রহিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল ভৈরব। ক্ষণকাল পরে অপরাজিতা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

অপরাজিতা ॥ ভৈরব, চন্দনকে আমি এ-খ-নই চাই।

ভৈরব ॥ দেওয়ান মশাই থেকে শুরু করে সবাই তাকে খুঁজছেন। কর্তা ভালো আছেন তো?

অপরাজিতা ॥ কর্তার জীবন ঐ চন্দন। চন্দনকে যদি না পাও ভৈরব কর্তাকে আজ হারাবে। ছোট—ছোট তরফের কর্তা কোথায় ভৈরব?

[বিশ্বজিৎ চৌধুরীর প্রবেশ]

বিশ্বজিৎ ॥ সশরীরে হাজির বৌদি। দাদার নাকি—

[দুয়ার ঠেলিয়া ডাক্তার দেখা দিলেন।]

ডাক্তার ॥ আবার উনি মূর্ছিত হয়েছেন! ইনজেক্‌শন দেওয়া কর্তব্য। দিই?

অপরাজিতা ॥ কর্তব্য মনে হলে অবশ্য দেবেন।

[ডাক্তার দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া ঘরে ঢুকিলেন।]

অপরাজিতা ॥ [বিশ্বজিতের চোখে চোখ চাহিয়া] চন্দন?

বিশ্বজিৎ ॥ চন্দন! কোথায়?

অপরাজিতা ॥ [ভৈরব] চন্দনকে চাই ভৈরব, এখনি। এবং যে তাকে লুকিয়ে রেখেছে তার মাথা চাই। বুঝলে?

ভৈরব ॥ তোমাকে আমি কোনদিনই ভুল বুঝিনি মা [ছুটিয়া গেল]

বিশ্বজিৎ ॥ চন্দন কি তবে হারিয়ে গেল?

অপরাজিতা ॥ [নীরব রহিলেন]

বিশ্বজিৎ ॥ তবে আমিও যাই—খুঁজে দেখি—

অপরাজিতা ॥ না।

বিশ্বজিৎ ॥ না! কেন ?

অপরাজিতা ॥ আমার স্বামীর ইচ্ছা নয়।

বিশ্বজিত ॥ কিন্তু তোমার কি ইচ্ছা নয় ?

অপরাজিতা ॥ স্বামীর ইচ্ছাই স্ত্রীর ইচ্ছা।

বিশ্বজিৎ ॥ বটে! [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] স্বামীর ইচ্ছানুযায়ীই তুমি সব স—ব কাজ কর, না ?

অপরাজিতা ॥ হ্যাঁ।

বিশ্বজিৎ ॥ এখানেও যে দেখছি মাধবীলতা। তোমাদের বাগানে সেই দীঘির ধারে সেই বেদী-পীঠে ওর চাঁদোয়া দেখেছিলাম। সেই যে···সেই দিন —সেদিনও এমনই কাঁচা জ্যোৎস্না ছিল, মনে পড়ে ?

অপরাজিতা ॥ হ্যাঁ, সেখানেও মাধবীলতা আছে। এটা তারই চারা। আমিই তার পরদিন এখানে এনে বারান্দায় তুলে দিয়েছি। ও ঘরের ভেতর যেতে চায়। আমি ঐ জানালা তাই বন্ধ রাখি। আর কিছু শোনবার আছে। আমি এখন স্বামীর কাছে যেতে পারি বোধ হয়।

বিশ্বজিৎ ॥ স্বামীরই ইচ্ছা বুঝি ?

অপরাজিতা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু ঐ কথাটাই বা বারেবারে তোলা কেন ? [ক্ষণেক থামিয়া] এই প্রশ্ন তুলেই তো আমায় লজ্জা দিতে চাইছ যে সাত বছর পূর্বে—সেই-যে হঠাৎ একদিন—তোমায় সেই মাধবীলতার কুঞ্জে ডেকে এনেছিলাম—সেও কি স্বামীরই ইচ্ছায় ?

বিশ্বজিৎ ॥ তা কেন ? তোমার স্বামী তো সেদিন গৃহে ছিলেন না, কলকাতায় গিয়েছিলেন। একলা থাকতে তোমার ভয় হয়েছিল, বিশেষ—রাত্রে তাই। হ্যাঁ, তাই তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে। সে আবাহনকে স্বামীর ইচ্ছা বলে ভুল করবার লোক তো আমি নই।

অপরাজিতা ॥ স্বামী আমায় ডাকছেন, তাই সংক্ষেপেই বলে যাচ্ছি—

বিশ্বজিৎ ॥ স্বামী তোমায় ডাকছেন! আমি যে বধির, এ কথা তো জানা ছিলনা!

অপরাজিতা ॥ মনে মনে··· মনেরও অজ্ঞাতে যে ডাকা যায় এবং মনে মনেই যে, সে ডাক শোনাও যায়, এ তো শেখাবার কথা নয় ঠাকুরপো। এ কথাই বা তোমায় কি করে বোঝাই যে স্বামীর অজ্ঞাত ইচ্ছাতেই আমি তোমায় সেই এক রাতে আবাহন করেছিলাম। স্বামী কামনা করেছিলেন ঐ চন্দনকে, কিন্তু তাকে গঠন করবার শক্তি তাঁর ছিলো না বলেই—

বিশ্বজিৎ ॥ তুমি আমাকে·

অপরাজিতা ॥ চুপ! তুমিই না তাঁর মুখের ওপর একদিন শুনিয়েছিলে—'যত

পারুন মোকদ্দমা জিতুন—চোখ বুজলেই তো ও সম্পত্তি আমার ?' আমি তাঁকে পোষ্যপুত্র নিতে বললাম। তিনি বললেন বরং মৃত্যু ভালো, তবু অপৌরুষের ঐ অপবাদ···বলেই প্রস্তাব করলেন, দ্বিতীয়বার বিয়ে করবেন।

বিশ্বজিৎ ॥ করলেন না কেন ?

অপরাজিতা ॥ আমি জানতাম, তাই বাধা দিলাম। শুধু তাও তো নয়, তিনি যদি অপৌরুষের সত্য অপবাদ মাথায় তুলে নিতে রাজী নন, আমিই বা কেন বন্ধ্যাত্বের মিথ্যা কলঙ্ক মাথায় নেব ? আমি বাধা দিলাম। বাধা দিলাম বটে, কিন্তু নিরুপায় স্বামীকে যে তুমি অমনি অপমান করবে এ অপরাজিতা তো তাও সইতে পারলোনা। আরও সইতে পারলোনা স্বামীব সেই বুভুক্ষিত বুকের হাহাকার—'আমার বুকে সন্তান দাও অপরাজিতা।'

বিশ্বজিৎ ॥ তাই !

অপরাজিতা ॥ হ্যাঁ তাই তাঁর স্ত্রীর বুকে যে সক্ষমা নারী ঘুমিয়েছিল, সে জেগে উঠল। তাঁর স্ত্রী ছিল সতী, কিন্তু এ নারী ছিল মা।

বিশ্বজিৎ ॥ অনেক নতুন কথা শিখছি বলে মনে হচ্ছে !

অপরাজিতা। শিখবে বইকি। আমার স্বামীর সম্পত্তিতে তোমার ছিল অন্যায় লোভ। তোমার সেই লোভ চূর্ণ কববার জন্যে তোমাকেই আমার অস্ত্র করলাম। [হাসিয়া উঠিলেন] কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়, এ শিক্ষাটাও আজ তোমার হোক

বিশ্বজিৎ ॥ বটে। আমাকে দিয়েই তুমি আমাকে জয় করে অ-পরাজিতার মালাচন্দন পরিয়ে দিলে তোমাব ঐ স্বামীর কণ্ঠে ! [উত্তেজিত হইয়া] আমি এভাবে পরাজিত হব না অপরাজিতা। কোথায় চন্দন—কোথায় সে ?

[ছুটিয়া যাইতেই ভৈরবের প্রবেশ। তাহার বুকে ঘুমন্ত চন্দন।]

ভৈরব ॥ পেয়েছি মা—[দ্বার ঠেলিয়া ডাক্তারের মুখ বাহির হইল।]

ডাক্তার ॥ [অপরাজিতাকে] শীগগীব আসুন তো [অপরাজিতা তৎক্ষণাৎ ঘরে গেলেন]

ভৈরব ॥ সারা গ্রাম তন্নতন্ন করে খুঁজে অবশেষে পেলাম কি না ঠাকুরঘরে প্রতিমার পেছনে। কি ঘুমই না ঘুমুচ্ছে, কিছুতেই জাগল না !

বিশ্বজিৎ। [অস্বাভাবিক আগ্রহে চন্দনকে দেখিতেছিলেন, উগ্র ব্যগ্রতায়] আমাকে একটিবার দাও তো ভৈরব···আমাকে একটিবাব দাও !

ভৈরব ॥ না কর্তা···[সভয়ে সরিয়া গেল]

[অপরাজিতা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

অপরাজিতা ॥ আমার বুকে দাও ভৈরব ! [ভৈরব দিল] ঘরের ভেতর যাও ভৈরব। [ভৈরব গেল] তুমি চন্দনকে বুকে নিয়ে এই ইজিচেয়ারে শুয়ে থাক।···বিস্মিত হচ্ছ যে ? ওকে তোমার বুকে তুলে দিতে আমার এতটুক ভয়

নেই ঠাকুরপো। দার্জিলিং-এ তোমার যে খোকা আছে তাকে যেদিন গলা টিপে মারবে, সেইদিন তোমায় আমি ভয় পাবো, আজ নয়। নাও, দেরী ক'রো না—[চন্দনকে তাঁহার বুকে দিয়া] হ্যাঁ, আর ঐ মাধবীলতাটা—

[ভৈরব বাহিরে আসিল।]

ভৈরব ॥ জ্ঞান হয়েছে মা। তোমায় ডাকছেন।

অপরাজিতা ॥ যাচ্ছি। ঐ মাধবীলতাটা সরিয়ে দাও ভৈরব, ওতে সাপ থাকে।

পূর্বাশা (কুমিল্লা), আশ্বিন, ১৩৩৯

বিদ্যুৎপর্ণা

[দৃশ্য : নাটমন্দির। দেবদাসীগণের নৃত্যগীত। নৃত্যগীত শেষ হইয়া আসিতেছে, ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখে দুই পার্শ্ব হইতে দুইখানি কৃষ্ণ যবনিকা পড়িয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে যাইবে, এমন সময়, দ্বিতলের অলিন্দ হইতে মন্দির-পুরোহিতের উত্তরাধিকারী প্রিয়তম শিষ্য ইন্দ্রজিৎ সোপান-পথে ছুটিয়া নিম্নে আসিয়া সেই যবনিকা দুইখানি দুই হাতে ধরিয়া, বিচ্ছিন্ন রাখিয়া, আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে ডাকিলেন—]

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎপর্ণা। বিদ্যুৎপর্ণা।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ [অন্তরাল হইতেই] না। না। না।

ইন্দ্রজিৎ ॥ একটি কথা। একবত্তি একটি কথা। দাঁড়াও শোন

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ হয় না। হয় না। এখন নয়, এখন নয়।

ইন্দ্রজিৎ ॥ কখন ? কখন ?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ ইঁদুর যখন সাপ ধরবে তখন। [অট্টহাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ

[পূর্বোক্ত সোপান-পথে পুরোহিত ত্বরিৎ-পদে নামিয়া আসিয়া ইন্দ্রজিৎ-হস্তধৃত যবনিকা-প্রান্তদ্বয় মুক্ত করিয়া দিয়া ইন্দ্রজিৎকে মুখোমুখি দাঁড় করাইলেন]

পুরোহিত ॥ ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিৎ ॥ [অপরাধীর মত চমকিয়া উঠিয়া, পরে, সংযতভাবে মাথা নিচু করিয়া] পিতা।

পুরোহিত ॥ এই বার বার তিনবার আমার উপদেশ—আমার আদেশ তুমি লঙ্ঘন করলে। করলে কি না বল ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ [নতমুখে নীরব রহিলেন]

পুরোহিত ॥ আমার আদেশ ছিল তুমি পাতাল-গুহায় নির্জনে একমনে

তিনমাস যোগাভ্যাস করবে। কিন্তু তার প্রথম তিন দিনেই তুমি তিনবার তোমার আসন ত্যাগ করে ছুটে এসেছ ঐ কালনাগিনীর পাশে ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ [নতমুখে নীরবই রইলেন]

পুরোহিত ॥ আমার আদেশ লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি কি জানো ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ [তথাপি নীরব রইলেন]

পুরোহিত ॥ নীরব কেন ? উত্তর দাও ! আমার আদেশ লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি কি ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ প্রাণদণ্ড।

পুরোহিত ॥ আমি কি ভাবে সেই প্রাণদণ্ড প্রয়োগ করে থাকি ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ ক্ষুধিত সর্পের দংশনে অপরাধীর মৃত্যু-ব্যবস্থা হয়।

পুরোহিত ॥ এখন ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমার আপত্তি নেই। আমি প্রস্তুত। তবে…

পুরোহিত ॥ তবে ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ তবে মৃত্যুর পূর্বে একটি প্রার্থনা।

পুরোহিত ॥ বল।

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎপর্ণাকে…

পুরোহিত ॥ বল—

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমার একটি চুম্বন, শুধু একটি চুম্বন নিবেদন করে যাব।

পুরোহিত ॥ হ্যাঁ।

ইন্দ্রজিত ॥ হ্যা। মরতে যখন বসেছি, তখন ভয় নেই, লজ্জা নেই। হ্যাঁ…একটি চুম্বন, শুধু একটি চুম্বন। একরত্তি একটি চুম্বন।

পুরোহিত ॥ ওরে নির্লজ্জ ! আমি না তোর পিতা ! তবু তোর এত অসংযম ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ [নীরব রইলেন]

পুরোহিত ॥ ওরে অবোধ ! বিদ্যুৎপর্ণা কে জানিস ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ হয়তো জানি…হয়তো জানিনা ! নিমেষের দেখা তাই দেখি। কে…জানতে চাইও না ! শুধু চাই ঐ আলোর একটি ঝলক। কত সহস্র জনের রঙীন কামনা, রঙীন কল্পনায় ঐ রূপ ঐ মূর্তি গড়ে উঠেছে…আমার চুম্বনে, একরত্তি একটি চুম্বনে . ঐ মূর্তি, ঐ রূপ, আরো এক তিল সুন্দর হবে…আমি তাই চাই, আমি তাই চাই…

পুরোহিত ॥ ওরে উন্মাদ ! ও মানুষ নয়, ও কালনাগিনী। হ্যাঁ কালনাগিনী। …জানিস ?…এক বৃদ্ধ বেদে ওকে কোলে করে তিনটি সাপের চুপি নিয়ে অনাহারে মুমূর্ষু অবস্থায় আমাদের মন্দিরে এসে উপস্থিত। সে আজ দশ বৎসরের কথা। আমি আশ্রয় দিয়ে খাদ্য দিলাম। শুনলাম, বেদেনী সাপ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেছে, রেখে গেছে ঐ শিশুকন্যা। মেয়েটি মায়ের

মত সাপের হাতে মারা না যায় এই ভয়ে বেদে এক রকম পাগল হয়ে গেছে। মেয়েকে দুধ খেতে দিলাম, বেদে সে দুধ সাপ দিয়ে খাওয়ালো। মেয়েকে কি খাওয়ালো জানো ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ কি ?

পুরোহিত ॥ বিষ। এক তিল পরিমাণ বিষ। আমি অবাক! সে বলে—'ওকে সাপের বিষ তিল তিল করে খাইয়ে মানুষ করেছি। সাপের বিষে আর ওর মরণ নেই!' ও হচ্ছে সেই বিদ্যুৎপর্ণা। তারপর বেদেও কিছুদিন পরে মারা গেল। কি এক খেয়ালে কালনাগিনীকে আমিও ওর পিতার মতই বিষ দিয়ে মানুষ করে তুলেছি, কিন্তু আজ বুঝছি···আজ কেন? প্রতিদিন প্রতি রাত্রে প্রতি মুহূর্তে বুঝছি—আমি আমার আশ্রমে নিজ হাতে ঐ বিষ-বৃক্ষ রোপণ করেছি। ওর ঐ নিষিদ্ধ ফল আমার স্বর্গকে নরক করেছে···আজ শয়তান শুধু তোমাদেরই স্কন্ধে ভর করেনা। ও-হো-হো···আমি কি করেছি!

[কপালে করাঘাত করিত নতমুখে ভাবিতে লাগিলেন।]

ইন্দ্রজিৎ ॥ আকাশের বিদ্যুৎকে আপনি পৃথিবীতে ধরে রেখেছেন।

পুরোহিত ॥ [সস্নেহে ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করিয়া] ওরে অবোধ! [নিম্নস্বরে] ওর চুম্বনে মরণের ছায়া পড়ে, ওর স্পর্শে জীবনের স্পন্দন আড়ষ্ট হয়, ওর আলিঙ্গনে মৃত্যু আলিঙ্গন দেয়।...সাবধান। অভিশাপে অভিশপ্তা ঐ নারী। সাবধান।

ইন্দ্রজিৎ ॥ ঐ অভিশাপই আমার আশীর্বাদ।

পুরোহিত ॥ [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বজ্র-কঠোর স্বরে] তুমি তিন তিনবার আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ। তার শাস্তি নিজ মুখেই স্বীকার করেছ—মৃত্যু।

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমার প্রার্থনাও পূর্ণ হোক। একবত্তি একটি চুম্বন...তারপর মৃত্যু।...জীবনের সুধায় আমার মৃত্যু স্নান করে উঠক।

পুরোহিত ॥ বটে।

ইন্দ্রজিৎ ॥ [পুরোহিতের মুখের পানে হঠাৎ মুখ তুলিয়া] হ্যাঁ।

পুরোহিত ॥ এই কি আমার শিক্ষা? আদর করে বুকে তুলে নিয়ে আশৈশব যে শিক্ষা দিয়ে এসেছি, সে কি এই শিক্ষা?

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমি ভেবে দেখেছি। আপনার শিক্ষা আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। আমি চাই জেগে থাকতে, আমি চাই আমার রক্তের তালে তালে নাচতে...যেমন নাচ ঐ বিদ্যুৎপর্ণা নেচে গেল। আমি কি জন্মেছি ঘুমিয়ে থাকতে?

পুরোহিত ॥ এত অসংযম! এত অসংযম!

ইন্দ্রজিৎ ॥ সংযম তাদের জন্যে যারা বিপদকে ডরায়, যারা মরতে ভয় পায়, যারা গণ্ডীর মধ্যে থেকে সুখ-শান্তিতে জীবন নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে

চায়। জীবনের ষোল আনা তারা চায়ও না, পায়ও না। আমি ঠকবার পাত্র নই, আমি জীবন-মৃত্যু পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে চাই। আমি চাই ঐ বিদ্যুৎ। . মাথায় বজ্র ভেঙ্গে পড়বে জানি, কিন্তু বিদ্যুৎ! অমন আলো কি কেউ কখনো দেখেছে ?

পুরোহিত ॥ বটে !...আজ তোমার মুখে এ কি কথা শুনলাম পুত্র! [ক্ষণকাল নীরব রহিয়া] তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ। [ক্ষণকাল পরে] তোমাকে নিয়ে আমি যে কি করব বুঝছিনা !

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক।

পুরোহিত ॥ [নীরব রহিলেন]

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎপর্ণাকে ডেকে আনি। সে এসে নৃত্য করুক। রূপে রসে-গানে-গন্ধে জীবন ভরপুর মাতাল হয়ে উঠুক।

পুরোহিত ॥ তারপর ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ মরণ। আমার সোনার মরণ। সার্থক মরণ।

পুরোহিত ॥ কিন্তু...কিন্তু সে কি তোমাকে ভালবাসে ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ হয়তো বাসে, হয়তো . না। কিন্তু, সে ভালো না বাসলেই আরো ভালো। আমার প্রেম আর কামনা বুকে নিয়ে আবো সাধনা করবে। আমার অর্ঘ্য আবো ফুলে ফলে ভরে উঠবে। আমাব আরতির আলো আরো ভালো করে জলে উঠবে। আমার ধুপ আবো ভালো করে পুড়বে।...তবু যদি বর না পাই আবার নতুন করে তপস্যা আরম্ভ করব। তপস্যায় তপস্যায়. আমি সুন্দর থেকে সুন্দরতর হব। তারপর কোনদিন হয়তো ঐ নীলাকাশে একটি তাবা হয়ে আমি আকাশের বুকে স্থান পাব—ঐ বুকে, যে বুকে বিদ্যুৎ খেলে! যে বুকে বিদ্যুৎ নাচে!

পুরোহিত ॥ কিন্তু রাজাও যে তাকে কামনা করে! আজ রাত্রির এই শৃঙ্গার উৎসবে রাজার যোগদানও ঐ উদ্দেশ্যেই বৎস!...সে কি বুঝছ না ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎপর্ণাকে কে না কামনা করে পিতা!

পুরোহিত ॥ কিন্তু তুমিই বা তা কেমন করে সহ্য করবে!

ইন্দ্রজিৎ ॥ ॥ আকাশের ঐ চাঁদ...ঐ বিদ্যুৎ...ভালোবাসে সবাই. কিন্তু তা নিয়ে কি হিংসা চলে কখনো ?

পুরোহিত ॥ তর্ক নয়, তর্ক নয়। বৌদ্ধ ঐ রাজা আমাদের এই লুপ্ত প্রায় হিন্দুধর্মের শেষ চিহ্ন এই মন্দিরটুকু ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে আমার কাছে ঐ দেবদাসী বিদ্যুৎপর্ণাকে তাঁর সেবাদাসী করবার অন্যায় প্রস্তাব করেছেন। আমি অসম্মত হলে যুদ্ধ! আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। আর সম্মত হলে আমাদের ধর্মের যুগযুগান্তব্যাপী অপমান, অপযশ। দশ বৎসর হ'ল ঐ হিন্দুদ্বেষী রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছে। এই দশ বৎসর আমি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এমনি অপমান অপযশ আশঙ্কা করেছি।

ইন্দ্রজিৎ ॥ প্রতিকার থাকে, প্রতিকার করুন। কিন্তু...

পুরোহিত ।। কিন্তু ?

ইন্দ্রজিৎ ।। কিন্তু আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন ।

পুরোহিত ।। প্রতিকার আছে । শুনবে, কি প্রতিকার ?

ইন্দ্রজিৎ ।। [নিরুপায় হইয়া] বলুন...

পুরোহিত ।। প্রতিকার ঐ বিদ্যুৎপর্ণা ।

ইন্দ্রজিৎ ।। [চমকিয়া উঠিয়া উত্তেজিত বিস্ময়ে] বিদ্যুৎপর্ণা ?

পুরোহিত ।। হ্যাঁ ! বিদ্যুৎপর্ণা দশ বৎসর পূর্বে.. যেদিন ঐ রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, সেইদিন থেকেই আমি এই প্রতিকারের উপায় ঠিক করতে পেরেছিলাম ঐ শিশুকন্যা বিদ্যুৎপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে। ঐ শিশুর রূপলাবণ্য দেখে.. তপস্বী আমি সন্ন্যাসী আমি, আমি অকুতোভয়ে বলব ...আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি তাকে নিজ হাতে গড়ে তুলেছি আমার হাতের সুদর্শন অস্ত্রের মতো ।

ইন্দ্রজিৎ ।। অস্ত্র কি না জানিনা কিন্তু সুদর্শনা বটে।...সুদর্শনা, সত্য সত্যই প্রিয়দর্শনা আমাদের প্রিয়তমা ঐ বিদ্যুৎপর্ণা ।

পুরোহিত ।। আবার প্রগল্‌ভতা। তবে শোন—

ইন্দ্রজিৎ ।। বলুন···আপনি বলুন—

পুরোহিত ।। বড ভালোবাসি আমি তোমায় পুত্র। তুমি যদি আমার অবাধ্য হও, আমার জীবনের সর্ব আশা, সর্ব কামনা, সকল সাধনা ব্যর্থ হবে। আমি তোমাকে রাজা করব বৎস...তুমি শুধু ঐ বিদ্যুৎপর্ণার আশা ত্যাগ কর।

ইন্দ্রজিৎ ।। আমি রাজ্যের ভিখারী নই ।

পুরোহিত ।। [স্তম্ভিত হইলেন। পরে উত্তেজিত হইয়া] বেশ তাই হবে। তাই হবে।

ইন্দ্রজিৎ ।। হবে ? হবে ?

পুরোহিত ।। হবে। কিন্তু তার পূর্বে

ইন্দ্রজিৎ ।। তাব পূর্বে...?

পুরোহিত ।। হ্যাঁ, তার পূর্বে ঐ বাজাকে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নাটমন্দিরে নিয়ে এসো। তাঁর আসবার সময় হয়েছে ।

ইন্দ্রজিৎ ।। তারপরই—।

পুরোহিত ।। না। তারপর বিদ্যুৎপর্ণার নৃত্য হবে। নৃত্য শেষে বাজাকে বিদ্যুৎপর্ণার শয়নকক্ষে নিয়ে যাবে। তারপর···?

ইন্দ্রজিৎ ।। হ্যাঁ, তারপর ?

পুরোহিত ।। তারপরই তোমাব পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে বিদ্যুৎপর্ণাকে গ্রহণ করা না করা তোমার অভিরুচি।

ইন্দ্রজিৎ ।। অভিরুচি ! হাঃ হাঃ হাঃ !

পুরোহিত ।। হেসো না উন্মাদ। তোমার কি পরীক্ষা শুনেছ ?

ইন্দ্রজিৎ ।। বলুন...আপনি বলুন।

পুরোহিত ।। রাজা বিদ্যুৎপর্ণাকে আলিঙ্গনে চুম্বনে গ্রাস করছে, সেই দৃশ্য তোমাকে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। আকাশের চাঁদ, আকাশের বিদ্যুৎকে বিশ্বশুদ্ধ লোকে ভালবাসে, কিন্তু তাতে কেউ কাউকে হিংসা করেনা। তুমিও আজ এখানে রাজাকে হিংসা করতে পারবে না। প্রতিবাদে একটি কথাও বলতে পারবে না।

ইন্দ্রজিৎ ।। প্রতিবাদ করতে চাইও না। বিদ্যুৎপর্ণা, বিশ্বের বিদ্যুৎপর্ণা। সমগ্র পৃথিবী তাকে অভিনন্দন করছে দেখলে আমার বুক ভরে উঠবে। সে ধরণীর বুক জুড়ে বাস করছে। আমারই বুকের বিদ্যুৎ বিশ্ব-হিয়ায় তার নৃত্যের তালে তালে খেলা করছে সে তো আমারই গর্ব আমারই গৌরব!

পুরোহিত ।। যা বলতে হয় বল, কিন্তু ঐ তোমার পরীক্ষা। আমার এই শর্ত তোমাকে পালন করতে হবে। তুমি সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখবে। তার পরও যদি তুমি ঐ বিদ্যুৎপর্ণাকে কামনা কর—

ইন্দ্রজিৎ ।। আমি করি। আমি করি।

পুরোহিত ।। তখন আমার আর কোন আপত্তি থাকবে না। তুমি তাকে গ্রহণ ক'রো।

ইন্দ্রজিৎ ।। আমি চললাম। আমি চললাম। আমি রাজাকে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে আসি। আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানিনা, কিন্তু আমার সেই অজ্ঞাত ভাগ্য-দেবতার উদ্দেশে প্রণাম...শত কোটি প্রণাম। আমি চললাম, আমি চললাম।

[প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় পুরোহিত দ্রুতপদে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে সহসা স্পর্শ করিয়া ফিরাইলেন।]

পুরোহিত ।। রাজ্য চাও?

ইন্দ্রজিৎ ।। বিদ্যুৎ চাই।

পুরোহিত ।। দাঁড়াও। ওরে আমার অবোধ পুত্র! তোর জন্যই যে আমার এই প্রচণ্ড সাধনা! যদি রাজ্য চাস...বিদ্যুৎপর্ণাকে ভুলে যা! আর যদি বিদ্যুৎপর্ণাকে চাস তবে

ইন্দ্রজিৎ ।। তবে?

পুরোহিত ।। আমার হৃদয়-শ্মশানে তোর চিতা জ্বলবে।

ইন্দ্রজিৎ ।। [সহসা রুদ্র-আনন্দে অট্টহাস্যে] হাঃ হাঃ হাঃ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ।

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান। বিস্মিত স্তম্ভিত ভাবে ইন্দ্রজিতের পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে লীলায়িত গতিতে চঞ্চল চরণে বিদ্যুৎপর্ণা আসিয়া তাঁহার সেই নির্বাক বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তখনি ছুটিয়া গিয়া পুরোহিতের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন। পুরোহিত চমকিয়া উঠিলেন]

পুরোহিত ।। কে?

বিদ্যুৎপর্ণা ।। আমি। হাঃ হাঃ হাঃ...ভয় পেয়েছ! চমকে উঠেছ! হাঃ হাঃ হাঃ।

পুরোহিত ।। তোমাকে এখানে কে আসতে বলেছে?

বিদ্যুৎ ॥ 'বিদ্যুৎ' 'বিদ্যুৎ' বলে এখনি আমাকে ডাকলো কে !

পুরোহিত ॥ কে ডাকলো ?

বিদ্যুৎ ॥ আমায় ভালবাসে...যে !

পুরোহিত ॥ আমি তোমার রসিকতার পাত্র নই বিদ্যুৎ। আজ কিছুদিন হ'ল তোমার মধ্যে আমি দেবদাসীর সংযম দেখতে পাইনা।...পরিণাম অতি কঠোর...বুঝলে ?

বিদ্যুৎ ॥ নির্জন কারাবাস ?

পুরোহিত ॥ হ'তে পারে !

বিদ্যুৎ ॥ হয় না। নির্জন কারাবাস আমার হতে পারেনা। কারাগারে তোমার রক্ষী আমার স্তব করবে। শুধু কি তাই ? কারাগারের আশে-পাশে অন্ধকারে মৃদু গুঞ্জন উঠবে...

"কালো কালো ভোম্‌রা করে হায় হায় !
বধুর অধরে মধু কোথা পাওয়া যায় !"

পুরোহিত ॥ দুর্বিনীত অসংযমী তবে শুধু ইন্দ্রজিৎ নয়—

বিদ্যুৎ ॥ না আমি তার এক ধাপ উঁচু। সে নাচতে জানেনা। আমি জানি। এমন নাচ নাচতে জানি, যা দেখলে—

পুরোহিত ॥ এখনো তুমি সেই নাচ নাচো বিদ্যুৎ ? আমার নিষেধ তবে তুমি অগ্রাহ্য করবার স্পর্ধা রাখো ?

বিদ্যুৎ ॥ রক্তের ডাক ! রক্তের ডাক ! আমি কি কবব। আমাব মা নেচেছে, আমি নাচবোনা !

পুরোহিত ॥ কিন্তু ..আমি তোমাকে 'মানুষ' করেছি, সভ্যতা শিক্ষা দিয়েছি—

বিদ্যুৎ ॥ তারই ফলে আমার দেহে এই মিথ্যা আবরণ উঠেছে। কারাগার ! কারাগারে তুমি আমায় বেঁধে রেখেছ। ঢেকে রেখেছ...। ভালো লাগেনা। আমার ভালো লাগেনা। কোনদিন তোমরা বলবে এই যে আমার চোখ দুটি—এরাও নরকের দুয়ার...ঢাকো ঢাকো ওদের—কোথায় ঠুলি ! কোথায় ঠুলি !

পুরোহিত ॥ পাপ। মূর্তিমান পাপ তোমার চোখে মুখে।

বিদ্যুৎ ॥ শুধু চোখে মুখে কেন ? বল...এই বুকে !...সন্তানও যেন বুকের দুধ চোখ বুজে খায় !...হ্যাঁ ! ভয় নেই, আমার বসন সংযতই রয়েছে।

পুরোহিত ॥ আর আমি বিস্মিত হচ্ছি না। এর আভাষ আমি ইন্দ্রজিতের মাঝেই পেয়েছি। তোমাদের দু'জনকে নিয়ে যে আমি কি করব বুঝতে পারছি না।

বিদ্যুৎ ॥ সেই কথা বলতেই আমি এসেছি। আমাদের দু'জনকে মুক্তি দাও। আর হাতে তুলে দাও আমার পৈত্রিক সম্পত্তি 'বঙ্করাজ' 'শঙ্খচূড়'

পুরোহিত ॥ [রুদ্ধ নিঃশ্বাসে] কে সে ?

বিদ্যুৎ ॥ যে জাগরণে ঘোষণা করে যে আত্মসংযম চিত্তসংযম...সকল রকমের সংযম সে আয়ত্ত করেছে, কিন্তু ঘুমের মধ্যে অসহায় নিরুপায় হয়ে নিজেরই অজ্ঞাতে অসংযমের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়—

পুরোহিত ॥ তার মানে ? তার মানে ?

বিদ্যুৎ ॥ তার মানে অনেকের সুনিদ্রা হয় না।

পুরোহিত ॥ [সন্দিগ্ধ ভাবে] বটে !

বিদ্যুৎ ॥ তোমারো !...তুমি ঘুমের ঘোরে মনের কথা বিড় বিড করে বল।

পুরোহিত ॥ [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে]...কি বলি ?

বিদ্যুৎ ॥ ঠিক ঐ ইন্দ্রজিত যা বলে ··তাই !

পুরোহিত ॥ কন্যার স্নেহে আমি তোমাকে লালন পালন করেছি, সাবধান—

বিদ্যুৎ ॥ সে আমার বাল্যে। কিন্তু—আজ সে জন্যে হয়তো অনুতাপই হচ্ছে !

পুরোহিত ॥ বিদ্যুৎ ! বিদ্যুৎ !

বিদ্যুৎ ॥ তাই বলছিলাম—সন্ন্যাসী যদি আমার জন্য ঘুমাতে না পাবে, রাজা তো বিলাসী ! তার কথা না বললেও চলে।

পুরোহিত ॥ মুগ্ধ বিস্ময়ে তোমার প্রলাপ আলাপ শুনলাম বিদ্যুৎ। কত কথাই না তুমি বলতে পার ! হাঃ হাঃ হাঃ [কপালের ঘাম মুছিয়া] যাক।

বিদ্যুৎ ॥ [সঙ্গে সঙ্গে] হাঃ হাঃ হাঃ।

পুরোহিত ॥ হাসির কথা নয়। পারবে তুমি আমাদের ধর্মের— আমাদের দেবতার আমাদের তপস্যার সেই মহাশক্রকে বশ করতে—জয় করতে, জয় করে ক্রীতদাস করে রাখতে ?

বিদ্যুৎ ॥ [ক্ষণেক ভাবিয়া] পারব।—পারতাম। কিন্তু করব না। হ্যাঁ, করব না।

পুরোহিত ॥ কেন ? কেন বিদ্যুৎ ?

বিদ্যুৎ ॥ সে তোমার শক্র, কিন্তু তুমি আমার শক্র।

পুরোহিত ॥ সে কি ! সে কি বিদ্যুৎ ?

বিদ্যুৎ ॥ তুমি আমাকে কারাগারে রেখেছ। আমি যাদের ভালবাসি তুমি আমার কাছ থেকে তাদের কেড়ে নিয়েছ, সরিয়ে রেখেছ, তাড়িয়ে দিয়েছ।

পুরোহিত ॥ বল কি বিদ্যুৎ !

বিদ্যুৎ ॥ কোথায় ইন্দ্রজিৎ ! কোথায় বঙ্করাজ ! কোথায় শঙ্খচূড ! কোথায় দুধসাগর ?

পুরোহিত ॥ এই কথা !—তবে কি আমাদের চাইতে তোমার কাছে বিষধর সাপই প্রিয় হ'ল ?

বিদ্যুৎ ॥ হ'ল। হ্যাঁ, হ'ল—আমি তাদের ভালোবাসি। তারা আমায় ভালোবাসে। এ আমাদের রক্তের টান।—কোথায় তারা ! কোথায় তারা ?

পুরোহিত ॥ আছে, তারা আছে। তাদের আমি দুধ কলা দিয়ে পুষে রেখেছি।

বিদ্যুৎ ॥ মিথ্যা কথা। তারা বেঁচে আছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর যদিই বা বেঁচে থাকে, তাদের তুমি খেতে দাও না। বঙ্করাজ একবেলা কলা না পেলে ঢলে পড়তো! শঙ্খচূড় একবেলা ব্যাঙ না পেলে গোসা করতো! দুধসাগর একবেলা দুধ না পেলে আমার মার বুকের দুধ চুষে খেত! সেই তারা! আজ কোথায় তারা?

পুরোহিত ॥ আছে, তারা আছে।

বিদ্যুৎ ॥ ও কথায় আমি ভুলব না। এক সঙ্গে আমরা মানুষ হয়েছি, এক সঙ্গে আমরা খেলা করেছি, দুধ খেয়েছি, আদর পেয়েছি, বড় হয়েছি। কই তারা! কোথায় তারা?

পুরোহিত ॥ আছে তারা---আছে, কিন্তু---অনশনে। আমি তাদের কিছুদিন হ'ল অনশনে রেখেছি।

বিদ্যুৎ ॥ বটে! বটে! কিন্তু কেন?

পুরোহিত ॥ মাঝে মাঝে ও-রকম প্রয়োজন হয়। কেন, তা কি জান না?

বিদ্যুৎ ॥ জানতে চাইও না। তুমি আমার শত্রু। তুমি আমার শত্রু।

পুরোহিত ॥ যা বলতে হয়, পরে বোলো। আগে শুনে নাও—কেন তারা আমার অস্ত্র।—কামন্দককে মনে পড়ে?

বিদ্যুৎ ॥ কামন্দক।---কোথায় সে? রসের গল্প অমন আর কেউ বলতে পারত না! কোথায় সে?

পুরোহিত ॥ একদিন সে তোমার অধর দংশন করতে ছুটে গিয়েছিল। উপবাসক্লিষ্ট বঙ্করাজ তার অধর দংশন করে তৃপ্ত হ'ল।

বিদ্যুৎ ॥ সে কি!

পুরোহিত ॥ হ্যাঁ!---যুধাজিৎকে ভোলনি, না?

বিদ্যুৎ ॥ শত যুদ্ধের বীর সেই যুধাজিৎ! সে আমাকে রাজমুকুট উপহার দিয়েছিল!

পুরোহিত ॥ এবং রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে তোমার ভালে চুম্বন-তিলক এঁকে দিয়েছিল---

বিদ্যুৎ ॥ তুমি তা জেনেছ!

পুরোহিত ॥ জেনেছিলাম বলেই তো অনাহারী শঙ্খচূড় যুধাজিতের মনি-মুকুট-মণ্ডিত ভালে বিষ চুম্বন এঁকে দিয়ে জীবনরসে ভরপুর হয়ে উঠল!

বিদ্যুৎ ॥ সত্যি! সত্যি?

পুরোহিত ॥ তবে কি তোমার সঙ্গে পরিহাস করছি?

বিদ্যুৎ ॥ কি করেছ! তুমি কি করেছ!—কেন তুমি তাদের এ শাস্তি দিতে গেলে?

পুরোহিত ॥ কেন তারা আমার নিষেধ মানেনি?

বিদ্যুৎ ।। তোমার স্বপ্ন যে কতখানি সত্য, আজ তা বুঝছি ! তুমি হিংসায় আকুল ! তারা যে আমায় ভালবাসতো তুমি তা সহ্য করতে পারনি। এখন বুঝছি তোমার ঐ নিষেধাজ্ঞা, ঐ দণ্ডাজ্ঞার মূলে কোন প্রবৃত্তি জল সেচন করে ! এখন বুঝছি কামনা বয়সের অপেক্ষা রাখেনা ! এখন বুঝছি আমার শক্তি কতখানি !—পুত্র আমার পদানত, পিতাও মনে মনে, স্বপ্নের সংগোপনে আমারই পদানত।

পুরোহিত ।। বল কি !

বিদ্যুৎ ।। হাঁ, পিতা হয়েও তুমি ইন্দ্রজিতের বৃদ্ধ প্রতিমূর্তি ! ..উভয়ের দেহে একই রক্ত প্রবাহিত, না ?

পুরোহিত ।। [বিচলিত হইয়া] না···না···না···তা নয় ! তা কখনই নয় । তা হয় না । [ভাবিয়া] ছিঃ ছিঃ ছিঃ না, তোমার সঙ্গে আর কোন কথা নয়।···কি বল ?...না···না···না···, হাঁ, আমরা যেন প্রথমে কি কথা বলছিলাম---হাঁ, মনে পড়েছে। রাজাকে তোমার জয় করতে হবে বিদ্যুৎ। আমি তোমার ভরসাতেই নিশ্চিন্ত রয়েছি। প্রতিদানে তুমি যা চাও.. পাবে। রানী হতে চাও ..রানী হও কিন্তু রাজাকে জয় কর।

বিদ্যুৎ ।। তোমার এই আত্মপ্রবঞ্চনা, তোমার এই অপ্রকৃতিস্থতা আমার বেশ লাগছে। কিন্তু আমি এ সুযোগ হারাব না। আমি চাই মুক্তি, যদি দাও তবে...

পুরোহিত ।। তবে ঐ রাজাকে জয় করবে ?

বিদ্যুৎ ।। করব।

পুরোহিত ।। রাজা তোমাকে কামনা করে। তৃপ্ত কর তাকে।

বিদ্যুৎ ।। করব···যদি তুমি—

পুরোহিত ।। বল···

বিদ্যুৎ ।। যদি তুমি ঐ ইন্দ্রজিৎকে আমার দান কর।···যদি তুমি ঐ বঙ্করাজ, শঙ্খচূড, দুধসাগরকে আমার হাতে তুলে দাও।

পুরোহিত ।। তারপর ?

বিদ্যুৎ ।। তারপর আমরা এই কারাগার থেকে বের হয়ে পড়ব। সমুদ্র আমাদের পথ চেয়ে আছে। পর্বত আমাদের মুখপানে তাকিয়ে আছে। বনবীথি আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ইন্দ্রজিৎ আর আমি হাত ধরাধরি করে পথ চলব। ও বাজাবে ডমরু, আমি বাজাব বাঁশী। বঙ্করাজ আমার গলা জড়িয়ে আনন্দে দুলবে ! শঙ্খচূড আমার মাথায় উঠে খেলা করবে। দুধসাগর আমায় নাগপাশে বেঁধে দুধ খাবার জন্য বায়না করবে !---ঠিক তেমনি করে চলব যেমন করে আমার বাবা আমার মা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছিল !---বেদে আর বেদেনী ! আমার জীবনের স্বপ্ন ! আমার স্বপ্নের জীবন !

পুরোহিত ।। সে না হয় হবে এখন ! কিন্তু, রাজাকে বশ করা সহজ নয়। তোমার মত কত সুন্দরী তাঁর ক্রীতদাসী ! পারবে তো ? তুমি পারবে তো ?

বিদ্যুৎ ॥ আমি আমার শক্তি জানি। যা জানতাম না, তাও জানিয়েছ তুমি। [ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর] রাজার মত কত সুন্দর আমার মুখের একটি কথা শোনবার জন্য ক্রীতদাস হয়েছে !---বেশি নয়! বেশি নয়—এই বেদেনীর একটি চুম্বন !---রাজা আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে! আমি তা ভাবছিনা আমি ভাবছি আমার স্বপ্নের জীবন! জীবনের স্বপ্ন !---কোথায় আমার সাথী---কোথায় তার বাঁশী ?---বঙ্করাজ কি ঘুমিয়ে আছে? শঙ্খচূড় কি কাঁদছে? দুধসাগর কি রাগ করেছে?

পুরোহিত ॥ সব আছে---সব পাবে! [বাহিরে ভেরী বাদ্য] ঐ শোন ভেরী বাদ্য!

বিদ্যুৎ ॥ [নাচিয়া উঠিয়া] সে এসেছে! সে এসেছে! এইবার বঙ্করাজ লাফিয়ে উঠবে! শঙ্খচূড় ফণা ধরবে! দুধসাগর নাচবে!

পুরোহিত ॥ রাজা এসে পড়েছেন। ও তারই আগমনী ভেরী বাদ্য। সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ আছে।

বিদ্যুৎ ॥ আমি জানি! আমি জানি! সে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে! আমরা যাবো! ঐ সাগরের পারে---ঐ পাহাড়ের ধারে ---ঐ বনের কোলে!

পুরোহিত ॥ উতলা হয়ো না বিদ্যুৎ! তুমি প্রস্তুত হও। রাজাকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হও।

বিদ্যুৎ ॥ আমি প্রস্তুত আছি! আয়! আয়! আয়! কে আসবি আয়!

সাপের খেলা ভাবি
যে না আসবে আড়ি।

পুরোহিত ॥ উতলা হয়ো না বিদ্যুৎ! আজ দশ বৎসর হ'ল যে কামনা নিয়ে সসর্প গৃহে বাস ক'রে তোমাকে লালন-পালন করেছি, আমার সে কামনা আজ সিদ্ধ কর! ..ঐ রাজা !...ঐ রাজা! ওকে জয় কর, বশ কর। তোমার দেহের নাগপাশে ওকে জড়িয়ে ধর। চুম্বন দাও...আলিঙ্গন দাও। ও তোমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে, নিশ্চয়ই পড়বে ..আমি জানি পড়বে।

বিদ্যুৎ ॥
আয় আয় আয়!
চুমু খাবো বঙ্করাজ
আয় আয় আয়!
দুধ দেব দুধসাগর
আয় আয় আয়!
শঙ্খ বাজে শঙ্খচূড়!
আয় আয় আয়!
মা মনসা মা মনসা!
আয় আয় আয়!

[সর্প-নৃত্য আরম্ভ করিল।]

পুরোহিত ॥ হ্যাঁ, নাচো। ঐ নাচ নাচো! আর আমার নিষেধ নেই, নাচো বেদেনী, নাচো! ঐ রাজা...বীরদর্পে আসছে। ঐ অহঙ্কার চূর্ণ কর। নাচো। সৃষ্টির সেই আদিম নাচ নাচো। সাপের নাচ নাচো—নাগপাশে বাঁধো! বশ করো! ক্রীতদাস করো!

বিদ্যুৎ ॥

কালনাগিনী! কালনাগিনী!
আজকে তুমি রাজরানী।
মাথার মণির কিবা আলো!
বঁধু তোমায় বাসে ভালো।
তোমার মুখে আছে মধু।
লোভে লোভে আসে বঁধু!
রানী রানী ওগো রানী!
কালনাগিনী! কালনাগিনী।

[সর্প-নৃত্য আরম্ভ করিল।]

পুরোহিত ॥ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!...আমি . আমি...এ পৌরোহিত্য চাই না। আমি রাজা! আমিই রাজা! . দেবে? . একটি চুম্বন . [বিদ্যুৎপর্ণার কাছে গেলেন]

বিদ্যুৎ ॥ [পুরোহিতের মুখের কাছে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া অট্টহাস্য করিলেন] হাঃ হাঃ হাঃ

পুরোহিত ॥ [সভয়ে পিছাইয়া গিয়া] বিষ! বিষ!...ওগো আমার বিষকন্যা! ওগো আমার স্বহস্ত-রচিত বিষবৃক্ষ!...ক্ষুধায় প্রাণ যায়...পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়, কিন্তু তোমার ঐ ফলফুল...আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে পারি না—হায় হায় হায়! এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি!

বিদ্যুৎ ॥ [অট্টহাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ।

[পুনরায় সর্প-নৃত্য আরম্ভ করিল। ইন্দ্রজিত-কতৃক পরিচালিত হইয়া দণ্ডধারী পারিষদগণ সেনানীগণ পরিবৃত হইয়া নীরবে রাজা তথায় প্রবেশ করিয়া নীরবেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়নে বিদ্যুৎপর্ণার নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ চোখের নিমিষে পরিবর্তিত পরিবেশে সহস্র দীপ জ্বলিয়া উঠিল। দুই পার্শ্ব হইতে দুই দল দেবদাসী চকিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাজার প্রতি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া বিদ্যুৎপর্ণার সহিত তালে তালে নাচিতে লাগিল। ক্রমে নৃত্য শেষ হইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে দীপ সকলও নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। অপূর্ব ভঙ্গীতে নর্তকীগণ রাজাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল]

বিদ্যুৎ ॥ একটি পয়সা রাজা, একটি পয়সা! কে দেখবে সাপের খেলা! দুধসাগরের নষ্টামি! দেখবে যদি তাই বল—যদি কেউ বাসো ভালো!

রাজা ॥ [ইন্দ্রজিতের প্রতি] কে!

ইন্দ্রজিৎ ॥ সে।

রাজা ॥ [পুরোহিতের প্রতি] সে?

পুরোহিত ॥ হ্যাঁ—সে।

বিদ্যুৎ ॥

শঙ্খচূড় বঙ্করাজ!
নাই ভয় নাই লাজ!

দুধসাগর দুধ চায়
সামলানো হ'ল দায়!
দেখবে যদি তাই বল!
যদি কেউ বাসো ভালো!

রাজা ॥ ভালোবাসি! ভালোবাসি!

ইন্দ্রজিৎ ॥ দেখব! দেখব!

সকলে ॥ দেখব দেখব!

[বিদ্যুৎপর্ণা পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন সহস্র প্রদীপ দ্বিগুণিত তেজে জ্বলিয়া উঠিল। দেবদাসীরা সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীতে যোগ দিল। হাতছানি দিয়া রাজাকে ডাকিতে ডাকিতে বিদ্যুৎপর্ণা যবনিকার অন্তরালে চলিয়া যাইতে লাগিল। রাজা ও ইন্দ্রজিৎ পুরোহিতের প্রসারিত হস্ত-সঙ্কেতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িয়া গেল। পুরোহিত তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া চোরের মত যবনিকার এক প্রান্তভাগ উত্তোলন করিয়া কি দেখিতে লাগিলেন। দীপের তেজ ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। দেবদাসীদের একটি করুণ সঙ্গীত শ্রুত হইতে লাগিল। দীপ নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। সঙ্গীত থামিয়া গেল। দীপ নিভিয়া গেল। তখন দূরাগত বংশীধ্বনির মৃত্যু-মূর্ছনা শোনা যাইতে লাগিল। ক্রমে তাহাও ডুবিয়া গেল। হঠাৎ সেই অন্ধকারের অন্তর হইতে বিদ্যুৎপর্ণার উচ্চকিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

বিদ্যুৎ ॥ জয়! জয়! জয়! জয় করেছি! বশ করেছি! রাজা, দেশের রাজা, ধরণীর ঈশ্বর ক্রীতদাস হয়ে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে। মাত্র একটি চুম্বনে! একটি আলিঙ্গনে!

ইন্দ্রজিৎ ॥ পিশাচী, তাকে কি হত্যা করে এলে পাষাণি! ঐ শোন তার আর্তনাদ। উঃ, কি কাতর আর্তনাদ!

বিদ্যুৎ ॥ মাতলামি! মাতলামি! ও তার মাতলামি! গুরু কোথায়! কোথায় তুমি! কোথায় আমার বক্ষবাজ! শঙ্খচূড়! দুধসাগর!

ইন্দ্রজিৎ ॥ ঐ শোন অসির ঝনঝনি! ঐ শোন রাজার মর্মভেদী আকুল মৃত্যু-যন্ত্রণা! ঐ শোন তার সেনানীদের ক্ষিপ্ত কোলাহল! ঐ আবার অসির ঝনঝনি! রাজাকে তুমি হত্যা করেছ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হত্যা করেছ। তাঁর সেনানীরা ক্ষেপে উঠেছে। কিন্তু—কি নিদারুণ অন্ধকার! পিতা কোথায়! প্রভু কোথায়? আমার অসি কই?

বিদ্যুৎ। রাজাকে আমি চুম্বন করেছি, আলিঙ্গন দিয়েছি।

পুরোহিত ॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

বিদ্যুৎ। কে ও! ঐ অট্টহাস্যে পরাণ কেঁপে ওঠে। কে তুমি?

পুরোহিত ॥ আমি পুরোহিত।

বিদ্যুৎ ॥ গুরু! গুরু! আমি জয় করেছি! আমি বশ করেছি।

পুরোহিত ॥ বটে!

বিদ্যুৎ ॥ একটি চুম্বনে—একটি আলিঙ্গনে—বেশি নয়—বেশি নয়, তাতেই আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে।

পুরোহিত ॥ ঐ একটি চুম্বনে—ঐ একটি আলিঙ্গনেই রাজা পঞ্চত্ব লাভ

করেছে। তার মৃতদেহ তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে! ওগো বিষকন্যা, প্রতিদিন তিল তিল করে বিষ খাইয়ে আজ দশ বৎসর হল আমি যে কালনাগিনী সৃষ্টি করেছি, আজ সে আমার গোপন অভিসন্ধি পূর্ণ করেছে ঐ রাজাকে দংশন ক'রে!

বিদ্যুৎ॥ সে মরে গেছে?

পুরোহিত॥ মরে গেছে।

বিদ্যুৎ॥ চুম্বনেই বিষ? আলিঙ্গনেও বিষ?

পুরোহিত॥ ইন্দ্রজিৎ তুমি উত্তর দাও। স্বচক্ষে তুমি দেখে এসেছ।

বিদ্যুৎ॥ ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ॥ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ॥ আমি কালনাগিনী! আমি কালনাগিনী!

পুরোহিত॥ তুমি বিষকন্যা! তুমি আমার স্বেচ্ছাকৃত সৃষ্টি। আমি নিজ হাতে তোমাকে গড়েছি। কিন্তু…

বিদ্যুৎ॥ বল! বল!

পুরোহিত॥ কিন্তু ঐ যে রাজা—ও তো মরে বাঁচলো, আর আমি! আমি যে দিবানিশি অনুতাপে জ্বলে মরছি! কে জানতো আমার বিষকন্যার একটি চুম্বনের জন্য বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বপ্নের মাঝে কামনার বিষে দংশিত হবে! হায় হায়! এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি।

বিদ্যুৎ॥ আজ দেখছি সবাই ক্ষেপে উঠেছে! তোমরা কি সবাই মাতাল হলে! কিন্তু আমি ঠিক আছি। আমি ভুলব না—ঠকব না! গুরু! রাজাকে জয় করেছি, এইবার আমার সাপ তিনটি দাও। ইন্দ্রজিৎ, কোথায় তুমি! কাছে এস। ঐ কান পেতে শোন সমুদ্রের গর্জন! ডাকছে! আমাদের ডাকছে! আর বিলম্ব নয়, কোথায় আমার বঙ্কদাঁত! শঙ্খচূড়? দুধসাগর?

পুরোহিত॥ আছে, তারা আছে, আমার সঙ্গেই আছে। কিন্তু বিদ্যুৎ!…আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে?

বিদ্যুৎ॥ না! না! তুমি এই মন্দিরেই থাকবে। আমরা আবার ফিরে আসব। ঠিক আমার বাবা সদলবলে যেমন এসেছিল! সঙ্গে আনব আমাদের খোকাখুকু। গুরু! কাছে এস. শোন। আমাদের খোকা-খুকু আরো সুন্দর হবে…আমার চাইতেও…ইন্দ্রের চাইতেও! তুমি তাদের আবার বুকে তুলে নিয়ো। আবার মানুষ করো…আবার ভালবেসো।…

পুরোহিত॥ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ…ভুল! ভুল! ভুল! সব তোমার ভুল। আমি তোমার সর্বনাশ করেছি।…কাকে নিয়ে তুমি জীবনের স্বপ্ন দেখছ! স্বপ্নের জীবন কল্পনা করছ…তুমি কালনাগিনী! তুমি বিষকন্যা। রাজাকে হত্যা করেছ, ইন্দ্রজিৎকেও…

বিদ্যুৎ॥ আবার সেই কথা?

পুরোহিত ॥ আরো প্রমাণ চাও ?

বিদ্যুৎ ॥ তুমি আমার সাপ দাও ! কোথায় তারা ?…আমি আর মুহূর্ত অপেক্ষা করব না, কোথায় তারা ?

পুরোহিত ॥ সর্বনাশ হয়েছে বিদ্যুৎ, সর্বনাশ হয়েছে ! চুপড়ির আবরণ খুলে এই অন্ধকারে দুধসাগর বের হয়ে পড়েছে। আমি তাকে খেতে দিইনি, সে এইবার ছাড়া পেয়ে তার শোধ নেবে ! ঐ শোন তার গর্জন ! বাঁচাও বিদ্যুৎ, আমায় বাঁচাও ! তুমি এসে আমায় জড়িয়ে ধর। দুধসাগর বুঝবে আমি তোমার দেহলগ্ন। সে কাকে দংশন করতে গিয়ে কাকে দংশন করবে মনে করে আর দংশনই করবে না।

বিদ্যুৎ ॥ কিন্তু…ইন্দ্রজিৎ ?

পুরোহিত ॥ সে আলো নিয়ে আসুক। যাও ইন্দ্রজিৎ…যাও

ইন্দ্রজিৎ ॥ হ্যাঁ, আলো ! আমি আলো নিয়ে আসছি [প্রস্থান]

বিদ্যুৎ ॥ দুধসাগর ! দুধসাগর ! আমি বিদ্যুৎ। আমি তোর দুধ বোন ! আমি তোকে দুধ দেব !…কিন্তু আমার কাছে আসিস না ! আমার গুরু আমার দেহ জড়িয়ে আছেন। বিশ্বাস না হয়…ঐ শোন আমি তাকে চুমু খাচ্ছি… সাবধান…কাকে দংশন করতে কাকে দংশন করবি। ঠিক নেই কিন্তু…

পুরোহিত ॥ [চিৎকার করিয়া উঠিয়া দংশন করেছে· দংশন করেছে।

বিদ্যুৎ ॥ সে কি ! সে কি !

পুরোহিত ॥ কিন্তু দুধসাগর নয়…

বিদ্যুৎ ॥ তবে !

পুরোহিত ॥ তুমি !…বিদায় ! ইন্দ্রজিৎকে চুম্বন ক'রো না…আলিঙ্গন দিয়ো না !…আমি তোমার সর্বনাশ করেছি… যদি তোমার খোকাখুকু হবার কোন আশা থাকতো---তবে আমি এই মন্দিরে যেমন করেই হোক তাদের আশায় বেঁচে থাকতাম, কিন্তু…তা যখন নয়…তখন যাকে ভালবেসে নিজে সৃষ্টি করেছি, তারই চুম্বন পেয়ে আলিঙ্গন পেয়ে আনন্দে মরলাম। প্রতি রাত্রের দুঃস্বপ্নের চাইতে একদিন এ-ক মু-হূ-র্তে ম-রা ভালো। তৃ-প্ত হ-য়ে ম-রা ভা-লো…বিদায় !

বিদ্যুৎ ॥ গুরু !…গুরু ! [উত্তর পাইল না]

* * * * *

[ক্ষণকাল নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল। পরে আলো হস্তে ইন্দ্রজিৎ প্রবেশ করিয়া দেখে বিদ্যুতের পদতলে পুরোহিতের মৃতদেহ লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যুৎ পাষাণ-মূর্তির মত সেই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।]

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎ ! বিদ্যুৎ !

বিদ্যুৎ ॥ [চমকিয়া উঠিয়া ইন্দ্রজিৎকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন] দেখেছ !

ইন্দ্রজিৎ ॥ গুরু !

বিদ্যুৎ ॥ গুরু নয়, গুরুব মৃতদেহ।···আমাব একটি চুম্বনে, একটি আলিঙ্গনে পাযেব তলায লুটিযে পড়েছে---আব উঠবে না।

ইন্দ্রজিৎ ॥ চলে এস বিদ্যুৎ ·সেনানীবা উলঙ্গ অসি হস্তে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রেব মতো আমাদেব খুঁজে বেড়াচ্ছে। এতক্ষণ অন্ধকাবে নিবাপদে ছিলাম---এখন এই আলো

বিদ্যুৎ ॥ নিভিযে দাও নিভিযে দাও·

ইন্দ্রজিৎ ॥ বেশ। দিলাম। [দীপ নিবাপন] এইবাব এস, চল তোমাব সেই পাহাড়েব ধাবে···সমুদ্রেব পাবে বনানীব কোলে

[কোন উত্তর পাইল না]

ইন্দ্রজিৎ। [আবো উচ্চস্ববে। বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ। [দূব হইতে উত্তব আসিল]

বিদ্যুৎ ॥ ইন্দ্রজিৎ। ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ।

বিদ্যুৎ ॥ [আবো দূব হইতে] বিদ্যুৎ আকাশে। বাইবে এসে দেখে যাও

[পরিবর্তিত প্রকৃতি। মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদ মাঝে মাঝে মেঘ সরিয়া যাইতেছে জ্যোৎস্না উঠিতেছে, আবার পরক্ষণেই মেঘে ঢাকা পড়িতেছে। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে।

ইন্দ্রজিৎ ॥ [উচ্চস্ববে] অত দূবে নয়। কাছে এস। চল চল সেই পাহাড়েব ধাবে, সমুদ্রেব পাবে, বনানীব কোলে

বিদ্যুৎ ॥ [আর্তনাদ কবিযা উঠিল] না না না।

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ ॥ আকাশেব ঐ চাঁদ দূবে কতদূবে তবু সবসীব ঐ পদ্ম আনন্দে দুলছে। চুম্বন নয়। আলিঙ্গন নয় তবু দোলে। ওপবে ঐ চাঁদ আব নিচে ঐ পদ্ম ওব অর্থ জানো। একজন তুমি—আব একজন আমি। হাঃ হাঃ হাঃ।

[সুদূরে কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গেল।]

ইন্দ্রজিৎ ॥ বিদ্যুৎ ! বিদ্যুৎ। আকাশেব বিদ্যুৎ ··আকাশে হাবিযে গেল।

য ব নি কা

ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৪

উদ্ধার

[১৩৪৫ এর ভাদ্র। বন্যাবিধ্বস্ত বাঙলা।

শত শত গ্রাম জলের তলায় চলে গেছে। গ্রামবাসীরা যারা পেরেছে পালিয়েছে, যারা পারেনি তারা ঘরের চালের উপর, কি কলাগাছের ভেলায় কিম্বা বাঁশের মাচানে আশ্রয় নিয়েছে। কত লোক কত শিশু কত গৃহপালিত পশু যে ডুবে মরেছে তার ইয়ত্তা নেই।

এমনি একটা বন্যাক্রান্ত গ্রাম থেকে যারা পালাতে পারেনি তাদের কথা বলছি।

বন্যার জল হু হু করে বাড়ছে। একটি বাঁশের মাচানে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষা প্রয়াসী কয়েকজন লোক এবং একটি পাঁঠা।

এইবার লোকগুলির পরিচয় দিই। রামহরি ভট্টাচার্য, বয়স পঁয়তাল্লিশ, পৌরোহিত্য করতেন, জ্বরে অচেতন, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছেন, বন্যায় না মরলেও ব্যারামে মারা যাবেন, এ প্রায় জানা কথা। সৌদামিনী দেবী রামহরির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বয়স কুড়ি বাইশ, বেশ সুন্দরীই বলা যায়, চোখে বিদ্যুৎ খেলে। রামহরির প্রথম পক্ষের সন্তান নরু, বয়স সাত, পাঁঠাটির মালিক সে বঙ্ক। তার কান্নাকাটিতেই পাঁঠাটি এই মাচানে আশ্রয় পেয়েছে।

রামহরির প্রতিবেশী এবং যজমান প্রিয়লাল রায়, বয়স পঁচিশ, মহাজনী ব্যবসা।

পরাণ—রামহরির ভাগচাষী—বয়স সাতাশ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ।

শেষ রাত্রি। একটা বাঁশের আগায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। রামহরি অচেতন অবস্থায় মাচানের এক কোণে পড়ে রয়েছে। ছেলেটা (নরু) ঘুমাচ্ছে। পাঁঠাটি তার পাশে ধুঁকছে। পরাণ সেথ চোখ বুজে এক কোণে পড়ে রয়েছে—ঘুমিয়ে কি জেগে বলা যায়না। প্রিয়লালের হাতে এক তাড়া দলিল—লণ্ঠনের যথাসম্ভব কাছে গিয়ে সে নিবিষ্ট চিত্তে দলিলগুলো দেখছিল। সৌদামিনী স্বামীর বিছানায় স্তব্ধ হয়ে বসে বন্যার ক্রমবর্ধমান জলের পানে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে]

সৌদামিনী ॥ বানের জল হু হু করে বাড়ছে!

[প্রিয়লাল নিবিষ্টচিত্তে দলিলের পাতা দেখছিল—কথাটি তার কানে গেল না]

বানের জল হু হু করে বাড়ছে—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এ মাচানও তলিয়ে যাবে।

প্রিয়লাল ॥ [এবার শুনল। উঠে দাঁড়াল] রাতও পোহাবে না। এমনি করেই কি আমরা মারা যাব!

সৌদামিনী ॥ আমি বুঝতে পারছিনা আপনি এখনো কেন এখানে আছেন! আপনি চলে যান!

প্রিয়লাল ॥ কি করে যাই!

সৌদামিনী ॥ কলাগাছের ভেলাটা—ও একজনের ভার সইবে বই কি।

প্রিয়লাল ॥ একজন নয়, দু'জনই যাওয়া যায় ও ভেলায়!

সৌদামিনী ॥ সে আমি জানি। কিন্তু দু'জন আপনি পাচ্ছেন কোথায়?

প্রিয়লাল ॥ তুমি আর আমি!

সৌদামিনী ॥ আমার স্বামী—

প্রিয়লাল ॥ সে তো ঘাটের মড়া—নিঃশ্বাস বইছে কি না দেখ তো ?

সৌদামিনী ॥ আমার ছেলে—

প্রিয়লাল ॥ তোমার সতীনের ছেলে—

সৌদামিনী ॥ ঐ পরাণ সেখ—দশ বছরের ভাগচাষী আমাদের বাঁচাতে নিজে থেকে গেল—পালাল না !

প্রিয়লাল ॥ ব্যাটা চাষা···ওদের তো এই-ই কাজ !

সৌদামিনী ॥ কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে আব কোন চাষাই এল না। ঘুম থেকে উঠে দেখেন ঘরে জল ঢুকেছে, লোকজন কেউ নেই, সব পালিয়েছে।

প্রিয়লাল ॥ অথচ গ্রামের দশ আনা লোকেব মহাজন আমি ! দশ আনা লোকের মাথা কিনে রেখেছিলাম আমি ! ব্যাটাদের আমি দেখে নেব।

সৌদামিনী ॥ হ্যাঁ, মাথাই কিনেছিলেন, পা-তো আর কেনেননি। তাই ওরা পালাতে পেরেছে। কিন্তু আপনি পালালেন না কেন বলুন দেখি। এখনো—এখনো পালাতে পারেন !

প্রিয়লাল ॥ পালানো আমার পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। বাড়ীর লোকজন-দের তো মামার বাড়ী চালান দিলাম। কেন আমি থাকলাম !

সৌদামিনী ॥ দলিলেব তাড়াগুলো হয়তো খুঁজে পাচ্ছিলেন না ?

প্রিয়লাল ॥ সেগুলো হাতে নিয়েছিলাম সবাব আগে। ঘুম থেকে জেগেই দেখলাম চারিদিকে সমুদ্রের মতো জল থৈ থৈ করছে। সেই যে হাতে নিয়েছি, এ পর্যন্ত তা নামাইনি, দেখছ তো। ছ' হাজাব টাকার মন ··মস্থক রেহান হ্যাণ্ডনোট। আব নিলাম বিভলবাবটি। নিয়ে ছুটলাম তোমাদের বাড়ী।

সৌদামিনী ॥ আমাদেব উদ্ধাব করতে !

প্রিয়লাল ॥ তোমাদেব নয়, তোমাকে।

সৌদামিনী ॥ বিভলবাব নিয়ে !

প্রিয়লাল ॥ হ্যাঁ।

সৌদামিনী ॥ আপনার হাতে যখন রিভলবাব আছে, আমরা নিশ্চিন্ত। কি বলেন ?

প্রিয়লাল ॥ অনেকটা। জোর করে তোমায় আমি ভেলায় তুলব এখন। দেখবো কে বাধা দেয় !

সৌদামিনী ॥ আমাকে আপনি উদ্ধাব করবেনই, কি বলেন ?

প্রিয়লাল ॥ নিশ্চয়। একটা ঘাটের মড়া তোমার স্বামী। উদ্ধারই আমি একে বলব।·· হ্যাঁ, আর সময় নেই, ভেলায় ওঠ—

রামহরি ॥ [প্রলাপ বকছিল] গেল—গেল—আমার ঘর ডুবে গেল। আজ এক মাস ধরে তিন চার জ্বর উঠছে তার ওপর এই ঝড জল, ওষুধ নেই, পথ্য নেই। তবু—

সৌদামিনী ॥ আমার সিঁদুরের জোর আছে বলতে হবে। ও কি! ও কি!

প্রিয়লাল ॥ কি?

[দেখা গেল পরাণ সেখ হামা দিয়ে পাঠাকে টেনে নিয়েছে—এবং তার গলাটা চেপে ধরে একটা লম্বা ছুরি দিয়ে পাঠাটাকে জবাই করে আর কি।]

প্রিয়লাল ॥ এই। ও কি হচ্ছে?

পরাণ ॥ খাব।

প্রিয়লাল ॥ ব্যাটা রাক্ষস, না পিশাচ?

পরাণ ॥ চুপ। তোমরা ভদ্রলোক—বড়লোক—আজও ভাত খেয়েছ দু'মুঠো। আমাকে দিয়েছিলে কি? খিদেতে এমনি করে মরব না কি?

[নরু পাঠা নিয়ে টানাটানিতে জেগে উঠেছে। এ দৃশ্য দেখেই চীৎকার করে উঠল]

নরু ॥ আমার পাঠা! আমার পাঠা।

পরাণ ॥ আজ তিনদিন এক দানা ভাত পাইনি। বাঁচতে হবে। আমাকে বাঁচতে হবে।

নরু ॥ ভাত আছে। মা আমার জন্যে লুকিয়ে রেখেছে। আমি দিচ্ছি। ওকে ছেড়ে দাও।

[পরাণের চোখে জল এল। সে পাঠাকে ছেড়ে দিল]

পরাণ ॥ থাক। ও ভাত তুমিই খাও।

নরু ॥ মা, ভাত চারটি আমার পাঠাটাকে দি। ও আজ ক'দিন কিছু খায়নি। ও কী করে বাঁচবে?

সৌদামিনী ॥ দাও। সেই সঙ্গে তুমিও এক মুঠো খাও।

পরাণ ॥ আমি ভেলাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

প্রিয়লাল ॥ খবরদার। ও ভেলা আমার।

পরাণ ॥ মানে। তুমি মহাজন বলে?

প্রিয়লাল ॥ আলবৎ।

পরাণ। তবে তুমি জানো না, তোমায় বলি। আজ সন্ধ্যাবেলা। তখন তুমি ঘুমিয়ে। ঠাকরুণ ভাত রাঁধবেন। কাঠ নেই। মাচান থেকে বাঁশ খুলে নিলে মাচান যাবে। কি করা যায়। ঠাকরুন তখন এক তাড়া দলিল জ্বালিয়ে ভাত রেঁধেছেন। জানো?

প্রিয়লাল ॥ বটে। [সৌদামিনীর দিকে কড়াদৃষ্টিতে তাকিয়ে] এ কথা সত্যি?

সৌদামিনী ॥ কি জানি। ও আমাকে কতকগুলো কাগজ দিলে। তখন অত দেখবার সময় ছিল না। আর দেখেই বা কি হত। খেতে হবে তো? বাঁচতে হবে তো?

প্রিয়লাল ॥ আমি দেখছি। যদি সত্যি হয় [পরাণের প্রতি] আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন।

[দলিলের তাড়াগুলো বের করে দেখতে লাগল]

পরাণ ॥ [সৌদামিনীকে] আমি চললাম ঠাকরুন। ভেবেছিলাম থাকব—

মরতে হয় এক সঙ্গেই মরব। বাঁচতে হয় এক সঙ্গেই বাঁচব কিন্তু। ক্ষিদের জ্বালা আর সইতে পারছি না।

সৌদামিনী॥ ইচ্ছে করেই তুমি খাওনি পরাণ। আমি তোমায় খেতে বলেছি।

পরাণ॥ হ্যাঁ বলেছ, কিন্তু খাইনি। কেবলই মনে হয়েছে, আমি খেলে তোমাদের পেট ভরবে না। যতক্ষণ সইতে পেরেছি, সয়েছি। কিন্তু আর পারছিনা।

সৌদামিনী॥ কিন্তু যাবেই বা কোথায়! চারিদিকে সমুদ্রের মতো জল!

পরাণ॥ বাঁচতেই যে যাচ্ছি, তাই বা তোমাকে কে বললে ঠাকরুণ?

সৌদামিনী॥ তবে যেয়ো না। এক সঙ্গেই মরব।

পরাণ॥ কিন্তু সে আরও ভীষণ। এখনও চারটি চাল আছে। ভাতও হতে পারে। দেশলাই আছে—দলিল আছে। কিন্তু ভাত হলেই তা না খেয়ে পারবনা—ভাত দেখলেই এবার আর আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারবনা। কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলব।

সৌদামিনী॥ বেশ তো, এ দু'দিন আমরা খেয়েছি, আজ তুমি খাবে।

পরাণ। তাও পারব না—না। আমাকে পালাতেই হবে—মরতে, তোমাদের চোখের আড়ালে।

সৌদামিনী॥ কিন্তু বাঁচা কি কিছুতেই যায় না?

পরাণ॥ না। আমি ভেবে দেখেছি, তুমিও দেখছ, জল যে রকম বাড়ছে বাঁচবার আর কোন উপায়ই নেই। পাঁঠাটা জবাই করে কাঁচা মাংস খেতে যাচ্ছিলাম আমি! বাঁচবার কোন উপায় থাকলে কোন মানুষ এ পারতো?—না। মরতে যখন হবেই, তখন মানুষের মতই আমায় মরতে দাও ঠাকরুণ।

সৌদামিনী॥ [চুপি চুপি] তোমার মরা হবে না। তুমি চলে গেলে আমি মনে ব্যথা পাব পরাণ।

[পরাণ যেন কেমন হয়ে গেল। অভিভূতের মতো সে সৌদামিনীর দিকে চেয়ে রইল]

সৌদামিনী॥ তুমি যাবে?

পরাণ॥ না।

[প্রিয়লাল কাছে এসে দাঁড়াল। তার হাতে রিভলবার]

প্রিয়লাল॥ [পরাণকে] ন'হাজার টাকার দলিল তুমি আমার পুড়িয়েছ।

সৌদামিনী॥ চারটি ভাতের দাম এত? তা তো জানতাম না!

প্রিয়লাল। তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারব।

গুলি করতে রিভলবার তুলল]

পরাণ॥ [সৌদামিনীর দিকে চেয়ে] আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে—কিন্তু হ'ল না।

সৌদামিনী॥ তুমি বাঁচবে। সবাই বাঁচবে। কেউ মরবেনা যতক্ষণ আমি আছি।

প্রিয়লাল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ।
সৌদামিনী ॥ [মুচকি হেসে] গুলি কর! দেরী করছ কেন?

[হঠাৎ কি মনে হল। রিভলবারটা খুলে দেখে—গুলি নেই।]

প্রিয়লাল ॥ [সৌদামিনীর প্রতি] তোমার কাজ?
সৌদামিনী ॥ [মুচকি হাসতে লাগল]
প্রিয়লাল ॥ কোথায় গুলি, বল!
সৌদামিনী ॥ [জল দেখিয়ে দিল]
পরাণ ॥ [হেসে উঠল] আমারটি কিন্তু হাতেই আছে। [ছুরি তুলে ধরল]
সৌদামিনী ॥ তাহলে এবার ভাত রাধা যাক। বাঁচতে হবে—আমাদের সবাইকে বাঁচতে হবে। চাল আছে—কিন্তু কাঠ নেই—বাঁশও নেই।
পরাণ ॥ দলিল আছে! দেশলাই আছে!
প্রিয়লাল ॥ [দলিলের তাড়াগুলো সৌদামিনীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে] নাও। কিন্তু আমি চললাম।
পরাণ ॥ স্বচ্ছন্দে। ভেলাটি তোমাকে দিলাম মহাজন।
প্রিয়লাল ॥ [সৌদামিনীকে] আমি যাচ্ছি। কিন্তু একা যেতে হবে এ যদি জানতাম, আমি আসতাম না। আমি বাঁচতে পারতাম,—বাঁচতে পারতাম সৌদামিনী।

সৌদামিনী ॥ তুমি যেয়ো না। তুমি থাকো।
প্রিয়লাল ॥ থাকব? কোথায় থাকব?
সৌদামিনী। আমার সংসারে।
প্রিয়লাল ॥ তোমার সংসার! ঐ ঘাটের মড়া এরই মাঝে? সৌদামিনী, তুমি চলে এস। এখনো—এখনো—সময় আছে। এখনো হয়ত আমরা দুজনেই বাঁচতে পারব।
সৌদামিনী ॥ সবাইকে নিয়ে আমাকে বাঁচতে হবে।
প্রিয়লাল ॥ কিন্তু আমি চাই তোমাকে।
সৌদামিনী ॥ আমিও চাই—তোমাকে। তুমি চলে গেলে আমার জীবন অন্ধকার হবে যাবে।
প্রিয়লাল ॥ তবে তুমি কেন থাকছ! এসো—।
সৌদামিনী ॥ কি করে যাই! আমার স্বামী, আমার ছেলে, কাউকেই আমি ছাড়তে পারছি না। যাদের পেয়েছি কাউকেই ছাড়তে পারছিনা। না, তোমাকেও না। তুমি যেয়োনা।
প্রিয়লাল ॥ বেশ, যাব না। কিন্তু এখানে থাকা মানে মরা।
সৌদামিনী ॥ যদি মরি, এক সঙ্গেই মরব।
পরাণ ॥ [দূরে একটা বড় নৌকা দেখতে পেয়ে] বেঁচে গেলাম। আমরা বেঁচে গেলাম। ঐ যে কত বড় একটা নৌকা এই দিকে আসছে।

প্রিয়লাল ॥ [দেখে] রিলিফ পার্টির নৌকা ! ঐ যে নিশান ! আমরা বেঁচে গেলাম সৌদামিনী ! বেঁচে গেলাম !

সৌদামিনী ॥ আমরা বাঁচলাম ! সবাই আমরা একসঙ্গে বাঁচলাম ! [নরুকে ডাকতে লাগল] নরু . নরু.. ওঠো—ভোর হয়েছে !

শ্রীহর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা ১৯৩৮

কালীবাড়ী

দুর্গা ॥ কি ভাই গঙ্গাজল, আজ যে ভারি ব্যস্ত-সমস্ত দেখছি !

কালীতারা ॥ হ্যাঁ ভাই, আজ একটু সকাল-সকাল নেয়ে-খেয়ে ঘরদোরে হাত দিয়েছি। ধোঁয়াতে আর কালীর ঝুলে দু'দিনেই যা নোংরা হয় !

দুর্গা ॥ বস্তির ঘরবাড়ী এমনই হয়। কতই-বা ধোবে আর কতই-বা পুঁছবে ? ধুয়ে-পুঁছে না-হয় এক রকম দাঁড় করালে। ঐ নোংরা নর্দমাটা ? ওর কি করতে পারছো শুনি ?

কালীতারা। কি আর করছি ! কোথায় পাবো তোমার মতো শিশিতে শিশিতে এসেন্স। ও ধারের জানালা আমার বন্ধই থাকে, গরমে পচে মরি, তবু। ফটকে তো এ-ঘরে শোয়া ছেড়ে দিয়েছে, বারান্দায় শোয়।

দুর্গা। তা' সেই ভালো। হলেই বা বাপ-মা, ছেলে এখন আলাদা শোয়, সেই ভালো এখন, বোঝবার বয়স হয়েছে তো।

কালীতারা ॥ তোমার যত অনাসৃষ্টি কথা। আমাদের এ বয়েসে কী-ই বা দেখবে আর কী-ই বা বুঝবে ! ঘর মোটে এই একখানা, একটা মাত্র ছেলে, শিবরাত্রির সলতে, বারান্দায় শোয় সইতে পারিনা। রাতে চমকে চমকে উঠি।

দুর্গা। বলি তো তোমাদের দাসবাবুকে, এসেন্সের কারখানায় কাজ ক'রে নিজে তো হয়েছো নবাব। হাজার হাজার শিশি প্যাক করছো, রোজ একটি করে শিশি বাড়ী আনছো, তো একদিন না হয় এক শিশি এসেন্স বেশী করেই পকেটে পুরলে, ওগো এক শিশি এসেন্স না হয় আমার 'গঙ্গাজলে'ই ঢালো ! পারে না। দামী-দামী সব ব্যাপার তো !

কালীতারা ॥ সত্যিই তো।

দুর্গা। আজ এনেছে হাস্নুহানা। এ নাকি জাপান দেশের রানীদের গোসা ভাঙাতে হলে চাই-ই। এ মাসে একদিনও থিয়েটার দেখতে পাইনি, বুঝলে ভাই কাল রাতে তাই নিয়ে—তাই মান ভাঙাতে আজ এই হাস্নুহানা। তা

এনেছ, বেশ, জামা কাপড়ে দাও। তা না। বুকটা আমাব এখনো জ্বলছে। স্নান করিয়ে ছেড়েছে। যত বলি লোকে বলবে কি, তত মেতে ওঠে। বলে, লোকে বলবে একটি ফুটন্ত ফুলেব বাগান হেঁটে বেড়াচ্ছে। দেখ দেখি কথা।

কালীতাবা॥ তা মিথ্যে কি। তুমি এখানে এলে নর্দমাটা একেবাবেই ভুলে যাই।

দুর্গা॥ তুমি বলেই এ-কথাটা বললে। অন্য লোকেব যে চোখ টাটায়।

কালীতাবা॥ চোখ নয়, নাক। জুতো জোড়া বেশ চকচকে হয়েছে, না?

দুর্গা॥ তা হয়েছে। এতও পাব তুমি। যেমন কবে লেবু ঘসছো, চামড়া উঠে না যায় দেখো। তোমাদেব দাসবাবুব এতে মন উঠবে না। এই তো আজ থিয়েটাবে নিয়ে যাবেন, এবই মধ্যে মুচিব ডাক পড়েছে। দেখে এলাম জুতো বুরুষ হচ্ছে। কোন কাজ যদি নিজেব হাতে কববেন। তা, না, এ জুতোও বেশ ঝকঝকে হয়েছে। হঠাৎ আজ এমন জাঁকজমক কেন ভাই? কর্তা বুঝি যাবেন কোথাও?

কালীতাবা॥ হ্যাঁ, বলে গেছেন আমাদেব নিয়ে আজ বাতে একটু বেব হবেন।

দুর্গা॥ ও ছাপাখানায় সাবাদিন ভূতেব মতো খেটে-খেটে একটু বেব হওয়া ভালো। তোমাদেব দাসবাবু তো বলেন, প্রেসে থিয়েটাবেব বিজ্ঞাপন ছেপে-ছেপেই ভদ্দবলোক মাবা গেল, একটা দিনও যদি থিয়েটাব দেখে। আমি হেসে বলি, চিনিব বলদ। উনি বলেন— চুপ, শুনলে বাগ কববেন ভদ্দবলোক। আমি বলি, আমাব কপালেব বব, এ ঠাট্টা আমি কববো না তো কববে কে?

কালীতাবা। সত্যি ভাই ঠিক বলেছ, চিনিব বলদ। ফটকে তো বলে, শহবেব দেওয়ালে দেওয়ালে যত থিয়েটাবেব বিজ্ঞাপন সব তাব বাবাব হাতে ছাপা। এই নিয়েই তাব কি গর্ব। তবু তো আজ পর্যন্ত একদিনও থিয়েটাব দেখেনি? আমিই তো ফটকে-কে বলি, তোব বাবা একটা চিনিব বলদ, খোকা। ও নিয়ে বড়াই কবাব নেই।

দুর্গা॥ তা একদিন কেন যাও না ভাই থিয়েটাবে। পুরুষদেব ওপব একটু জোবজববদস্তি কবতে হয় বৈ-কি। শখ বলে কোন জিনিস তো ওদেব নেই।

কালীতাবা॥ যাদেব ভাত চলে না, তাদেব শখ না থাকাই ভালো। তবু তো আমাদেব শখেব অন্ত নেই। দেখছ না—ফটকে-কে স্কুলে পড়ানো হচ্ছে? এদিকে ভাত চলেনা, ওদিকে ফটকেব জন্যে প্রাইভেট-মাস্টাব বাখবেন শুনছি। হেডমাস্টাব নাকি বলেছেন, বাড়ীতে একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিলে ছেলে আমাব বৃত্তি পাবে।

দুর্গা॥ তোমাদেব দাসবাবু কথাটা শুনেছেন। শুনে কি বলেন জানো? বলেন, গবীবেব আবার ঘোড়া বোগ কেন? আমি বলি, চুপ, শুনলে রাগ করবেন ভদ্দরলোক। তোমাদেব দাসবাবু বলেন, বা-বে তোমাব গঙ্গাজলের বর এ ঠাট্টা আমি করবো না তো করবে কে?

কালীতারা ॥ মিথ্যে তো তিনি কিছু বলেন নি। গরীবের ঘোড়া রোগ, তা মিথ্যে নয়। ওঁর জেদ ছেলেকে যাতে ছাপাখানার ভূত হতে না হয় তা তিনি করবেন।

দুর্গা ॥ ছাপাখানার ভূতই বটে? যে চেহারায় ঘরে ফেরেন! তা চেহারা-খানা তো আর মন্দ নয়! আমি তো তোমাদের দাসবাবুকে বলি, না খেতে পেয়ে মরে গেলেও ছাপাখানায় তোমায় কাজ করতে দেবোনা।

কালীতারা ॥ না না, কখনো দিয়োনা। এসেন্সের কারখানায় প্যাকারের কাজ ঢের ভালো কাজ। রোজ এক শিশি এসেন্স পকেটে পুরতে পারলে বৌ-এর মন-চুরি করা যায়। ছাপাখানার কাজে সে সুবিধে নেই ভাই।

দুর্গা ॥ কি জানি ভাই, কথাটা ঠিক বুঝলাম না। চোর বললে না তো!

কালীতারা ॥ যদি বলেই থাকি, আমার গঙ্গাজলের বরকেই বলেছি। এ ঠাট্টা আমি করবো না তো করবে কে! দেখ দেখি ভাই, এ-জামাটা আর রিফু করব? খোল নলচে বদলালে হুঁকোটার যা থাকে, এ-জামাটা হয়েছে তাই! এই জামা গায়ে দিয়ে আজ উনি বাইরে বের হবেন! বলি, একটা জামা কেনো—তা উনি বলেন, সে-দামে ফটকের একটা মানে-বই কেনা যাবে।

দুর্গা ॥ কোথায় যাচ্ছো ভাই আজ? জামাকাপড় ঝেড়েপুঁছে যে আর রাখলেন না!

কালীতারা ॥ কি জানি ভাই, বলেছেন যাবেন! জানো তো, না গেলে বিশ্বাস নেই! আমাদের কোনখানে যাওয়া—আজ তিন বছরের মধ্যে এ-ঘরেব বাইরে পা দিয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না?

দুর্গা ॥ নেমন্তন্ন-টন্ন বুঝি?

কালীতারা ॥ আমাদের নেমন্তন্ন কে করবে ভাই। আর নেমন্তন্ন করলেও যেতেই কি পারি! ট্রাম-বাসের ভাড়া কোত্থেকে জোটে!

দুর্গা ॥ আজ?

কালীতারা ॥ কি জানি! জানি না ভাই। ফটকে পরীক্ষায় ফাস্ট হয়েছে। আজ খবর শুনে কাজে বেরুবার সময় বলে গেছেন ফটকে-কে নিয়ে আজ আমরা—না ভাই, এখনো আমার বিশ্বাস হয় না। কি করে পারবেন!

[ফটিকের প্রবেশ]

কিরে খোকা, এরি মধ্যে ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল!

ফটিক ॥ আজ যে শনিবার তা বুঝি মনে নেই। এই যে মাসিমা! বাড়ীতে পা দিতেই বুঝেছি তুমি এসেছ। আজ তো চামেলী নয়, [ঘ্রাণ নিতে নিতে] বকুল, তাও নয়, বল না কি।

দুর্গা ॥ জাপান দেশের নাম শুনেছিস?

ফটিক ॥ বারে! তা আর শুনব না।

দুর্গা ॥ সে দেশের রানী রাগ করলে সে দেশের রাজা—

ফটিক ॥ মিডাকো বল—

দুর্গা ॥ মিডাকো-ফিডাকো নয়, রাজা—

ফটিক ॥ ঐ ওদের রাজাকেই মিডাকো বলে।

দুর্গা ॥ তুই তোর মেসোর চেয়ে বেশি জানিস?

ফটিক ॥ তুমি মেসোকে বলেই দেখো! মিডাকো। সেই মিডাকো বুঝি এই এসেন্স?

দুর্গা ॥ তা যদি মিডাকো হয়, তাতেই বা কি? একটি শিশির দাম তিন তিনটি টাকা! কখনো শুনেছিস? তোর মেসোতো বললেন, আজ এই এসেন্স মেখে থিয়েটারে যাচ্ছি, যত লোকের যত এসেন্স সব চাপা না পড়ে তো কি!

ফটিক ॥ থিয়েটারে যাচ্ছো! থিয়েটারে যাচ্ছো? আজ তোমরা থিয়েটারে যাচ্ছো?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ। চন্দ্রগুপ্ত দেখতে যাচ্ছি।

ফটিক ॥ নাট্যনিকেতনে? দুর্গাদাস চন্দ্রগুপ্ত, অহীন চৌধুরী সেলুকাস আর শিশির ভাদুড়ী চানক্য। সেই থিয়েটার দেখতে যাচ্ছ?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ। তোর দেখছি সব নাম মুখস্থ! দেখেছিস কোনদিন এঁদের?

ফটিক ॥ না দেখলেও ওঁদের আমি জানি। ওদের যত হ্যাণ্ডবিল, যত প্ল্যাকার্ড সবই আমার বাবা ছাপেন যে। দেখিনি ওঁদের কোন দিন, তবু হ্যাণ্ডবিল পড়েছি! আজ দু' বছরে ওঁদের যত হ্যাণ্ডবিল বেরিয়েছে আমার কাছে সব আছে, সব আমার মুখস্থ।

কালীতারা ॥ তুই কোন জামাটা পরবি? এ-টা না ও-টা? এটা একটু ছিঁড়েছে, ওটা আবার ময়লা।

ফটিক। মাসি! ওদের আমি দেখিনি সত্যি, কিন্তু দেখলেই আমি চিনবো!

দুর্গা ॥ ওদের দেখা তো কম কথা নয়! এই যে আজ আমরা যাচ্ছি, এরই মধ্যে এক টাকা দু'টাকা তিন টাকার সব টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। দু'টাকার শেষে দু'খানা টিকিট তোমার মেসো দু'টাকা দু'টাকা চার টাকা দিয়ে কিনে এনেছেন, সেও মারমারি করে। এখন যা আছে—চার টাকার খান কয়েক পাচ টাকার আর খানকতোক—তাও না কি থাকবে না।

ফটিক ॥ মা মাসিকে বলি?

কালীতারা ॥ কি আর বলবি? এখনো উনি ফিরলেন না, যাওয়া হবে কি না-হবে বুঝছি না বাবা!

দুর্গা ॥ কোথায় যাবে তোমরা? বায়োস্কোপ-টায়োস্কোপ দেখতে বুঝি? তা বাপু মন্দ নয়, চার আনা পয়সা হলেই যাওয়া যায়। তা তোমার মেসোর গোঁ, বলেন মারিতো গণ্ডার, লুটিতো ভাণ্ডার! ও সব চার আনা ছ'আনার ব্যাপারে আমি নেই। শোন কথা!

ফটিক ॥ তবে শোন মাসি। আমরাও আজ ঐ থিয়েটারেই যাচ্ছি—চন্দ্রগুপ্ত দেখতে।

দুর্গা ॥ কোথায় যাচ্ছ?

ফটিক ॥ নাট্যনিকেতনে। চন্দ্রগুপ্ত দেখতে।

দুর্গা ॥ তোমরা যাচ্ছ?

ফটিক ॥ হঁ্যা!

দুর্গা ॥ নাট্যনিকেতনে? যেখানে আজ ঐ দুর্গাদাস—আরো আরো সব কে-কে মস্ত মস্ত—

ফটিক ॥ হঁ্যা, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী আর শিশিরকুমার ভাদুড়ী, "যাঁরা বাঙলার নব নাট্যযুগের সূচনা করেছেন, যাঁরা—"

কালীতারা ॥ এই খোকার শুরু হ'ল। ও সব রেখে আমায় বল দিকিনি কোন জামাটা পরবি?

দুর্গা ॥ টিকিট বুঝি আগেই কিনে রেখে ছিলে? এক টাকার টিকিট?

ফটিক ॥ না মাসি। ও, টিকিট কিনে আমরা থিয়েটার দেখিনা। ও দেখবে তোমরা।

দুর্গা ॥ তার মানে?

ফটিক ॥ বছরের পর বছর বাবা ঐ থিয়েটারের যত ছাপার কাজ সব ছেপে যাচ্ছেন। ধরতে গেলে ও থিয়েটার আমাদের। তাই ওঁরা আমাদের পাস দেবেন, বুঝলে মাসি?

দুর্গা ॥ তাই না কি। তা হলে এদ্দিন তোমরা চুপচাপ ছিলে কেন বাপু? এমন সুবিধে থাকতে?

কালীতারা ॥ ট্রাম বাসের খরচাটা তো আর ওঁরা দেন না।

দুর্গা ॥ আজ বুঝি দেবেন?

কালীতারা ॥ না। দু'দিনের জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে আজ উনিই দেবেন। আজ একটা কিছু আনন্দ উনি করবেনই। ওই যে—খবর পেয়েছেন পরীক্ষায় খোকা ফাস্ট হয়েছে!

দুর্গা ॥ তা থিয়েটারে যাবে। তার জন্যে বাড়াঘর দেখছি ধুয়ে-পুঁছে ছেঁড়া ঐ জুতো জোড়ার মতই চকচকে করে তুললে। আমি ভাবছিলাম কারো বুঝি বিয়ে।—তা আসি ভাই, তোমরা যাবে পাসে, আর আমাদের হচ্ছে টিকিট তাও দু'টাকার টিকিট, একটু আগে-ভাগেই যেতে হবে। দেখো বাবা ফটিক, ফার্স্ট ক্লাসে বসে লাস্ট ক্লাসের এই মেসো-মাসীকে চিনতে পারবে তো?

ফটিক ॥ ও তোমার এসেন্সের গন্ধে আমি তোমায় ঠিক চিনে নেব মাসী।

দুর্গা ॥ ফাস্টো হওয়া ভালো, তাই বলে ধরাকে সরা-জ্ঞান করা ভালো নয় বাবা। আসি দিদি। [প্রস্থান।]

কালীতারা ॥ মাসীর মনে কেন ব্যথা দিলি খোকা!

ফটিক ॥ আজ দিন পেয়েছি মা, দিয়েছি। ও রকম ব্যথা তোমার মনে

উনি তিনশো পয়ষট্টি দিন দিচ্ছেন। চিরদিন তুমি সয়েই গেছ। আজ আমরা দিন পেয়েছি।

কালীতারা ॥ না বাবা, কারো মনে ব্যথা দিতে আমার বড্ড ভয় হয়! কোন জামাটা তুই পরবি বাবা?

ফটিক ॥ এটা একটু ছেঁড়া হলেও এইটেই বেশ সাফ আছে। এটা আমায় মানায়ও ভালো, তুমিই বলেছ। এইটেই আমি পরব। কিন্তু বাবার জামা ঠিক করে রেখেছ?

কালীতারা ॥ ওঁর একটা জামাও সাদা নেই। কালীর দাগ আছেই। ক্ষার দিয়ে কেচেও হার মেনেছি। তা একটা উড়নি আছে। সেটা গায়ে জড়িয়ে নিলে, এক রকম চলে যাবে এখন। ওঁর জুতো জোড়া চার পয়সা দিয়ে সেলাই করিয়ে নিয়েছি। লেবু দিয়ে নিজেই ঘ'সে—

ফটিক ॥ চমৎকার হয়েছে। বাবা দেখে অবাক হয়ে যাবেন—ভাববেন নতুন জুতো এলো কোত্থেকে!

কালীতারা ॥ দে, তোর স্যাণ্ডেল জোড়া একটু সাফ করে দি।

ফটিক ॥ এই স্যাণ্ডালেই চলবে এখন। আমার ধুতির আড়ালে একে লুকিয়ে রাখতে আমি যা পারি, তুমি অবাক হয়ে যাবে দেখে। লোকে জানবে পায়ে স্যাণ্ডাল রয়েছে—কিন্তু দেখতে পাবেনা কেউ। তুমি কোন শাড়ীখানা পরবে মা?

কালীতারা ॥ তাই তো ভাবছি। এই-টে কেমন হবে রে খোকা?

ফটিক ॥ এটা যে আটপৌরে মা! সোনা-মামা তোমায় যে সেই একবার পুজোয় একখানা জংলা শাড়ী দিয়েছিল—সেইটে পরো মা।

কালীতারা ॥ সেটা···সেটা নেই বাবা।

ফটিক ॥ নেই! বল কি মা?

কালীতারা ॥ না, সেটা নেই। আমি এইটেই পরবো। ক্ষার দিয়ে কেচে কেমন ধবধবে করেছি, তোদের ধোপাতেও এমন পারতো না, বুঝলি খোকা। এই যে! এলেন!

[ফটিকের বাবা সাধুচরণের প্রবেশ]

ফটিক ॥ বাবা, সব তৈরি। মা জামাকাপড় সব গুছিয়ে রেখেছে।

সাধুচরণ ॥ তাতো বুঝলাম বাবা, কিন্তু—

কালীতারা ॥ কি? পাস দেয়নি?

সাধুচরণ ॥ তা দিয়েছে। এমন পাস দিয়েছে যা আমরা ভাবতেও পারি না। স্পেশাল কুশন, ছ'টাকা করে এক একটা সিট!

ফটিক ॥ আমি জানি একেবারে ফার্স্ট রো!—হুররা! হুররা!

কালীতারা ॥ [সাধুচরণকে] তবে? তবে আবার 'কিন্তু' কেন? শরীর ভালো আছে তো?

সাধুচরণ ॥ ও পাস আমার মতো লোককে দেওয়া মানে আমাদের যাওয়া হ'ল না।

কালীতারা ॥ কেন, কেন?

ফটিক ॥ কেন বাবা?

সাধুচরণ ॥ ঐ সব সিটে রাজা-মহারাজার মতো লোকেরা বসেন। আমি থিয়েটারের কর্তাকে বললাম, হুজুর এক টাকার সিট দিন। তিনি বললেন, এই ক'খানা সিট ছাড়া আর সিটই নেই সাধুচরণ! আজ দশ বছরের মধ্যে তুমি একদিনও পাস চাওনি, তাই তোমায় দিলাম। সেজেগুজে একটু ফিটফাট হয়ে এসো, তাহলেই হবে'খন। তা আমাদের এই সব সাজ সজ্জা নিয়ে কি করে ওখানে গিয়ে বসব! লোকে হাসবে যে! ·গেট কিপার ঢুকতেই দেবেনা—বলবে, চোর! চুরি করেছে!

ফটিক ॥ কার সাধ্যি তা বলে? থিয়েটারের কর্তা তো রয়েছেন!

সাধুচরণ ॥ সে তো পরের কথা। তিনি এসে না-হয় গোলমাল মেটাবেন, কিন্তু গোলমালটা হলেই যে মাথা কাটা যাবে। সঙ্গে তোমার মা থাকবেন, তাঁর মনের অবস্থাটা কি হবে, সেটা ভেবে দেখ!

কালীতারা ॥ [ফটিককে] আজ আবার তোমার মাসীও যাচ্ছেন। এ রকম একটা গোলমাল হলে তার কাছে তো আর মুখ-দেখানো যাবেনা খোকা!

সাধুচরণ ॥ আসতে আসতে ভাবছিলাম আমাদের জামাকাপড় কিনতে কত লাগে? খুব কম করে টাকা পনেরো'

কালীতারা ॥ না না, সে সব চলবে না। খোকার প্রাইভেট মাস্টার রাখতেই হবে। বেশ তো, থিয়েটার না-হয় আমরা নাই দেখব। কি বলিস খোকা?

ফটিক ॥ [নিরুত্তর রইল]

সাধুচরণ ॥ [কালীতারাকে] আচ্ছা, তোমার মেজদার দেওয়া তোমার সেই জংলা শাড়ীখানা? ও' সেইটেতো আমাদের বড়বাবুর মেয়েব বিয়েতে দিতে হ'ল, না?

কালীতারা ॥ [নিরুত্তর রইল]

ফটিক ॥ তার চেয়ে বরং ঠনঠনে কালীবাড়ীতে চল মা। আজ অমাবস্যা আছে। তার আবার শনিবার। আজ ওখানে বিশেষ ঘটা ক'রে আরতি হবে, দেখবে এখন!

কালীতারা ॥ ঠনঠনে কালীবাড়ী!

ফটিক ॥ [হেসে] হ্যাঁ মা, ওখানে বোধ হয় স্পেশাল কুশন নেই আর এ জামা-কাপড়ও চলবে।

কালীতারা ॥ চল বাবা চল—

ফটিক ॥ দাঁড়াও মা, তার আগে মাসীকে এ পাসটা দেখিয়ে আসছি ; গিয়ে বলছি মাসী, ও দু'টাকার টিকিটে থিয়েটারে না গিয়ে তোমরাও আমাদের সঙ্গে এস। চল, গিয়ে মা-কালীকে বলি, থিয়েটারের সব সিটগুলোই এক দামের—এক ক্লাসের করে দাও মা ! যদ্দিন না করছ, তদ্দিন আমরা থিয়েটার দেখছি না, হ্যাঁ।

উত্তরা, আশ্বিন, ১৩৪৬

উল্কাপাত

[কলিকাতায় সুরুচিসম্পন্ন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বাসভবন। হল-ঘর। ইহা উপবেশন কক্ষও বটে, আবার লাইবেরীর সাজসজ্জাও বর্তমান। অন্য পার্শ্বে ডাইনিং টেবিল সমেত খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ফাল্গুন মাসের সন্ধ্যা। এই হল-ঘরে কেহ ছিল না। পর্দা সরাইয়া প্রথমে একজন বৃদ্ধ ও তৎপরে একজন বৃদ্ধা প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদেরহাব-ভাব দেখিয়া মনে হইল, যেন তাহারা বহুদিন পরে কোনও পরিচিত স্থানে আসিয়াছেন।]

বৃদ্ধা ॥ কত বদলেছে !

বৃদ্ধ ॥ এই ছাখো—বসবার ঘরে আবার খাবার টেবিল এনেছে।

বৃদ্ধা ॥ টে[illegible]ল-চেয়ারে বসে খাওয়া খোকার খুব সাধ ছিল। কেবল তোমার ভয়েই সেটা পারতো না।···তা যাক, কিন্তু ঘরটা কেমন সুন্দর সাজিয়েছে ! ওগো দেখছো—তোমার আর আমার ফটো কত সুন্দর বাঁধিয়ে পাশাপাশি রেখেছে !

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ।···কিন্তু লোকজন সব কোথায় গেল ? বিয়ে-বাড়ী বলে মনেই হচ্ছে না।

বৃদ্ধা ॥ ভেতরে বোধহয় যে যার কাজে ব্যস্ত।

বৃদ্ধ ॥ তাই বলে বসবার ঘরটা ভালো করে সাজানোর কথাটা ভুলে যাওয়া তো উচিত হয় না—একটু ফুল-টুল ধূপ ধুনো ! বাড়ীর মালিক বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে আসছে আজ, তা এদের কোনো খেয়াল নেই !

বৃদ্ধা ॥ দেখতে শুনতে তো ঐ এক উমা, আর তো সব ঝি চাকর। তা, উমা একা ক'দিক সামলাবে বল ? তা'ছাড়া সাজিয়ে গুজিয়ে লাভই বা কি ? যার জন্যে সাজানো, সে-ই তো আজ চলে যাবে।

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ, তা-ও তো বটে ! কিন্তু তবু বলবো, এরা তো তা' [illegible]ন না। যে কাজে যেটকু দরকার, তা' কেন হবে না ?

বৃদ্ধা ॥ চুপ ! কে যেন আসছে !

[নেপথ্যে কে বলিয়া উঠিল দিদিমণি, বসবার ঘরটা আমি সাজিয়ে আসছি।]

বৃদ্ধ॥ এই মরেছে! সেই হতচ্ছারা ভোলা—ব্যাটা এখনও বেঁচে আছে।

বৃদ্ধা॥ ও তোমাকে যা' ভয় পেতো!—দেখলেই পালাতো। আজ পাবে না—এই যা রক্ষে।

[দুইটি ফুলের মালা ও ঝাড়ন হস্তে বৃদ্ধ ভৃত্য ভোলার প্রবেশ। ফুলের মালা দুইটি টেবিলের উপর রাখিয়া ঝাড়ন দিয়া ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে গুণ গুণ করিয়া গাইতে লাগিল।]

ভোলা॥
খোকা বাবুর বিয়ে।
টোপর মাথায় দিয়ে।
বউ এনেছে সোনা।
তাই রে নারে না না॥

বৃদ্ধ॥ ব্যাটা আবার গান গাইছে।

বৃদ্ধা॥ ঐ গান গেয়ে খোকাকে ঘুম পাড়াতো—মনে নেই?

[ধূপ-ধুনা হস্তে বিধবা উমার প্রবেশ।]

উমা। কিন্তু ভোলাদা, বর-কনে আসার সময় হল, আমাদের আত্মীয়-স্বজন এখনও তো সব এলোনা!

ভোলা॥ যারা আসবার তারা সব এসে গেছে—গোল বারান্দায় বসে হাওয়া খাচ্ছে। এই গরমে বসবার ঘরে কেউ বসতে চাইছে না অথচ বসবার জন্যে আজ সারাদিন খেটে খুটে এই ঘরটাই সাজিয়েছি, জঞ্জাল সাফ করেছি, ডজন খানেক ইঁদুর মেরেছি।

উমা॥ যত মারছ তত বাড়ছে—ইঁদুরের অত্যাচার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে...দাও দেখি, মালা দুটো বাবা মার ফটোতে পরিয়ে দিই! [মালা দুইটি লইয়া] খোকা আজ বিয়ে ক'রে ঘরে বউ আনছে। আজ যদি মা-বাবা বেঁচে থাকতেন, কতো সুখী হতেন। হ্যাঁ ভোলাদা, আজ এ সব কাজকর্ম যাঁদের করার কথা, তাঁরা চলে গেছেন স্বর্গে। পড়ে রয়েছি তুমি আর আমি। সব সামলাতে পারবো তো?

ভোলা॥ তা স্বর্গে গেলে কি হবে—ওদের আশীর্বাদ রয়েছে তো।

[ভোলা একটি টুল আগাইয়া দিলে তাহাতে উঠিয়া উমা ফটো দুইটিতে মালা পরাইতে লাগিল। ভোলা একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।]

তুমি কিছু ভেবো না দিদিমণি। ও আমরা ঠিক চালিয়ে নেবো।

বৃদ্ধ॥ ফুলের মালা আমাদের গলায় পরাচ্ছে উমা!

বৃদ্ধা॥ বিধবা হয়ে আসা অবধি আমাদের দু-জনের জন্মদিনে আমাদের গলায় মালা-পরানোর এই উৎসব—এ উমাই শুরু করেছে।

বৃদ্ধ॥ জীবনে কোনো সুখই তো তুমি পাওনি মা। বাপের সংসারে এসে যেটুকু শান্তি পেয়েছিলে, আজ তুমি তাও হারাবে। তোমার দিকে আমি তাকাতে পারছিনা মা!

বৃদ্ধা ।। [বৃদ্ধের প্রতি] এ সবই তোমার পাপের ফল।

[ইতিমধ্যে উমা মালা পরানো শেষ করিয়া টুল হইতে নামিল।]

উমা ।। [ফটোর দিকে চাহিয়া যুক্ত করে] শুনেছি, বাড়ীতে যখন বিশেষ কোনে ঘটনা ঘটে, পূর্বপুরুষরা তখন উপস্থিত হন। আজ আমার খোকন ভাইয়ের বিয়ে! নিশ্চয়ই তোমরা এখানে এসেছো। অলক্ষ্যে থাকলেও আশীর্বাদ করো, বৌ নিয়ে আমার খোকন ভাই যেন সুখী হয়—এ সংসারে যেন আবার চাঁদের হাট বসে।

[উমা যুক্ত-করে প্রণাম করিল]

ভোলা। হ্যাঁ, কর্তা-বাবু—হ্যাঁ কর্ত্রী-মা—খোকন যেন আমাদের সুখী হয়।

[ভোলাও যুক্ত করে প্রণাম করিল। উমা ধূপ-ধুনা দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল]

উমা।। হ্যাঁ ভোলাদা, কাল রাতে বিয়ের সময় তুমি তো ছিলে। এ বিয়েতে খোকনকে খুব খুসী দেখলে তো?

ভোলা ।। ডগমগ, ডগমগ—খুসীতে ডগমগ।

উমা।। [ভোলার কাছে গিয়া চুপি চুপি] আমার ভয় কি জান ভোলাদা? খোকন উল্কাকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল। জান তো!

ভোলা ।। সে দোষ ওই উল্কার। এ তো আমি একশো বার বলেছি—ওই উল্কাই খোকনকে তাতিয়েছিল।

উমা।। [ফটোর দিকে তাকাইয়া] কিন্তু সে বিয়ে আমি বন্ধ করেছি! কিছু অন্যায় করেছি বাবা? এই উল্কাকে তুমিই একদিন পথ থেকে কুড়িয়ে বাড়ীতে এনে মানুষ করেছিলে। বলেছিলে—জাত-কুলের ঠিক নেই। কোন এক অনাথা মেয়ে। সেই মেয়ের সঙ্গে আমাদের বিয়ে হ'তে পারে কখনও? তোমরা যদি বেঁচে থাকতে বিয়ে দিতে?—কখনও না।

বৃদ্ধা।। না না, না, কখনও না। তখন জানতাম বলেই ও মেয়েকে আমি বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছিলাম। এ সংসারের কলঙ্ক ওই মেয়ে। সর্বনাশী ওই মেয়ে ও আজ খোকনের সর্বনাশ করবে। ওকে তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে।

বৃদ্ধ। চুপ। ওরা শুনবে।

বৃদ্ধা। কই শুনছে! যদি শুনতে তবে তো বেঁচে যেত, খোকন আমার বেঁচে যেত। ওরা আমাদের দেখছে না, শুনছে না, শুধুই আমি কেঁদে মরছি।

বৃদ্ধ।। থামো, থামো। শোন ওরা কি বলছে।

[ইতিমধ্যে উমার ধূপ-ধুনা দেওয়া হইয়া গিয়াছে।]

উমা।। একথা ঠিক ভোলাদা, উল্কার রূপের তুলনা নেই। বুদ্ধি-শুদ্ধিও খুব। কিন্তু আর তো কোন পরিচয় নেই তার। আর, যে বৌ আমরা ঘরে আনছি, সে নামেও যেমন লক্ষ্মী। নামকরা বড ঘরের মেয়ে; লেখা-পড়ায়,

গান-বাজনায়, বেথুন কলেজে ফার্স্ট। সুন্দরী অবশ্য উষার মত নয়। কিন্তু রূপ ধুয়ে তো আর জল খাবে না। কি বল ভোলাদা ?

ভোলা ॥ তা নয়তো কি দিদিমণি ! কত্তাবাবুর পুণ্যের সংসারে মা-লক্ষ্মী এলেন। এইটেই হ'ল গিয়ে বড কথা।

বৃদ্ধা ॥ পুণ্যের সংসার ! পুণ্যের সংসার ! পুণ্যের সংসারই যদি হত—তাহলে ওই কালনাগিনী এ বাড়ীতে ঠাঁই পেত না।

[উল্কা ও তাহার বান্ধবী রত্নার প্রবেশ। উভয়ের হাতে মালা গাঁথিবার ফুল ও সরঞ্জাম]

উমা। একি উল্কা। বর কনে আসার সময় হয়ে এলো, এখনও তোমাদের মালা গাঁথা হয়নি ?

উল্কা ॥ একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না দিদি। তাই এই ঘরটায় এলাম। ভেবো না দিদি। রত্না আর আমি দুজনে হাতাপাতি করে এখনি মালা গেঁথে ফেলছি।

উমা ॥ তুমি এসো ভোলাদা। গোল-বারান্দায় তুমি চা-জলখাবার দাও। আমি বরণের আয়োজন দেখছি।

[উমা ও ভোলার প্রস্থান। উল্কা ও রত্না মালা গাঁথিতে বসিল।

বৃদ্ধা ॥ কিগো, মুখ ফিরিয়ে কেন ? ভালো করে চেয়ে দেখ—তোমার বিষবৃক্ষে আজ কি ফুলটি ফুটেছে।

বৃদ্ধ ॥ ফুল—ফুলই। ফুলের কী দোষ। দোষ ওরও নয়, ওর মারও নয়—দোষ আমার।

রত্না ॥ [মালা গাঁথিতে গাঁথিতে] ও: ! খুব হাত চালাচ্ছিস তো ! আমি ভেবেছিলাম, গিয়ে দেখব তুই কাঁদতে বসেছিস।

উল্কা ॥ জীবনে কোনোদিন কাঁদিনি। কাঁদবার মেয়ে আমি নই।

রত্না। কিন্তু ভাই, আমি বলছি—আমার বুকের ধন যদি কেউ এমনি করে ছিনিয়ে নিতো আমি সইতে পারতাম না।

উল্কা ॥ লক্ষ্মীদেবীর কথা বলছিস ? না, তাঁর কী দোষ ? তাঁর কোনো দোষ নেই।

রত্না ॥ বুঝিছি—ব্যথাটা কোথায় বুঝিছি। আচ্ছা, তোর কাছেই তো একবার শুনেছিলাম, যে যত বাধাই দিক, রমেনবাবু তোকে বিয়ে করবেনই।

উল্কা ॥ বলেছিলেন। আমি তোকে মিথ্যে বলিনি রত্না।

রত্না ॥ মিথ্যে বলেছেন তবে তিনি। কিম্বা সত্যিই বলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কথা রাখার সাহস হ'ল না। কথাটা হয়ে দাঁড়াল মিথ্যে। এরা পুরুষ নয় ভাই, কাপুরুষ। বরং বলবো তুই বেঁচে গেছিস।

উল্কা ॥ [হঠাৎ আর্তনাদ করিয়া উঠিল] উঃ।

রত্না ॥ কী হ'ল ?

উল্কা ॥ ছুঁচটা আঙুলে ফুটে গেছে!

রত্না ॥ কই—দেখি, দেখি। ইস্!

উল্কা ॥ [রত্নাকে ঠেলিয়া দিয়া] সরে যা। রক্ত দেখলে আমার মাথায় খুন চাপে।

বৃদ্ধ ॥ ইস! রক্ত বেরিয়েছে!

বৃদ্ধা ॥ আমি জানি—আমি জানি—রক্তারক্তি আজ কিছু একটা হবেই!

রত্না ॥ চল্—চল্—একটু আইডিন দিয়ে দিই।

উল্কা ॥ না, না, এ আর কি হয়েছে—বরং ভালোই হলো। ফুলগুলো আমার রক্তে রাঙা হয়ে গেল। রক্ত আমি ভারি ভালোবাসি।

রত্না ॥ তুই বলছিস কী উল্কা! রক্তটাতো এখনও বন্ধ হলো না!

উল্কা ॥ রক্ত কোনদিন খেয়েছিস? এই ছাখ—আমি খাচ্ছি।

[ক্ষত স্থান চুষিতে লাগিল]

রত্না ॥ রাক্ষুসী!

[নেপথ্য হইতে শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিল]

রত্না ॥ শাঁখ বাজছে। বর-কনে তবে এসে গেছে।

উল্কা ॥ তুই যা [রত্নার হস্তস্থিত মালা লক্ষ্য করিয়া] ওটা তো হয়ে গেছে। এটা আমি শেষ করে আসছি।

[রত্নার প্রস্থান উল্কা দৃঢ়স বন্ধ ওষ্ঠে কান পাতিয়া মাঙ্গলিক ধ্বনিসমূহ শুনিতে লাগিল]

বৃদ্ধ ॥ উল্কা. শোন মা—শোন—

বৃদ্ধা ॥ ও [illegible] করবে, খুন—দেখে নিও, ও খুন করবে। তৈরি হচ্ছে।

বৃদ্ধ ॥ শোন মা, খোকনের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়না—হতে পারেনা।

বৃদ্ধা ॥ সে কথা আজ বলে লাভ কি? আজ হয়তো তুমি বুঝছো. পাপ মানুষ করে লুকিয়ে, কিন্তু সে পাপ চাপা থাকে না। একদিন না একদিন তার বিষময় ফল ফলবেই। ওর চোখ-মুখ দেখে বুঝছো না? খোকনকে ও আজ খুন করবে!

বৃদ্ধ ॥ না. না, ঐ দেখ—ওর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। হ্যাঁ, ঐ তো মালা গাঁথা শেষ করলো। হ্যাঁ মা, যে কথা আমি জীবনে কাউকে বলতে পারিনি—বলিনি, আজ তোমাকে আমি বলছি, খোকন আর তুমি—দুজনেই আমার সন্তান।

বৃদ্ধা ॥ আজ আর একথা কাকে বলছো? কে শুনছে? আমি তোমার স্ত্রী—আমার কাছে যে কথা কখনও তুমি বলোনি, সে কথা জগতের কেউ আজ শুনতে পাবেনা।···ঐ ছাখো, ও চলে যাচ্ছে।

বৃদ্ধা ॥ হ্যাঁ সেই হাসি—বাজ পড়বার আগে বিদ্যুৎ যে হাসি হাসে

[মালা লইয়া উল্কা চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে সেখানে রমেন ও লক্ষ্মী বর-কনের সাজে সজ্জিত অবস্থায় বিধবা দিদি উমা কর্তৃক আনীত হইল। উল্কা চমকাইয়া উঠিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল]

উমা ॥ [ফটো দুখানি দেখাইয়া লক্ষ্মীর প্রতি] ঐ আমাদের বাবা, আর ঐ আমাদের মা। আজ এই পরম দিনে ওঁরা কেউ বেঁচে নেই।

রমেন ॥ না দিদি, বেঁচে নেই একথা বলো না। ঠাকুর বলেছেন—মৃত্যু হওয়া মানে এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া। ওঁরা দুজনেই আমাদের জীবনে বেঁচে আছেন।..হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি, স্বর্গ থেকে ওঁরা আমাদের দেখছেন—আশীর্বাদ করছেন [লক্ষ্মীর প্রতি] এসো আমরা প্রণাম করি।

[উভয়ে ফটো প্রণাম করিল]

উমা ॥ এইবার এসো গোল-বারান্দায় এসো। সবাই নতুন বৌয়ের গান শুনবে বলে বসে আছে।

রমেন ॥ আজকে ওকে রেহাই দাও দিদি। বাপের বাড়ী ছেড়ে আসতে কেঁদে কেঁদে গলা ভেঙ্গে গেছে।

লক্ষ্মী ॥ না দিদি। তবে হ্যাঁ, আজ আমাকে রেহাই দিন, বরং আজ আর কেউ গাইবে, আর আমি শুনবো।

রমেন ॥ উল্কা, তুমি যাওনা ভাই। আজকের রাতটা ম্যানেজ কর।

উমা ॥ দুধের স্বাদ তো ঘোলে মিটবেনা ভাই। যেতে হবে তোমাকেই এসো না—ভয় কি? তুমি কথা কইলেই সে ওদের কাছে গান হয়ে দাঁড়াবে! চল—চল—

রমেন ॥ হ্যাঁ, চল। ওদের কাছে তোমাকে নিয়ে এর আগেই আমার যাওয়া উচিত ছিল।

[লক্ষ্মীকে লইয়া উমা ও রমেনের প্রস্থান। উল্কার মনে হইল, তাহাকে এমন অপমান আর কখনও কেহ করে নাই। কিন্তু এ আঘাতে সে ভাঙিয়া পড়িল না। বরং দলিতা ফণিনীর মতো সে তাহাদের গমনপথের দিকে দৃঢ়সংবদ্ধ দৃষ্টে তাকাইয়া কী ভাবিতে লাগিল

বৃদ্ধা ॥ দেখছো, মেয়েটার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু আমি বলবো উমা ঠিকই করেছে। বরং বলবো, আজ এই শুভদিনে ঐ অলুক্ষণে মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

বৃদ্ধা ॥ না, না, বরং শুভদিনেই কাউকে আঘাত দিতে নেই। এ দিনে কারোর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়া ভাল নয়।

[রমেনের পুনঃ প্রবেশ]

রমেন ॥ কী! খুব মেজাজ দেখানো হচ্ছে যে।

উল্কা ॥ মানে?

রমেন ॥ কেন তুমি এলে না আমাদের সঙ্গে? আজকের দিনে গোমড়া মুখে কেন তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে দূরে দূরে?

উল্কা ॥ তবে কি আমাকে নাচতে হ'বে আজ?

রমেন ॥ আলবাৎ হবে।...এ বিয়ে আমি চাইনি। এ বিয়ে যে চেয়েছিল, সে তুমি।

উল্কা ॥ বেশ তো। তাই বলে আমাকে ধেই ধেই করে নাচতে হবে আজ, এমন কোন কথা ছিল কি রমেনদা?

রমেন ॥ নাচতে তুমি পারবেনা—কাঁদতেই তোমাকে হবে, এ আমি জানতাম। দিদি যখন বললে—পথ থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে বিয়ে করা চলে না, আমি তা' মানিনি। বাড়ী থেকে সরিয়ে নিয়ে বিয়ে করতেই চেয়েছিলাম তোমাকে আমি। কিন্তু তুমি তাতে রাজী হওনি।

উল্কা ॥ হ্যাঁ হইনি। তোমার বাবা আমাকে এ সংসারে ঠাঁই দিয়েছিলেন। সে সংসার ভেঙে দেবার মতো নেমকহারামি আমি করতে পারিনা রমেনদা—একথা আমি তোমাকে কতোবার বলবো! জীবনে কি শুধু প্রেমটাই বড় হবে? কৃতজ্ঞতা বলে কি কিছু নেই?

রমেন ॥ কৃতজ্ঞতা—কৃতজ্ঞতা! আমার বাবার সংসার না ভেঙে আমার জীবন চুরমার করে দেওয়া—এই তোমার কৃতজ্ঞতা?

উল্কা ॥ তোমার জীবন আমি চুরমার করিনি রমেনদা। আমি তোমাকে বিয়ে করতে বলেছি।

রমেন ॥ হ্যাঁ, সে বিয়ে আমি করেছি—শুধু দেখতে—শুধু বুঝতে—তুমি কতো বড়ো পাষাণ! যে আঘাত তুমি আমাকে হেনেছো, সেই আঘাত সুদে-আসলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি আজ। মুখ ভার করে বসে থাকলে চলবেনা। আসতে হবে তোমাকে আমার সঙ্গে। নতুন বৌয়ের সঙ্গে আমার প্রেমের খেলা দেখে তোমাকে হাসতে হবে, নাচতে হবে, আসতে হবে তোমাকে আমার সঙ্গে—এসো—

উল্কা ॥ আমি যাবোনা। আমার সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

রমেন ॥ সে আমি জানিনা। তোমাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

উল্কা ॥ বেশ, যাবো। দুজনেই যাবো একসঙ্গে—চিরতরে।

রমেন ॥ চিরতরে! মানে?

উল্কা ॥ কেন? মনে নেই? তোমাতে-আমাতে যখন বিয়ে হ'তে পারেনা জানা গেল, একদিন রাত্রে তুমিই তো বলেছিলে—এসো উল্কা বিষ খাই—চির মিলনের পথে যাই।

রমেন ॥ বলেছিলাম। কিন্তু সেদিন তুমি রাজী হওনি। পরে আমি ভেবে দেখলাম, মরা অতো সোজা নয়।

উল্কা ॥ কিন্তু এখন দেখছি বাঁচাও অতো সোজা নয়।

রমেন ॥ কি বললে! উল্কা, এ তুমি কি বললে?

[লক্ষ্মীকে লইয়া উমার পুনঃ প্রবেশ]

উমা ॥ যা ভেবেছিলাম তাই।

রমেন ॥ হ্যাঁ দিদি, তাই। খুব লোককে মালা গাঁথবার ভার দিয়েছো। আমি এসে তাড়া দিয়ে তবে মালা-গাঁথা শেষ করিয়েছি।

উমা ॥ বেশ করেছো। এখন এই নাও ভাই, তোমার জিনিস তুমি বুঝে নাও। [উল্কার প্রতি] এই কাজের দিনে সবচেয়ে বেশি অকাজ করছো তুমি উল্কা।

উল্কা ॥ অকাজ! কী আর এমন অকাজ করিছি। কিছু না করেও যখন বদনাম কিনছি, একটা কিছু আমাকে করতেই হবে—এমন কিছু করতে হবে—

উমা ॥ আর যা-ই কর, লোক হাসিও না উল্কা।

[উমার প্রস্থান]

লক্ষ্মী ॥ উল্কা—চমৎকার নাম তো!

রমেন। এই—এই ছাখো! উল্কার সঙ্গে তোমার এখনও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। উল্কা—আমার বোন না হলেও—বোনের চেয়েও বেশী। একসঙ্গে খেলাধুলো করে মানুষ হয়েছি।

[লক্ষ্মী উল্কাকে প্রণাম করিতে গেল]

বৃদ্ধ ॥ লক্ষ্মী—মা আমার সত্যি লক্ষ্মী!

বৃদ্ধা ॥ কিন্তু ও মেয়েটি অলক্ষ্মী। ওর কাছে যাওয়া কেন?

উল্কা ॥ [লক্ষ্মীকে] না ভাই, আমাকে তোমায় প্রণাম করতে হবেনা।

[উল্কা হস্তস্থিত মালাটি লক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিল]

বৃদ্ধা ॥ পাপীয়সী, ঐ ফুলের তলে সাপ লুকিয়ে রাখেনি তো?

বৃদ্ধ ॥ পাপী আমি, পাপীয়সী ওর মা—মেয়েটার কি দোষ?

বৃদ্ধা ॥ থামো। দোষ ওর রক্তের।

লক্ষ্মী ॥ [মালাটি দেখিতে দেখিতে] কী সুন্দর।

রমেন ॥ কী সুন্দর তোমায় মানিয়েছে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী ॥ এ হ'ল গিয়ে আমার ধার করা রূপ। [উল্কাকে দেখাইয়া] রূপের মহাজন তোমার সামনে।

রমেন ॥ হলো তো! এতো বড়ো প্রশংসা তুমি আমার কাছেও কোনদিন পাওনি উল্কা। ওগো মহাজন, ইতরজনের জন্যে মিষ্টান্ন বরাদ্দ থাকে। আর কিছু না হোক চট করে দু গ্লাস সরবৎ খাইয়ে দাও দেখি।

উল্কা ॥ বোসো—আনছি। [উল্কার প্রস্থান]

বৃদ্ধা ॥ [আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া] বিষ দেবে! এই সরবতেই ও বিষ দেবে!

রমেন ॥ [লক্ষ্মীকে] ওঃ···তুমি ঘেমে উঠেছো। আমি পাখাটা খুলে দিচ্ছি

[টেবিল পাখাটা খুলিয়া দিতে গেল]

বৃদ্ধা ॥ [চীৎকার করিয়া] খোকন! খোকন খবরদার—ওর সরবৎ তোরা খাবিনা।

বৃদ্ধ ॥ না, না, উনি অতোটা নীচ হতে পারেনা।

বৃদ্ধা ॥ কেন পারেনা? যারা সমাজে এতোটা নীচে নামতে পারে, ও মেয়ে তাদের। ও সব পারে।

রমেন ॥ পাখাটার কী ব্যাপার! লাইট জ্বলছে, অথচ পাখাটা চলছে না!

[লাঠি হস্তে ভোলার প্রবেশ]

রমেন ॥ এই যে ভোলাদা [তাহার হস্তে লাঠি দেখিয়া] লাঠি! ব্যাপার কি বলোতো?

ভোলা ॥ সেঁকো বিষেই যদি ইঁদুর মরতো, তবে বলতাম শালারা ভদ্দর লোক! লাঠিই ওদের একমাত্র ওষুধ। কই? কোথায় ইঁদুর?

[উদ্যত লাঠি লইয়া চারিদিকে ইঁদুর খুঁজিতে লাগিল]

লক্ষ্মী ॥ ইঁদুর! কোথায়?

রমেন ॥ তাই তো—ব্যাপার কি? ব্যাপার কি ভোলাদা?

ভোলা ॥ আজ ক'দিন ইঁদুরের উৎপাত ভীষণ বেড়েছে সত্যি। সব ঘরের যত জঞ্জাল আজ আমি নিজে হাতে সাফ করেছি শুধু এই ভয়ে যে, বৌমা যেন ভয় না পায়। তাও রক্ষে নেই! আজ এই শুভদিনে বৌমার গায়ের ওপর দিয়ে একটা ধেড়ে ইঁদুর লাফিয়ে গেল!

রমেন ॥ বৌয়ের গায়ের ওপর দিয়ে একটা ধেড়ে ইঁদুর লাফিয়ে গেল? কখন ভোলাদা? [লক্ষ্মীকে] কিগো, কখন?

লক্ষ্মী ॥ ব্যাপার কি? ধেড়ে ইঁদুর—লাফিয়ে গেল—আমার গায়ের ওপর দিয়ে? কখন?

ভোলা ॥ বাঃ! যায়নি? তবে যে—উনি আমার বাক্স থেকে ইঁদুর-মারা সেঁকো বিষের পুরিয়া নিয়ে ছুটে এলো—খাবারে মিশিয়ে এ ঘরে ছড়িয়ে দিতে! ইঁদুর মারতে!

রমেন ॥ কই? কখন?

লক্ষ্মী ॥ কোথায় ইঁদুর?

রমেন ॥ না, না, তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে। উনি আনতে গেছে সরবৎ, আমাদের জন্যে।

ভোলা ॥ বিষ হাতে আনতে গেছে সরবৎ? [ভোলা কি যেন ভাবিতে লাগিল]

লক্ষ্মী ॥ কিন্তু এ কী রকম ঠাট্টা? [লক্ষ্মী স্বামীর মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিল]

রমেন ॥ তাই তো! আর সরবৎ আনতেই বা এতো দেরি কেন?

[রমেন পথের দিকে সবিস্ময়ে তাকাইল]

বৃদ্ধা ॥ বুঝেছি—আমি বুঝেছি—ইঁদুরের নাম করে বিষ নিয়ে তা মেশাচ্ছে

ঐ সরবৎএ। (চীৎকার করিয়া) তোরা বুঝিসনি। আমি বুঝেছি। খবরদার। ওর দেওয়া সরবৎ তোরা খাবিনা! খবরদার—খবরদার!

বৃদ্ধ॥ সে কি এতো নিচে নামবে? এতো নিচে?

বৃদ্ধা॥ যারা সমাজের এতোঠা নিচে নামতে পারে, ও মেয়ে তাদের। ও সব পারে—ও সব পারে।

[একটি ট্রেতে দুই গ্লাস সরবৎ লইয়া হাসিমুখে উল্কার প্রবেশ। সকলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করিয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল।]

বৃদ্ধা॥ রাক্ষুসী? সর্বনাশী? তোর মনে এই ছিল—তোর মনে এই ছিল?

[উল্কা ট্রেট লইয়া রমেন ও লক্ষ্মীর সম্মুখ ধরিল]

ভোলা॥ খবরদার খোকন, খবরদার! ও সরবৎ থাক।

বৃদ্ধা॥ [উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া] শোন—শোন মা উল্কা! এদ্দিন কাউকে বলতে পারিনি ..আজ বলছি—তোর আর খোকনের মা আলাদা হলেও বাপ হচ্ছি আমি। বিয়ে তোদের হয়না—বিয়ে তোদের হয়না।

বৃদ্ধা॥ কে শুনছে? সে আজ কে শুনছে?

উল্কা॥ [রমেন ও লক্ষ্মীর প্রতি] কি? নেবে না?

ভোলা॥ ইঁদুর—ইঁদুর! হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ ইঁদুর মারবার নাম করে সেই বিষে সরবৎ করে মানুষ মারতে এসেছিস?

[উল্কা স্তম্ভিত হইল—লক্ষ্মী এবং রমেনও]

উল্কা॥ বিষের সরবৎ দিচ্ছি—আমি?

বৃদ্ধা॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা নয় তো কি? আমাদের চোখে ধূলো দেবে কে? আমরা স্পষ্ট দেখেছি!

বৃদ্ধ॥ না, না, বিষ তুমি দিতে পার না উল্কা। খোকন তোমার ভাই, তোমার দুজনে আমার সন্তান।

উল্কা॥ [সহাস্যে রমেনকে] তোমাকে আমি বিষ দিতে পারি রমেনদা? বেশ, তবে খেও না। [গ্লাসশুদ্ধ ট্রেট টেবিলে রাখিয়া উল্কার প্রস্থান]

রমেন॥ না, না, সে কি কথা! তুমি দেবে বিষ!

[রমেন একটি গ্লাস তুলিয়া লইয়া সরবৎ পান করিতে লাগিল। লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ বৃদ্ধা ভোলা যুগপৎ চীৎকার করিয়া উঠিল]

সবাই॥ —সর্বনাশ!

রমেন॥ [পান শেষ করিয়া] বিষ নয়, অমৃত। [লক্ষ্মীর প্রতি] লক্ষ্মী তুমি হয়তো খেতে ভয় পাচ্ছো। কিন্তু কিছু ভয় নেই। ও মেয়েটাকে আমি জানি। আমার ভয় হচ্ছে ওর জন্যে। আমি ওকে দেখে আসছি।

[রমেনের প্রস্থান]

বৃদ্ধ ॥ দেখলে তো, আমরা মিছেই ভয় করছিলাম। বিষ ও দিতে পারে না। নেমকহারামি ও করবে না—ও আমার মেয়ে।

বৃদ্ধা ॥ তোমার মেয়ে বলেই ও নেমকহারামি করবে। তুমি আমার সঙ্গে নেমকহারামি করোনি ?

লক্ষ্মী ॥ [প্রস্থানোদ্যত ভোলাকে] দাঁড়াও। আমিও যাবো।

ভোলা ॥ না, না, আমি এখনি আসছি।

[ছুটিয়া রমেনের প্রবেশ]

রমেন ॥ ভোলাদা—ডাক্তার—ডাক্তার—শীগ্‌গীর ডাক্তার ডেকে আনো। বিষ খেয়েছে উল্কা ! এসো লক্ষ্মী, আর বোধ হয় ওকে বাঁচাতে পারবো না !

[সকলের ব্যস্তভাবে কক্ষ হইতে প্রস্থান]

বৃদ্ধা ॥ ঠিক হয়েছে—বেশ হয়েছে ! বাপ-মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

বৃদ্ধ ॥ সন্তানের বিবাহ আর সন্তানের মৃত্যু—দিব্য চোখে একযোগে দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছিলাম আমরা। মিথ্যা হলো না। পুত্রের হল বিবাহ—কন্যার হলো মৃত্যু !!

বৃদ্ধা ॥ পাপের হলো প্রায়শ্চিত্ত—আজ তোমার মুক্তি !!

ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৬৬

ক্ষণ-স্বপ্ন

[ধানবাদ। নন্দলাল সেনের গৃহে উপবেশন কক্ষ। নন্দলাল সেন, নন্দা সেন, নন্দা দেবী ও নন্দিতা দেবী—তিনজনেই মোটর-ভ্রমণের উপযোগী পোশাক পরিহিত একটি গোল-টেবিল ঘিরিয়া তিনজনে বসিয়া চা পান করিতেছেন। আয়া সেবা সরকার একটি থার্মোফ্লাস্ক আনিয়া নন্দিতা দেবীর সম্মুখে ধরিল]

সেবা ॥ দিদিমণি ! থার্মোফ্লাস্কে চা দিতে বলছো। সঙ্গে রাখবে, না গাড়ীর কেরিয়ারে দেবো ?

নন্দিতা ॥ তোমার বুদ্ধি হ'বে কবে সেবা ? কেরিয়ার থেকে যখন ওটা বের হবে, তখন কি ওটা আর থার্মোফ্লাস্ক থাকবে ! আর চা-টা চেয়েছি পথের জন্যে ধানবাদ থেকে আসানসোলে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নয়।

[সেবা নীরবে থার্মোফ্লাস্কটি টেবিলে রাখিয়া চলিয়া গেল]

নন্দলাল ॥ ওকে বড়ো বেশী বকো নন্দিতা।

নন্দিতা ॥ শুনলে মা ? বাবার কথা শুনলে মনে হয়, সেবাই ওঁর মেয়ে—আমি নই।

নন্দা ॥ তা' বলবো—সেবার চাল-চলনটা তোমার বাবার প্রশ্রয়ে এই বাড়ীর মেয়ের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে—আয়ার মতো নয়।

নন্দিতা ॥ চেহারাটাও আয়ার মতো নয়। আমি তখনই বলেছিলাম, এতো 'প্রেটি' আয়া আমার দরকার নেই। তা' বাবার দয়াটাই তখন বড়ো হলো,—আমার মতামতটা ভেসে গেল ?

নন্দলাল ॥ খাজাঞ্চীবাবুর শালী—পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে তার ঘাড়ে চাপলো। ছাপোষা লোক—নিজেরই সংসার চলে না। ম্যাট্রিক পাশ—দেখতে সুশ্রী—তোমার আয়া হলেই মানায়—এই বলে আমায় যখন ধরলো, তখন তোমার মানটাই বাড়লো—এইটেই আমি ভেবেছিলাম মা। কিন্তু এখন যখন দেখছি, তুমি খুসী নও, ওকে ছাড়িয়ে দেওয়াই ভালো।

নন্দা ॥ বুঝলি মা নন্দিতা, সেবার বরাত খুললো। ঠিক দেখিস্,—ছিল আয়া, হবে অফিসের ক্লার্ক বা আর কিছু,—তার মানে পেতো আশী—পাবে দেড়শো।

সেবা ॥ আসবো ?

[দেখা গেল, কুণ্ঠিত-চিত্তে সেবা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে]

নন্দিতা ॥ কেন ?

সেবা ॥ দিদিমণি, তুমি বোধহয় 'অ্যাপ্রো'টা নিতে ভুলে গেছো '

নন্দিতা ॥ [তাড়াতাড়ি ভ্যানিটী ব্যাগটি খুলিয়া খুঁজিয়া দেখিয়া] তাইতো। বাঁচালে। 'থ্যাঙ্ক্‌স'।

[সেবার প্রস্থান]

নন্দলাল ॥ [হাতঘড়ি দেখিয়া] না, আর দেরী করা চলে না। এখনি রওনা না হলে আসানসোল পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে। পিক্‌নিকের সান্ধ্য-আসরটাই আমরা 'মিস্' করবো।

নন্দা ॥ কেবলই ভয় হচ্ছে, আমরাও চলো যাবো, আর যদি কলকাতা থেকে নন্দন এসে পড়ে ?

[নন্দলাল পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিলেন ও চোখে চশমা দিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলেন]

নন্দলাল ॥

"শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং জ্যাঠামশায়, আমি আগামীকল্য প্রাতের ট্রেনে রওনা হইয়া বেলা বারোটায় ধানবাদ পৌঁছিব। অপরিচিত জায়গা বলিয়া আমি সকালের ট্রেনে গিয়া দুপুরে পৌঁছানোই স্থির করিয়াছি! শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবক—শ্রীনন্দন দাসগুপ্ত।

বারোটার ট্রেন কখন চলে গেছে। এখন তিনটে বাজে। আজতো এলোই না। কালও যদি আসে—আসবে সেই দুপুরে। আসানসোল ডাকবাংলোয় আজ রাতটা কাটিয়ে কাল দুপুরের অনেক আগেই আমরা এখানে ফিরতে পারবো। ঐ চিঠি পড়ে একথা কি মনে করা যায় যে, আজ আর তার আসবার সম্ভাবনা আছে? তোর কী মনে হয় মা?

নন্দিতা।। ঐ চিঠি পড়ে বাবা?

নন্দলাল।। হ্যাঁ মা, তোর কী মনে হয়?

নন্দিতা।। লোকটি একটি ভূত—সিঙ্গাপুরী ভূত! নইলে এযুগে কেউ কখনো লেখে মা—[বাবার হাত হইতে চিঠিখানি কাড়িয়া লইয়া পড়িতে লাগিল]—প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং। বাব্বাঃ! দাঁত ভেঙে যাবে।

নন্দলাল।। আমাদের আনন্দমোহন আজ তিরিশ বছর সিঙ্গাপুরে ব্যবসা করছে। বছরের পর বছর রোজগার তার এতোই বেড়ে যাচ্ছে যে, দেশে ফেরবার ফুরসত নেই। সিঙ্গাপুরবাসী হলেও সে বাংলার সংস্কৃতি ছাড়েনি। ছেলে বড হতে না হতেই আমাকে চিঠি লিখে পাঠালো। সংস্কৃত আর বাঙলা বই আর ব্যাকরণ পাঠিয়ে দাও। ছেলেকে সংস্কৃত পড়াবো, বাংলা শেখাবো। এ চিঠি সেই শিক্ষার নমুনা। [নন্দিতা হাসিয়া উঠিল।] হাসির কথা নয় মা। আমাদের ছোট বেলাতেও এই রকম চিঠি লেখাই রেওয়াজ ছিল। কোটি প্রণাম না জানালে আমার বাবা চটে যেতেন। কোটিপতি হয়েও বন্ধু আনন্দমোহন তার ছেলেকেও কোটি কোটি প্রণামের মন্ত্রটা শেখাতে ভোলেনি।

[সেবার প্রবেশ]

সেবা।। কর্তাবাবা, আপনার এই শালটা—

নন্দা।। এই গরমে আবার শাল কেন?

নন্দলাল।। নাগো, ও ঠিকই এনেছে। আসানসোলে এই দুটো মাস দিনে যেমন গরম, শেষ রাতটায় আবার তেমনি ঠাণ্ডা—হ্যাঁ, এখানকার চেয়েও। ওটা আমার স্যুটকেসে দিয়ে দাও।

[সেবা চলিয়া যাইতেছিল, নন্দা ডাকিল]

নন্দা।। আর শোনো। আসানসোল থেকে কাল সকালে রওনা হয়ে গোটা দশেকের মধ্যেই আমরা এখানে ফিরবো। বারোটার ট্রেনে কলকাতা থেকে নন্দন আসতে পারে। পথের কথা বলা যায়না—তাও আবার মোটর গাড়ীতে আসবো। এমনও হয়তো হতে পারে,—নন্দন এসে গেল, আমরা তখনও পথে! তাই বলে যেন তার আদর-আপ্যায়ন কি অভ্যর্থনার ক্রটি না হয়। মনে রেখো সে আমাদের হবু জামাই।

সেবা।। জানি কর্তা-মা।

নন্দিতা ॥ [চটিয়া] জানো ! তুমি কি করে জানলে ?

সেবা ॥ আজ দুদিন ধরে আপনাদের মুখে এই কথাই তো কেবল শুনছি ।

নন্দিতা ॥ তুমি ভুলে যাও—তুমি আয়া। আমাদের সব কথা তোমার শোনবার মতোও নয়,—শোনা উচিতও নয় । না বাবা, এসব আমি সইতে পারিনা। আমি দেখছি, আমাদের আশেপাশে ওর যখন দাঁড়িয়ে থাকবার কথা নয়, তখনও কাজের অছিলা করে থাকে ।

নন্দা ॥ কিন্তু দূরে দূরে থাকলে সেও আবার এক বিপদ! ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি—তার ওপর সব কিছু বুঝিয়ে বলা—তাও আবার বলবো এক, বুঝবে এক, করবে আর এক । তার চেয়ে এ বরং ভালো । তবে হ্যাঁ, শুনতে দোষ নেই—কিন্তু শুনেছো বলা দোষ ।

নন্দলাল ॥ [হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া] তা' যা' বলেছো ! এসব শেখো সেবা,—শেখো । হ্যাঁ আর দেখ, এই যে তোমার কর্ত্রী মা বলছিলেন—কাল আমরা রয়েছি পথে, এদিকে এসে গেছে নন্দন বাবাজী । তা' যদি এসেই যান, কী করে চিনবে তুমি ?

সেবা ॥ কেন ? তিনি কি তাঁর নাম বলবেন না ?

নন্দিতা ॥ হ্যাঁ নন্দন দাসগুপ্ত—নামটা মনে রেখো ।

সেবা ॥ নামটা আমার অবশ্যই মনে থাকবে দিদিমণি । কিন্তু ও নামের আর কেউ তো আসতে পারেন ?

[সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল]

নন্দিতা ॥ [রাগিয়া গিয়া] যতো সব আজগুবি কথা । নন্দন নাম যেন ছড়াছড়ি যাচ্ছে ।

সেবা ॥ না তা' যাচ্ছেনা বটে দিদিমণি, কিন্তু চোর-জোচ্চোরের ছড়াছড়ি । ঐ নামটি নিয়ে—

নন্দিতা ॥ [চটিয়া গিয়া] বাবাঃ লুকিয়ে লুকিয়ে সব ডিটেক্‌টিভ্ নভেল পড়ে। তাই এই সব উদ্ভট কথা।

নন্দলাল ॥ কিন্তু মা, কাগজে তো আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, এ সবও হচ্ছে। কিন্তু সেবা, বুদ্ধির বহরটা যদিও তোমার বেশী, চোর-জোচ্চোরের সাহসের বহর অতোটা হবেনা—আমার বাড়ীতে ।

নন্দা ॥ না বাপু, বলা যায় না । আমরা কেউ রইলাম না—

নন্দলাল ॥ আমরা থাকলেই বা কী করতাম ? ও ছেলেকে আমরা কেউ দেখেছি ? কী করে বলবো দেখতে কেমন ? চিনবো কী করে ? বর্মা থেকে এর আগে কখনও কি এদেশে এসেছে ?

নন্দিতা ॥ এতোদিন ধরে এতো করে তোমাদের বলছি, বার্মাতে একটা ফটোর জন্যে লেখো !

নন্দলাল ॥ না, না, না, তাতে আনন্দ ভাবতো, তার ছেলের চেহারা দেখে তবে বুঝি তোর সঙ্গে তার বিয়েতে আমি রাজী হবো। কোটিপতি লোক—হয়তো চটেই যেতো। তাই আমি ফটো চাইনি। কিন্তু খবর নিয়ে তো জেনেছি চেহারায় কার্তিকটি। বুঝলে সেবা, ও তুমি দেখলেই চিনবে। কিন্তু আর এতোটুকু দেরি নয়। ওঠো—ওঠো সব…

[সকলে গট্‌গট্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছু পরে মোটর স্টার্ট দিয়া চলিয়া যাইবার শব্দ শোনা গেল। ক্ষণপরে সেবা ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই কলিং বেল ঘন ঘন বাজাইতে লাগিল। এদিক ওদিক হইতে বাবুর্চি, খানসামা, বয়, দারোয়ান প্রভৃতি ভৃত্যগণ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।]

সেবা ॥ মন দিয়ে সব শোন—আমার ওপর বাড়ীর ভার ছেড়ে দিয়ে ওঁনারা সব আসানসোলে কী এক নেমন্তন্ন রাখতে গেলেন। ফিরবেন কাল দুপুরে। কিন্তু তাঁরা বাড়ী নেই বলেই যে, কাজে তোমরা গাফলতি করবে, তা' চলবেনা।

বাবুর্চি ॥ বাঃ! তা কেন করবো ?

খানসামা ॥ তাঁরা নেই, তুমি আছ সেবাদি। যা হুকুম করবে, তাই করবো।

সেবা ॥ ঠিক আছে রহিম। তোমার শালীর অসুখ—দেখতে যাবে বলে এক রাত্তিরের ছুটি চেয়েছিলে। ছুটি মঞ্জুর হলো। তুমি যেতে পারো। কিন্তু ফিরে আসতে হবে কাল সকাল আটটায়। কাল আমাদের হবু জামাইবাবু আসছেন। ভাল ভাল সব রান্না করতে হবে। তোমার শালীর কাছ থেকে দু' একটা নতুন রান্না শিখে এস বরং। তোমার একঘেয়ে রান্না আর ভাল লাগেনা।

বাবুর্চি ॥ জরুর।

[বাবুর্চির প্রস্থান]

সেবা ॥ বাহাদুর !

বাহাদুর ॥ বলিয়ে দিদি।

সেবা ॥ তোমাকে একটা ভারী জরুরী কাজ দিচ্ছি। বাজারে রাম সীতার মেলা বসেছে। মেলাটা ভাল জমেছে কিনা দেখে এসো। হবুজামাই হয়তো দেখতে যেতে চাইবেন।

বাহাদুর ॥ জরুর, আভী যাতাহুঁ। [যাইতে গিয়া ফিরিয়া] মেলামেঁ রামলীলা ভী হোতী হ্যায়। ক্যায়্‌সী হোতি হ্যায় ইস্‌কী রিপোর্ট দেনে' লিয়ে মুঝে কাল সবেরে ওয়াপস আনা পড়েগা।

সেবা ॥ [গম্ভীর ভাবে] তাই ফিরবে।

[সানন্দচিত্তে বাহাদুরের প্রস্থান]

সেবা ॥ আর ভোলা, তোমাকেও একটা সাংঘাতিক কাজের ভার দিচ্ছি।

হবুজামাই হয়তো এসেই দিদিমণিকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যেতে চাইবেন। কোন হলে কী ছবি হচ্ছে—সব জেনে শুনে এসো। যেটা ভাল, সেটা বরং তুমি নিজে দেখে এসো। আমি জানি, তুমি যেতে চাইবে না। হয়তো বলবে, তোমার মাথা ধরেছে—

ভোলা ॥ না, না, তা' কেন বলবো সেবাদি? মরতে মরতেও হুকুম তামিল আমি করবোই। না, না, সে তুমি কিছু ভেবোনা সেবাদি। আমি এখনই যাচ্ছি এই বিকেলের শো-তে। ফিরে এসে রিপোর্ট দিচ্ছি। ঠিক রিপোর্ট দিয়েছি কি না, রাতের শো-তে গিয়ে তুমি সেটা যাচাই করে নিতে পারো সেবাদি।

সেবা ॥ আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

[খানসামার প্রস্থান]

বালক-ভৃত্য ॥ আমি কি দোষ করলাম সেবাদি? সবাইকে তুমি বাইরে পাঠালে,—একা আমি বুঝি খাঁচার পাখী হয়ে চুপটি করে বসে থাকবো?

সেবা ॥ না, না, সে কি কথা রে নীলমণি! ছুটি আজ আমাদের সবার। আমি যে আমি—আমারও।...গলা ছেড়ে গা' দেখি আমার সঙ্গে·

"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি।
আজ আমাদের ছুটিরে ভাই, আজ আমাদের ছুটি।"

বালক-ভৃত্য ॥ সেবাদি, তুমি এমন চেঁচিয়ে গান গাইছো! সাহেবরা জানলে তোমার আর রক্ষে নেই।

[কোনও ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই সেবা পূর্ববৎ গান গাহিয়া চলিল। গান গাহিতে গাহিতে উচ্ছসিতভাবে লাফাইয়া গিয়া জানালার পর্দাগুলি একে একে খুলিয়া দিল। গানটি প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে বাড়ীতে একটি মোটর গাড়ী প্রবেশ করার শব্দ শোনা গেল। মোটর-হর্ণ বাজিয়া উঠিল। সেবা গান শেষ করিল]

বালক-ভৃত্য ॥ সাহেবরা ফিরে এসেছে সেবাদি—সাহেবরা ফিরে এসেছে। তুমি কি সর্বনাশ করেছো, এখনি বুঝবে। আমি পালাই—

[বালক-ভৃত্যের পলায়ন। বাহির হইতে একজন আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

আগন্তুক ॥ [বাহির হইতে] ইহাই তো শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেন মহাশয়ের গৃহ?

সেবা ॥ ভেতরে আসুন।

[আগন্তুক কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সেবার সহিত নমস্কার বিনিময় করিল। দেখা গেল, আগন্তুক বয়সে তরুণ, সুদর্শন ও অভিজাত পোশাক পরিহিত। রুমাল দিয়া মুখের ধূলা মুছিল]

সেবা ॥ হ্যাঁ, এইটেই শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেনের গৃহ। কেন বলুন তো?

আগন্তুক ॥ দেখুন, কলিকাতা হইতে দ্বিপ্রহরের ট্রেনে আজ আমার এখানে পৌঁছিবার কথা ছিল। কিন্তু বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় ট্রেন ধরিতে না পারায় আমি আমার কাকার মোটর গাড়ী লইয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি।

সেবা ॥ ও! আপনিই তবে—

আগন্তুক ॥ [স্মিতহাস্যে] আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই সিঙ্গাপুরবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন দাসগুপ্ত মহাশয়ের একমাত্র নন্দন শ্রীনন্দন দাসগুপ্ত।

সেবা ॥ [উচ্ছ্বসিত ভাবে] ও—আপনি! আসুন—বসুন। আপনি আজ বারটার ট্রেনে এলেন না দেখে সবাই ভাবলেন,—আপনি কাল বারটার ট্রেনে আসবেন। আপনি চিঠিতে ঐ রকম লিখেছেন। ওঁরা তাই একটু আগে চলে গেলেন আসানসোলে একটা নেমন্তন্ন রাখতে। কাল সকালে ফিরবেন।

নন্দন ॥ ওঁরা—অর্থাৎ! .. শ্রীযুক্ত সেন?

সেবা ॥ শুধু শ্রীযুক্ত সেন নন, শ্রীযুক্তা সেনও বটে।

নন্দন ॥ আর তাঁদের কন্যা? শ্রীমতী নন্দিতা দেবী? তিনিও কি তবে গিয়াছেন?

সেবা ॥ তার আগে আপনি বলুন,—নন্দিতা দেবী যদি গিয়েই থাকেন, তবে আপনি কি করবেন?

নন্দন ॥ আমিও এখনি কলিকাতা রওনা হইব।—আর কি করিব?

সেবা ॥ (হাসিয়া) আর যদি তিনি না গিয়ে থাকেন?

নন্দন ॥ আনন্দে থাকিয়া যাইব। তিনি আছেন? কোথায় তিনি? [সেবাকে হাসিতে দেখিয়া] ও—আপনি! আমাকে ক্ষমা করুন নন্দিতা দেবী।

সেবা ॥ ' (ন।

নন্দন ॥ কী আশ্চর্য দেখুন। আপনি নন্দিতা দেবী—আমার সম্মুখে যখন দণ্ডায়মানা, তখন কিনা আমি ভাবিতে ছিলাম—তিনি কোথায়—যাঁহাকে দেখিবার জন্য সুদূর সিঙ্গাপুর হইতে আমি প্রেরিত হইয়াছি। অদৃষ্টের কী পরিহাস!

সেবা ॥ [হাসিয়া] পরিহাসই বটে! আসুন—ভেতরে আসুন।

[নন্দনকে লইয়া সেবা গৃহাভ্যন্তরে গেল]

কালক্ষেপক অন্ধকারান্তে

[পূর্বোক্ত দৃশ্যে বর্ণিত নন্দলাল সেনের উপবেশন-কক্ষ। পরদিন সকাল। সেবা ফুলদানিতে কতকগুলি ফুল সযত্নে সাজাইতেছে। বালক-ভৃত্য নীলমণি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে]

নীলমণি ॥ এ কী সেবাদি! যে সব ফুল তোলবার হুকুম নেই, সে সব ফুলও তুমি আজ তুলেছো? দিদিমণি ফিরে এসে দেখলে আগুন হয়ে যাবেন না?

সেবা ॥ না। এ ফুলগুলো আজকের জন্যেই দিদিমণি মনে মনে জীইয়ে রেখেছিলেন।

নীলমণি ॥ সে রেখেছিলেন নিজে তুলবেন বলে। তুমি তুললে যে?

সেবা ॥ তুললাম তো—যা হয় হবে। নীলমণি, দরজা-জানালার পর্দাগুলো তুই টেনে দে।

নীলমণি ॥ কেন সেবাদি ? আমার কাছে কিন্তু এই-ই ভাল লাগে,—ঘরে কেমন রোদ এসেছে।

সেবা ॥ আমাদের ভালো লাগলেই তো চলবে না। যেখানকার যা নিয়ম।

[নীলমণি পর্দাগুলি টানিয়া দিতে লাগিল]

নীলমণি ॥ আচ্ছা সেবাদি, হবু-জামাই এখনি এতো ঘুমোচ্ছে,—যখন সত্যি সত্যি জামাই হবে, তখন হয়তো হবে কুম্ভকর্ণ। চায়ের জল চাপিয়ে বসে থাকতে হবে সারাদিন।. সে তোমার কম বিপদ হবেনা।

সেবা ॥ তা যা বলেছিস ! দেখে এলাম, এখনো ওঠেন নি।

নীলমণি ॥ লোকে বলবে কী ! আমরা তো জানি, রাতে চুরি করে বলে দিনে ঘুমোয় চোরেরা।

সেবা ॥ চুপ। এ সব বলতে নেই, নীলমণি। তুই ছুটে গিয়ে দেখে আয়তো, বাবুর্চি, খানসামারা এসে কাজে লেগে গেছে কিনা! কর্তাদের ফেরবার সময় হয়ে এলো।

[নীলমণির প্রস্থান। ফুলগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে সেবা গাহিতে লাগিল]

সেবা ॥ 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়া-মুখ চন্দা'

[তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে নন্দনের প্রবেশ]

নন্দন ॥ নন্দিতা ! দেখ দেখি, আমার নিদ্রা ভঙ্গের কী বিলম্ব হইল।

সেবা ॥ [হাসিয়া] নিদ্রা-ভঙ্গ নয় ঘুম ভাঙতে। বিলম্ব নয়,—বল দেরি। আমরা বলি—দেখ দেখি, ঘুম ভাঙতে কত দেরি হলো। এটা বললে, তোমারও দাঁত ভাঙবে না,—বুঝতেও কারোর কষ্ট হবে না।

নন্দন ॥ হ্যাঁ, তোমাকে আমার শিক্ষক হইতে হইবে। তবেই না আমি ইহা পারিব নন্দিতা।

সেবা ॥ শিক্ষক নয়—বল মাস্টার।

[সেবা কলিং বেল টিপিলে খানসামা ভোলার প্রবেশ]

চা।

[ভোলার প্রস্থান]

নন্দন ॥ মাস্টার হইবে পুংলিঙ্গ,—তুমি কী হইবে নন্দিতা ?

সেবা ॥ ও—হ্যাঁ। আমি মাস্টারনী।

নন্দন ॥ আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী। আমি পতি—তুমি পত্নী। আমি তোমার প্রিয়তম,—তুমি আমার প্রিয়তমা। আসিবার পূর্বে ব্যাকরণ পাঠ করিয়া আমি শিক্ষা করিয়া—মানে, শিখিয়া আসিয়াছি নন্দিতা। তোমার নিকটও আমি কিছু কম শিক্ষা করিলাম না গত রাত্রিতে। তুমি শুনিলে আশ্চর্যান্বিতা হইবে নন্দিতা, ইতঃপূর্বে আমি কখনও সম্পূর্ণ রাত্রি জাগ্রত থাকি নাই।

সেবা ॥ এসব কথা বলতে নেই,—কাউকে বলোনা যেন !

নন্দন।। না না, আর কাহাকেও বলিব না,—আর কাহাকেও বলিব না। বিগত রজনীর মধুর স্মৃতি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

সেবা।। আমারও।

নন্দন।। বিগত রজনীর শেষ ভাগে তুমি যেন আমাকে কী বলিতে গিয়া থামিয়া গেলে…ক্রন্দন করিতে লাগিলে। তখন হইতে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। তোমার পিতামাতা আসিবার পূর্বেই আমি উহা শ্রবণ করিতে,—মানে শুনিতে চাই! বল,—বল প্রিয়া।

[আবেগে সেবার হাত দুইখানি ধরিল]

সেবা।। না, না, এখন হাত ধরতে নেই। এখনি সব আসবে কিনা!

নন্দন।। [হাত ছাড়িয়া দিয়া] তবে তুমি বল।

[খানসামা ভোলা ট্রেতে করিয়া নন্দনের জন্য চা দিয়া গেল। সেবা উহা পরিবেশন করিতে লাগিল]

নন্দন।। চা পান করিব আমি একাকী? তুমি?

সেবা।। হাঁ, তুমি একাই চা খাবে। আমি খাবোনা।

নন্দন।। কেন?

সেবা।। আমার যা বলা হয়নি—তোমাকে আমি তা এখন বলবো। আর তা' যখন বলবো, তোমার সঙ্গে আমার চা খাওয়া আর চলবে না।

নন্দন।। ইহা উত্তম রমণীগণের চা-পান আমার পিতৃদেব অনুমোদন করেন না,—আমিও না। তুমি কী বলিবে, বল প্রিয়া।

সেবা।। রাতের অন্ধকারে যা' বলা সহজ ছিল, দিনের আলোতে তা বলা সহজ নয়। আমার যা' বলার, তা, এই চিঠিতে আমি লিখেছি। চা খেতে খেতে পড়।

[সেবা নন্দনকে একখানি চিঠি দিল। নন্দন উক্ত চিঠি পড়িতে শুরু করিলে সেবা তাহার অলক্ষ্যে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।]

নন্দন।। [চিঠি পড়িতে পড়িতে] একী! তুমি নন্দিতা নও। তোমার নাম সেবা? তুমি…আয়া? না, না, না, ইহা হইতে পারেনা। নন্দিতা—প্রিয়া—

[সেবাকে ধরিবার উদ্দেশ্যে অন্দরের দিকে ছুটিল এবং ক্ষণপরেই দেখা গেল, সেবা এ ঘরে ছুটিয়া আসিল ও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিল নন্দন। নন্দন সেবাকে ধরিয়া ফেলিল]

এ ছলনা কেন?

[সেবা নীরব রহিল]

নীরব থাকিলে চলিবে না। তোমাকে বলিতেই হইবে।

সেবা।। আমার হাত ছাড়—কেউ হয় তো এসে পড়বে। তুমি বোসো।

[নন্দন বসিল। সেবা তাহার পার্শ্বে আর একখানি সোফায় বসিল।]

নন্দন ॥ বল !

সেবা ॥ এ ষড়যন্ত্র বিধাতার—আমার নয়, আমার নয়। আমার অদৃষ্টে যে সৌভাগ্য তিনি লেখেননি, সেই সৌভাগ্যের সব সুযোগ তিনি ঘটিয়ে দিলেন আমার জীবনে কাল রাত্রে। তুমি এলে—আমাকে তুমি দেখলে—ভুল করে আমাকেই ভাবলে তোমার সেই মানসী ! হই না কেন আমি আয়া—হই না কেন দাসী, তবু আমি মানুষ—রক্ত-মাংসের মানুষ। তাই আমার লোভ হলো। ভাবলাম—এই একটা রাত—সারা জীবনে এই একটা রাতেই আমার কাছে এসেছে আমার রাজপুত্র—আমি 'না' বলতে পারলাম না।

নন্দন ॥ কিন্তু ইহাব পরিণাম কী সেবা ? না, না, তুমি নীরব থাকিলে চলিবে না। ইহার পরিণাম ?

সেবা ॥ পরিণাম একটা শূন্য—তার বেশি কিছু নয় নন্দন।

নন্দন ॥ প্রহেলিকা ছাড। বল।

সেবা ॥ এ বাড়ী—এ ঘর—এ সংসার থেকে আমি এখনি চলে যাচ্ছি। পাঁচ মিনিট পরে আমার ছায়াও তোমার চোখে পডবেনা নন্দন। মনে করো, এ এক ক্ষণ-স্বপ্ন। আমি চলে গেলে আব তা তোমার মনেও পড়বেনা নন্দন।

[যাইবার জন্য উঠিল]

নন্দন ॥ দাঁড়াও নারী। প্রথম প্রেমেব ক্ষত চিহ্ন সাবা জীবনেও যে আমার দূর হইবে না নারী ! পলায়ন করিয়া তুমি বাঁচিতে পার, কিন্তু আমি ?

সেবা ॥ বেশ, আমি যাব না। আমি থাকবো। আমার দুঃসাহসের এই কাহিনী—আমার এই ছলনা—তোমার হাতে অস্ত্র হয়ে শোভা পাক। তার আঘাত সইবার শক্তি—কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, আমি পেয়েছি নন্দন—আমি পেয়েছি।

[বাহিরে একখানি মোটর আসিয়া থামিবার শব্দ শোনা গেল]

ঐ যে ওঁরা এলেন। আমি চললাম আমার দৈনন্দিন কাজে। আপনাকে আর এক পেয়ালা চা দেবো ?

নন্দন ॥ অবশ্য দিবে।

সেবা ॥ আনছি।

[সেবার প্রস্থান। ক্ষণপরেই নন্দলাল, নন্দা ও নন্দিতার প্রবেশ]

নন্দলাল ॥ বাইরে গাড়ী দেখেই আমি বুঝেছি, তুমি নিশ্চয়ই নন্দন ?

নন্দন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। [নন্দলালকে প্রণাম করিয়া উঠিল]

নন্দলাল ॥ ইনি আমার স্ত্রী। [নন্দন নন্দাদেবীকে প্রণাম করিল]
আমার মেয়ে নন্দিতা। [নন্দন ও নন্দিতা নমস্কার বিনিময় করিল]
বোসো। সব কুশল তো ?

[সকলে বসিল]

নন্দন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দলাল ॥ কলকাতা থেকে মোটরে চলে এসেছো ?

নন্দন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দলাল ॥ ভালো—ভালো। এডভেঞ্চার আমিও ভালবাসতাম বয়সকালে। তা কখন এলে ?

নন্দন ॥ আজ্ঞে, গতকাল অপরাহ্নে।

[সকলে চমকিয়া উঠিল]

নন্দা ॥ কাল !

নন্দন ॥ আজ্ঞে—কাল।

নন্দা ॥ বল কী ! কাল বিকেল গেছে—কাল রাত গেছে—আজ সকাল গেছে ! আমরা ছিলাম না.. না জানি তোমার কতো অসুবিধা হয়েছে বাবা ! আয়া—আয়া।

[সেবা চারজনের উপযোগী চা একটি ট্রেতে করিয়া লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল]

নন্দা ॥ সাহেবকে খেতে টেতে দিয়েছো তো ? না, বাবুর্চিখানায় গল্প-গুজবেই মেতে ছিলে ?

নন্দন ॥ না, না, উনি আমার আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি করেন নাই।

নন্দিতা ॥ 'উনি' আবার কে মা ?

নন্দা ॥ মেয়েটি নন্দিতার আয়া।

নন্দন ॥ আমি জানি। কিন্তু আয়া হইলেও আমি উহাকে শ্রদ্ধা করি।

[পিতা, মাতা ও কন্যা—পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি। হঠাৎ পিতা বলিয়া উঠিলেন—]

নন্দলাল। বটেই তো ! বটেই তো ! চা দাও সেবা।

[কাপে চা ঢালিয়া সেবা কাপটি নন্দনকে দিতে গেল। নন্দন উহা দুই হাতে আগ্রহে লইতে গেল। আবেগাতিশয্যে কাপটি তাহার হাত হইতে মেঝেতে সশব্দে পড়িয়া গিয়া ভাঙিয়া গেল]

নন্দিতা ॥ [চীৎকার করিয়া সেবার উদ্দেশ্যে] ইডিয়ট !

নন্দা ॥ আক্কেল দেখেছো !

নন্দন ॥ না, না, উহার কোন দোষ নাই। ভুল আমারই। দোষ যদি কিছু হইয়া থাকে তাহার জন্যও দায়ী আমি।

[সেবা কাপের ভগ্নাংশগুলি কুড়াইতে গেল। নন্দন তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। পিতা, মাতা ও কন্যা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল]

—————

মন্দিরা, আশ্বিন, ১৩৬১

ভূমিকম্প

চ্যাটার্জি ॥ আসুন, এই ঘরে আসুন। এই ঘরেই আপনি মিসেস্ চ্যাটার্জিকে পড়াবেন। বসুন, আপনি বসুন। কী নাম যেন আপনার বললেন ?

ব্যানার্জি ॥ বিষাণ ব্যানার্জি।

চ্যাটার্জি ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিষাণ ব্যানার্জি। আমার ওয়াইফ, মানে মিসেস চ্যাটার্জি বলছিলেন,—এক সময়ে নাকি আপনার সঙ্গেই ওঁর বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল। কী কপাল দেখুন! আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। আমার বাড়িটা খুঁজে বের করতে আশ' করি কষ্ট হয়নি বিষাণবাবু ?

ব্যানার্জি ॥ না। কিছুমাত্র না। আপনার চিঠিতে বাড়ির নম্বর দেওয়া ছিল। আর তা ছাড়া আপনার নাম বলতেই দেখলাম, আপনাকে এ পাড়ার সবাই চেনে।

চ্যাটার্জি ॥ আমাকে চিনুক আর না চিনুক মশায়, বাড়িটা আমার সবাই চেনে। এতো বড বাড়ি আর এতো সুন্দর বাড়ি এ মুলুকে আর নাকি একটিও নেই। এ বাড়ির নামটা জেনেছেন তো ?

ব্যানার্জি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। 'বৈজয়ন্তী'।

চ্যাটার্জি ॥ ওই জয়ন্তীর নাম থেকেই বৈজয়ন্তী নাম দিয়েছি। জয়ন্তী এতে ভারী খুশী। আপনি জানেন তো জয়ন্তীকে ?

ব্যানার্জি ॥ হ্যাঁ, এক সময়ে জানতাম বৈকি, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা।

চ্যাটার্জি ॥ তা দেখবেন, কিছু বদলায়নি। অতো গরীবের মেয়ে এতো বড়লোকের ঘরে পড়েও আজ পর্যন্ত বডমানুষি চাল-চলন ধরতে পারলো না। কিন্তু তা বলে ওব ওপর রাগ করতে পারিনা। আমি বলেছিলাম, বিলেত-ফেরত কোন প্রফেসরকে তোমার মাস্টার রেখে দিই জয়ন্তী। রাজী হল না। কোথেকে মশায় আপনার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বের করে আপনাকে ধরে নিয়ে এলো। তা' আপনি পারবেন ওকে পডাতে ? আপনার বিদ্যার দৌড় তো দেখলাম বি. এ., বি. টি.। এতোকাল পাড়াগাঁয়ের স্কুলে মাস্টারি করেছেন। শহরের এই সব আদব-কায়দা,—মানে এইসব জিনিষগুলোই ও একেবারে জানেনা —মানে ইংরিজিটাই আপনি একটু বেশি জোর দেবেন—বুঝেছেন স্যার ?

ব্যানার্জি ॥ দেখা যাক।

চ্যাটার্জি ॥ আপনার শোবার ঘর-টর—ওসব জয়ন্তীই দেখিয়ে দেবে। মাইনে তিনশো টাকা—সে ঠিকই আছে। আগাম কিছু দরকার হলে আমাকে

বলবেন—জয়ন্তীকেও বলতে পারেন। কিন্তু শুধু গাল-গল্প না করে পড়াবেন—বিশেষ করে ওই ইংরিজিটা। আচ্ছা চলি। আমার আবার অফিসের তাড়া আছে। আমি জয়ন্তীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—আরে আরে, মেঘ না চাইতেই জল। এই যে জয়ন্তী এসে গেছে। [জয়ন্তীর প্রবেশ] জয়ন্তী, এই নাও তোমার মাস্টার—বিষাণ ব্যানার্জি। আমার যা বলবার তা ওঁকে সব বলেছি। এইবার তোমার পড়াশোনার ব্যবস্থা করে নাও। অফিস থেকে ফিরতে আমার রাত হবে। আর হ্যাঁ, লাঞ্চও আজ আমি বাইরে খাচ্ছি। চিরিও! [প্রস্থান]

জয়ন্তী ॥ অবাক হয়ে কী দেখছো? বসো বিষাণদা।

বিষাণ ॥ বসছি।

[বিষাণ বসিল। জয়ন্তীও তাহার সামনে একটি সোফায় বসিল]

বিষাণ ॥ আমাকে নিয়ে তোমার আবার এ খেলা কেন বলতে পারো, জয়ন্তী?

জয়ন্তী ॥ এর মধ্যে খেলাটা আবার কি দেখলে বিষাণদা? আমার মাস্টার দরকার, তোমার চাকরি দরকার,—যোগাযোগ হবে না?

বিষাণ ॥ অক্সফোর্ডের একজন এম. এ.ও তো তোমার মাস্টার হতে পারতেন, জয়ন্তী।

জয়ন্তী ॥ কী রকম মাস্টার আমার চাই, সেটা আমারই বোঝবার কথা, বিষাণদা।

বিষাণ ॥ কিন্তু একজন বি. এ., বি. টি.র মাইনে তিনশো টাকা কেন হচ্ছে, সেটা কি আমার বোঝবার কথা নয় জয়ন্তী? এর মানে কী?

জয়ন্তী ॥ মাইনেটা কি কম মনে হচ্ছে বিষাণদা?

বিষাণ ॥ না, বড্ড বেশী মনে হচ্ছে, এবং কেন হচ্ছে সেইটেই আমি বুঝতে চাই।

জয়ন্তী ॥ তোমার মাইনে ওখানে কত ছিল, বিষাণদা?

বিষাণ ॥ সে সামান্যই ছিল।

জয়ন্তী ॥ তাঁরা হয়ত তোমার মূল্য বোঝেননি। কিন্তু তাই বলে আমি এ কথাও বলবো না যে, আমিই তোমার মূল্য বুঝেছি কিংবা মূল্য দিচ্ছি। কিন্তু আর এ কথাই বা কেন বিষাণদা? তুমি এ চাকরি নিয়েছো—চাকরিতে যোগ দিয়েছো। [ইলেকট্রিক বেল টিপিয়া জয়ন্তী বয়-কে ডাকিল] চা খাবে, না কফি?

বিষাণ ॥ এটা আমার চা-কফি খাওয়ার সময় নয়।

[বয়ের প্রবেশ]

জয়ন্তী ॥ বয়, দু' পেয়ালা কফি।

[বয়ের প্রস্থান]

বিষাণ ॥ তোমার স্বামী বলছিলেন, তুমি বদলাওনি। তিনি ঠিকই

বলেছেন। তোমার স্বভাব এতোটুকুও বদলায়নি। বদলেছে তোমার চেহারা। তুমি আরো সুন্দর হয়েছো!

জয়ন্তী ।। আমি যে সুন্দরী, একথা তোমার মুখে আজ এই প্রথম শুনলাম, বিষাণদা। তুমি আমাকে মনে মনে ভালবাসতে—আমি জানতাম। কিন্তু মুখ ফুটে তা তুমি একদিনও আমায় বলোনি।

বিষাণ ।। তোমার স্বামী বলে গেলেন, গাল-গল্প না করে পড়াশুনা করতো। তোমার পড়াশুনার জন্যেই আমি এসেছি। একশো টাকা মাইনে পেতাম। তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে তোমরা আমায় এনেছো। তিনগুণ বেশী খাটতে আমি এসেছি—পড়াতে, তোমার গল্প শুনতে নয়!

[বয় কফির ট্রে আনিয়া দুইজনের সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল]

জয়ন্তী ।। ছাত্রীকে ভালো করে বুঝতে হবে, তবে তো তুমি তাকে পড়াবে।

বিষাণ ।। তোমাকে আমার বুঝতে এতটুকু বাকি নেই, জয়ন্তী!

জয়ন্তী ।। এতদিন পড়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা। আজ আমি কি,—কি তুমি বুঝেছো?

বিষাণ ।। বুঝেছি—আজও আমি বুঝেছি। কিন্তু তোমার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, জয়ন্তী!

জয়ন্তী ।। তুমি আমাকে ছাই বুঝেছো। তুমি না খেলে আমি খেতে পারি? এই তুমি আমাকে বুঝেছো?

বিষাণ ।। খাচ্ছি।

জয়ন্তী ।। [হাসিয়া] হাঁ, তবে খানিকটা বুঝেছো। কিন্তু আর কি বুঝেছো বলো দেখি শুনি।

বিষাণ ।। বুঝেছি, এ বিয়েতে তুমি সুখী হওনি জয়ন্তী।

জয়ন্তী ।। বল—

বিষাণ ।। তোমার মনের এই জ্বালা আর তুমি বইতে পারছো না, তাই তুমি আমাকে টেনে এনেছ এখানে—আমাকে সব বলে হালকা হতে।

জয়ন্তী ।। মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলে যাচ্ছো, বিষাণদা। আচ্ছা, আজ থাক। চল তোমার থাকবার ঘর দেখিয়ে দিই। মেসোমশায় ভালো আছেন? আচ্ছা তুমি বিয়ে করলে না কেন, বিষাণদা?

বিষাণ ।। যার ভাত জোটে না, সে কেন বিয়ে করেনি—এ প্রশ্ন এক শুধু সেই করতে পারে, আজ যার ভাতের অভাব নেই...দুহাতে ভাত ছড়াচ্ছে।

জয়ন্তী ।। ভাত তো আমারও জুটতো না একদিন, বিষাণদা। বাড়িশুদ্ধ লোক পর পর ক'দিন না খেয়ে আছে দেখে একদিন সন্ধ্যারাতে নিজের পাড়া থেকে চলে যাই আর এক পাড়ায়—যে পাড়ায় আমাকে কারুর চেনবার কথা নয়। পথের এক কোণে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়েছিলাম। শুধু দাঁড়িয়েছিলাম

বললে ঠিক বলা হবে না! ভঙ্গীটাই ছিল এমন, যেন আমি বেশ-একটু বিপন্ন এবং আমার কিছু বলবার আছে।—মানে আমার চালচলনটা বেশ একটু সন্দেহজনক···বেশ একটু কৌতূহল-দ্দীপক হয়েই দাঁড়িয়েছিলাম।

বিষাণ।। তোমার রূপ আছে—বুদ্ধি আছে—অভিনয় করতে তুমি জানো। তোমার পক্ষে এসব এতটুকু অসম্ভব নয়।

জয়ন্তী॥ সেদিন আমার মনের যা অবস্থা, ভালো-মন্দ বোঝবার শক্তি আমার ছিল না। দরকার ছিল আমার টাকার। "শুনুন আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে"—আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম, আমাদের ভাত জুটছে না। আশ্চর্য, যাকেই বললাম, কেউ আমাকে বিমুখ করলে না।

বিষাণ॥ এক রাত্রে কতো রোজগার হল?

জয়ন্তী।। চার আনা।

বিষাণ।। কী বলছো তুমি জয়ন্তী! তোমার চেহারার এতো বড় অপমান—এও আমায় শুনতে হল!

জয়ন্তী ।। না, বিষাণদা। অপমান করার সুযোগ দিইনি বলেই চার আনা। বাড়ির ঠিকানা দিলে কিম্বা ট্যাক্সিতে উঠে বসলে খুব কম করে চল্লিশটা টাকা নিয়ে সেই রাতে ঘরে ফিরতে পারতাম—আশা করি এটা তুমি বিশ্বাস করবে, বিষাণদা। একটি লোকই পেয়েছিলাম, যে আমার কথা শুনে কোন প্রশ্ন না করে পকেট থেকে চার আনা পয়সা বার করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল—পিছু ফিরে একটিবার চাইলেনা এবং শুনে আশ্চর্য হবে, র জামা-কাপড় ছিল খুবই ময়লা আর হাতে ছিল বাজারের থলি! মানে, সাহায্য করবার মতো লোক একেবারেই নয়,—সাহায্য পাবার যোগ্যতাই যার বেশি।

বিষাণ।। সাহায্য নিতে এই রকম লোকই তুমি বেছে নিলে জয়ন্তী?

জয়ন্তী। তখন রাত দশটা বাজে। অপমান না করে সাহায্য করতে পারে, দান করতে পারে—কয়েক ঘণ্টা চেষ্টা করেও যখন এমন লোক মিললো না, তখন মনে পড়লো তোমার কথা। খুঁজতে লাগলাম, তোমার সমগোত্র লোক—মানে, গরীব লোক—আর, তখন আর আমার অপেক্ষা করার উপায় ছিল না। ছোট-ভাইবোনগুলো আমায় পথ চেয়ে বসেছিল কি না!

বিষাণ।। তুমি এটা অন্যায় বলছো, জয়ন্তী। অপমান না করে বড়লোকও যে উদার হয়, গরীবের মেয়ের দুঃখে-দুঃখিত হয়,—গরীবের মেয়েকে ভালবাসতে পারে, তাকে রাজরানীর সম্মান দিতে পারে, তার প্রমাণ কি তোমার জীবনে একেবারেই নেই, জয়ন্তী?

জয়ন্তী।। [হাসিয়া] না, নেই।

বিষাণ।। তুমি কি মিস্টার চ্যাটার্জিকে অযথা অপমান করছোনা, জয়ন্তী?

জয়ন্তী ॥ চ্যাটার্জি সাহেবই আমাকে অপমান করেছেন। পেটের জ্বালায় সে অপমান আমি মাথা পেতে নিয়েছি ইচ্ছা করে—খুশী হয়ে—এতোটুকু অনুতাপ না ক'রে।

বিষাণ ॥ অপমানের রকমটা জানতে পারলে তবে বুঝতে পারি, জ্বালাটা তোমার কোথায়।

জয়ন্তী ॥ বাড়ি ফিরতে আমার রাত হয় দেখে পাড়ার লোকেরা আমাকে যে আখ্যা দিতে লাগলো, মা সেটা সইতে পারলেন না। বাবা আমার বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিলেন। তুমি নিশ্চয় বলবেনা বিষাণদা, বাবা খুব অন্যায় করেছিলেন।

বিষাণ ॥ আমিও তো তাই-ই করতাম।

জয়ন্তী ॥ কেন করবে না ? নিশ্চয় করবে। মেয়েদের চরিত্রে কলঙ্ক—কেউ সইতে পারে না। কিন্তু বিষাণদা, তার দুদিন পরে মা যখন গলায় দড়ি আত্মহত্যা করলেন—নিছক খেতে না পেয়ে আর ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে না পেরে, সেটাও তো সইবার নয়।

বিষাণ ॥ ঘটনাটা আমরা যখন শুনলাম, তখন আমরা 'হায় হায়'করেছি।

জয়ন্তী ॥ আমি করিনি। মিস্টার চ্যাটার্জির দামি গাড়িটা বস্তি-উন্নয়নের অজুহাতে আমাদের পাড়ায় প্রায়ই ঘোরাঘুরি করতো। মিস্টার চ্যাটার্জিকে চিনতে আমার বাকি ছিলনা। সমাজ-সেবার নামে আমার সেবা করতে চাইলে আমি বললাম,—আপত্তি নেই, তবে সেটা পাকাপাকিভাবে করতে হবে। কী ভেবে তিনি রাজী হলেন। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

বিষাণ ॥ এ বিয়ের তবে এই ইতিহাস ?

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁ বিষাণদা। বাবা আর ভাইবোনেরা—এমনকি অসহায় পাড়া-প্রতিবেশীরাও দুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। শুধু দুঃখ এই, মা আজ নেই।

বিষাণ। চ্যাটার্জি সাহেব তোমার সম্মানই রেখেছেন। অপমান করেছেন বললে অবিচার করা হবে না কি ?

জয়ন্তী ॥ আমার অপমানটা তুমি বুঝবে না, বিষাণদা। সেটা বুঝেছি আমি। ভালবেসে আমরা কেউ কাউকে বিয়ে করিনি। তাঁর ছিল রূপের মোহ। আমার ছিল টাকার প্রয়োজন। তিনি চেয়েছিলেন এই বুড়ো বয়সে এমন একজন 'মিসেস্'—যাকে সভা-সমিতিতে, পার্টিতে, ক্লাবে সগর্বে পাশে রেখে আর সকলের চোখ ঝলসে দিতে পারেন। ভালবেসে তিনি আমায় বরণ করেননি, টাকা দিয়ে তিনি আমায় কিনেছেন। আমি তার বধূ নই··· . আমি তাঁর বিবাহিতা রক্ষিতা।

বিষাণ ॥ আমি বলবো তিনি তোমাকে যতো না অপমান করেছেন, তার চেয়ে ঢের বেশি অপমান করছো তুমি —তোমাকে। পেটের ক্ষুধা মেটানোই কি জগতে সবচেয়ে বড় কথা ?

বিষাণ ॥ আমি বলবো তিনি তোমাকে যতো অপমান করেছেন, তার চেয়ে ঢের বেশি অপমান করেছো তুমি—তোমাকে। পেটের ক্ষুধা মেটানোই কি জগতে সবচেয়ে বড় কথা ?

জয়ন্তী ॥ নয় ?

বিষাণ ॥ আচ্ছা, মানছি হ্যাঁ। কিন্তু সেজন্যে কি চুরি করতে হবে ? ডাকাতি করতে হবে ? আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হবে ? দেহ বিক্রি করতে হবে ?

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁ, হবে। সব দেশে, সব যুগে তা-ই হয়েছে, তা-ই হয়।

বিষাণ ॥ না, কখনো না। সভ্য-সমাজে তা হয় না।

জয়ন্তী ॥ অস্বীকার করছি না। কিন্তু এখানে যখন তা হচ্ছে, তখন তোমার-আমার সমাজ আজ আর সভ্য-সমাজ নয়। সভ্যতার মুখোস খুলে ফেল, বিষাণদা। যে-সমাজে এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য, অনাহারে এত মৃত্যু,—সেখানে সভ্যতার আইন, আচার-বিধি চলবে না, চলবে না। জঙ্গলের আইনই হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখানকার আইন।

বিষাণ ॥ খুব বড়ো বড়ো কথা তোমার মুখে শুনছি আজ। তোমাকে আমি কী শেখাবো বুঝছি না। আমাকে যে কেন তুমি এখানে নিয়ে এলে, তাও বুঝছিনা।

জয়ন্তী ॥ তোমাকে আমি ভালোবাসি বিষাণদা। পেটের ক্ষুধা মিটেছে, কিন্তু মনের ক্ষুধা মেটেনি। তাই তোমাকে চাই তাই তোমাকে এনেছি। তুমি আমি হাত ধরাধরি করে দেশের কাজ করব, এই ছিল আমাদের স্বপ্ন। এতকাল তা হয় নি। এখন হবে।

বিষাণ ॥ কিন্তু—

জয়ন্তী ॥ এর মধ্যে আর 'কিন্তু' নেই। আমি জানি, তুমিও আমাকে ভালোবাস বিষাণদা।

বিষাণ । কিন্তু—

জয়ন্তী । যতো 'কিন্তুই' বল, যেটা সত্যি, সেটা আর মিথ্যে হবেনা বিষাণদা। ভালোবাসার ব্যাপারটা মেয়েরা যেমন বোঝে, তোমরা তেমন বোঝোনা। কে আমাকে ভালোবাসে—সেটা আমার বুঝতে ভুল হবেনা।

বিষাণ ॥ কিন্তু তোমার এই বিয়ের পর—

জয়ন্তী ॥ এই অসভ্য সমাজে—জঙ্গলের আইনে কোনো দোষ নেই··· কোনো পাপ নেই।

[নেপথ্যে মিস্টার চ্যাটার্জির গলা শোনা গেল 'বয় বয়']

জয়ন্তী ॥ একী ? সাহেব এরই মধ্যে ফিরে এল যে ?

বিষাণ ॥ তখন থেকে আমরা এখানে বসে গল্প করছি দেখলে খুশী হবেন না জয়ন্তী। অন্তত একখানা পড়ার বই-টই—

জয়ন্তী ॥ না, না, কিছু দরকার নেই। এ সমাজে সব চলে।

[দোতলা হইতে একতলার সিঁড়িপথে জন দুই লোক যেন উপর হইতে নিচে ছুটিয়া নামিতেছে এরূপ পদশব্দ শোনা গেল। জয়ন্তী ও বিষাণ চমকিয়া উঠিল]

বিষাণ ॥ ব্যাপার কী ?

জয়ন্তী ॥ তাইতো।

[সেই মুহূর্তেই আলুলায়িত-কুন্তলা, বিপর্যস্তবসনা সুন্দরী যুবতীটি এই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে এই বাড়িরই আয়া। নাম রেবা। তার চেহারায় যৌবনের উগ্রতা এবং উচ্ছলতা আছে।]

রেবা ॥ দেখুন তো, এসব কি ?

[কিন্তু সেখানে অপরিচিত এক ব্যক্তির উপস্থিতি তৎক্ষণাৎ যথাসম্ভব সংযত হইল।]

জয়ন্তী ॥ কে—সাহেব ?

রেবা ॥ হ্যাঁ। অফিসের ড্রয়ারের চাবি ফেলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ওপরে গিয়ে দেখেন, আপনি নেই। তাই আমাকে—

জয়ন্তী ॥ জ্বালাতন করছিলেন। তা চাবিটা কোথায় ?

রেবা ॥ জানিনা, দেখছি। আপনি আসুন।

[রেবা ছুটিয়া চলিয়া গেল]

বিষাণ ॥ একটা যেন ঝড় বয়ে গেল ! ব্যাপার কি ?

জয়ন্তী ॥ এই সমাজের আর একটা কাহিনী। মেয়েটি ছিল অনাথা। সাহেবের সেই সমাজ-সেবার ব্রত। চোখে পড়ে, কিন্তু দেবার মতো পরিচয় নেই ব'লে আয়ার চাকরি দিয়ে সাহেব একেও দয়া করেছেন। কিন্তু দয়াটা মাঝে এমন মারাত্মক হয়ে ওঠে যে, মেয়েটা সইতে পারে না।

বিষাণ ॥ কী ভীষণ।

[মিষ্টার চ্যাটার্জির প্রবেশ]

চ্যাটার্জি ॥ [জয়ন্তীকে] সেই থেকে তুমি এখানে জয়ন্তী ?

জয়ন্তী ॥ কে বললে ?

চ্যাটার্জি ॥ অফিসের ড্রয়ারের চাবিটা ভুলে ফেলে গেছলাম। নিতে এসে তোমার আয়ার কাছে শুনি, সেই থেকে তুমি এখানে। তা বেশ, তা বেশ পড়াশোনার কথাই হচ্ছিল বুঝি ?

জয়ন্তী ॥ তা ছাড়া আর কি ? কিন্তু চাবি পেয়েছো ?

চ্যাটার্জি ॥ তোমার আয়াকে খুঁজে আনতে বলেছি।

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁ। ও তোমার সব জানে—আমার চেয়েও বেশি জানে। প্রাইভেট সেক্রেটারি বলা যায়।

[চাবির একটি চেন হাতে লইয়া রেবার পুনঃ প্রবেশ]

রেবা ॥ [চাবির চেনটি সাহেবকে দিয়া] নিন্। আপনি যেখানে বলেছিলেন সেখানে ছিল না। অনেক খুঁজে তবে বের করেছি।

জয়ন্তী ॥ [চ্যাটার্জির প্রতি সকৌতুকে] বলিনি !

চ্যাটার্জি ॥ [আয়াকে] তোমার কর্ত্রী তোমার প্রশংসা করছিলেন রেবা। বলছিলেন—তুমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি।

রেবা ॥ [জয়ন্তীকে] কেন আপনি এমনভাবে আমাকে লজ্জা দেন !

জয়ন্তী ॥ লজ্জার কথা তো নয়। [হঠাৎ চিৎকার করিয়া] ভূমিকম্প ! ভূমিকম্প !!

[সকলে ভীষণ চমকিয়া উঠিল]

চ্যাটার্জি ॥ ভূমিকম্প ? কই না !

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁ। ওই আবার—সর্বনাশ হলো—সর্বনাশ হলো—হ্যাঁ, ওই ওই—শিগ্‌গির বেরিয়ে পড—শিগ্‌গির বেরিয়ে পড—

[জয়ন্তী নিজেই টিপয়, সোফা, ইত্যাদি ঠেলিয়া ফেলিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল]

চ্যাটার্জি ॥ হ্যাঁ। এসো, এসো—

[তাড়াতাড়ি রেবার হাতটি চাপিয়া ধরিল]

রেবা ॥ না, না ছাড়ুন।

চ্যাটার্জি ॥ না, না, সব বাইরে এসো—বাইরে এসো—

[ভীত ত্রস্ত হইয়া রেবাকে বাহুবন্ধনে লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল]

বিষাণ ॥ কিন্তু কই ?

[জয়ন্তী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

জয়ন্তী। ভূমিকম্প না হাতি ! ভূমিকম্পের ভয় দেখিয়ে তোমায় দেখালাম, আমরা কোথায়। কে-ই বা স্বামী, কে-ই বা স্ত্রী ! এ সমাজে কোনো দোষ নেই—কোনো পাপ নেই।

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬০

উপচার

এক পল্লীগ্রামের প্রান্তে 'তারা' ভৈরবীর 'পঞ্চবটী'—একটি কদম গাছের তলে একখানি মাটির ঘর। তাহার সম্মুখস্থ দূর্বাশ্যাম প্রাঙ্গণে সন্ধ্যা-বেলা-শেফালি-মাধবীর গন্ধ ও শ্যামলশ্রীর আবির্ভাবে আকাশ বাতাস রূপে রসে গন্ধে মাতিয়া উঠিয়াছে।

তারা ভৈরবীর বোধ-করি-বা যিনি ভৈরব, তিনি জাগ্রত কি মৃত সে বিষয়ে প্রথম দর্শনে মতভেদ হইতে পারে। তারা তাহাকে ভৈরব বলিয়াই ডাকে, কিন্তু তাহার নাম অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তারানাথ। তারা হইতে তারানাথ, না তারানাথ হইতে তারা, সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া আমরা এইটুকু ঘোষণা করিতেছি যে, ভৈরবীর নাম তারা, এবং ভৈরবের নাম তারানাথ।

তারানাথের বয়স খুব বেশি হইবে না, কিন্তু তাহাকে দেখিলে মনে হইবে কয়েকখানি হাড় শ্মশান হইতে সংগ্রহ করিয়া ঐ তারা ভৈরবী একটি চামড়া দিয়া জুড়িয়া বাঁধিয়াছে। তাহার কোটরগত চক্ষুর অস্বাভাবিক দীপ্তি স্মরণ করিলে লেখকের লেখনী আর অগ্রসর হইতে সাহস পায় না।

অথচ, এই তারানাথের প্রতি তারার যত স্নেহ, অথবা বন্ধন, প্রেম বা পীরিত অসাধারণ। তারানাথকে তারা ভৈরব বলিয়াই ডাকে, কিন্তু তারাকে তারানাথ শালী ভিন্ন অন্য নামে সম্ভাষণ করিয়াছে শোনা যায় নাই। অবশ্য শালী সম্বোধনটি রাগের কি অনুরাগের সম্বোধন, সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে।

সকলের কথাই বলা হইল, এইবার তারার কথাটি ভালো করিয়া বলি। তারা যুবতী। রং উজ্জ্বল শ্যাম। লোকে বলে দেখিতে বেশ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এই ভৈরব এবং ভৈরবী অতি অল্পদিন হইল এই পল্লীগ্রামে ঐ পরিত্যক্ত পঞ্চবটীতে আশ্রয় লইয়াছে, সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে কোনও রোমাঞ্চকর রোমান্স এখনো তৈরি হয় নাই।

আগামী কল্য মহাসপ্তমী। গ্রামের জমিদার-বাড়ীতে মহাসমারোহে এইবার প্রথম দুর্গোৎসব হইবে। জমিদারের নাম শিবরাম চক্রবর্তী। বয়স ত্রিশ। হঠাৎ দুর্গোৎসবে তাঁহার সুমতি হইল কেন, তাঁহার পারিষদগণকে একথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ইঙ্গিতে জানায় "ঐ তারা ভৈরবী—"...বোধ করি গ্রামে ভৈরব-ভৈরবীর আবির্ভাবই জমিদার মহাশয়কে দুর্গোৎসবের অনুপ্রেরণা দিয়াছে।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যারাত্রি। কুটিরের বারান্দায় ভৈরব তারানাথ একখানা কম্বলে আপাদমস্তক ঢাকিয়া পড়িয়া ছিল। ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া ভৈরবী তারা বাহিরে আসিল, এবং হাতের প্রদীপ বারান্দার একটি কাষ্ঠের দীপাধারে রাখিয়া ধীরে ধীরে তারানাথের পায়ের কাছে আসিয়া নতজানু হইয়া ডাক দিল]

তারা ॥ ভৈরব !

তারানাথ ॥ [এই ডাক শুনিয়া তাহার রোগযন্ত্রণা যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। নানাবিধ যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ নানা তালে এবং নানা ছন্দে কালো কম্বলের তলায় জন্মগ্রহণ করিল।]

তারা ॥ সন্ধ্যা-গড়িয়ে গেছে। ঘরে চল—

তারানাথ ॥ [যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দরাশি বাড়িয়াই চলিল।]

তারা ॥ বাইরে বড় হিম। এখানে পড়ে থাকলে কাশিটা আরো বাড়বে।

তারানাথ ॥ [কাশিটি ঘুমাইয়া ছিল। এইবার তাহার ঘুম ভাঙিল। ঘুম ভাঙিল বলিলে ঠিক বলা হইল না, লাফাইয়া উঠিল, বীরবিক্রমে লাফাইয়া উঠিল] খক্-খক্-খক্।

তারা ॥ ভেতরে চল, আমি গলায় পুরোণ ঘি মালিশ করে দিচ্ছি, কাশি এখনি তরল হয়ে যাবে—

তারানাথ ॥ [কাশিতে কাশিতে তাহারই ফাঁকে] গরু মেরে আর জুতো দানে কাজ নেই। কাশির কথা তোকে বলতে বলেছিল কে রে শালী ? এতক্ষণ তো ওটা ভুলেই ছিলাম। যেই মনে করিয়ে দিলি, ওরে হারামজাদী —খক-খক-খক—[কফ ফেলিবার জন্য কম্বলের তলা হইতে মুখ বাহির করিল।]

তারা ॥ [নতজানু হইয়া বসিয়া ছিল, এইবার ভৈরবের পায়ে প্রণাম করিয়া ভৈরবকে ধরিয়া কহিল] এইবার ওঠ—...চল চল ঘরে চল—

তারানাথ ॥ ওষুধ এনেছিস ?

তারা ॥ ওষুধের কথা তো বলনি !

তারানাথ ॥ [ভেঙাইয়া] ওষুধের কথা তো বলনি ! ওরে শালী ! ওরে হারামজাদী—খক-খক-খক—

তারা ॥ [অবিচলিত ভাবে] তাহলে হয়তো আমি শুনিনি—

তারানাথ ॥ তাতো শুনবিই না ; তা শুনবি কেন রে শালী ? বিষের কথা বললে নাচতে নাচতে গিয়ে বিষ এনে দিতিস ! তা. দেনা, তাই এনে দেনা, আমিও বাঁচি. তুইও বাঁচিস ! আরে শালী হারামজাদী, মতলবখানা তোর কি. তা কি এই তারাপীঠের সিদ্ধ ভৈরব তারানাথ ঠাকুর বোঝে না ?

তারা ॥ কেন অনর্থক গালমন্দ কর। কি চাই. বল না—!

তারানাথ ॥ একটু 'কারণ' যোগাড় করতে বলেছিলাম. যায়নি কানে ?

তারা ॥ শুনেছিলাম, কিন্তু

তারানাথ ॥ কিন্তু সেটা নিজের পেটেই গেছে, এই তো ?

তারা ॥ [ধীরভাবে] আমি জোগাড় করতে পারিনি। হাতে টাকা ছিল না।

তারানাথ ॥ কিন্তু যাকে পটল-চেরা চোখে মজিয়েছ. সেই জমিদারবাবুটি তো ছিলেন—

তারা ॥ কাকে দেখে কে যে মজেছে. সে কথা ঘাটের মড়ার মুখে না হয় নাই শুনলাম।

তারানাথ ॥ তবে রে হারামজাদী, যত বড মুখ নয় তত বড কথা [প্রহার করিতে উদ্যত হইতেই] খক···খক খক [প্রবল কাশি। একটু শান্ত হইতে] খুব বেঁচে গেলি শালী !

তারা ॥ 'কারণে' তোমার আরো অপকার হয় দেখেছি—

তারানাথ ॥ ... শালী, চটাস নি কিন্তু—যদি ভালো চাস···

তারা ॥ আর ভালো আমি চাইনে। তুমি ভালো হলেই রক্ষে—

তারানাথ ॥ তাই বা কই চাস ? তাই যদি চাইতিস, তবে 'কারণ' পেলাম না কেন ?

তারা ॥ জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। কাল তাঁর বাড়ীতে পুজো। আজ সারাদিন তিনি ঘরের বাইরে বের হননি. পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত। একঘর লোকের মাঝে আমি যেতে পারলামনা. দেউড়ি থেকে খবর নিয়ে ফিরে এলাম—

তারানাথ ॥ তবে না পুজো হবে না শুনেছিলাম ?

তারা ॥ গিন্নির খুব ইচ্ছে. পুজো হয়। কর্তা ছিলো দোমনা। সেদিন আমি গিন্নির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম...

তারানাথ ॥ বটে। আজকাল অন্দরেও যাতায়াত হচ্ছে !

তারা ॥ কর্তার ছেলের খুব অসুখ। গিন্নি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন দেখতে। গিন্নি বললেন পুজো হলেই ছেলের ব্যামো ভালো হবে। এমন সময় কর্তাও হঠাৎ এসে পড়লেন—

তারানাথ ॥ সে আমি বুঝি। হঠাৎ নয়, হঠাৎ নয় রে শালী, হঠাৎ নয়—

তারা ॥ সে তুমি যা-ই বোঝ! কর্তা আমার মত জিজ্ঞাসা করলেন। আমিও বললাম "পুজো করুন, খোকা ভালো হয়ে যাবে"—কি ভেবে যে আমি পুজো করতে বললাম, জানিনা, কিন্তু, কেন শুধু এই আশাই মনে মনে জাগছে, শুধু খোকাই ভালো হবেনা, ভালো হবে সবাই···সকলে· ·কেউ বাদ যাবেনা!

তারানাথ ॥ হ্যাঁ, ভালো হবে, অন্ততঃ আমি ভাল হবো। যদি জমিদার মশাই—

[কোটরগত চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।]

এই দুর্গোৎসবে, বেশী নয়, এক কলস 'কারণ' ভক্তিভরে এই পঞ্চবটী পীঠে নিবেদন করেন। শোন শালী, না-না, ওরে ভৈরবী, শোন— তুই গিয়ে বলনা কেন, মাটির দুর্গোপ্রতিমা-পুজোর চাইতে এই পঞ্চবটীর পীঠস্থানে একটা কারণ-মহোৎসব করলেও কিছু কম পুণ্যি হবেনা।

তারা ॥ তোমার কাশি দেখছি বেশ সেরে গেছে!

তারানাথ ॥ এই আবার—খক্-খক্—আবার মনে করিয়ে দিলে—খক্!

[হাঁপাইতে লাগিল।]

তারা ॥ দোহাই তোমার, তুমি ঘরে চল, ঘরে গিয়ে একটু দুধ খেয়ে ঘুমাতে চেষ্টা কর—

তারানাথ ॥ ঘুম? এখনি ঘুম কেনরে শালী? শোন ডাইনি, ঘুমালেও তারাপীঠের সিদ্ধ ভৈরব স-ব দেখতে পায়। আমি ঘুমাব, আর তাল-বেতাল এসে এখানে স্ফূর্তি করবেন, সেটি আমি সইবনা, রক্ত খাব, হাড় খাব, মাংস খাব, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো, বলিস তাদের,— হ্যাঁ।

তারা ॥ কিন্তু তাই বলে দুধ খেতেও দোষ!

তারানাথ ॥ দুধ পেলি কোথা?

তারা ॥ জমিদার-গিন্নি পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাল পুজো, আমায় নেমন্তন্ন করেছেন। যে দাসী এসেছিল, ব্যগ্রতা দেখাল খুব-ই। আমি যাব, যাব না?

তারানাথ ॥ [উঠিয়া দাঁড়াইল] আমায় ছেড়ে।

তারা ॥ আমি তোমার পথ্যি দিয়ে, তবে যাব, দেবীর মহাস্নান শেষ হলেই আবার আসবো তোমায় দেখতে, তারপর বললে আবার যাবো। আমি কায়মনপ্রাণ দিয়ে দেবীর কাছে তোমার আরোগ্য চাইব। তুমি ভালো হবে, নিশ্চয় ভালো হবে, জমিদারের খোকাও ভালো হবে—

তারানাথ ॥ তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি নারে শালী।·· তুই কোনো খানে গেলে আমার মনে হয় আমার দম বুঝি আটকে এল!···আমার ভয় করে, আমার ভালো লাগেনা। ..যে কটা দিন বেঁচে আছি, তোর কোলে—

তারা ॥ দেখছি গরম ঘি আর গলায় না মালিশ করলেও চলবে,···সেরে গেছে—

তারানাথ ॥ কি সেরেছে···খক্-খক্ . কাশি?···খক্-খক্—

তারা ॥ কাশির নাম কিন্তু এবার আমি মুখেও আনি নি !

তারানাথ ॥ ওরে শালী ! ওরে হারামজাদী !···খক্‌-খক্‌-খক্‌ [পুনরায় বসিয়া পড়িল] আকারে বলেছিস—ইঙ্গিতে বলেছিস···চোরা চাউনিতে বলেছিস . খক্‌-খক্‌-খক্‌ ।

[হাঁপাইতে লাগিল]

তারা । আমি পাখা নিয়ে আসি··· [ঘরে গিয়া পাখা আনিল । তারানাথ এবার বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল]

তারানাথ । পাখা করিস পরে । আগে ঐ বাতিটা দাওয়ায় ধর—ঐ যেখানে কাশি ফেলেছি । খক্‌-খক্‌ ।

তারা ॥ কেন ? কেন ?

তারানাথ ॥ ধর শালী, বাতি ধর—

তারা । [কাশি যেখানে পড়িয়াছিল, সেখানে বাতি ধরিল] কি ?

তারানাথ । [ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিয়া]—কি ? চোখের মাথা খেয়েছিস না কি ? [মুখ ভেঙাইয়া] কি ! [হতাশ হইয়া লুটাইয়া পড়িল] নে এইবার তোর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল ।

তারা ॥ রক্ত ! [শিহরিয়া উঠিল]

তারানাথ । কোন শালা বেতালের রক্ত খেয়েছিলাম হজম হ'লো না ।

তারা ॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে] তুমি আজ বিকেলে পান খেয়েছিলে, সেই যে আমি সেজে দিলাম —এ তাই—, ওগো—, এ···তাই—

তারানাথ ॥ ওরে শ্যালী, ঐ পান তোর নতুন ভৈরবকে সেজে দেবার জন্যে বাটা ভরে তুলে রাখ । এমনি পান যেন সে শালাও খায় । নাও, এইবার পাখাখানা আমার হাতে এগিয়ে দাও ঠাকরুণ—[কিন্তু হাত না বাড়াইয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িল]

[তারার চমক ভাঙিল । তৎক্ষণাৎ হাওয়া করিতে লাগিল । কিন্তু তাহার চোখ রহিল সেই রক্ত-কাশির উপর]

তারানাথ ॥ ও—হো—হো ! [যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে লাগিল]

তারা । [উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া চাহিয়া কাহার চরণে যেন তাহার আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল]

তারানাথ । ওঃ আর পারিনা. হাওয়া কর···একটু জোরে হাওয়া কর—

[তারা হাওয়া করিতে করিতে তারানাথ ক্রমে সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িল]

তারা ॥ ভৈরব !

[কোন উত্তর পাইল না । সেখান হইতে উঠিয়া ঘরে গেল । ঘর হইতে একটি বালিশ আনিয়া তারানাথের মাথায় অতি সাবধানে গুঁজিয়া দিল । পরে তাহাকে আবার হাওয়া করিতে লাগিল । দূর হইতে একটি রামপ্রসাদী গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল । কে গাহিতেছিল "এমন দিন কি হবে তারা । (যবে) তারা তারা বলে দুনয়নে পড়বে ধারা ॥"—ইত্যাদি ক্রমে সে তারার পঞ্চবটীতে আসিয়া থামিল । তারা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল]

তারা ॥ নায়েব মশাই ?

আগন্তুক [নায়েব] ॥ তারা নামের গান ধরতেই মনে হল জ্যান্ত তারা ঠাকরুণকে একবার দেখে যাই। ঐ পুণ্যিটুকুর আশাই করি কিনা ঠাকরুণ !··· শুয়ে কে ? ভৈরব ঠাকুর বুঝি ?

তারা ॥ নায়েব মশাই, সর্বনাশ হয়েছে আজ !

নায়েব ॥ তোমার আবার কি হল ঠাকরুণ ?

তারা ॥···আমার নয়.. ঐ ওর।...খোকার অসুখ আজ কেমন নায়েব মশাই ?

নায়েব ॥ আরে কবরেজ তো একরকম জবাবই দিয়েছে। কিন্তু ভৈরব ঠাকুরের ঐ মড়াটির ওপর খাঁড়ার ঘা পড়েছে বুঝি ?...প্রাণবায়ুটুকু প্রবাহিত হচ্ছে তো ? [বলিতে বলিতে ভয়ে দূরে সরিয়া গেল]

তারা ॥ [তারানাথের কপাল স্পর্শ করিয়া] বেঁচে আছে, এখনো আছে। ...কিন্তু আজ রক্ত উঠেছে—

নায়েব ॥ এ্যাঁ—তাহলেই তো যক্ষ্মা ! . শিব···মহাশিবেরও অসাধ্য ব্যারাম ! তা হলে, হয়ে এসেছে। কিন্তু, বুঝলে ঠাকরুণ, তুমি একটু সাবধানেই থেকো, সর্বনাশী রাক্ষুসীর পুজো যখন হল না, তখন কার যে কখন কি হয়, কেউ-ই বলতে পারছে না। বিশেষ, চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা উঠে, পুজো না হলে, শাস্ত্রেই বলেছে, মহামারী !...নরকের কথা আর নাই বা বললাম !

তারা ॥ [কাঁপিয়া উঠিল]...পুজো হবে না, সে কি নায়েব মশাই ?

নায়েব ॥ হ্যাঁ, এই তীরে এসে তরী ডুবল আর কি !···আরে, টাকা থাকলেই কি পুজো হয় ? দেওয়ানকে কলকাতা পাঠালেই কি দুর্গোৎসবের যোগাড় হয় ? বলেছিলাম, কর্তা, আমিই কলকাতা যাই। পুরোনো মনিবের সংসারে দশটি বছর এই পুজোর তদ্বির করেছি আমি। কর্তা তা শুনবেন কেন। বি.এ. ফেল দেওয়ান যে ! বললেন দেওয়ান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক, তিনিই যাবেন।···বুঝলে ভৈরবী ঠাকরুণ, কাল পুজো, আজ প্রায় এই দুপুর রাতে ধরা পড়ল দেবীর মহাস্নানেরই যোগাড় নেই !...এফ্‌-এ পাস দেওয়ান, বুদ্ধিমান বিচক্ষণ দেওয়ান পাঠিয়ে মহাস্নানের যোগাড় হ'ল না। এই গ্রাম ধ'রে সবংশে নির্বংশ হবার যোগাড়।···হরে দুর্গা ! হরে দুর্গা !

তারা ॥ [শঙ্কিত পরাণে] খোকার অসুখ বেড়েছে ?

নায়েব ॥ আরে, অবস্থা যা, চিতায় উঠতে কত দেরি, মাত্র এই এক প্রশ্ন হতে পারে।···অসুখ তো বাড়বেই, সে তো ধর্তব্যই নয়।· ·কাল শুনবে, অবশ্যি আজকের রাতটি যদি কাটে, কাল শুনবে মহামারী শুরু হয়ে গেছে। আরে দুর্লভপুর গ্রামটি ঐ অমনি করে এক রাত্রিতে উচ্ছন্ন যায়নি ? কে না জানে ?

তারা ॥ রক্ত উঠেছে, ওর কাশিতে রক্ত উঠেছে। ·কি হবে নায়েব মশাই ?

নায়েব ॥ রক্তও উঠেছে, কৈলাসধামেরও দরজা খুলে গেছে।…ওতো পুণ্যির কথা ঠাকরুণ!

তারা ॥ আমরা যে পাপী.. মহাপাপী আমরা।…ও ভয়ে ভালো করে ঘুমাতেও পারে না। আমায় ছেড়ে ও একদণ্ডও টিকতে পারেনা! মৃত্যুভয় ওর বড় ভয়। মার কি দয়া হবে না?

নায়েব ॥ তোমাদের এত ভয় কেন ঠাকরুণ? তোমরা যে সেই সর্বনাশীরই চেলা চেলী!…দুজনে দুপাত্র টেনে ব্যোম হয়ে শুয়ে ঘুম দাও না!

তারা ॥ [শঙ্কা-ব্যাকুল চিত্তে] তুমি বুঝছনা, তুমি বুঝছনা নায়েব মশাই! এমনিই আমরা মহাপাপ করেছি, তার ওপর—

নায়েব ॥ দেবতার জানিত লোক তোমরা, দেবীর বাহনই হচ্ছ তোমরা, তোমাদের পাপ? বল কি ঠাকরুণ?

তারা ॥ হ্যাঁ, পাপ.. পাপ করেছিলাম। করেছিলাম বলেই সংসার ছেড়ে দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম।

নায়েব ॥ তারাও বেরিয়েছিল…

তারা ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] কারা?

নায়েব ॥ আমার এক কুটুম্ব। কিন্তু সে আর এক কথা। একটা লজ্জারই কথা। গেরস্থ ঘরের এক কুলকামিনীকে…

তারা ॥ [সঙ্গে সঙ্গে] বিধবা? বালবিধবা?

নায়েব ॥ আ.. না—না—মা। তুমি বের হয়েছে এক অবস্থায়, আর সে মাগী বের হয়েছিল কুলে কালি দিয়ে! ভগবৎ প্রেমের 'ভ'ও ছিলনা তাতে!

তারা ॥ আমাদেরও। আমাদেরও ছিল না, নায়েব মশাই, তাই…তাই বুঝি আমাদের এ দশা!

নায়েব ॥ ভগবৎ প্রেম নেই তোমাদের? সাধেই কি ভৈরব ভৈরবী হয়েছো!

তারা ॥ ভৈরব চিনেছে ভৈরবী, ভৈরবী চিনেছে ভৈরব, ভগবানকে আজ পর্যন্তও চিনে উঠতে পারলাম না নায়েব মশাই! মনেও তো পড়ে না তাঁর কথা। মনে হয়তো পড়তোও না, যদি না ওর এমনি দশা হ'ত!…কিন্তু নায়েব মশাই, এখন দেখছি তাঁকে মনে করেই আরো নতুন করে সর্বনাশ ডেকে আনলাম।

নায়েব ॥ সে কী ভৈরবী ঠাকরুণ!

তারা। আমি যে মা দুর্গার চণ্ডীমণ্ডপে ওর কল্যাণের জন্যে পুজো মানত করেছি, পুজোই যদি না হয়, মানত রক্ষা হবে কিসে, ওর কল্যাণই বা হবে কেন?…[কাঁপিয়া উঠিয়া] পুজো হবে না কেন? কিসের অভাব?

নায়েব ॥ পুরোহিত রায় দিয়েছেন মহাস্নানের কি যেন দুটি উপকরণ

আজ রাত্রে যোগাড় না হলে কাল পুজো হতে পারে না। 'বোধনে'ই দেবীর বিসর্জন হবে।

তারা ॥ সে যে মহাসর্বনাশের কথা হবে নায়েব মশাই!…জমিদারবাবু কি করছেন?

নায়েব ॥ তিনি আর কি করবেন! মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। খোকাবাবুর অসুখ আরো বেড়েছে খবর পেয়ে অন্দরে গেলেন, আমরাও উঠে এলাম।

তারা ॥ পুজো না হলে খোকাবাবুও ভালো হবে না, আর [শিহরিয়া উঠিয়া] ওরও মঙ্গল দেখছি না। রক্ত উঠেছে নায়েব মশাই, রক্ত উঠেছে—

নায়েব ॥ কিন্তু ঘুমাচ্ছেন তো বেশ! শ্বাস প্রশ্বাস বইছে তো?

তারা ॥ কেন আপনি অমঙ্গল ডেকে আনছেন? রাত হয়েছে আপনি এখন যান।

নায়েব ॥ হ্যাঁ, যাব-ই তো, যাচ্ছি [অদূরে অন্ধকারে কোনও অদৃশ্য প্রাণীকে কল্পনা করিয়া] তাই তো! কর্তা যে! আলো কই? ওগো ভৈরবী ঠাকরুণ! তোমার বড় সুপ্রসন্ন কপাল। রাজ্যের রাজা স্বয়ং তোমার কুটীরে শুভ পদার্পণ করেছেন [তারা ভীত চমকিত হইয়া উঠিল] আরে, আলোটা এগিয়ে নিয়ে যাওনা! কর্তা যেমন আপন ভোলা লোক আলো কি চাকর বাকরের কথা খেয়ালই ছিল না বুঝি! [তারা উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু আলো লইয়া অগ্রসর হইল না। নায়েব তখন বাধ্য হইয়া আলো লইয়া অগ্রসর হইতেই জমিদারবাবুর প্রবেশ। আলো রাখিয়া আভূমি নত হইয়া নমস্কার করিয়া] ভৈরব ঠাকুরকে দেখতে এসেছিলাম, ভারী অসুখ ঠাকুরের শিবের অসাধ্য সেই ব্যারাম রাজযক্ষ্মা! ভৈরবী ঠাকরুণ কেঁদেই অস্থির— ঐ দেখুন না চোখ দুটি এখনো ছলছল। আমি বললাম আমাদের খোকাবাবুও সেরে উঠছেন না। পুজো না হলে, [শিহরিয়া উঠিল] ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। জানেন তো সেই দুর্লভপুরের কথা, এক রাত্রিতে গ্রামকে গ্রাম উচ্ছন্ন গেল! পুজো হবে তো— উপকরণ মিলছে না যে।

জমিদার ॥ [নায়েবের প্রতি] এ গ্রামে কো নেই, সে আমি জানি। পাশের গ্রামেও নেই। নিশ্চিন্তপুরে নেই, হরশুরাতে নেই, কোনও গ্রামে নেই। ভাতশালার খোঁজ নিয়েছ?

নায়েব ॥ নেই, নেই, সেখানেও নেই কর্তা! প্রবল-প্রতাপ আপনি সশরীরে বর্তমান থাকতে আপনার এলাকায়, কি আপনার আশেপাশের এলাকায় কোন মাগীর ঘাড়ে কটা মাথা যে বেশ্যাবৃত্তি করবে!

জমিদার ॥ আজ দেখছি আমার এই শাসনই আমার কাল হল!

নায়েব ॥ ঐ তো কথা। লোকে বলে প্রবল-প্রতাপ শিবরাম চক্রবর্ত্তির এক পরগণায় জমিদারী শাসন চলে, দশ পরগণায় সামাজিক শাসন চলে! কোন্ মাগীর ঘাড়ে কটা মাথা—

তারা॥ আপনারা এখানে এ কি শুরু করলেন? এত রাত্রে আমার এখানে...

নায়েব॥ আমি বলি। কোনখানেই একটা বেশ্যা খুঁজে পাচ্ছিনা; কালকের পুজো যে ঐ জন্যেই আটকে পড়েছে ঠাকরুণ! তা ঠাকরুণের চটবারই কথা, ভৈরব ঠাকুরের এই এখন-তখন কিনা!

তারা॥ [জমিদারের চোখে চোখে চাহিয়া] কালকের পুজোয় বেশ্যার কি দরকার জানি না, জানতে চাইও না। সে যাক। কিন্তু আপনারা এখানে এত রাত্রেই বা কেন এসেছেন তাও তো বুঝে উঠতে পারছি না। এটা মাতালের মাতলামিরও জায়গা নয়, বেশ্যা খোঁজবার গোয়াড়ও নয়—

নায়েব॥ আ-হা-হা! চটো কেন! চটো কেন! বলুন না কর্তা—কেন এসেছেন—

জমিদার॥ মদ আমরা কেউ খাইনি ভৈরবী। তবে ছেলের অসুখ, তাতে পুজো আটকে যাচ্ছে, তার ওপর জমিদারের সম্মুখে সব মোসাহেব সবকিছু মিলে আমাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছে, এই যা!

তারা॥ সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু, এখানে আপনাদের, বিশেষ আপনার আসবার কারণ বুঝতে পারছি না—

জমিদার॥ গিন্নি বললেন তুমি নাকি খোকার মাথায় কি জপ পড়েছিলে তাতে খোকা একটু আরাম বোধ করেছিল। তোমাকে তিনি আবার চান, এই রাত্রেই, ঐ দণ্ডে কিন্তু আমি জানি তুমি যাবে না তাই আমি এখানে এলেও সেজন্যে আসিনি

তারা॥ আমি যেতাম, কিন্তু ভৈরবের অবস্থাও খুবই খারাপ। ও ভালো থাকলে ওকে সঙ্গে নিয়ে এই রাত্রেই যেতাম। কিন্তু আমি যাবোই না যদি আপনি ঠিক ধরে নিয়েছিলেন, তবে এলেন কেন?

জমিদার॥ আমি তো এখনি বললাম, তোমাকে নিয়ে যেতে আমি আসিনি। আমি এসেছি তোমার কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে—

নায়েব॥ [জমিদার 'প্রার্থনা' করিতেছেন, মোসাহেবের মনে সেটা বরদাস্ত হইল না] প্রার্থনা! ··বলেন কি হুজুর! আপনি শুধু একটিবার মুখ ফুটে বলুন না। তবেই দেখবেন—

জমিদার॥ [বিরক্ত হইয়া] নায়েব—[আদেশসূচক স্বরে] এখনি এখান থেকে যাও···ঐ পথের পাশে গিয়ে বসে থাকো··যাও· [নায়েব ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, মাথা চুলকাইতে লাগিল]—যাও বলছি [নায়েব ছুটিয়া অদৃশ্য হইলে, তারার প্রতি] ওর ব্যবহারের জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি ভৈরবী!

তারা॥ ··কিন্তু ঐ ক্ষমা চাইবার মতো দুর্ব্যবহার কি শুধু নায়েবের একার? সেও না হয় যাক, কিন্তু আজ আমাদের এই অসময়ে আপনারা আমাকে

জ্বালাতন করতে এসেছেন কেন বলুন দেখি ?…একটা কথা শুনুন…আপনার খোকাই শুধু মরণাপন্ন কাতর নয়, ঐ যে দেখছেন ভৈরব…উনি এখনও বেঁচে রয়েছেন কিনা. সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে।…আপনি যান…গিয়ে, খোকাকে দেখুন, ওঁকেও দেখবার জন্যে আমাকে অবসর দিন—

জমিদার ॥ আজ বুঝি কাশির সঙ্গে খুব রক্ত উঠেছে ?

তারা ॥ [ভয়ে, আতঙ্কে] হ্যাঁ।

জমিদার ॥ শুনলাম যক্ষ্মা।…বাঁচাতে চাও ওকে ভৈরবী ?

তারা ॥ খোকাকে আপনি বাঁচাতে চান কিনা, আপনাকে সে প্রশ্ন করলে দেখছি আপনি কিছুমাত্র আশ্চর্য হবেন না !

জমিদার ॥ কিন্তু আমি আশ্চর্য হলাম, শুধু এই দেখে যে তুমি তবে ঐ ঘাটের মড়াটাকেও ভালোবাস। ভক্তি করলে বিস্মিত হতাম না. কিন্তু ভালোবাসলে বিস্মিত হবার কারণ আছে—

তারা ॥ কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার এই রকম আলাপ,…না, এত কথারই বা দরকার কি ? আপনি আমার পঞ্চবটী ছেড়ে এই মুহূর্তেই চলে যান—যান বলছি—

জমিদার ॥ [অবিচলিত ভাবে, সহজ সরল স্বরে] আমি যাবনা ভৈরবী। না ভৈরবী, আমি যাবনা। তুমি অপমান করে তাড়িয়ে দিলেও আমি যাবনা। আমি নিরুপায় হয়েই তোমার শরণ নিতে এসেছি। জমিদার হলেও আজ আমি দুনিয়ার দীনতম ভিক্ষুক। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি—

[তারা বিস্মিত হইয়া জমিদারের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল ।

জমিদার ॥ হ্যাঁ, ভিক্ষা চাইছি। বিশ্বাস কর ভৈরবী। এর মধ্যে একটুকু ছলনা নেই। আর এ-ও শোন ভৈরবী, আজ যে আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, সে ভিক্ষা চাইছি আমার খোকার কল্যাণের জন্যে, তোমার ভৈরবের কল্যাণের জন্যে,—এদেশের সবার কল্যাণের জন্যে—

তারা ॥ বলুন, শিগ্‌গির বলুন, আপনাকে আমার কি দেবার আছে, কি দিতে হবে—

জমিদার ॥ আজ এই ষষ্ঠীর রাত্রেও কালকের মহাসপ্তমীর পূজোর আমি সম্পূর্ণ আয়োজন করতে পারিনি। দেওয়ানের ভুলেই এই সর্বনাশ হয়েছে—

তারা ॥ সে আমি নায়েবের মুখে শুনেছি। দেবীর মহাস্নানে প্রয়োজন কি দুটি উপকরণ আপনি যোগাড় করতে পারেননি।…সুরা ?

জমিদার ॥ আমার ভাণ্ডারে আর যারই অভাব হোক না কেন, সুরার অভাব কোন কালেই হবেনা, অন্ততঃ যতদিন আমি বেঁচে আছি। হ্যাঁ, এ কথা বলতে আমার লজ্জা নেই। না, সুরা নয়—

তারা ॥ গজদন্ত মৃত্তিকা ?

জমিদার ॥ না,—

তারা ॥ বরাহদন্ত মৃত্তিকা ?

জমিদার ॥ তাও নয় ভৈরবী, তাও নয়—

তারা ॥ সাগর মৃত্তিকা ?

জমিদার ॥ ডায়মণ্ডহারবার থেকে আনিয়েছি।

তারা ॥ তবে ?...গঙ্গামৃত্তিকা তো কলকাতাতেই মিলেছে. মেলেনি ?

জমিদার ॥ মিলেছে। অসাধারণ যা কিছু সব মিলেছে। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে মহাস্নানের এত খবর তুমি রাখ কেমন করে ?

তারা ॥ জন্মেই তো আর কেউ ভৈরবী হয়না! বাপের জমিদারী না থাক সাত পুরুষের দুর্গাপূজাটা ছিল। মনে পড়ে ছেলেবেলায় ঐ আসাধারণ জিনিসগুলি যোগাড়ের জন্যে কি অসাধ্য সাধনই না করেছি!

জমিদার ॥ কিন্তু মহাস্নানের সাধারণ জিনিসগুলির খবর বোধ করি রাখ না!

তারা ॥ তাও রাখি বই কি! পুজোর তদ্বির করতে বাবার ছেলে ছিলনা—ছিল এই মেয়ে।

জমিদার। শ্বশুরবাড়ীতেও বুঝি ও-ভার তোমারই ছিল ভৈরবী ? [ভৈরবীর চোখে চোখে চাহিয়া রহিলেন]

তারা ॥ ও কথায় তো আপনার কোনও কাজ নেই— মুখ নামাইয়া ধীরভাবেই কহিল]

জমিদার ॥ [হতাশ হইয়া পড়িলেন। শেষে নূতন উদ্যমে] আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি ভৈরবী।

তারা ॥ ভিক্ষা চাওয়াটা আপনার সরলতার পরিচয় দিচ্ছেনা। খুলেই বলুন না কি চাই ?

জমিদার ॥ চাই বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা।

তারা ॥ [স্তম্ভিত হইল! পরে আত্মদমন করিয়া ধীরভাবে] আপনি কি মদ খেয়ে মাতলামি করতেই এখানে এসেছেন ?

জমিদার ॥ আমি ভয়ে আতঙ্কে মরিয়া হয়ে এসেছি।

তারা ॥ এসেছেন কোথায়, তা বোধ হয় একেবারে ভুলে যাচ্ছেন না—

জমিদার ॥ মোটেই না—

তারা ॥ তবে ?

জমিদার ॥ মাটি খুঁড়ে নেবার ভার আমার। কোদাল কি খন্তা তোমাকে ধরতে হবে না। তোমাকে শুধু অপবাদ অপমান সইতে হবে। আমি ভিক্ষা চাইছি তোমার সেই কলঙ্ক—

তারা ॥ [ক্ষোভে রোষে কাঁপিতে লাগিল। চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কোন কথা মুখ হইতে বাহির হইল না।]

জমিদার ॥ [ক্ষণকাল পরে] তোমার ভৈরব বেঁচে আছে তো ?

তারা ॥ মরলেও কাউকে মড়া পোড়াতে শ্মশানে যেতে হবেনা। আমি শেষবার জানতে চাই আপনি এখনি এখান থেকে দূর হবেন কি না।

জমিদার ॥ ঐ ঘাটের মড়াকে যখন নিকট করেছ, কি অপরাধে আমাকেই বা দূর করছ ?···পরপুরুষ তো আমরা দুজনেই, নয় কি ?

তারা ॥ [এইবার আর জ্ঞান রহিল না। ভৈরবকে ধাক্কা দিয়া জাগাইতে চেষ্টা করিল]·· ভৈরব ! ভৈরব !

জমিদার ॥ মরার ওপর আর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছ কেন ভৈরবী !·· এখনি জেগে কাশতে শুরু করে আরও খানিকটা রক্ত বমি করবে ! আমি বলি ভালোই যদি ওকে বেসে থাকো, মার পুজো হোক, ওর কল্যাণই হবে তাতে···

তারা ॥ [ভৈরবের ঘুম ভাঙ্গাবে, এমন সময় জমিদারের শেষ কথা কয়টি শুনিয়া তারা তাহাকে জাগাইল না, জমিদারের চোখে চোখে চাহিয়া কহিল]· আপনি ভুল বুঝেছেন, এবং আজ যদি আমার ভৈরব সুস্থ সবল থাকতো, লাঠির গুঁতোতে আপনার ভুল ভেঙে দিত !

জমিদার ॥ এবং তা যখন হল না, হবার নয়,···তখন ভৈরবীর শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠেই না হয় শুনলাম ভুলটা আমার কোন জায়গায় !

তারা ॥ আমার ভৈরব আমাকে বিয়েই করেছেন। উনি ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ। পঞ্চম পক্ষে আমায় বিয়ে করে ষষ্ঠবার যাকে গ্রহণ করলেন তিনি ছিলেন এক বিধবা। ব্যাপারটা যখন আদালতে গড়ালো, তখন জেল এড়াবার মতলবে পঞ্চম পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে সংসার ত্যাগ করলেন। সেই থেকে উনি ভৈরব আর আমি ভৈরবী। এই হল আমার ইতিহাস। বিশ্বাস করতে হয় করুন, কিন্তু তাই বলে পুজোটা বাদ দেবেন না ! ওতে আমারো স্বার্থ রয়েছে ষোল আনা। মুমূর্ষু ছেলে দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে জানিনা, কিন্তু মুমূর্ষু স্বামী দেখে ঐ পুজোর কথাটাই আমাকে উতলা করেছে বড় বেশ। মানত ! মানত ! আমি পুজো মানত করেছি !

জমিদার ॥···পুজো তো আমিও মানত করেছি, কিন্তু তোমার ইতিহাসই আমাকে উতলা করলে সবচেয়ে বেশি। বুঝলাম নায়েব তবে আমাকে ভুল খবরই দিয়েছিল। তবে তারও দোষ নেই, ভৈরব-ভৈরবীদের সম্বন্ধে অমনি একটা কুসন্দেহ বিশ্ব জুড়েই রয়েছে কিনা !···কিন্তু ভৈরবী, বিয়ে না হয় হয়েছিল তবে বিয়ের পরও ভৈরবীদের উদারতা কম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নয়। আমি আজ ..

তারা ॥ তার মানে আপনি চান বেশ্যার দুয়ারের মাটি, এবং তা ··

জমিদার ॥ তোমারই দুয়ার থেকে নিতে চাই।

তারা ॥ [পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল] আবার···

জমিদার ॥ ওটা আমি একেবারেই বাদ দিতে চেয়েছিলাম। পুরোহিতকে বললাম ঐ ঘৃণিত জায়গার ঘৃণিত মাটি দিয়ে দেবীর মহাস্নান হবে, এটা সইতে পারছি না। তিনি হেসে বললেন—ওর চাইতে পুণ্য-পূত মাটি আর নেই।

যারা বেশ্যা-গৃহে যায়, তারা তাদের পুণ্য বেশ্যার দুয়ারে রেখে যায়। ঘরে তো নরক। তাই ঐ পবিত্র 'বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা' চাই। কিন্তু, দেওয়ানজী তা আনেন নি, পাড়াগাঁয়ে বেশ্যা নেই, অন্ততঃ থাকলেও স্বীকার করেনা···অথচ ও না হলে সেবাইতেও বলছেন, পুজো হবে না। আমার এই প্রথম পুজো, বিশেষ ছেলে যখন রোগ-শয্যায়, তখন পুজোর সব অনুষ্ঠানই সঠিক হওয়া চাই। কি না!

তারা ॥ ভুলে যাবেন না আমি ভৈরবী—বেশ্যা নই—

জমিদার ॥ কিন্তু হতে কতক্ষণ ? দোষই বা কি ? ··ভৈরব ঠাকুর ওপারের স্বপ্ন দেখছেন ! তিনি মাথা ঘামাবেন না। আর যদি কিছু শোনেনই, বড় জোর তাঁর কাশিটা বাড়বে। তুমি তখন এই বুঝিয়ে বলো, ঐ কাশিটাই ভালো করবার জন্যে এ সব—

তারা ॥ শয়তান···

জমিদার ॥ সত্যি বলছি, কাশিটা ভালো হয়ে যাবে ·

তারা ॥ ভৈরব ! ভৈরব ! [তারানাথকে ঠেলিতে লাগিল। তারানাথের ঘুম ভাঙিবার উপক্রম হইল। তাহার গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল]

জমিদার ॥ কিছু পুণ্য এর মধ্যেই এখানে ঢেলেছি। ওকে জাগালে ও এখনি রক্ত বমি করবে। আমি বলি তোমার মানত রক্ষা করে ওর শেষ চিকিৎসাটাই না হয় দেখ। জাগিয়ো না, ওকে জাগিয়ো না, ওকে জাগিয়ো না ভৈরবী। আমার সকল পুণ্য এখানে নিঃশেষ হোক . পুজো হোক···

তারানাথ ॥ [চোখ বুজিয়া ঘুমের ঘোরেই] এত গোলমাল কেন ? [হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল] ওরে—ওরে ভৈরবী—ঐ ওরা আমাকে নিতে এসেছে, বাঁচা আমাকে বাঁচা [ভয়ে দস্তুর মতো কাঁপিতে লাগিল]

জমিদার ॥ বাঁচাও···ওকে বাঁচাও···

তারা ॥ [তারানাথের দেহের উপর লুটাইয়া পড়িয়া] ভয় নেই, দুর্গা দুর্গা বল—

তারানাথ ॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে] দু-র্গা ! দু-র্গা ! [ক্রমে শান্ত হইল] আমি একি দেখছিরে ভৈরবী ! মা দুর্গা শাসাচ্ছেন...পুজো মানত করে তুই পুজো দিস্‌নি জিব লকলক করছে রক্ত খাবে . রক্ত রক্ত

জমিদার ॥ পুজো দাও···পুজো দাও···

তারানাথ ॥ ঐ . ঐ···! বেরিয়ে আসছে, আমার গলা দিয়ে শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে আসছে···[যূপকাষ্ঠবদ্ধ বলির মত ভয়ে আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল।]

তারা ॥ [আর সহ্য করিতে পারিল না, জ্ঞানহারা হইল জমিদারের সম্মুখে যাইয়া] নাও . তুমি আমার দুয়ারের সকল মাটি নাও···কর পুজো . পুজো [কাঁদিয়া ফেলিল] নইলে বাঁচে না ও বাঁচে না—

জমিদার ॥ কিন্তু...শাস্ত্রে বলে...

তারা ॥ [হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে] দেহ নাও...সব নাও.. !...নাও মাটি !... তোমার পুণ্যে, আমার পাপে, হোক পুজো...পুজো হোক...

[নায়েবের প্রবেশ]

নায়েব ॥ [দূর হইতেই তারাকে কাঁদিতে দেখিয়া] ইঃ আবার ডাক ছেড়ে কান্না হচ্ছে ! বলি অত গরব কেন ? [ছুটিয়া জমিদারের সম্মুখে আসিয়া] দিন ওকে ছেড়ে। মার পুজোর ব্যবস্থা মা-ই করেন। এই মাত্র জগন্নাথ পাঁড়ে 'বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা' নিয়ে এসেছে। যেমন তেমনটি নয়, কলকাতায় পাঁচটি বৎসর ব্যবসা চালিয়ে একমাস হ'ল ফুলবাড়ী থানায় নাম লিখিয়েছে, শুনলাম খুব পসার—!

———

আত্মশক্তি, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৩

পঞ্চভূত

[অধ্যাপক মানবেন্দ্র ভট্টাচার্যের শয়ন কক্ষ। অধ্যাপক-পত্নী মনীষা মরণাপন্ন কাতর। মনীষা ঘুমাইতেছেন। দ্বারপথে দাঁড়াইয়া অধ্যাপক এবং ডাক্তার। রাত্রি প্রায় দশটা।]

ডাক্তার ॥ দেখুন, এখনো বোধ হয় সময় আছে। আপনি কালই এই বাড়ীটা ছেড়ে অন্য একটা নতুন বাড়ীতে উঠে যান—

অধ্যাপক ॥ আপনাদের ঐ এক কথা। কিন্তু কথাটার মানে আমি একেবারেই বুঝিনা। ভূত বলে কিছু নেই ; ওটা শুধু দুর্বল মনের একটা আতঙ্ক মাত্র—

ডাক্তার ॥ মানলাম। কিন্তু...যখন এই বাড়ীটাতে ঐ আতঙ্ক থেকেই আপনার স্ত্রী মরণাপন্ন কাতর, তখন কি, অন্ততঃ তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্যেও এ বাড়ীটা ছেড়ে—

অধ্যাপক ॥ আপনি রোগের মূল কারণটি ভুলে যাচ্ছেন। আতঙ্কটার প্রকৃত উৎপত্তিস্থল গৃহ নয়, মন। হাঁ ডাক্তারবাবু, এ বিষয়ে আমার গবেষণা নির্ভুল—

ডাক্তার ॥ এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার তর্ক করা শোভা পায়না, যখন আপনি এই প্রেততত্ত্ব নিয়েই থিসিস্ লিখছেন।··শেষ হয়েছে ?

অধ্যাপক ॥ হয়নি। কিন্তু, আজ রাত্রের ভেতরই শেষ করতে হবে। শেষ করতেই হবে। কেন জানেন ?

ডাক্তার ॥ আজ রাত্রেই শেষ করতে হবে কেন ?

অধ্যাপক ॥ থিসিস্ দাখিল করবার শেষ দিন হচ্ছে কাল। আজ সারাটি রাত আমাকে লিখতে হবে—

ডাক্তার ॥ রোগিণীর সেবা এবং থিসিস্ লেখা এক সঙ্গে—কি করে হবে?

অধ্যাপক ॥ সে আমি ভাবিনা ; সেবা করবার লোক আছে।

ডাক্তার ॥ লোক পেয়েছেন? রাত্রে তো এ বাড়ীতে ভয়ে কেউ থাকতে চায়না আমি শুনেছি ; সে কথা কি তবে—

অধ্যাপক ॥ সবাই মিথ্যা আতঙ্কে ভীত নয় ডাক্তারবাবু। যারা সত্যের সন্ধানে বের হয়েছে—

ডাক্তার ॥ এ বাড়ীতে তেমন সৎসাহসী কি একজনের বেশি আছে? অর্থাৎ আপনার দোসর?

অধ্যাপক ॥ না থাকলে আমার থিসিস্ লেখা চলতো কি করে? বিশেষ, রাত্রে ছাড়া এইরকম গভীর গবেষণায় আমার মন বসে না অথচ রাত্রেই ওর অসুখ বাড়ে। তারা রাত্রে এসে মনীষার সেবাশুশ্রূষার ভার নেয়। আমি নিশ্চিন্ত মনে লিখি—

ডাক্তার ॥ তারা কে?

অধ্যাপক ॥ আমার পাঁচজন ছাত্র। হ্যাঁ, আপনি তো তাদের দেখেছেন... ক্ষিতিশ...অপরেশ...

ডাক্তার ॥ দেখেছি, এবং এও দেখেছি মনীষাদেবী বিকারের ঘোরে ওদের ভয়েই বেশি অস্থির হয়ে ওঠেন—

অধ্যাপক ॥ সে আমিও দেখেছি। অথচ সে ভয় নিতান্তই কি নিরর্থক নয় ডাক্তারবাবু? মনীষার এই মানসিক বিকার, এই চিত্তবিভ্রমকেই আমার থিসিসের গোটা একটি অধ্যায়ের বিষয়-বস্তু করেছি। আমার ঐ ছাত্ররা মনীষার চিত্তবিকারের খোরাক যোগায় নিভয়ে। আমি পর্যবেক্ষণ করি... গবেষণা করি...লিখি—

ডাক্তার ॥ আমিও লিখব—

অধ্যাপক ॥ লিখবেন! কি লিখবেন?

ডাক্তার ॥ খুব সম্ভবতঃ একটি থিসিস্ই।

অধ্যাপক ॥ কি বিষয়ে?

ডাক্তার ॥ আপনার সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া আবশ্যক। তবে তাতে হাত দিতে পারবো।

অধ্যাপক ॥ বলুননা—বলুননা—আজই বলুননা।

ডাক্তার ॥ না, আজ নয়। সে কথা যাক। কাল সকালে দুটো ওষুধ পাঠাবো.. একটা মনীষাদেবীর, অপরটা—

অধ্যাপক ॥ অপরটা?

ডাক্তার ॥ আপনার।

অধ্যাপক ।। আমার !

ডাক্তার ।। হাঁ, আপনার। আপনি খাবেন। যদি না খান—

অধ্যাপক ।। আমি ওষুধ খাব ! আমার আবার কি হল ?

ডাক্তার ।। অসুখ হয়েছে।

অধ্যাপক ।। আমি তো কোন অসুখ বুঝছিনা—

ডাক্তার ।। ব্যাধি ঐ।...শুনুন আপনি যদি ওষুধ না খান, মনীষাদেবীকেও আমার ওষুধ দেবেননা।

অধ্যাপক ।। আমার অসুখ—!

ডাক্তার ।। হ্যা !...আর শুনুন। মনীষাদেবী বেশ ঘুমোচ্ছেন। আজ রাত্রে ওঁর সেবা-শুশ্রূষা না হয় নাই হ'ল। ক্ষিতীশবাবুরা এলে আজ রাত্রে তাদের বাড়ী গিয়ে ঘুমাতে বলবেন। আপনি নিশ্চিন্ত মনে থিসিস লিখুন ..নমস্কার।

অধ্যাপক ।। নমস্কার। [ডাক্তারের প্রস্থান] ডাক্তারবাবু বেশ রসিক লোক দেখছি। অথবা, ওঁরও কি মানসিক বিকার ? অসুখ হল মনীষার, আর ওষুধ খাব আমি !

মনীষা ।। কে ও ?

[উচ্চহাস্যে—হাঃ হাঃ হাঃ। মনীষা চমকিয়া উঠিলেন]

অধ্যাপক ।। আমি।

মনীষা ।। ক্ষিতীশবাবু ?

অধ্যাপক ।। না।

মনীষা ।। অপরেশ ?

অধ্যাপক ।। আমি—আমি—

মনীষা ।। তেজেশ ?

অধ্যাপক ।। আঃ—আমি।

মনীষা ।। কে ? মরুত্তমবাবু ?

অধ্যাপক ।। [কাছে আসিয়া] আমাকে চিনতে পারছো না মনীষা ?

মনীষা ।। [আশ্বস্ত হইয়া] আঃ তুমি। আমি ভাবছিলাম বুঝি ব্যোমকেশ বাবু।

অধ্যাপক ।। তারা এখনো আসেনি। এই এল বলে। ওরা না এলে আজ আমার উপায় নেই। মনীষা, কাল বেলা দশটায় আমার থিসিস দাখিল করতে হবে—আর বারো ঘণ্টা সময়ও নেই !

মনীষা ।। আমারো নেই,—নেই। আমারো হয়ে এসেছে। এস না... আমার কাছে একটু বসো। তোমার আঙুলগুলো কই ? আমার চুলের ভেতর দাও দেখি—

অধ্যাপক ।। দিচ্ছি ! কিন্তু আমার থিসিসটা—

মনীষা ।। শুধু চুলের ভেতর দিলেই হল ? আঙুল চুলের ভেতর এঁকে বেঁকে খেলছে না কেন ? তুমি কিছু জানো না।...ক্ষিতীশবাবু সেদিন—

[দরজায় ক্ষিতিশের আবির্ভাব]

ক্ষিতীশ ॥ আমি এসেছি মনীষা দেবী!

মনীষা ॥ [আতঙ্কে] না—না—না—

অধ্যাপক ॥ এসো ক্ষিতীশ।

মনীষা ॥ [রুখিয়া উঠিয়া] খবরদার, কখনো না।

অধ্যাপক ॥ ছিঃ মনীষা!

মনীষা ॥ যম! যম! ও আমার যম!

ক্ষিতীশ ॥ মনীষা দেবী, আমি—

মনীষা ॥ [অধ্যাপকের হাত দুখানি আঁকড়াইয়া ধরিয়া] ওরা আমায় নিয়ে যাবে। তুমি আমায় ধরে রাখ—

অধ্যাপক ॥ ওরা তোমার সেবা-শুশ্রূষা করতে এসেছে। আমাকে যে এখনি থিসিস লিখতে বসতে হবে। ভেবে দেখ মনীষা, আমি ডক্টরেট পাবো সে কি তোমারই কম গর্ব মনীষা?

মনীষা ॥ রেখে দাও তোমার ডক্টরেট। তুমি আমার কাছে এস। আমার বিছানায় এস। আমায় আদর করো ..ভালোবাসো···আমায় একটি চুমো দাও—

অধ্যাপক ॥ ছিঃ মনীষা, ছিঃ। ক্ষিতীশ, তুমি ড্রয়িং-রুমে গিয়ে বোস। খানিকটা পরে এসো এসো কিন্তু।

ক্ষিতীশ ॥ নিশ্চয় স্যার। [প্রস্থান]

মনীষা ॥ গেছে?

অধ্যাপক ॥ হ্যাঁ, গেছে। কিন্তু মনীষা, এ সব তোমার কি পাগলামি বল দেখি?

মনীষা ॥ দোরটা দাও।

অধ্যাপক ॥ ওরা তবে কি করে আসবে?

মনীষা ॥ ওদের আসতে হবেনা। ওরা এলে ওরা আমায় নিয়ে যাবে।

অধ্যাপক ॥ ছিঃ মনীষা—আবার ভুল বকছো?

মনীষা ॥ না—না, ভুল নয়। তুমি আমায় ছেড়ে গেলেই ওরা আসবে। তুমি দোর দাও।

অধ্যাপক ॥ ওদের না আসতে দিলে তোমার সেবাশুশ্রূষা করবে কে?

মনীষা ॥ কেন, তুমি আমার কাছে থাকো। এই একটি বালিশে আমরা দুজনে মাথা রাখি—মুখোমুখি হয়ে শুই, তুমি কথা বল, আমি শুনি। আমায় একটি চুমো দাও ..আমার সব অসুখ সেরে যাবে। ·সত্যি বলছি···আমি সত্যি বলছি—

অধ্যাপক ॥ কিন্তু আমার যে অবসর নেই মনীষা। আজ রাত্রের মধ্যে

আমাকে থিসিস শেষ করতে হবে। এই দেখ, রাত প্রায় এগারোটা হোলো। আর তো আমি না গিয়ে পারিনা।

মনীষা ॥—এস!

অধ্যাপক ॥ ক্ষিতীশদের ডেকে দি—

মনীষা ॥ খবরদার দোর বন্ধ কর।

অধ্যাপক ॥ তোমার শুশ্রূষা?

মনীষা ॥ লাগবেনা আমি বেশ আছি। তুমি দোর বন্ধ কর—

অধ্যাপক ॥ ওরা যে এসেছে!

[মনীষা কোন কথা বলিলেন না। শালখানি মুখের উপর টানিয়া আনিয়া মুখ ঢাকিলেন।]

মনীষা—[কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরায় ডাকিলেন] মনীষা!

[দ্বারে ক্ষিতীশ]

ক্ষিতীশ ॥ বোধ হয় ঘুমিয়েছেন স্যার।

অধ্যাপক ॥ আমারো তাই মনে হচ্ছে।—এস, ভেতরে এস।

মনীষা ॥ [মুখ হইতে শাল সরাইয়া] কখনো না। আমি ঘুমাব . কিন্তু ওরা এলে আমি পাগল হয়ে যাই···ওরা চলে যাক।

অধ্যাপক ॥ তাহলে ক্ষিতীশ—

ক্ষিতীশ ॥ বলুন স্যার।

অধ্যাপক ॥ শুশ্রূষার আজ আবশ্যক বুঝছিনা।

ক্ষিতীশ ॥ বেশ স্যার, আমরা-ড্রইং রুমেই শুয়ে থাকব। যদি আবশ্যক হয় আমরা আসব।

মনীষা ॥ দোর দাও।

অধ্যাপক ॥ দিচ্ছি। আর কিন্তু বিরক্ত করতে পারবেনা। এই দোর দিলাম। এইবার তুমি ঘুমাও। আমি আমার লাইব্রেরী ঘরে লিখতে চললাম।

মনীষা ॥ আমার পাশের এই জানালাটা—

অধ্যাপক ॥ বন্ধ করব?

মনীষা ॥ তুমি কি সত্যিই আমায় ছেড়ে···লিখতে যাচ্ছ?

অধ্যাপক ॥ না গিয়ে উপায় নেই মনীষা।

মনীষা ॥ তবে ওটা বন্ধ করে যাও।

অধ্যাপক ॥ কেন মনীষা? দিব্যি হাওয়া আসছে—

মনীষা ॥ হ্যাঁ, যতক্ষণ তুমি আছ। দিব্যি হাওয়া ··ফুরফুরে হাওয়া...! শুধু কি একা? সঙ্গে এনেছ বকুলের আকুল গন্ধ। সে কি শুধু গন্ধ? সেই গন্ধে ভেসে বেড়াচ্ছে আমারই মর্মবাণী...তুমি আমার পাশে আছ, আমি তোমার পাশে আছি···আমরা অমর! আমরা অমর!

অধ্যাপক ॥ বাঃ, বেশ কথা মনীষা। তবে জানালা খোলাই থাক। আমি এখন আসি।

মনীষা ॥ না—না—তবে জানালা বন্ধ করে দিয়ে যাও!

অধ্যাপক ॥ কেন? ফুরফুরে হাওয়া...বকুলের ব্যাকুল গন্ধ—

মনীষা ॥ হ্যাঁ, যতক্ষণ তুমি আমার কাছে আছ। যেই তুমি আমায় ফেলে দূরে যাবে···অমনি রুখে আসবে এক ঝড়ো হাওয়া! শুধু কি একা? তার সঙ্গে উড়ে আসবে ধূলো আর মাটি···আমার সেই যুগযুগান্তরের খেলার সাথী!··· শুধু কি তাই?···ঐ যে আকাশ, ওর চোখে তখন আগুন জ্বলবে···বিদ্যুতের চমকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে···তাও যদি বা না যাই, ও তখন কাঁদতে বসবে... সে চোখের জলের বৃষ্টিধারাও যদি তুচ্ছ করি···ঝড়ো হাওয়া আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে ঐ বাইরে। ওদের ভাণ্ডার থেকে যে রূপ আমি তোমার জন্যে তিলে তিলে চুরি করে তিলোত্তমা হয়ে পালিয়ে এসেছিলাম···সেই রূপ ওরা আবার তেমনি তিলে তিলে কেড়ে নেবে—

অধ্যাপক ॥ তুমিও কি কোন থিসিস্ লিখছো মনীষা? এত কথা তুমি কবে কোথা থেকে শিখলে?

মনীষা ॥ কেন? ঐ ক্ষিতীশ··· ঐ অপরেশ···ঐ তেজেশ···ঐ মরুত্তম··· সেই ব্যোমকেশ! তারা যে এ কথা কতবার কতভাবে আমায় বলে! কখনো কানে কানে! কখনো মনে মনে!

অধ্যাপক ॥ ওরা কি মনীষা? ওরা?

মনীষা ॥ জান না তো ওদের কীর্তি! গভীর রাতে আমার পাশে বসে যখন ওরা বলে ওরাই সেই ধূলা মাটি, সেই আকাশ বাতাস আগুন এবং জল, আমার জন্যে ওরা ওৎ পেতে বসে আছে—শুধু দেখছে···তুমি আমায় ছেড়ে কতদূর গেছ···কতদূরে আছ···বল দেখি কেমন করে আমি বাঁচি?

অধ্যাপক ॥ তুমি আজ বড্ড ভুল বকছ মনীষা!

মনীষা ॥ ভুল নয় ভুল নয়। ভুল করছো তুমি। তুমি আমায় যতই ভুলছো···ততই ওরা সাহস পেয়ে এগিয়ে আসছে! তুমি আমায় ছেড়ে যতই দূরে চলে যাচ্ছো, ওরা ততই আমায় গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে!..যে চুমোটি তুমি আমায় দাও না, সেই চুমোটি ওরা দিতে পাগল! আমি কি দেখি জানো?

অধ্যাপক ॥—কি?

মনীষা ॥ একটা প্রকাণ্ড লড়াই আমাকে নিয়ে অহরহ চলছে।

অধ্যাপক ॥ লড়াই?

মনীষা ॥ হ্যাঁ লড়াই। কোন যুগে যেন তুমি মনে প্রাণে শুধু রূপই কামনা করেছিলে। সেদিন ঐ ছিল তোমার ধ্যান, ঐ ছিল তোমার তপস্যা।

সেই আকর্ষণেই আমার জন্ম। হাসিমুখে তোমার জন্যে তিল তিল করে ওদের ঐশ্বর্য হরণ করে তিলোত্তমা হয়ে তোমার দুয়ারে এসে দাঁড়ালাম···তুমি মনে-প্রাণে সেদিন আমায় বরণ করে বুকে নিলে! ··তখন· ·ভাঙলো ওদের ঘুম। কিন্তু জেগে উঠে ওরা দেখে আমি তোমার মনে···আমি তোমার প্রাণে আমি তোমার ঐ আঁখি তারার মাঝে।...ওরা আমায় খুঁজেই পেলো না খুঁজেই পেলো না···হাঃ হাঃ হাঃ [পাগলের মত হাসিতে লাগিলেন]

অধ্যাপক।। সর্বনাশ হল! আমার থিসিস্—

মনীষা।। [তৎক্ষণাৎ ভীত বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে] হ্যাঁ, সর্বনাশ হল ঐ থিসিসে! সেইদিন ওরা ঐ থিসিসের অন্ধকারে পথ পেলো। আগে ওরা আমার ত্রিসীমানায়ও আসতে সাহস পায়নি। কিন্তু যেই ওরা দেখলো আমার চেয়ে তোমার কাছে থিসিস্ বড় . সেইদিন সেইদিন থেকে তুমি যতই এক-পা এক-পা করে দূরে যাচ্ছ ওরা এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছে—[চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন] শেষে—অবশেষে—

অধ্যাপক।। অবশেষে তুমি পাগলই হলে মনীষা—

মনীষা।। [সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া] আজ ওদের আঙুল আমার মাথায় চুলে কত খেলাই খেলে! ওদের ঠোঁট আমার মুখের কাছে কাঁপে। ওরা আমার পায়ে ধরে কাঁদে। কানে কানে চুপি চুপি ডাকে আয়! আয়! আয়!· ·কিন্তু, তখন···তুমি—

অধ্যাপক।। হয়তো থিসিস্ লিখি, এবং সে থিসিস্ আজ আমায় শেষ করতেই হবে, এই বাকি রাতটুকুর ভেতর, অতএব—

মনীষা।। তুমি যাবে?

অধ্যাপক।। না গিয়ে আমার উপায় নেই। অবশ্য এ ঘরেও লিখতে পারতাম, কিন্তু তোমার জ্বালায়—

মনীষা।। থিসিস্ই কি তোমার সব? আমি কি তোমার কেউ নই?

অধ্যাপক।। তুমি আমার স্ত্রী। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার মনে এমনি সব অদ্ভুত চিন্তা নেচে বেড়াচ্ছে! অমন প্রশ্ন আর ক'রো না, লোকে শুনলে হাসবে। নাও, জানালা বন্ধ করে দিলাম। এইবার তবে [ঘড়ির দিকে চাহিয়া] বারোটা বাজতে চলেছে—সর্বনাশ! [ত্বরিতপদে পার্শ্বের কক্ষে প্রস্থান]

মনীষা।। শোন—শোন—

অধ্যাপক।। তুমি বলে যাও আমি লিখতে লিখতে শুনে যাচ্ছি।

মনীষা।। এই যে—এই যে! ওগো তারা এসেছে! জানালায় তারা এসেছে—ক্ষিতীশ-অপরেশ-তেজেশ-মরুত্তম আর ব্যোমকেশ—

অধ্যাপক।। আসুক—

মনীষা।। উঃ মাগো!

[ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিয়া তখনি পড়িয়া গেলেন]

[দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হইতে লাগিল। অধ্যাপক তাঁহার কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিলেন এবং দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন।]

অধ্যাপক ।।—কে ?

বাহির হইতে ।। আমরা !

অধ্যাপক ।। কে তোমরা ?

বাহির হইতে ।। ঝড় উঠেছে, ধূলো মাটি উড়ছে ! আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টিও নামল। একসঙ্গে পঞ্চভূতের তাণ্ডব নৃত্য।

অধ্যাপক ।। [ছুটিয়া মনীষার নিকট গিয়া] মনীষা—মনীষা—

[কোন উত্তর পাইলেন না। এদিকে বাহিরের চাপে দরজাটি হঠাৎ খুলিয়া গেল। অধ্যাপকের পঞ্চ ছাত্র... ক্ষিতীশ, অপরেশ, তেজেশ, মরুত্তম এবং ব্যোমকেশ ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল এবং মনীষার চারিপাশে ঝুঁকিয়া পড়িল।]

অধ্যাপক ।। মনীষা—মনীষা—[পঞ্চ ছাত্র মনীষার দেহ স্পর্শ করিল।]

পঞ্চ ছাত্র ।। হয়ে গেছে। এখন এঁকে নিয়ে যেতে হবে—

অধ্যাপক ।। কোথায় ?

পঞ্চ ছাত্র ।। শ্মশানে ! ভাববেন না, আমরাই নেব।

———

রচনা ও প্রকাশ :

সন ১৩৩৮, ইং ১৯৩১

অরূপ-রতন

ইঙ্গিত :

বৃহদ্রথ···বৃদ্ধ কাশীরাজ।

জয়াদিত্য ··কাশীরাজ-কন্যা লেখার সহিত সদ্যপরিণীত কোশলেশ্বর।

রেখানাথ···সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকূট জনপদের অধিপতি।

লেখা ·কাশীরাজ-কন্যা।

সুলেখা···কাশীরাজের শ্যালিকা-কন্যা।

মাধবিকা···রাজকন্যাদের অন্তরঙ্গ সখী।

এতদ্ভিন্ন...চিত্রকূট-দূত, সেনাপতি, রেখানাথের শিষ্য, ঘাতক।

স্থান এবং কাল : চিত্রকূট জনপদ-প্রান্তে কাশীরাজের শিবির। রাত্রিতে উদ্বোধন এবং ঊষাতে বিসর্জন।

* * * *

[দৃশ্য ।—রাজকীয় শিবির। শিবিরটি একটি বিরাট বস্ত্রাবাস। তাহার যে অংশ দেখা

যাইতেছে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে 'দরবার' দ্বিতীয়ভাগে 'অতিথি-নিবাস' এবং তৃতীয়ভাগে 'বিলাসকক্ষ'। প্রত্যেক কক্ষ অপর কক্ষের সহিত অন্তর্নিহিত ক্ষুদ্রায়তন দরজা দ্বারা সংলগ্ন। তদ্ভিন্ন সকল কক্ষেরই সম্মুখ দিয়াই বিস্তৃত অলিন্দ। সেই অলিন্দপথে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাতায়াত চলে। সকল কক্ষেরই সম্মুখে বিশালায়তন সুবিস্তৃত দরজা, তাহা কালো পর্দা দ্বারা আবৃত। প্রয়োজন কালে সেই পর্দা উত্তোলিত হয় এবং তখন কক্ষাভ্যন্তর সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। শিবিরস্থ দরবার-কক্ষে বৃদ্ধ কাশীরাজ বৃহদ্রথ এবং তাঁহার নবজামাতা কোশলেশ্বর। সম্মুখে চিত্রকূট-দূত যুক্ত করে দণ্ডায়মান।]

বৃহদ্রথ ॥ দূত! তুমি অবধ্য; কিন্তু মনে রেখো তোমার প্রভু অবধ্য নয়।

দূত ॥ মহারাজ! দাস তা অবগত আছে। এ দাস শুধু তার প্রভুর বার্তা আপনার সকাশে নিবেদন করেই মুক্ত। কিন্তু, সেই যে নিবেদন—সে নিবেদন তো নির্ভয়েই করা বিধি।

বৃহদ্রথ ॥ নির্ভয়েই নিবেদন কর!

দূত ॥ আমাদের প্রভু কুমার রেখানাথ যে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী, তা দেশবিদেশের সকল কলাবিদ্‌ই স্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, তৎপ্রবর্তিত চিত্রাঙ্কণপদ্ধতি আজ দেশবিদেশের চিত্রীমহলে প্রচলিত। অজন্তা গুহায় তাঁর পরিকল্পিত শিল্পৈশ্বর্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে গুণগ্রাহী মগধ-সম্রাট, কুমার রেখানাথকে এই গিরি-মেখলা, নির্ঝরিণী-স্নাতা পরম রমণীয় চিত্রকূট জনপদ দান করেন।

জয়াদিত্য ॥ সে কথা সকলেই জানে। কাজের কথা বল।

দূত ॥ এ নিতান্তই একটা দুর্ঘটনা যে তিনি আপনাদের উভয়ের বিরাগ-ভাজন। সত্য বটে, তিনি নিতান্ত দুর্বল, নিতান্ত অসহায়, কিন্তু··কিন্তু বর্তমান যুগের শিল্পজগতে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট—এ কথাও সত্য।

জয়াদিত্য ॥ আমি শিল্প-জগতের প্রজা নই, আমি বাস্তব জগতের রাজা! অর্থাৎ আমি দুর্ধর্ষ সৈনিক। আমি অপমান সহ্য করিনা, অপযশ তুচ্ছ করি। আমার জয়যাত্রায় যদি পর্বতও প্রতিবন্ধক হয়, তবে সে পর্বত চূর্ণ ক'রেই চলে আমার অভিযান।

দূত ॥ আমি স্বীকার করি, কোশলেশ্বরের এ বৃথা দম্ভ নয়। আপনি আজ দেশের সার্বভৌম নরপতি।. কিন্তু·· ঐ কাশীরাজ একদিন শিল্প-জগতের উন্মাদনায় মেতে উঠেছিলেন ব'লেই আজ এই বিরোধ।

জয়াদিত্য ॥ সরল ভাষায় কথা বল দূত! আমি শুনেছি কাশীরাজ তাঁর কন্যার বিবাহের পূর্বে তাঁর চিত্র রেখানাথকে দিয়ে অঙ্কিত করিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, কন্যা স্বামিগৃহে গেলে সেই চিত্র তাঁকে সান্ত্বনা দেবে। যথেষ্ট অনুনয় সত্ত্বেও রেখানাথ সেই চিত্র অঙ্কন করতে সম্মত হন নি।

বৃহদ্রথ ॥ শুধু তাই নয় দূত! তোমাদের কুমার আমার নিমন্ত্রণে, আমার রাজপ্রাসাদে এসে আমার কন্যাকে দেখলেন। দেখে বললেন আমার কন্যার ছবি এঁকে তিনি তাঁর তুলির অমর্যাদা করতে চাননা—এমনি বিরাট তাঁর দম্ভ!

দূত ॥ দম্ভ নয় ; তার কারণ আছে। তাঁর শেষ কীর্তি অজন্তাগুহার চিত্র-পরিকল্পনা। তিনি রমণী-মূর্তি এত বেশী অঙ্কন করেছেন যে, নতুন সৃষ্টির ধ্যান করতে করতে হঠাৎ একদিন এমন এক অপরূপ সুন্দরীর সন্ধান পান যে, তারপর থেকে তিনি সেই মূর্তিরই রূপদান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সেই দিন থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যদি তিনি রমণী-মূর্তিই অঙ্কন করেন, তবে অঙ্কন করবেন সেই মূর্তি ; তা' না হলে তার চাইতে নিকৃষ্ট সৌন্দর্যের মূর্তি এঁকে তাঁর তুলির অমর্যাদা করবেন না। আপনার কন্যা—

বৃহদ্রথ ॥ আমার কন্যা কোশলেশ্বর জয়াদিত্যের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত দেশবিদেশের রাজন্যবৃন্দ-কর্তৃক এ যুগের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

দূত ॥ কিন্তু কুমার রেখানাথ বলেন যে আপনার কন্যার চাইতেও তাঁর সেই সুন্দরী আরো বেশী সৌন্দর্যের অধিকারিণী।

জয়াদিত্য ॥ আমার বধূ তাঁর সেই সুন্দরীর সৌন্দর্য-গর্বকে পদদলিত করবেন বলেই তোমার কুমারের চিত্রকূট জনপদ আমি অবরোধ করেছি। যতক্ষণ তা না পারি, ততক্ষণ আমার বিবাহ সম্পূর্ণ হবেনা।

বৃহদ্রথ ॥ জানো দূত, আমার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য শ্রীমান জয়াদিত্য তাঁর বিবাহের সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলি শেষ করবার বিলম্বও সহ্য করেননি। বিব রাত্রি প্রভাত হতেই তিনি আমাদের নিয়ে তোমাদের এই জনপদে ছুটে এসেছেন। এখনো তাঁর ফুলশয্যা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়নি! আজ, আজ এই বিদেশে এই যুদ্ধ-শিবিরে, সেই ফুলশয্যার অনুষ্ঠান করতে হবে—এও কি কম পরিতাপের বিষয়!

জয়াদিত্য ॥ শোন দূত, আর কথাতে কাজ নেই ; কাল প্রভাতে তোমাদের শিল্পজগতের একচ্ছত্র সম্রাট এই বাস্তব জগতের সার্বভৌম সম্রাটের সম্মুখে হয় তাঁর সুন্দরীর শ্রেষ্ঠতর সৌন্দর্য প্রদর্শন ক'রে আমাদের দর্প চূর্ণ করবেন, নয়, নিজে জয়াদিত্যের জয়যাত্রার রথচক্রে চূর্ণ হবেন।

দূত ॥ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সেই অপরূপার খোঁজ করেছেন আমাদের কুমার; কিন্তু তবু দেখা তাঁর পাননি। তবুও কিন্তু কুমার রেখানাথ সেই অপরূপার রূপ-রেখার যে পরিকল্পনায় বিভোর, আমরা তার আভাস পাই তাঁর চোখে-মুখে, স্বরে, গানে, স্বপ্নে!…এখনো আমি নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিনা। কিন্তু তবু, আবার জিজ্ঞাসা করি, এই কি শেষ কথা?

বৃহদ্রথ ॥ হ্যাঁ, এই শেষ কথা।

জয়াদিত্য ॥ আজ আমাদের ফুলশয্যা। এই ফুলশয্যার রাত্রিটুকু তোমাদের কুমারের অবসর। তিনি এই অবসরে যেন তাঁর কর্তব্য স্থির করেন। নইলে আগামী প্রভাতে আমার সর্বপ্রথম কার্য হবে তোমাদের জনপদ অগ্নিদগ্ধ করা।

দূত ॥ তার প্রয়োজন নেই। আমরা আত্মসমর্পণ করেছি ; তবে কুমারের কথা স্বতন্ত্র। তিনিও আজ রাত্রেই তাঁর কর্তব্য স্থির করবেন। আপনারা আগামী প্রভাতেই তাঁর দর্শন পাবেন। যদি আর কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আজ রাত্রেই তিনি তা আপনাদের জানাবেন বলেছেন।···আমার অভিবাদন গ্রহণ করে এবার তাহলে আমায় বিদায় দিন।

[দূতের প্রস্থান]

জয়াদিত্য ॥ আমি বিস্মিত হয়েছি এই চিত্রকরের স্পর্ধা দেখে।

বৃহদ্রথ ॥ তার এই স্পর্ধা কাল প্রভাতে চূর্ণ করা চাই বৎস! অপরূপ-রূপসী আমার কন্যা—রাজন্যমণ্ডলে একথা একবাক্যে স্বীকৃত হয়েছে। আমার লেখার একমাত্র তুলনা আমার শ্যালিকা-কন্যা সুলেখা। দুইজন দুইজনের প্রতি-মূর্তি! যারা জানে না, তারা বলে লেখা আর সুলেখা দুই যমজ ভগিনী। প্রকৃতির এই খেয়ালে আমাদের বিপদের অন্ত নেই! তবু প্রভেদ আছে। সে প্রভেদ তাদের মনে। একজন তেজোদৃপ্তা, আর একজন কুসুম-কোমলা। একজন দিনের রৌদ্র, আর একজন রাত্রির জ্যোৎস্না। এই প্রভেদটুকু না থাকলে কে যে লেখা আর কে সুলেখা আমিই চিনে উঠতে পারতাম না!

জয়াদিত্য ॥ না-চিনে-উঠতে পারবার ভয় আমিও প্রতিপদেই করে এসেছি সেই জন্যেই, আমি লেখাকে চোখে চোখে রেখেছি।

বৃহদ্রথ ॥ চোখে চোখে রাখবার প্রয়োজন নেই। সুলেখা যখন আমার রাজসংসারে এসে দাঁড়াল, তখন সাদৃশ্যের এই গোলযোগ দূর করবার জন্যে, আমি আমার লেখার হাতে আমার রাজচিহ্নখচিত হীরকাঙ্গুরীয়ক পরিয়ে দিলাম। ঐ চিহ্নেই তুমি সব সময়ে তাকে চিনতে পারবে। রাজপুরীর সবাই ঐ চিহ্নে রাজকুমারীকে চিনে থাকে। এই গোলযোগ হ'ত না, যদি আমার শ্যালিকা বেঁচে থাকতেন। তিনি সুলেখাকে প্রসব করেই পরলোকে, আমার স্ত্রীর কাছে চলে যান! মরবার সময় তিনি তাঁর ঐ অনাথা কন্যাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে দুই মাতৃহারা কন্যাকে সমভাবে আমি লালন-পালন করে এসেছি। সুলেখা আমার কাছে লেখার চাইতে কিছু কম নয়।···যাক সে কথা। আমি যাই, ফুলশয্যার আয়োজন করি। আজ সে-কাজও আমাকেই করতে হবে ; যার করবার কথা, তিনি নিশ্চিত মনে স্বর্গ সুখ উপভোগ করছেন।

[পরিচ্ছদের প্রান্ত দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে অলিন্দপথে বিলাসকক্ষের দিকে প্রস্থান করিলেন তিনি দৃষ্টিপথের অন্তরালে যাওয়া মাত্র রাজকন্যার সখিগণ দরবার কক্ষের দুই পার্শ্বস্থিত দ্বারপথে প্রবিষ্ট হইয়া চকিতে জয়াদিত্যকে নৃত্যদ্বারা আক্রমণ করিল। সেই নৃত্য-গীতে তাহারা জয়াদিত্যকে ফুলশয্যায় আবাহন করিতেছিল। নৃত্যগীতান্তে কাশীরাজকন্যা লেখা দরবারকক্ষে উপস্থিত হইয়া স্বামীকে সহাস্যে অভিনন্দিত করিলেন এবং ইঙ্গিতে সখীকুলকে সে স্থান হইতে অপসারিত করিলেন]

লেখা ॥ শুভরাত্রি।

জয়াদিত্য ॥ শুভরাত্রি।

লেখা ॥ ফুলশয্যা?

জয়াদিত্য। হ্যাঁ, ফুলশয্যা। যেদিন তোমাকে দেখেছিলাম আমাদের রাজসূয় যজ্ঞে, আমাদের নাটমন্দিরে সেই নৃত্য উৎসবে, সেইদিন রাত্রে আজকের এই ফুলশয্যা কল্পনা করেছিলাম। সেই কল্পনা প্রতিরাত্রে স্বপ্নময়ী হয়ে আমাকে ছলনা করেছে! দেশের শ্রেষ্ঠ বীর যেখানে, ঐ জায়গায় পরাজিত হয়েছে!··· কিন্তু আজ?

লেখা ॥ ছলনা করেছে!··বটে! কি যে ছলনা নয়, কে যে ছলনা নয়, এই ছলনার সংসারে তা বলা শক্ত।...হ্যাঁ, শক্ত। প্রথমেই ধরুন আপনি বললেন নাটমন্দিরের সেই নৃত্য-উৎসবে আপনি আমাকে দেখেছিলেন। কিন্তু··

জয়াদিত্য ॥ কিন্তু?

লেখা ॥ কিন্তু সে কি আমাকেই দেখেছিলেন?

জয়াদিত্য ॥ হাঃ হাঃ হাঃ...আমার চোখকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।

লেখা ॥ সত্যি?···কিন্তু শাস্ত্রে কি পড়েন নি যে, নিজের চোখে দেখেই অনেক সময় পণ্ডিতগণ রজ্জুকেই সর্প বলে ভ্রম করেন। করেন না কি?

জয়াদিত্য ॥ তুমি কি বলতে চাও সেদিন আর কাউকে তুমি বলে ভ্রম করেছিলাম?

লেখা ॥ আমি বলতে চাই, যদি সেদিন আপনি আমাকে না দেখে সুলেখাকে দেখে থাকেন?

জয়াদিত্য ॥ কিন্তু তোমার হাতের হীরকাঙ্গুরীয়ক?

লেখা ॥ ও আপনার আত্ম-প্রবঞ্চনা। নয় কি? হীরকাঙ্গুরীয়কের কথা আপনি আজ এই ক্ষণকাল পূর্বে পিতার কাছে জানতে পেরেছেন, সেদিন জানতেন না! তারপরেও না।

জয়াদিত্য ॥ আমার কল্পনার সঙ্গে খেলা করো না লেখা।· আমার সকল স্বপ্ন ভেঙে দিয়ো না, দিয়ো না। আমি তোমাকেই ভালবেসেছি লেখা। আর কাউকে নয়।

লেখা ॥ তবেই দেখুন। আমার এই রূপ আপনি ভালোবাসেন নি! কারণ আমারও যে রূপ, সুলেখারও সেই রূপ! আপনি ভালোবেসেছেন রাজকন্যার স্মৃতি।

জয়াদিত্য ॥ হ্যাঁ, হয় তো তাই। কিন্তু তাতে কি কিছু আসে যায়?

লেখা ॥ হয়তো যায়, হয়তো যায় না। আমি ঠিক জানি না। কিন্তু লোকে যে স্মৃতিকেই ভালোবাসে তার জ্বলন্ত নিদর্শন পেলাম ঐ পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে, যখন চিত্রকূট দূতের কথা শুনছিলাম!···সেই চিত্রকর কোনদিন হয়তো

মুহূর্তের জন্যে কোন এক নারীকে দেখেছে; আজও তার ধ্যানেই সে বিভোর, তার সেই ধ্যান রাজকুলের শ্রেষ্ঠা রূপসীও ভঙ্গ করতে পারেনি, কাল প্রভাতে মৃত্যু-রাক্ষসী পারবে কিনা তাও জানিনা!

জয়াদিত্য ॥ কাল প্রভাতের আর বিশেষ বিলম্ব নেই, অতএব শীঘ্রই তোমার কৌতূহল চরিতার্থ হবে! এখন চল…ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ রক্ষা করি!

লেখা ॥ ফুলশয্যা? ফুলশয্যা! হ্যাঁ ফুলশয্যা। কিন্তু তার পূর্বে আমার আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। অনুমতি পেলে নিবেদন করি।

জয়াদিত্য ॥ দয়া করে বল!

লেখা ॥ রাজসূয় যজ্ঞে যাকেই দেখে থাকুন আপনি রাজকন্যারূপে। আমার স্মৃতিকেই ভালোবেসে আজ আমাকে আপনার বধূরূপে বরণ করেছেন। …কিন্তু…কিন্তু

জয়াদিত্য ॥ নিঃসঙ্কোচে বল লেখা।

লেখা ॥ কিন্তু আমার ভয় হয়! হ্যাঁ, আমি শিউরে উঠি!…অন্ধকার রাত্রে অন্ধকার কক্ষে…

জয়াদিত্য ॥ বল ..বল লেখা!

লেখা ॥ যদি সুলেখাকে আপনি লেখা বলে ভ্রম করে বসেন!

জয়াদিত্য ॥ অন্ধকারেও হীরক জ্বলে!

লেখা ॥ তা আমিও জানি! কিন্তু, তবু তবু সুলেখা যদি ··

জয়াদিত্য ॥ হ্যাঁ বল.. সুলেখা যদি—

লেখা ॥ কোনদিন আমার অজ্ঞাতে, ধরুন আমার ঘুমের মাঝে, আমার এই হীরকাঙ্গুরীয়ক চুরি করে হাতে দিয়ে,…পরে…

জয়াদিত্য ॥ এ যে বিষম সমস্যায় পড়লাম! শোন। কালই আমরা কোশল যাত্রা করব। সেখানে আর তোমার সুলেখা রইবে না!

লেখা ॥ হ্যাঁ ঠিক বটে! হ্যাঁ সেখানে সুলেখা রইবে না বটে। যাক। কিন্তু, হ্যাঁ, ঐ চিত্রকরের বড় দর্প। কাল প্রভাতে সে পরাজিত হলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। দিতেই হবে। কি শাস্তি ঠিক হয়েছে?

জয়াদিত্য ॥ প্রাণদণ্ড। খুসী হবে?

লেখা ॥ না না না। তা নয়, তা নয়! মৃত্যু তার শ্রেষ্ঠ দণ্ড নয়।

জয়াদিত্য ॥ তবে?

লেখা ॥ আমার কথা থাকবে?

জয়াদিত্য ॥ আমি প্রতিজ্ঞা করছি অবশ্য থাকবে। বল, কি দণ্ড তুমি দিতে চাও?

লেখা ॥ ঐ সুলেখার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে হবে!

জয়াদিত্য ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—সে কি?

লেখা ॥ আমার খেয়াল! যে রাজকন্যাকে তুচ্ছ করেছিল, এইবার অনাথাকে বধূ বলে বরণ করুক! সুলেখার হাত থেকেও আমি মুক্তি পাই!

জয়াদিত্য ॥ তুমি তবে তাকে এখনো চেননি!—বেশ! সে যদি সুলেখাকে বিবাহ করতে অসম্মত না হয়, সুলেখা তারই বধূ হবে! এইবার চল।

লেখা ॥ আপনি অগ্রসর হোন। আমার সাজ-সজ্জা বাকি রয়েছে।

জয়াদিত্য ॥ শীগ্‌গীর এসো কিন্তু!

লেখা ॥ তাতে ত্রুটি হবে না।

জয়াদিত্য ॥ বেশ! আমি চললাম।

[অলিন্দপথে নেপথ্যে প্রস্থান। মাধবিকার প্রবেশ]

লেখা ॥ মাধবিকা!

মাধবিকা ॥ কি সখি!

লেখা ॥ আমার বিশ্বস্তমা—প্রিয়তমা সখি!

মাধবিকা ॥ ওকি ভাই! তুমি অমন শিউরে উঠছ কেন? ওকি! তোমার চোখ ছলছল কেন?

লেখা ॥ অরূপ-রতনের আশায় রূপসাগরে ডুব দিতে চলেছি!

মাধবিকা ॥ কি হয়েছে বোন, খুলে বল।

লেখা ॥ তোকে পূর্বেই যখন আভাস দিয়েছিলাম, তখন তুই আমার কথা রাখতে রাজি হয়েছিলি। এইবার তার পরীক্ষা।

মাধবিকা ॥ অক্ষরে অক্ষরে আমি তোমার কথা রাখব বোন! এখন কি করতে হবে বল!

লেখা ॥ আজ ফুলশয্যা।

মাধবিকা ॥ তার সময় হয়েছে। চল—

লেখা ॥ কিন্তু আমি ফুলশয্যায় যাবো না।

মাধবিকা ॥ তবে কি সই আমি যাবো?

লেখা ॥ যাবে সুলেখা।

মাধবিকা ॥ তবে তোমার সেই খেয়ালই বজায় রইবে।

লেখা ॥ হ্যাঁ।

মাধবিকা ॥ কিন্তু সুলেখা কি সম্মত হয়েছিল?

লেখা ॥ তাকে আমি আজ সারাটি অপরাহ্ণ বুঝিয়েছি, অবশেষে সে সম্মত হয়েছে। তোরা তাকে আমার ক্রীতদাসী বলে থাকিস, এমনি অনুগত আমার সে।—কিন্তু তোরা তাকে ভুল বুঝেছিস। প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবাসলেই ক্রীতদাসী হয়। সে আমার সেই ক্রীতদাসী। তা ছাড়া—

মাধবিকা ॥ তা ছাড়া?

লেখা। [চুপিচুপি] সুলেখা জয়াদিত্যকে ভালোবাসে।

মাধবিকা ॥ সে কি!

লেখা ॥ [হাসিয়া] একদিন আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। তা, আমি ওর দোষ দিই না। রূপে-গুণে, শক্তিতে-সাহসে, দুর্নিবার তার আকর্ষণ। তার ওপর সে সার্বভৌম নরপতি। ভালোবাসা পেতেই তার জন্ম।

মাধবিকা ॥ তবে তুমিও তাকে নিশ্চয়ই ভালোবাসো।

(লেখা ॥ না। আমি ভালোবাসি তাকে, যে আমাকে ভালোবাসে না। নারী যার পূজা পায়, তাকে সে পূজা করতে চায় না; নারী পূজা করতে চায় তাকে, যে তাকে পূজা করেনা।)

মাধবিকা ॥ তবে তুমি…

লেখা ॥ আমি যে চিত্রকরকে ভুলতে পারছিনা। নারীকে যে ভালোবাসে, নারী তাকে হয়তো ভুলতে পারে, কিন্তু নারীকে যে আঘাত করে, নারী তাকে ভুলতে পারে না।

মাধবিকা ॥ তুমি যা ভালো বোঝ কর। যা করতে বলবে, তাই করবো।

লেখা ॥ হ্যাঁ বোন, কর, তাই তাই কর। আমার জন্যে ভেবো না। এই নাও অঙ্গুরীয়ক, এই অঙ্গুরীয়ক সুলেখাকে পরিয়ে দাও, আমার সাজে সাজিয়ে দাও। তাকে ব'লো শুধু আজকের রাতটুকুর জন্যে আমি ছুটি চাইছি। একটি রাত! শুধু একটি রাত!

মাধবিকা ॥ বলব। কিন্তু কোশলরাজ যদি অঙ্গুরীয়ক সত্ত্বেও সুলেখাকে আর কোনরূপে চিনতে পারেন!

লেখা ॥ কোশলরাজ স্মৃতির ধ্যান করেন। যাকেই তিনি পাননা কেন, মনে করবেন সে আমি, কাশীরাজ-কন্যা লেখা। তা ছাড়া, 'অন্ধকারে দীবক জ্বলে' বলে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। [শিবিরপ্রান্তে সানাই বাজিয়া উঠিল] ঐ সানাই বাজছে! ফুলশয্যার তান!—না বোন, আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়, তুই যা শীগ্‌গীর! [তাহাকে অঙ্গুরীয়ক দিয়া অলিন্দপথে ঠেলিয়া দিলেন। মাধবিকা লেখার প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিয়া পরে অদৃশ্য হইল।]

[শিবির-প্রান্তে সানাই বাজিতে লাগিল। একমনে লেখা তাহা শুনিতে লাগিলেন। পরে একবার আবার অলিন্দপথে বাহির হইলেন, আবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া পর্দা টানিয়া দিয়া আত্মগোপন করিলেন। একাধিকবার এইরূপ করাতে মনে হইল তিনি খুব বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, এদিকে ফুলশয্যার শোভাযাত্রা অলিন্দপথ দিয়া ক্রমে বিলাসকক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। লেখা ছুটিয়া গিয়া অতি সঙ্কোচে সেই জনতার সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। ধূপ দীপ আলো, নানাবিধ যৌতুক প্রভৃতি বহন করিয়া সখীগণ, বাহকগণ ও অনুচরগণ শোভা-যাত্রার পুরোভাগে এবং পশ্চাদ্‌ভাগে ছিল। মধ্যভাগে ছিলেন বরণ-ডালা হাতে কুল-স্ত্রীগণ এবং ক্রমে জয়াদিত্য, অবগুণ্ঠিতা সুলেখা এবং বৃহদ্রথ।

বিলাসকক্ষে শুধু তাহারাই প্রবেশ করিলেন, যাঁহারা শোভাযাত্রার মধ্যভাগে ছিলেন। কাশীরাজ ও কুলস্ত্রীগণ বর ও বধূকে আশীর্বাদ করিয়া পার্শ্বস্থ দ্বারপথে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর সখীগণ বরণ ডালা হাতে লইয়া দুইপার্শ্বস্থ দ্বারপথে বিলাসকক্ষে প্রবেশ করিয়া সানাই বাদ্যের তালে তালে বর ও বধূকে আরতি অভিনন্দন অভিনন্দিত করিল। নাটকে গানের প্রয়োজন। অতএব

সম্ভবতঃ তাহারা সময়োপযোগী গানও গাহিয়াছিল। তাহা শেষ হইলে ক্রমে তাহারা অদৃশ্য হইল এবং বিলাসকক্ষের সম্মুখে পর্দা ঝুলিয়া পড়িল। শোভাযাত্রায় যাহারা বাহিরে ছিল, ততক্ষণে তাহারা অপসৃত হইয়াছে। ক্রমে সানাইও থামিয়া গেল।

অতিথি-নিবাসের সম্মুখস্থ দরজাপথের পর্দার আড়াল হইতে লেখা বাহিরে আসিলেন। কম্পিত-চরণে বিলাসকক্ষের পর্দাপথে উঁকি দিতে যাইয়াই সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে অলিন্দপথে ধীরে ধীরে দরবার-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখেন, সেখানে চিত্রকরসম্রাট রেখানাথ উপবেশন করিয়া আছেন। বোধ করি তিনি শোভাযাত্রার ভিড়ের মধ্য হইতে কোন সময়ে এখানে আসিয়া বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছেন। লেখা তাহাকে দেখিয়াই প্রথমে ছুটিয়া যাইতে গিয়া আবার ফিরিলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া সাহসভরে কথা কহিয়া তাঁহার তন্ময়তা দূর করিলেন]

লেখা ॥ আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

রেখানাথ ॥ আমার আশীর্বাদ। [হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন]

লেখা ॥ আপনার পদস্পর্শে আমাদের এই দীন বস্ত্রাবাস ধন্য !

রেখানাথ ॥ পরিহাসও তবে কলাবিদ্যা হিসাবে শিক্ষা করা যায় দেখছি ! ...হুঁ ·কিন্তু···রাজা কোথায় ? অথবা কোশলেশ্বর জয়াদিত্য ?

লেখা ॥ রাজা শয়নকক্ষে এতক্ষণ নিদ্রাগত। আর কোশলেশ্বর তাঁর হৃদয়েশ্বরীর সঙ্গে ফুলশয্যায় প্রেমরঙ্গে মত্ত। আপনার যা প্রয়োজন, যদি নিতান্ত অসঙ্গত না হয় তবে আমাকেই বলতে পারেন।

রেখানাথ ॥ আপনি—

লেখা ॥ আমি লেখা, কাশীরাজের শ্যালিকা-কন্যা।

রেখানাথ ॥ আমি আপনার কথা শুনেছি ; তবে দেখলাম আজ এই প্রথম। রাজকন্যা লেখার চিত্রাঙ্কনার্থে যখন আমি নিমন্ত্রিত হয়ে রাজপ্রাসাদে অতিথি ছিলাম, তখনি আপনাদের এই অশ্রুতপূর্ব সাদৃশ্যের কথা শুনি। আর সেই সময় রাজকন্যার সেই হীরকাঙ্গুরীয়ক-অভিজ্ঞানের কথা জেনেছিলাম বলেই আজ আপনাকে রাজকন্যা লেখা বলে ভুল করব না।

লেখা ॥ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ এই গভীর রাত্রে আপনার শুভ পদার্পণের উদ্দেশ্য ?

রেখানাথ ॥ কাল প্রভাতে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ ! তবু রাত্রের এই অনিয়ম ক্ষমা করা কি এতই কঠিন ?

লেখা ॥ আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। অসময়ে এই শুভাগমন কেন সেই কৌতূহল চরিতার্থ করতে চেয়েছিলাম। আপনিই বরং আমাকে ক্ষমা করুন !

রেখানাথ ॥ তর্কবিতর্কে সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই, আপনাদের অভিভাবকগণের আমি দর্শন ভিক্ষা করি !

লেখা ॥ আমিও বৃথা কথা বলে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাইনা। আপনার উদ্দেশ্য আমার নিকট বিবৃত করুন, তা'হলেই তা' সিদ্ধ হবে। জানবেন আমিই তাঁদের প্রতিনিধি।

রেখানাথ ॥ তবে আপনি শুনুন। কাল প্রভাত আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। আজ এই সুন্দর ধরণী থেকে বিদায় নেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি। স্নেহকাতর বৃদ্ধ কাশীরাজের মনে আমি যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছি, আজ আমাকে আমার সেই অনুতাপ থেকে মুক্ত হ'তে হবে। এই নিন রাজকন্যা লেখার প্রতিকৃতি।

লেখা ॥ [পরিপূর্ণ ঔৎসুক্য কিছুতেই দমন করিতে না পারিয়া] সে কি! সে কি!...কই? [হাত বাড়াইয়া প্রতিকৃতি গ্রহণ করিয়া তাহা দেখিয়া] উঃ এ যে অবিকল প্রতিচ্ছবি!...কিন্তু, কিন্তু—তবে আপনি আপনার সংকল্প ত্যাগ করলেন?...নিকৃষ্টতর সৌন্দর্য এঁকে আপনি পরাজয় স্বীকার করলেন?

রেখানাথ ॥ প্রতিকৃতি নিখুঁত হয়েছে?

লেখা ॥ নিখুঁত, নিখুঁত! এতো শুধু প্রতিকৃতি নয় এ জীবন্ত মূর্তি।... যাক আমার সাধনা সফল হ'ল। আজ তোমার এই পরাজয় কামনা করেই আমি তোমার শিল্প-কুঞ্জে অভিসারে চলেছিলাম—

রেখানাথ ॥ ..বিদায়! আমার শিষ্যের শ্রম সার্থক হয়েছে।...অতি যত্নে সে এঁকেছে! আমি আমার শ্রেষ্ঠ তুলি দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করব।

লেখা ॥ [সবিস্ময়ে] ..এ চিত্র তবে তুমি আঁকনি?

রেখানাথ ॥ আমি?—হাঃ হাঃ হাঃ।

লেখা ॥ এ চিত্র আমরা নেব না ..[সরোষে] ফেরত নাও...

রেখানাথ ॥ ফেরত নিতে হয়, শিষ্য নেবে, আমার কাজ শেষ হয়েছে। শোন নারী; আমার সুন্দরী তোমাদের দেখছে আর হাসছে! ..ঐ যে চিত্র .. ঐ চিত্রে, ঐ মনুষ্যের ঐ চারু ওষ্ঠের একটি পাশে ছোট্ট একটি কালো তিল বসিয়ে দিলে ঐ চিত্র আরো শতগুণ সুন্দর হয়ে উঠত! সেই যে সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যের চাইতেও শতগুণ সুন্দর আমার সুন্দরী। .কাল প্রভাতের প্রতীক্ষায় আমি ভয় পাইনি!... আমার এই শিষ্যও ভয় পেতো না.সে শুধু ঐ ছবিতে একটি তিল বসিয়ে দিত!. কিন্তু আমার ভয়, আমি আমার সুন্দরীকে কাল প্রভাতে বিশ্বভুবনে তার মহিমার পরিপূর্ণ সমারোহে প্রকাশিত করতে পারব কি না!...আমি ক্লান্ত, আমি শ্রান্ত, আমার তুলি চলেনা! রং সরে না!...দীর্ঘপথের যাত্রী আমি। সাথী নেই, দোসর নেই।...তবু চলেছি! সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে—তারই উৎসাহে চলেছি! চলবো!

লেখা ॥ চিত্রকর! বল ..আরো বল ..

রেখানাথ ॥ "ডুব দিয়েছি রূপ-সাগরে
অরূপ-রতন আশা করে!"

লেখা ॥ চিত্রকর! চিত্রকর!...তুমি কি যাদুকর?

রেখানাথ ॥ আমি চল্লাম। আজ এই রাত্রিটুকু আমাকে অমানুষিক শ্রম করতে হবে। আমার মাথার ভেতর রূপের আগুন জ্বলছে। হয়তো সে

আগুন বিশ্ব আলোকিত করবে, না হয়, তাতে আমার সত্তা ভস্মীভূত হবে।… কিন্তু তবু এর শেষ দেখবো! মরতে হয় মরবো, স্বপ্নে বিভোর হয়ে পরলোকে যাবো…সেখানে আবার চেষ্টা করবো, না পারি আবার মর্তে নেমে আসবো! যুগে যুগে জন্ম আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমার এই সাধনা চলবে।

লেখা ॥ চিত্রকর! চিত্রকর! তোমার সুন্দরীর কথা বল—

রেখানাথ ॥ সময় নেই, সময় নেই। আমার শেষ কথাটি তোমাকে বলে যাই। রাজকন্যা লেখাকে বলো—সে যেন আমাকে ভুল না বোঝে। যদি আমি কাল প্রভাতে জয়ী হই, বিশ্বভুবন বুঝবে—কি সৌন্দর্যে আমি মত্ত মাতাল হয়ে রয়েছি। আর যদি পরাজিত হই, তবু রাজকন্যা লেখাকে আমি আমার সুন্দরীর আভাস দিয়ে যাব। চিত্রপটে আমি তার রূপরেখা যতটুকু ফোটাতে পারি, সেইটুকু লেখাকেই উৎসর্গ করে যাব।—সেই হবে আমার জীবনের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ উৎসর্গ! লেখা সেই রূপরেখা ধ্যান করতে করতে আরো সুন্দর হবে, আরো অপরূপ হবে।

লেখা ॥ লেখাকে কেন এই উপহার?

রেখানাথ ॥ আমি জানি সে আমাকে ভালোবেসেছে। [বলিয়াই চকিতে অলিন্দ-পথে অন্তর্হিত হইলেন। লেখা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

[[illegible] লেখাকে [illegible] মাধবিকা আসিয়া বিস্ময় [illegible] লেখাকে স্পর্শ করিয়া সচকিত করিল।

মাধবিকা ॥ [illegible] এখনো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো?—সরো, সরো, ছুটে পালাও। ওরা এখানে উঠে আসছে।

লেখা ॥ কারা?

মাধবিকা ॥ [illegible]

লেখা ॥ তুমি জানলে কেমন করে?

মাধবিকা ॥ আমি আড়ি পেতে বসেছিলাম। ওদের সব প্রেমালাপই শুনেছি। এখন ওদের বেড়াবার সখ হয়েছে। ঐ জোৎস্না উঠেছে। বসন্ত সমীরণ ভেসে আসছে। প্রেম-সাগরে তুফান উঠেছে

লেখা ॥ কবিত্ব থাক। শোন—

মাধবিকা ॥ বলো—

লেখা ॥ আমার ঘরে চল, সুলেখাকে আমার অনেক কিছু বলবার আছে। কিন্তু নিজমুখে তা বলতে সাহস পাচ্ছি না। লজ্জা হচ্ছে। তুমি আমার দূতী হ'য়ে তাকে তা নিবেদন কর।

মাধবিকা ॥ কিন্তু তাকে একলা পাবার সুযোগ পেলে হয়। ঐ তারা আসছে!—চল পালাই [লেখার হাত ধরিয়া অতিথি-নিবাসে আত্মগোপন]

[কিছু পরে, সুলেখা ও জয়াদিত্য হাত-ধরাধরি করিয়া অলিন্দপথে দরবারকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।]

জয়াদিত্য ॥ এই জ্যোৎস্না-রাত্রে তুমি আমার কোলে মাথা রেখে গান গাও, আমি শুনি !

সুলেখা ॥ গান নয়। তুমি গল্প কর আমি শুনি। তোমার যুদ্ধজয়ের কাহিনী বল, তোমার কীর্তি কাহিনী বল, দেশের সার্বভৌম নবপতি তুমি, কি তোমার গৌরব, কি তোমার গর্ব, আমাকে বল···আমি শুনব !

জয়াদিত্য ॥ বলবো। সব বলবো।···কিন্তু আমি কি শুধু বলবই ? শুনব না ?

সুলেখা ॥ বেশ, তবে শোন

[সুলেখা গান গাহিলেন। গান শুনিতে শুনিতে জয়াদিত্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন।]

সুলেখা ॥ [গীতান্তে] একি ! তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ ? [কিয়ৎক্ষণ তাঁহার ঘুমন্ত সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া] না থাক।··· সাবাদিন যুদ্ধোদ্যমের শ্রমে ক্লান্ত তুমি·· ঘুমাও। আমি গান গাই। সেই স্বপ্নেব গান, যার আরম্ভও জানিনা—কখন যে ভেঙ্গে যাবে তাও জানিনা ! কি বহস্যময় এই স্বপ্নের জীবন, অথবা জীবনেব স্বপ্ন !

[তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। অতি শঙ্কিত চরণে মাধবিকা আসিয়া সুলেখার অঙ্গ স্পর্শ করিল। সুলেখা চমকিয়া উঠিলেন।]

সুলেখা ॥ কে ?

মাধবিকা ॥ চুপ ! [নিম্নকণ্ঠে] শুনে যাও—

সুলেখা ॥ কোথায় ?

মাধবিকা ॥···নির্জনে !··· চল ঐ বিলাস-কক্ষে—

[সুলেখা অঙ্গুলি নির্দেশে জয়াদিত্যকে দেখাইলেন।]

ঘুমিয়ে রয়েছেন থাকুন। ওঁকে না জাগানোই ভাল।—জাগালে আমাদেব কথা কইবার সুযোগ হবে না, অথচ বড় জরুবী কথা—

সুলেখা ॥ কিছু কি প্রকাশ পেয়েছে ?

মাধবিকা ॥ তুমি এসে শুনে যাও বোন !

[নিতান্ত অনিচ্ছাতেই সুলেখা মাধবিকার পশ্চাদ্‌বর্তিনী হইলেন। যাইবার সময় দরবার-কক্ষের পর্দা টানিয়া দিয়া গেলেন। তাঁহার অলিন্দপথে গিয়া বিলাসকক্ষের পর্দা অপসারিত করিয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।]

সুলেখা ॥ কি বোন ?

মাধবিকা ॥ লেখার কাজ শেষ হয়েছে।

সুলেখা ॥ কিন্তু, কিন্তু, .. রাত কি ভোর হয়েছে ?

মাধবিকা ॥ না এখনো বিলম্ব আছে। শোন বোন ! কাল প্রভাতে চিত্রকর রেখানাথ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে উপনীত হবেন। আজ রাত্রে সেই মৃত্যুপথ যাত্রীকে পরীক্ষা করবার জন্য লেখা, তোমার হাতে তার আজ রাত্রির

পত্নীত্ব সমর্পণ ক'রে অভিসারিকা সেজেছিল—হ্যাঁ, এ অভিসারিকা ভিন্ন আর কি!

স্থলেখা ॥ [আপন মনে] চন্দ্রমা তো এখনো অস্ত যায়নি!

মাধবিকা ॥ লেখার সেই পরীক্ষা শেষ হয়েছে।

স্থলেখা ॥ কিন্তু আমার স্বপ্ন তো এখনও শেষ হয়নি!

মাধবিকা ॥ শোন বোন—

স্থলেখা ॥ না...না...ব'লো না, ব'লো না...রাত্রি শেষ হোক, তাঁর ঘুম ভাঙ্গুক...

মাধবিকা ॥ স্থলেখা!

স্থলেখা ॥ চুপ!

মাধবিকা ॥ তবে শোন—

স্থলেখা ॥ বল,...বল...না—না ব'লো না!

মাধবিকা ॥...তুমি বুঝেছ!...লেখা এখন তোমার হাতের ঐ অঙ্গুরীয়ক ফেরত চায়—

স্থলেখা ॥ ওঃ! [আর্তনাদ করিয়া সুখাসনে এলাইয়া পড়িলেন]

মাধবিকা ॥ স্থলেখা! স্থলেখা! আমি ঐ পর্দার আডালে যেন কার পায়ের শব্দ পেলাম...ওঠ... আত্মসংবরণ কর... অঙ্গুরীয়ক দাও...

স্থলেখা ॥ না...না—। [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

মাধবিকা ॥ সে কি!

স্থলেখা ॥ পারিনা, পারবো না। তাঁকে ছেড়ে দিতে পারবো না, তিনি আমাকে ভালোবেসেছেন! তিনি আমাকে তাঁর ইহকাল পরকাল নিবেদন করেছেন, আমিও তাঁকে নিজেকে সমর্পণ করেছি! এ তো একদিনের, এক রাত্রির ভালোবাসা নয় সখি!

মাধবিকা ॥ মনে রেখো তুমি তাঁর পত্নী নও।

স্থলেখা ॥ হ্যাঁ, মন্ত্রপাঠ হয়তো হয়নি। কিন্তু...না-না-না—এ যে কিসের বন্ধন আমি বলতে পারব না!

মাধবিকা ॥ লোকে বলবে এ ব্যভিচার।

স্থলেখা ॥ রাধিকার এই ব্যভিচার তাঁর মাথার মণি ছিল, আমার এই ভালোবাসা আমারও মাথার মণি!

মাধবিকা ॥ কিন্তু কথার তো আর সময় নেই! তুমি তবে রাজকন্যার প্রস্তাবে সম্মত নও?

স্থলেখা ॥ না—না--না! [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

মাধবিকা ॥ জীবনে বোধ করি এই প্রথম তোমার ভগিনীর অবাধ্য হ'লে।

সুলেখা ॥ ওঃ [মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন]

মাধবিকা ॥ মূর্খ তুমি ! জয়াদিত্য তোমাকে ভালোবাসেনি, ভালোবেসেছে রাজকন্যাকে। তাঁর ধারণা তুমিই রাজকন্যা। যে মুহূর্তে জানতে পারবে যে তুমি রাজকন্যা নও—সুলেখা, সেই মুহূর্তেই…

সুলেখা ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] সে কি ?

মাধবিকা ॥ হ্যাঁ, সেই মুহূর্তেই তিনি তোমাকে ঘৃণায় পরিত্যাগ করবেন। যাও দেখি তুমি তাঁর কাছে একবার ঐ অঙ্গুরীয়ক ত্যাগ করে !

সুলেখা ॥ না—না—না ! তা কি সে পারে ? সে আমাকে মনে-প্রাণে ভালোবেসেছে—বলেছে, ওগো রানী ! যুগ-যুগান্তেও, জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়েও আমি তোমারই !

মাধবিকা ॥ অবোধ তুমি ! নিতান্ত সরলা তুমি ! তোমার অদৃষ্টে বহু দুঃখ আছে। এখনও সাবধান হও !…একবার গিয়েই দেখ না, তাঁর কাছে ঐ অঙ্গুরীয়ক ত্যাগ ক'রে ?

সুলেখা ॥ হ্যাঁ, যাব। তাতে আমার ভয় নেই ! আমি তাঁর কালো চোখে তাঁর মনের অন্তরতম কথাটি পর্যন্ত পড়েছি…হ্যাঁ যাব। এই নাও তোমার অঙ্গুরীয়ক [অঙ্গুরীয়ক দান] আমি চললাম ! আমি তাঁকে সব খুলে বলব ! তবু দেখবে সে আমারই, আমি তাঁরই !

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে পার্শ্বস্থ দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মাধবিকা তাঁহার এই উন্মাদনা লক্ষ্য করিয়া অবাক হইয়া রহিল। তাহার চমক ভাঙিল তখন যখন পরে লেখা আসিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন।]

লেখা ॥ অঙ্গুরীয়ক ?

মাধবিকা ॥ নাও [অঙ্গুরীয়ক দান]…কিন্তু প্রথমে সে কিছুতেই স্বীকৃত হয়নি !

লেখা ॥ আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। কিন্তু কি করবো ! উপায় নেই ! অরূপ-রতন আশা করে রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি। কি পাব কে জানে ?

মাধবিকা ॥ সুলেখা সেজে তবে আশা মিটলো না ?

লেখা ॥ মিটলো না ! মিটলো না ! . কোথায় যে কি পাব কে জানে ! আলেয়ার আলো লুকোচুরি খেলছে ! তারই পেছনে ছুটেছি আবার এই অঙ্গুরীয়ক নিয়ে। হয়তো তার উপহার পাবো।‥কিন্তু পাবো কি না তাই বা কে জানে ! ওগো, এই কি মরীচিকা ? মাধবিকা ! মাধবিকা ! মৃগতৃষ্ণিকার অর্থ জানিস ?

মাধবিকা ॥ রাত্রি শেষ হয়ে এলো। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও লেখা !

লেখা ॥ ঘুম ? আজ রাত্রে ঘুম ?…জীবনে আর ঘুম আছে কিনা তাই বা কে জানে !…না, না…আমি চললাম ! এইবার জয়াদিত্যের পরীক্ষা। আমার

ভাগ্যের জাল আমি নিজে বুনে যাচ্ছি! সেই জালে কে জড়িয়ে মরবে জানিনা!
…আমি নিজে? না জয়াদিত্য? না চিত্রকর?

[বিহ্বলভাবে পার্শ্বস্থ দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; মাধবিকাও তাঁহার অনুবর্তিনী হইল। প্রহর শেষের সানাই বাজিয়া থামিয়া গেল। ইহার পর দেখা গেল দরবার-কক্ষের পর্দা সরাইয়া সুলেখা ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত জয়াদিত্যকে জাগাইলেন।]

সুলেখা ॥ জাগো! ওগো জাগো! জাগো!

জয়াদিত্য ॥ কে?

সুলেখা ॥ বল দেখি কে! [দীপ নিভাইলেন]

জয়াদিত্য ॥ আমি দেখেছি।…তুমি আমারই হাতের লেখা। কিন্তু লেখা! অন্ধকারে এ আবার তোমার কি খেলা?

সুলেখা ॥ আলোতে নির্ভয়ে কথা বলা যায় না। আলোতে সত্য কথা দীপ্তি পায় না। অন্ধকারেই আজ আমাদের হৃদয় খুলতে হবে। আমি একটা দুঃস্বপ্নের কথা যদি তোমার কাছে বলি—

জয়াদিত্য ॥ তুমি কি ভয় পেয়েছ রানী?

সুলেখা ॥ ভয় পেয়েই তোমার কাছে ছুটে এসেছি—বলবো?

জয়াদিত্য। বল।

সুলেখা ॥ কিন্তু মনে কর আমি রাজকন্যা নই, আমি কোন অভাগিনী ভিখারী!

জয়াদিত্য ॥ রানী হ'তে হলে যে রাজকন্যা হতেই হবে, একথা তোমাকে কে বললে লেখা? আর ও কষ্ট-কল্পনারই বা প্রয়োজন কি?

সুলেখা ॥ আজ যদি আমি বলি, আমি লেখা নই, আমি সুলেখা—

জয়াদিত্য ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! অন্ধকারেও হীরক জ্বলে! তোমার হাতের ঐ হীরকাঙ্গুরীয়ক ঘোষণা করবে কে তুমি…কিন্তু একি! তোমার অঙ্গুরীয়ক?

সুলেখা ॥ নেই! নেই! ওঃ! [আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন]

[সহসা দীপ জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল সুলেখার পার্শ্বে মাধবিকা দাঁড়াইয়া আছে।

মাধবিকা ॥ সখি, এই তোমার হীরকাঙ্গুরীয়ক। [তাহার হাতে পরাইয়া দিতে দিতে]…তুমি হারিয়েছিলে, তোমার বোন পেয়ে আমাকে দিয়ে তোমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

সুলেখা ॥ ওঃ! [মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন]

জয়াদিত্য ॥ মাধবিকা! মাধবিকা! জল আনো! ব্যজন কর—

[সম্মুখস্থ পর্দা পড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে সমস্ত শিবির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। করুণ সুরে সানাই বাজিতে লাগিল। ক্রমে উষার আলো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শিবিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ দিয়া একদল বৈতালিক প্রভাতী গাহিয়া গেল। তাহারা যখন চলিয়া গেল তখন প্রভাত হইয়াছে। পাখীরা গান গাহিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে দরবার-কক্ষের পর্দা সরিয়া গেল। জয়াদিত্য বৃহদ্রথ এবং মন্ত্রী দরবার-কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। যুক্ত করে অপেক্ষমান দূত তাঁহাদের সম্মুখে আসিল।]

বৃহদ্রথ ॥ তোমার প্রভু কোথায় ?

দূত ॥ তিনি তাঁর চিত্রশালায়।

জয়াদিত্য ॥ তাঁর সুন্দরীশ্রেষ্ঠার চিত্র কই ?

দূত ॥ [নতশিরে নীরব রহিল]

জয়াদিত্য ॥ তাঁর সুন্দরীশ্রেষ্ঠার চিত্র কোথায় ?

দূত ॥ [তথাপি পূর্ববৎ নীরব]

বৃহদ্রথ ॥ এই মুহূর্তে উত্তর চাই ! বল দূত ! অবিলম্বে, নইলে—

দূত ॥ আমার যা বলবার আছে আমি নির্ভয়েই বলব।

জয়াদিত্য ॥ কথা রাখ।...বল, কোথায় তার সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠার প্রতিমূর্তি ?

দূত ॥ তিনি তা অঙ্কন করতে অক্ষম হয়েছেন।

জয়াদিত্য ॥ তা আমি বহু পূর্বেই জানতাম !

বৃহদ্রথ ॥ আমিও তা পূর্বেই জানতাম ! কিন্তু শুধু অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেই তো চলবেনা, আমার কন্যার বিশ্ববিজয়ী রূপের অমর্যাদা করবার গুরু অপরাধের দণ্ড ভোগ করতে হবে তাকে। মন্ত্রী, সেনাপতির প্রতি আদেশ ছিল উষা সমাগমেই সেই চিত্রীকে বন্দী করতে। আদেশ প্রতিপালিত হয়েছে কিনা দেখুন—

[মন্ত্রীর প্রস্থান]

দূত ॥ স্মরণ রাখবেন কুমার রেখানাথ যুগ-প্রবর্তক চিত্রশিল্পী। এই প্রতিভা অকালে ধ্বংস করলে ভবিষ্যৎ মানব-সমাজও আপনাকে ধিক্কার দেবে, আপনাকে অভিশাপ দেবে—

বৃহদ্রথ ॥ সে আমার কন্যার অপরূপ রূপকে অপমান করেছে। অন্য কেউ এ অপমান করলে ক্ষমা করা যেত, কিন্তু ঐ যুগপ্রবর্তক শিল্পী আমার যুগবরেণ্যা কন্যাকে অপমান করেছে, যুগ-যুগান্তরও লোকে ইতিহাসের কল্যাণে এ কথা না জেনে ছাড়বে না। আমি শুধু সেইজন্য অপরিণামদর্শী চিত্রকরকে ক্ষমা করতে অক্ষম !

[চিত্রহস্তে লেখার প্রবেশ]

লেখা ॥ ক্ষমার প্রয়োজন নেই পিতা। চিত্র সে দিয়ে গেছে। আর, সে-চিত্র আমাদের রূপগর্ব চূর্ণ করেছে। এই দেখুন—[বৃহদ্রথের হস্তে চিত্রদান]

বৃহদ্রথ ॥ একি ! মা ! এ চিত্র তুমি কোথায় পেলে ?

লেখা ॥ সে কাল রাত্রে, ফুলশয্যার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সময় এই চিত্র আমাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে গেছে।

বৃহদ্রথ ॥ দেখ দেখি বৎস ! [চিত্রখানি জয়াদিত্যের হস্তে দিলেন]

জয়াদিত্য ॥ কিন্তু...এ যে রাজকন্যা লেখার মুখখানিই মনে করিয়ে দেয় !

লেখা ॥ হ্যাঁ রাজা !...ও লেখা-সুলেখারই প্রতিমূর্তিই ; কিন্তু ঐ ছবির মুখ

সৌন্দর্য আরো শতগুণে ফুটে উঠেছে ঐ ওষ্ঠের পাশে ঐ ছোট্ট কালো তিলটিতে —যা আমাদের কারো নেই !

বৃহদ্রথ ॥ সত্য ?

জয়াদিত্য ॥ [অধোমুখে] সত্য ।

লেখা ॥ [পিতাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া] এইবার আমাকে বিদায় দিন !

বৃহদ্রথ ॥ সে কি মা !

লেখা ॥ মনে মনে আমি তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেছি !...এইবার তাঁর পথেরই পথিক আমি । তাঁর পথই আমার পথ ।

বৃহদ্রথ ॥ সে কি কথা মা !...আসুক সে, সে কি বলে শুনি !

[সেনাপতি ও রেখানাথের শিষ্যের প্রবেশ]

বৃহদ্রথ ॥ একি সেনাপতি ! তুমি একা কেন ? রেখানাথ কোথায় ?

সেনাপতি ॥ জীবনের পরপারে ।

লেখা ॥ [পাংশু হইয়া] সে কি !

সেনাপতি ॥ আমি যখন তাঁর দেখা পেলাম, তখন তাঁর শেষ মুহূর্ত !...

শিষ্য ॥ মৃত্যুকে তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করলেন, কিন্তু কেন করলেন—আমি তাঁর প্রধান শিষ্য --আমিও জানি না ।

লেখা ॥ আমি জানি ! আমি জানি ! ওঃ ! [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অব্যক্ত বেদনায় অভিভূত হইলেন]

জয়াদিত্য ॥ কিন্তু তবে কি সে-ই আমাদের পরাজিত করে চলে গেল ? .. বল সেনাপতি, এখনও ছুটে গেলে কি তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ?

সেনাপতি ॥ তাঁর আত্মা নশ্বর দেহ বহুক্ষণ ত্যাগ করেছে ।

বৃহদ্রথ ॥ বৎস ..যাবে ?

জয়াদিত্য ॥ হাঁ যাব । সার্থক তাঁর দম্ভ । তাঁর জীবনের দম্ভ মরণে গগন-স্পর্শী হয়েছে । সম্ভ্রমে আমার মাথা নত হচ্ছে । আসুন পিতা...তাঁর মৃতদেহের সম্রাটোচিত সংকার ব্যবস্থা করি ।

বৃহদ্রথ ॥ চল ..

[একটি মৌন বেদনা সকলের চোখেমুখে প্রতিফলিত হইয়াছিল । সসম্ভ্রমে সশ্রদ্ধচিত্তে তাহারা রেখানাথের মৃত্যু-বাসরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন শুধু লেখা আর রেখানাথের সেই শিষ্য ।]

শিষ্য ॥ আপনিই কি রাজকন্যা লেখা ?

লেখা ॥ না—না—না !

শিষ্য ॥ তবে আমার গুরুর এই শেষ এবং শ্রেষ্ঠ দান...এই বস্ত্রাবৃত চিত্রখানি রাজকন্যার হাতে দেবেন...আমি আর বিলম্ব করতে পারছিনা !

লেখা ॥ দিন । [পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় চিত্রগ্রহণ]...সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য এই চিত্রে

লুকিয়ে আছে!...আমি খুলব! আমি দেখব! হ্যাঁ, আমার অধিকার আছে! [চিত্র আচ্ছাদন-মুক্ত করিলেন]. কিন্তু, কিন্তু...এ কি!

শিষ্য ॥ কি?

লেখা ॥ [চিত্রপট দেখাইয়া] চিত্রপট...শূন্য.. সাদা সম্পূর্ণ সাদা!. এতে রেখামাত্র পড়েনি!

শিষ্য ॥ ঐ হচ্ছে অরূপ-রতনের অরূপ চিত্র! রেখা দিয়ে তা আঁকা যায় না...গেলে, জগতে একমাত্র তিনিই তা আঁকতে পারতেন।—পরাজয়ের অভিমানেই তিনি জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। বিদায় দেবী! বিদায়।

[নমস্কার করিয়া প্রস্থান।]

লেখা ॥ অরূপ-রতন! অরূপ-রতন! [শূন্যে চাহিয়া] তুমিও আজ আমার অরূপ-রতন! তোমাকে প্রণাম! তোমাকে প্রণাম!

ভারতবর্ষ, কার্তিক, ১৩৩৩

বসুন্ধরা

কলিকাতার উপকণ্ঠে দ্বিতল একখানি গৃহের নিম্নতলস্থ উপবেশন কক্ষ। খুব দামী না হইলেও সুরুচিসঙ্গত সাজসজ্জায় উপবেশন কক্ষটি সুসজ্জিত। দেখিলেই বোঝা যায় ইহা কোন চিত্র-শিল্পীর কক্ষ। সম্মুখে ক্ষুদ্র বারান্দা। বারান্দার নিম্নে উপবেশন-কক্ষের সম্মুখে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে সদর দরজা।

বেলা অপরাহ্ণ। দেখা গেল উপবেশন কক্ষ হইতে বেলিফ তাহার লোকজন এবং দুই তিন জন ভদ্রলোক বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহস্বামী রঞ্জিত বসু বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। রঞ্জিতের ভৃত্য মধু প্রাঙ্গণে নামিয়া গেল।

বেলিফ ॥ [সঙ্গী এক ভদ্রলোকের প্রতি] পজেসন (possession) হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই [রঞ্জিতকে দেখাইয়া] উনি বাড়ী ভেকেট্ (vacate) করে দেবেন। আপনি ইচ্ছা করলে আপনার নতুন ভাড়াটে এখানে আজই পাঠাতে পারেন। [রঞ্জিতকে] কি বলেন মশাই?

রঞ্জিত ॥ হ্যাঁ, সন্ধ্যার পর।

বেলিফ ॥ সদর দরজায় আমার লোক পাহারা রইল। আসুন।

[তাহারা চলিয়া গেল। ভৃত্য দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইল। রঞ্জিত উপবেশন-কক্ষে গিয়া তাহার আসনে বসিয়া ছবি আঁকিতে লাগিল। মধু দরজায় দাঁড়াইয়া বাহিরে উঁকি দিয়া কি দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া রঞ্জিতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেই...]

রঞ্জিত ।। [মধুকে কোন কথা বলিতে অবসর না দিয়া] হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবেনা মধু! ক'টা বাজে খেয়াল আছে ? রানী যে এখনি আসবে—

মধু ।। কি করতে হবে দাদাবাবু ?

রঞ্জিত ।। কি করতে হবে ! কেন, রানী স্কুলে যাবার সময় কিছু বলে যায়নি ?

মধু ।। স্কুল ছুটির পর তাঁর সঙ্গে স্কুলের হেড্‌মিসট্রেস ছবি দেখতে আসবেন।

রঞ্জিত ।। শুধু আসবেন ! তাঁদের চা দিতে হবে না ? রানী বলেনি ?

মধু ।। বলেছেন। কিন্তু—

রঞ্জিত ।। স্কুল ছুটির আর বেশি বাকি কি ?

মধু ।। শুধু চা তো আর চলবে না !

রঞ্জিত ।। তাই কি চলে মধু ? কোনোদিন তা চলেছে ? . ও, টাকা ?

মধু ।। [মুখ নত করিল]

রঞ্জিত । [হঠাৎ তাহার হাতঘড়ি ও দেয়াল ঘড়িটা দেখিয়া] দেখেছ ! আবার তিন মিনিট স্লো ! নাঃ আর পাবলাম না। এটা আর কোন মতেই হাতে রাখা চলেনা। যাও তো মধু, রমেশকে এটা দিয়ে এস – রমেশ··· চোরাবাজারে যার কারবার·· আঃ—আমাদের এই গলির মোড়ে যার বাসা,— হ্যাঁ, আমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে আছে। গেলেই নেবে—সঙ্গে সঙ্গে তোমায় দশটা টাকা দেবে— টা কয়টি নিয়েই কেকের দোকানে ছুটবে—

মধু ।। আপনি বলছেন কি দাদাবাবু ? এটা যে আপনার বিয়ের ঘড়ি। দামী ঘড়ি ' স্লো যাচ্ছে এটা ? আর ঠিক চলছে ঐ সাত টাকার জাপানী ঘড়ি ?

রঞ্জিত ।। তোমার সঙ্গে তো আমি বকতে পারবো না মধু। যা বলব তা যদি না শোন, তোমাকে আমার বলবার কিছু নেই। [ঘুরিয়া বসিয়া তুলিতে রঙ নিল]

মধু ।। আর ঘড়িটা বাইরে নিয়ে যেতেই বা দেবে কেন ? বাইরে যা' পাহারা—

রঞ্জিত ।। চুরি করে কিছু করা হচ্ছে না মধু। বে-আইনীও নয় !··· পাহারাকে এ কথা বলা আছে। [একটু থামিয়া] এই ঘড়িটার ওপর তোমার যে মমতা দেখছি···আমার ওপর তোমার ততটুকু মমতা থাকলে তোমাকে আমার এতকথা বলতে হোতনা মধু !

মধু ।। [হাতঘড়িটা তুলিয়া লইয়া] শুধু কেক, না আর কিছু ?

রঞ্জিত ।। যেন তুমি এ বাড়িতে কাউকে খাওয়াওনি মধু ! [মধু যাইতেছিল] শোন—[চারিদিক একবার দেখিয়া লইয়া] রানী এ সব কিছুই জানেনা। তুমি তাকে কিছু বলো না মধু।

[illegible]

রঞ্জিত ॥ যা বলতে হয় আমিই বলব। নতুন বাসা আমি দেখে রেখে এসেছি। সন্ধ্যার আগে যদি এই ছবিটা শেষ করতে পারি, কিছু টাকা আজই পাব.. এবং পেলে আজই রাত্রেই সে বাসায় উঠে যাব। তুমি এস মধু—ছবিটা আমাকে এখনি শেষ করতে হবে।

[মধু চলিয়া গেল। রঞ্জিত তাহার কাজে মন দিল। হঠাৎ বাহিরে একটা গোলমাল শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। রুদ্ধশ্বাসে দ্রুতপদে সে সদর দরজার অন্তরালে গিয়া গোলমালটা বুঝিতে চেষ্টা করিল।]

পাহারাদার ॥ না—না—এ চলবে না—চলবে না—

মধু ॥ শোন—শোন—[ফিস্ ফিস করিয়া সে কি কহিল]

পাহারাদার ॥ কই, দেখি।

[মধু বোধ হয় কিছু দেখাইল]

হাঁ, এটার কথা বলা আছে। শুধু এই ঘড়িটা, আর কিছু না। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওঠা নিয়ে যেতে পাব !

[মধু চলিয়া গেল, বোঝা গেল। রঞ্জিত ধীরপদক্ষেপে উপবেশনকক্ষে ফিরিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ তাহার কি মনে হইল। সে দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল : চাপা গলায় পাহারাদারকে কি কহিল। পাহারাদার উচ্ছ্বসিত উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল :—]

পাহারাদার ॥ আচ্ছা—আচ্ছা তাই হবে বাবু। ওদের আমি কিছু বলব না। দেখবেন দাঁড়িয়ে সেলাম করবো। আমাকে কিন্তু ফাঁকি দেবেন না বাবু। আচ্ছা—আচ্ছা—আপনি যান— ভাববেন না।

[রঞ্জিত উপবেশনকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাজে মন দিল এবং মাঝে মাঝে গুণগুণ করিয়া গাহিতে লাগিল—]

পথ হারিয়ে গেছে আমার হাটের জনতায়।
কোন দেশে মোর সোনার কুড়ে বলবে কে গো হায় ॥

[পা টিপিয়া টিপিয়া ধীরে ধীরে রানী বাহির হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। মুখে চাপা হাসি। দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ রঞ্জিতের গুণ গুণ গান শুনিল—ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। রঞ্জিত একমনে কাজ করিয়া যাইতেছিল—রানী তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। দেশলাই-এর বাক্সটি লইয়া তাহা হইতে একটি কাঠি বাহির করিয়া তাহা রঞ্জিতের কানের কাছে ধরিয়া জ্বালাইবার উপক্রম করিয়া—চীৎকার করিয়া উঠিল 'বাঃ'। রঞ্জিত চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলেই রানী তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের সামনেই দেশলাইটি জ্বালিয়া দিল। রঞ্জিত পুনরায় চমকিয়া উঠিয়া মুখ সরাইয়া লইতেই—তাহার চেয়ার উল্টাইয়া যাওয়ার মতো হইল। রঞ্জিত ভূপতিত হইতে হইতে বাঁচিয়া গেল।]

রানী ॥ [খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, চট্ করিয়া থামিয়া গিয়াই রঞ্জিতের দিকে পিছন ফিরিয়া] আমি দেখিনি—আমি কিছু দেখিনি—আমি এখানে ছিলাম না। আমি কিছু দেখিনি—আমি এই দেওয়াল। দেওয়ালের কান আছে কিন্তু চোখ নেই, হ্যাঁ—

[রঞ্জিত উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। [illegible] [illegible] রানীর পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিল।]

রানী ॥ উঃ ছাড়ো—হেড্ মিসট্রেস! হেড্ মিসট্রেস!

[রঞ্জিত 'হেড্ মিসট্রেস' শুনিয়াই চট করিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া প্রাঙ্গণের দিকে তাকাইল।]

রঞ্জিত ॥ [প্রাঙ্গণে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া] কই হেড্ মিসট্রেস?

বানী ॥ তাঁব বাড়ীতে। [মুখ বুজিয়া হাসিতে লাগিল]

রঞ্জিত ॥ তিনি এলেন না যে?

রানী ॥ নিশ্চয় আসবেন।

রঞ্জিত ॥ তোমার সঙ্গে আসবেন কথা ছিল—

বানী ॥ কথা তাই ছিল। শেষে কথা হল আমি তিনটেয় স্কুল থেকে বেব হয়ে মার্কেট হয়ে বাড়ী ফিবব। তিনি স্কুল থেকে সোজা এখানে আসবেন চাবটেয়।

রঞ্জিত ॥ মার্কেটে গিয়েছিলে?

বানী ॥ [অপরূপ ভঙ্গিতে] হ্যাঁ।

রঞ্জিত ॥ এদিকে আমি মধুকে—

বানী ॥ এদিকে আমি মধুকে বাড়ী ফেববাব পথে পেলাম। কেক কিনে বাড়ী ফিবছিল। ওকে বাসে কবে কমলালয় স্টোর্সে পাঠিয়ে দিলাম—সেখানে আমাব সব সওদা রেখে এসেছি যে। . . বলতো কি সওদা?

রঞ্জিত ॥ ও .আজ তুমি মাইনে পেয়েছ?

বানী ॥ নিশ্চয়। বলতো ক'মাসেব?

রঞ্জিত ॥ ক'মাসেব?

বানী ॥ বল—

রঞ্জিত ॥ কি কবে বলব।

বানী ॥ আমাব চোখ মুখ দেখেও বুঝতে পাবছো না? আগে তো আমাব চোখ দেখেও তুমি সব বলতে পাবতে। আজ পাবছ না কেন?

রঞ্জিত ॥ বিপদেব কথা বানী।

বানী ॥ আগে তুমি আমাব কথা সব সময় ভাবতে। . আচ্ছা আমি যদি এখন নাচি, তাহলেও কি বলতে পাববেনা, ক'মাসেব মাইনে একসঙ্গে পেয়েছি! নাচি?

রঞ্জিত ॥ দু'মাসেব?

বানী ॥ না নাচতেই তুমি কেন বললে? নাচবাব জন্যে আগে কত সাধ্য-সাধনা কবতে, আব এখন নাচতে চাইলেও—

রঞ্জিত ॥ হেড্ মিস্ট্রেস এসে পডবেন যে। নাচবে রাত্রে। এখন বল দেখি কি কি কিনলে?

রানী ॥ বলব কেন ?

রঞ্জিত ॥ বল না . শুনি—

রানী ॥ মধু এলেই দেখবে। দেখো, কিন্তু—

রঞ্জিত ॥ কি ?

রানী ॥ চম্‌কে উঠো না—

রঞ্জিত ॥ চম্‌কে দেবার মতও কিছু আছে নাকি ?

রানী ॥ আছে।

রঞ্জিত ॥ কি ?

রানী ॥ একটা দেশলাই ! [কৌতুকভরা চোখে হাসিতে হাসিতে দূরে সরিয়া গেল ! দেওয়াল-ঘড়িতে সাড়ে তিনটা বাজিল]

রানী ॥ [দেওয়াল-ঘড়ি এবং নিজের হাতঘড়ি মিলাইতে গিয়া] বাঃ তোমায় দেওয়াল ঘড়ি দেখি রেস্‌ খেলছে ! আমার ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বাজতে এখনো দশ মিনিট।

রঞ্জিত ॥ [ছবি আঁকিতে আঁকিতে] তার মানে বেসে তুমি হেরে গেলে রানী !

রানী ॥ [রঞ্জিতের কাছে ছুটিয়া আসিয়া] আর তুমি ? তোমার ঘড়ি কই ?

রঞ্জিত ॥ [হঠাৎ এই প্রশ্নে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু আত্মস্থ হইয়া সহজ-ভাবে] আমি আরো বেশি করে হারছিলাম।

রানী ॥ [অসহিষ্ণু ভাবে] ঘড়িটা কই ?

রঞ্জিত ॥ বললাম যে ! আমারটা আরো বেশি স্লো যাচ্ছিল—তাই তাকে হসপিটাল পাঠিয়েছি।

রানী ॥ সারতে দিয়েছ ?

রঞ্জিত ॥ [মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্তি হইলনা] ফেলে দিয়েছি।

রানী ॥ তার মানে ?

রঞ্জিত ॥ [রানীর মুখপানে চাহিয়া ম্লান হাস্যে] ফে—লে দিয়েছি

রানী ॥ দেখ, আমার বিয়ের ঘড়ি নিয়ে ওরকম তামাসা করলে সত্যি আমি ভারি চটে যাব কিন্তু—

রঞ্জিত ॥ [চুপ করিয়াই রহিল]

রানী ॥ বল না ঘড়িটা কই ?

রঞ্জিত ॥ যা বলবার আমি বলেছি রানী।

রানী ॥ বটে ! আচ্ছা আমি দেখে আসছি [ত্বরিৎপদে উপরে উঠিয়া গেল]

[রঞ্জিত তুলি রাখিয়া দুই গালে হাত দিয়া কয়েক মুহূর্ত কি ভাবিল। ইতিমধ্যে মধু আসিয়া দাঁড়াইল। মধুর এক হাতে একটি পোর্টেবল গ্রামোফোন অন্য হাতে একটি থলি। থলিটি জিনিষপত্রে বোঝাই। বগলে কতকগুলি ছোট বড় প্যাকেট। অবাক হইয়া মধুর দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। পরে]

রঞ্জিত ॥ রানী কিনেছে ?

মধু ॥ তবে আর কে কিনবে দাদাবাবু ?

রঞ্জিত ॥ গ্রামোফোন।

মধু ॥ শুধু গ্রামোফোন ! কমলালয় স্টোর্সে আর যে কি আছে তাতো জানি না দাদাবাবু ! দেখ [জিনিসগুলি বাহির করিতে লাগিল—রঞ্জিত নীরবে দেখিয়া যাইতে লাগিল]

একটি পোর্টবল্ গ্রামোফোন। খানকতক রেকর্ড। চারটা ফুলদানী। একটা ভালো টি-সেট্। জানালার ভালো পর্দা, আধ ডজন। একটা ভালো টেবিল ক্লথ। সেফ্‌টি রেজারের বাক্স। একটি হোল্ড-অল ! একটা ইক্‌মিক্ কুকার। কিছু ডালমুট—কিছু লজেন্স। আমার কেনা কেক। দুইটি ফুলের মালা। দেখলে দাদাবাবু ?

রঞ্জিত ॥ দেখলাম।

মধু ॥ এ সব কি হবে ? সন্ধ্যে বেলাই তো—

রঞ্জিত ॥ চুপ।

[নিস্তব্ধতা]

রঞ্জিত ॥ এগুলো রানীকে দাও গিয়ে। টাকা পেয়েছিলে ?

মধু ॥ হাঁ দাদাবাবু। কেক কিনেছি এই ফিরেছে - [গুণিয়া ৮ টাকা চোদ্দ পয়সা রঞ্জিতকে দিল। রঞ্জিত উহা পকেটে রাখিল]

রঞ্জিত ॥ তুমি গিয়ে চা কর। ঠিক চারটেয় হেড্‌মিস্‌ট্রেস আসবেন। কোন কিছু ত্রুটি না হয় মধু, বিশেষ আজ। [একটু পরে] হেড মিসট্রেস নাকি ওকে হিংসা করে, রানী কতদিন আমায় বলেছে। রানীর সৌভাগ্যের সেই গৌরব আজ হেড্‌মিসট্রেসের সামনে বজায় রাখতে হবে। [মধু চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় রানী দ্বিতল হইতে ছুটিয়া নিচে নামিল]

রানী ॥—[উচ্ছসিত কণ্ঠে] এসেছে মধু !···[ছুটিয়া গিয়া গ্রামোফোনটি খুলিয়া তাহাতে দম দিতে দিতে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া যাইতে লাগিল] আমার অনেক কালের সখ—রাত্রে যখন কথা বলে বলে আর কিছু বলবার থাকেনা—তখন এটা—আজ আমরা সারারাত জেগে দুজনে—[হঠাৎ দম দেওয়া বন্ধ করিয়া] ঐ পর্দাগুলো দেখেছ ? [ছুটিয়া গিয়া পর্দাগুলো ধরিল। তাহা হইতে একটা তুলিয়া লইয়া একটা জানালায় ছুটিয়া গিয়া তাহাতে উহা লাগাইতে লাগাইতে] এর চেয়ে ভাল ডিজাইন রাজা মহারাজার বাড়িতেও নেই, আমি জোর করে বলতে পারি।

[লাগানো শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ আবার কি মনে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে সে গম্ভীর হইয়া গেল। পর্দাটা ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া একটি ফুলের মালা তুলিয়া লইয়া, দেওয়ালে টাঙানো তাহার মৃত খোকার তৈলচিত্রে উহা পরাইয়া দিল]

যেটা আগে করবার সেইটাই গেলাম ভুলে ! এমন ভুলতো আমার

আগে কখনও হ'ত না—কখনো না। [গ্রামোফোনটিতে ধীরে ধীরে দম দিতে দিতে] ওর কথা তো কখনো ভুলতে পারিনা। স্কুলে পড়াচ্ছি—ওর কথা মনে পড়ে, পড়াতে হয় ভুল···একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করলে "আকবরের ছেলের নাম কি দিদিমণি ?" আমি বল্লাম ! ওরা সবাই হেসে উঠল ; রেগে উঠলাম, জিজ্ঞেস করলাম "হাসছ কেন ?" ওরা বললে "হ্যাঁ দিদিমণি, আকবরের ছেলের নাম খোকা ?'···হ্যাঁ, আমি নাকি বলেছিলাম 'খোকা।'

রঞ্জিত ॥ [রানীর মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে] মালাটা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওখানে ! ভারী সুন্দর ! না ?

রানী ॥ ছাই মানিয়েছে। মালাটা ও এতক্ষণ ছিঁড়ে ফেলত। ছিঁড়ে ফেলেই ফুলগুলো তুলতো আর ছিঁড়তো ! ছিঁড়তো আর হাসতো। ঘরময় ফুলের পাপড়ি ..আমি বকতে এসে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখতাম ! সেই ভালো, না, ঐ ভালো ! ছাই ! [মালার দিকে তাকাইয়া] ওটা ওখানে থাকবে না—[মালাটা খুলিয়া আনিতে যাইতেছিল—রঞ্জিত তাহার ধরিয়া ফেলিল]

রঞ্জিত ॥ থাকগে···নতুন কি গান এনেছ বলতো ?

রানী ॥ কি জানি কি এনেছি !

রঞ্জিত ॥ আমার জন্যে কি এনেছো ?

রানী ॥ [ছুটিয়া গিয়া সেফ্‌টি রেজারের বাক্সটি আনিয়া রঞ্জিতের টেবিলের উপর রাখিয়া] ফিট কর [ছুটিয়া গিয়া সেভিং ষ্টিক্ জলে ডুবাইয়া রঞ্জিতের গালে সাবান দিতে গেল।]

রঞ্জিত ॥ আঃ আমি আজ সকালেই কামিয়েছি যে !

রানী ॥ [কিছুমাত্র না দমিয়া রঞ্জিতের মুখ এক হাতে ধরিয়া অন্যহাতে তাহার মুখে সাবান মাখাইয়া যাইতে লাগিল] সে কি হয় ! আমি খুঁজে খুঁজে নতুন দিশি ব্লেড্ আনলাম। তোমাকে বলতেই হবে···বিলিতি ব্লেডের চেয়ে কিছুমাত্র খারাপ নয়—

রঞ্জিত ॥ পরীক্ষা করে দেখে সে কথা বললে স্বদেশীর অপমানই করা হবে রানী। . আঃ রানী—রানী—হেড্‌মিসট্রেস !

রানী ॥ [হাসিয়া উঠিয়া] ওতে আমি ভুলছিনা !···আচ্ছা, থাক। [চট্ করিয়া একটা তোয়ালে টানিয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া] ক্ষতি হয়নি, আরো সুন্দরই হল মুখখানি।.. ভারি লোভ হচ্ছে—

রঞ্জিত ॥ হচ্ছে নাকি ?

রানী ॥ ঐ ডালমুট। দেখলেই জিবে জল আসে। ·খাবে ?

রঞ্জিত ॥ [অভিমান] ডালমুট আমি খাইনা।

রানী ॥ তবে ঐ টেবিলক্লথটা টেবিলে পেতে ফেল। আমি ততক্ষণ—[বাহিরে গাড়ীর শব্দ] ঐ যাঃ এসে পড়েছে···ঐ ফুলদানী তিনটে ·ওটা নামাও—না-না হ'ল না;—তুমি সব—ওটা তোল—চেয়ারটা সরিয়ে দাও—জানালাটা খুলে দাও।

[নিজেদের মধ্যে যথাস্থানে সব সাজাইয়া রাখিয়া ছুটিয়া গিয়া চিরুনিটি লইয়া রঞ্জিতের চুলটি অতিক্রুত আঁচড়াইয়া দিয়া···নিজের বেশভূষা চট করিয়া দেখিয়া লইয়া চাপাগলায় রঞ্জিতকে রেডি? রঞ্জিত জানাইল 'রেডি' রানী তখন অচঞ্চল রূপে সহাস্য মুখে সদর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জিত তাহার অনুবর্তী হইল। উভয়ে সস্মিতমুখে হেড্‌মিসট্রেস্ শেফালী রায়কে অভ্যর্থনা করিল]

রানী ॥ আসুন—আসুন—[নমস্কারাদি বিনিময়ান্তে]

হেড্‌মিসট্রেস ॥ অনেকদিন আসিনি। আসবো-আসবো ভাবছিলাম —এমন সময় রানীই চায়ের নেমন্তন্ন করে বসল। [রানীকে] মানুষের মন যেন তোমার নখদর্পণে! কতক্ষণ ফিরেছ?

রানী ॥ এই তো সবে ফিরলাম!

[সকলে গিয়া উপবেশন কক্ষে বসিলেন]

হেড্‌মিসট্রেস ॥ [চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া] তোমাদের এখানে এলে আমার এত ভালো লাগে! অল্পের মধ্যে এরকম সাজানো সংসার আমার চোখে পড়েনা! এ যেন একখানা ছবি! এ বাড়ী ছেড়ে বাইরে বেড়াতে যেতেও বোধ হয় তোমাদের কষ্ট হয়, কি বল রানী? [জানালা-পথে তাকাইতেই] ক্রিসেন্থিমাম! কি সুন্দর ফুটেছে! অতবড় ডালিয়াও তো সচরাচর দেখিনা।

রঞ্জিত ॥ আপনাকে ভাগ্যক্রমে আজ যখন পেয়েছি, তখন, রানী, ওঁকেই মধ্যস্থ মানা যাক্ ···দেখতে কে বেশি সুন্দর মিসেস রায়?

রানী ॥ [হেড্‌মিসট্রেসকে দেখাইয়া দিয়া] মিসেস রায়।

রঞ্জিত ॥ [অপ্রতিভ হইল] না—না—আমি বলছিলাম ঐ ক্রিসেন্থিমাম না ডালিয়া?

হেড্‌মিসট্রেস ॥ না আমার হাস্টেস? [তিনজনেই হাসিতে লাগিলেন]

রঞ্জিত ॥ Comparison is odious. আচ্ছা, ও থাক। রানী চা দাও—

হেড্‌মিসট্রেস ॥ এত সকালেই বিদেয় করতে চাইছেন?

রঞ্জিত ॥ না—না, সে কি! রানী, তবে তোমার গ্রামোফোন—

হেড্‌মিসট্রেস ॥ আপনার ছবিটা বুঝি কিছুতেই দেখাবেন না! ছবি বোঝবার যোগ্যতা না থাকলে গ্রামোফোনই বাজাতে হয় রানী!

রঞ্জিত ॥ না,—না, সে কি! এই যে দেখুন না! [ছবি দেখাইতে বসিল। মধু আসিয়া দাঁড়াইল।]

মধু ॥ চা আনবো?

রানী ॥ আনো।

রঞ্জিত ॥ এই সবে শেষ করলাম! আপনার কি রকম লাগবে জানি না।

রানী ॥ মিস্টার বসু বলেন এই ছবির অন্তরালে নাকি কি গল্প লুকিয়ে

আছে। আমি তো খুঁজে পাইনা। দেখছি শুধু ধানের ক্ষেত, পাশে ছোট একখানা বাংলো বাড়ী—বাড়ীর সামনে কড়াই শুঁটির ক্ষেত—যেহেতু উনি… মিস্টার বসু, কড়াইশুঁটি খেতে ভালোবাসেন!

রঞ্জিত ॥ আমি না তুমি?

রানী ॥ জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলেই বুঝবেন অত কড়াইশুঁটি খাওয়া আমার তিন পুরুষেরও সাধ্য নেই।

রঞ্জিত ॥ কলে অফুরন্ত জল, অতএব রানী জল খায় না, বুঝলেন মিসেস রায়?

হেড্‌মিসট্রেস ॥ Silence! Silence!

রানী ॥ দেখুন তো!

হেড্‌মিসট্রেস ॥ কড়াইশুঁটি খেতে খেতে ওর ফুলগুলির কথা ভুলোনা রানী। কি চমৎকার রং! বাড়ী থেকে দেখছি একটা মেঠো পথ বেরিয়েছে… ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে কতদূর…উঃ…কতদূর চলে গেছে!…কিন্তু দৃষ্টির ঐ শেষে ওরা দুজন কে? মুখ যেন চেনা চেনাই মনে হয় রানী?

রানী ॥ [রঞ্জিতকে, সন্দিগ্ধভাবে] কে ওরা?

রঞ্জিত ॥ চিনতে পারছো না? চেনা উচিত।

রানী ॥ [রঞ্জিতের কাছে সরিয়া গিয়া, কানে কানে এবং সস্মিত সলজ্জ দৃষ্টিতে] আমরা?

রঞ্জিত ॥ আমরা কিনা সে তুমি বলবে। আমি বলব ওরা বসুন্ধরার ভাড়াটে। কোন অজানা দেশ থেকে ওরা দুজন—ঐ মানব আর ঐ মানবী পথ চলতে চলতে এই বসুন্ধরায় এসে পড়েছিল। বসুন্ধরার খানিকটা মাটি ওরা ভাড়া নিলো। ওরা সেই মাটিতে বাসা বাঁধলো, মাটি চষলো—আবাদ করলো—বীজ বুনলো—গাছ হ'ল—ফল ফললো—ফুল ফুটলো! দেহের রক্ত জল করে বসুন্ধরাকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর, ধনী থেকে আরো ধনী করে তুললো—এবং এমনি করে বসুন্ধরার ভাড়া মিটিয়ে ওরা মনের সুখে পরমানন্দে ঘরকন্না করতে লাগল!

রানী ॥ (হেড্‌মিসট্রেসকে) চমৎকার? না?

হেড্‌মিসট্রেস ॥ চমৎকার। তারপর?

রঞ্জিত ॥ এমনি করে কিছুদিন বেশ কাটলো। যত দিন যায়—তত আয়ু কমে—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা কমে আসে। ওদের এক ছেলে হ'ল। ওরা ভাবলো সে ওদের ক্ষতিপূরণ করবে! কিন্তু—

হেড্‌মিসট্রেস ॥ [দেওয়ালে টাঙানো ছবিটির দিকে চাহিয়া লইয়া] থাক—

রঞ্জিত ॥ তারপর—তারপর—কোথা থেকে কি হ'ল! হঠাৎ—হঠাৎ ওরা পেলো এক নোটিশ—এই মাটি এই ঘর এই বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে—আজই—

এখনই—এই জীবনসন্ধ্যায় তোমরা দূর হও, ঘরকন্না আর চলবেনা—ভাড়া তোমাদের বাকি পড়ে গেছে।

রানী॥ [অজ্ঞাত আতঙ্কে] সে কি! না—না, তা কেন হবে!

রঞ্জিত॥ [মৃদু হাস্যে] তাই তো হচ্ছে। সর্বত্র। এই বাড়িতে আমরা আজ বিশ বছর আছি। এই বাড়িতে আমার বাবা—আমার মা বাস করে গেছেন—এই বাড়িকে তাঁরা মনের মত করে সাজিয়েছেন—এই বাড়িতে আমরা মানুষ হয়েছি—এই বাড়িতে তাঁরা শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন—তাঁরা গেলেন—তুমি এলে—রূপে রসে গানে গন্ধে এই বাড়ি আবার ভরে উঠলো—মুগ্ধ হয়ে স্বর্গ থেকে ওই শিশু তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—কত খেলা সে খেললে—এখানে—ওখানে—সর্বত্র তার পায়ের ছাপ রেখে একদিন হঠাৎ পালিয়ে গেল। যাক্ সে—তবুও তো ক্রিসেন্থিমাম ফুটলো—ডালিয়া হেসে উঠলো…। এই তো তোমার বাড়ি? ভাড়া বাকি ফেলেছ কি, এ তোমার বাড়ি নয়।

রানী॥ তুমি কখনো ভাড়া বাকি ফেলোনা—

রঞ্জিত॥ আমার বলে কোন কথা হচ্ছেনা রানী। কথা হচ্ছে নিয়মের। শুধু কি ভাড়াটে বাড়ির কথাই হচ্ছে রানী? তা তো নয়! নিজের বাড়িতেই কি কেউ চিরকাল মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পেরেছে! যেতে হবে…সবাইকে একদিন এ সব ছেড়ে যেতে হবে। আমরা যাব আজ—আর কেউ যাবে কাল—কেউ যাবে পরশু! বসুন্ধরার আমরা কেউ নই রানী, কেউ নই। আমাদের দেশ এখানে নয়—এখানে নয়—

রানী॥ কোথায়?

রঞ্জিত॥ তাও জানিনা। না, হয়ত জানতাম কিন্তু এই মাটির মায়ায় যখন আমরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, তখন তা ভুললাম। কিন্তু আমরা যে ভাড়াটে এ কথাতো ভোলবার নয়! ভাড়া বাকি পড়লেই যে নোটিশ হয়, সেই নোটিশই কি তা স্মরণ করিয়ে দেয় না রানী?

রানী॥ যাও—তুমি আমাদের শুধু ভয় দেখাচ্ছ! [হেড্‌মিসট্রেসকে] আপনি এসব বিশ্বাস করেন?

হেড্‌মিসট্রেস॥ অন্তত: এটুকু বিশ্বাস করি যে ভাড়া বাকি পড়লে বাড়িওয়ালা নোটিশ দিয়ে অথবা না দিয়ে বাড়ি থেকে উঠিয়ে দেবে।—যাক্ …চমৎকার হয়েছে আপনার ছবি—অনেক নতুন কথাও শুনলাম। যদি কিছু মনে না করেন আজ আমি উঠি—আমার মাথাটা বডডো ধরেছে—

রানী॥ ধরবে না? মাথার আর দোষ কি! এ রকম গল্প শুনে আমার মাথাই টন টন করছে।

হেড্‌মিসট্রেস॥ [রানীকে] আচ্ছা ভাই আজ উঠি!

রানী॥ আর কি বলব! গাড়ী—?

হেড্‌মিসট্রেস ॥ না ভাই, গাড়ী তো রয়েছে। [রঞ্জিতকে] আমাদের ওখানে একদিন যাবেন—

রানী ॥ আমাকে বললেন না যে?

হেড্‌মিসট্রেস ॥ একজনকে বললেই যথেষ্ট। এ আমি জানি, যে কান টানলে মাথা আসে।

[এই কথোপকথনের মধ্যে তিনজন সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। রঞ্জিত দরজা খুলিয়া দিল। হেড্‌মিসট্রেস দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন]

হেড্‌মিসট্রেস ॥ রানী আজকাল দেখছি দরজায় দারোয়ান রাখো?

[রঞ্জিত তাহার অর্থ-শূন্য উচ্চহাস্যে রানীর উত্তর ডুবিয়া গেল। নমস্কারাদি বিনিময় পূর্বেই হইয়াছিল, হেড্‌মিসট্রেস গাড়ীতে চলিয়া গেলেন। রানী ও রঞ্জিত সদর দরজা বন্ধ করিয়া উপবেশন কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল।]

রানী ॥ বাইরে ও লোকটা কে?

রঞ্জিত ॥ [বুঝিতে পারিয়াও] কোথায়?

রানী ॥ আমি যখন আসি তখনও ওকে রোয়াকে বসে থাকতে দেখেছিলাম এখনো দেখি বসেই আছে!

রঞ্জিত ॥ [সহজভাবে] কি জানি কে! থাক না ক্ষতি কি! ছবিটার মর্মবাণী আজ বুঝলে?

রানী ॥ তুমি আজকের চায়ের আসরটা মাটি করলে! অমন সব ভয় দেখানো গল্প কি লোকের কাছে বলতে আছে? ছিঃ! লোকে কি ভাবে বলতো!...আচ্ছা, সত্যি কি এ বাড়ি থেকে আমাদের কোনোদিন উঠতে হতে পারে?

রঞ্জিত ॥ আমার যা বলবার তা তো খুব স্পষ্ট করেই বলেছি রানী!

রানী ॥ তুমি তো মাসে মাসেই ভাড়া মিটিয়ে দাও—না?

রঞ্জিত ॥ যদি দিই, উঠব না, যদি না দি, উঠতে হবে!

রানী ॥ আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বলতো! আমার সঙ্গে আগের মতো প্রাণ খুলে কথা বলোনা।

রঞ্জিত ॥ কি করে বুঝলে?

রানী ॥ আজ তুমি বলতে পারনি আমি ক'মাসের মাইনে পেয়েছি! কি কিনেছিলাম তাও বলতে পারলে না! আগে তো এমন ছিলনা! বাড়ি ফিরলেই তুমি বলতে রানী আজ তুমি স্কুলে মেয়েদের খুব বকেছ— আজ তুমি সেখানে গিয়েছিলে—ওখানে গিয়েছিলে? আমি অবাক হয়ে যেতাম! সব মিলতো!...তুমি আমার আগের মত ভালো বাসোনা—বাসোনা, না—না—না!

রঞ্জিত ॥ সত্যি?

রানী ॥ নয়তো কি!

রঞ্জিত ॥ আগে এমন ছিলে না?

রানী ॥ নিশ্চয়। না। শুভদৃষ্টির পর থেকে একটি মুহূর্তও তো আমি তোমাকে ভুলিনি!

রঞ্জিত ॥ তোমার সব মনে আছে রানী? এখনো, আজো?

রানী ॥ তোমার বুঝি নেই? দেখেছ... তাই তো বলছিলাম সুখের দিন আমার গেছে!

রঞ্জিত ॥ সুখের দিন বলতে বিশেষ করে কোনটি তোমার মনে হয় রানী?

রানী ॥ বিশেষ অবিশেষ আবার কি! প্রত্যেকটি দিন আমার চোখের সামনে ভাসছে।

রঞ্জিত ॥ তবু—তার মধ্যে—কোন দিনটি—কোন দিনটি সব চেয়ে সুখের মনে হয় রানী?

রানী ॥ বলব?

রঞ্জিত ॥ বলতো—

[সদর দরজার বাহির হইতে ঘন ঘন করাঘাত]

রানী ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] কে?

রঞ্জিত ॥ [চাঞ্চল্য দমন করিয়া] আমি দেখছি—[ছুটিয়া গিয়া সদর দরজা খুলিলেন]

বাইরে থেকে পাহারাদার ॥ সন্ধ্যা তো হয়ে এল বাবু! তাদের লোক খোঁজ নিতে এসেছে?

রঞ্জিত ॥ আর আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টার বেশি কিছুতেই নয়।

[সদর দরজা বন্ধ করিয়া রানীর কাছে আসিয়া দেখে রানী ছবিটি দেখিতেছে।]

রানী ॥ কে?

রঞ্জিত ॥ ছবি শেষ করবার তাগিদ।

রানী ॥ দেখ, ছবিটা কি না বিক্রি করলেই নয়? আমার ভারী ইচ্ছে হচ্ছে এ ছবিটা আমাদের ঘরেই থাক। সত্যি কথা বলতে কি পরের ঘরে তোমার ছবি যায়, আমার ভালো লাগেনা। তোমার ছবি দিয়ে আমার ঘর সাজাবো। [ছবিটা নির্দেশ করিয়া] আচ্ছা ওরা দুজনে পথের শেষে গিয়ে অমন করে পিছু ফিরে চেয়ে আছে কেন?

রঞ্জিত ॥ ঐ ভাড়া-বাড়ির মায়া। এই যে ভাড়া-বাড়ি, এই বিদেশের গেহ...এর জন্যে—এর জন্যে আমাদের চোখে জল আসে। বসুন্ধরা আমাদের দেশ নয় রানী জানি। কিন্তু এই বিদেশের মায়াই আমাদের সারাটা জীবন আচ্ছন্ন করে রাখে নাকি? যাক সেকথা। রানী, শুভরাত্রির পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত তোমার স্মৃতির পটে এঁকে রেখেছ, সত্যি?

রানী ॥ নয়তো কি?

রঞ্জিত ॥ বিয়ের পর তুমি এই বাড়িতে এলে। না? তারপর সেই এক

রাত্রে হঠাৎ আমাদের মনে হল ঘর আর আমাদের ভালো লাগছে না...আমরা পালাব। মনে আছে? কি ছেলে-মানুষই আমরা ছিলাম তখন?

রানী॥ মনে নেই? প্রথমটায় আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না! কি বোকাই আমি ছিলাম! শেষটায় তুমি আমায়—ছিঃ ভাবতেও লজ্জা হয়!

রঞ্জিত॥ এখানে তো কেউ নেই রানী! লজ্জা কি? শেষটায় আমি তোমার পায়ে ধরে সাধলাম···তখন আর কি কর! রাজি হলে!

রানী॥ ওমা! পালাতে সে কি ভয়! অমন ভয় আমি জীবনে আর কখনো পাইনি!

রঞ্জিত॥ অমন আনন্দ আমি জীবনে আর পেলাম না! টাকাপয়সা ইচ্ছে করলেই সঙ্গে নিতে পারতাম—কিন্তু নিলাম না! অন্ধকার রাত্রে দুজনে হাত ধরাধরি করে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম! চলতে চলতে রাত ভোর হয়ে গেল। তখন তোমার সে যে কি নিদারুণ লজ্জা, মনে আছে?

রানী॥ আর তোমার? সে কি নিদারুণ ভয়। সে কথা বুঝি ভুলে গেছ?

রঞ্জিত॥ আচ্ছা বেশ। লজ্জায়ই হোক আর ভয়েই হোক অবশেষে আমরা ইডেন গার্ডেনে গিয়ে উঠলাম। লাভার্স বাওয়ারে সারাটা সকাল কাটল.. দুপুরও! ক্ষিদে পেল না—তৃষ্ণা পেল না।

রানী॥ পেলো না আবার!

রঞ্জিত॥ পেল···কিন্তু...গেলও তো! একথা কি সত্যি নয় রানী? চুমু খেয়ে খেয়েই আমরা সারাটি দিন কাটিয়ে দিলাম। কোন কষ্ট হয়েছিল রানী?

রানী॥ কিন্তু কি দশাটা তুমি আমার সেদিন করেছিলে মনে আছে?

রঞ্জিত॥ কই সেদিন তো কিছু বলনি!

রানী॥ আজ যদি হয়, আজো বলব না। ও বুঝি বলবার কথা?···কিন্তু [সকৌতুকে] তারপর? তারপর?

রঞ্জিত॥ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বিকেল বেলা বায়ুসেবন উদ্দেশ্যে দাদামশায়ের প্রবেশ।

রানী॥ সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ মর্দন—দেখতে দেখতে সেখানে হাট জমে গেল···

রঞ্জিত॥ কিন্তু...তবু—অমন একটি দিন জীবনে আর পাইনি ··পেলাম না! কি বল রানী?

রানী॥ [চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া প্রায় কানে কানে] এই, যাবে?

রঞ্জিত॥ ঐ কথাটি, ঐ কথাটি শোনবার জন্তে আমি মরছিলাম রানী।··· চল—এখনি—

রানী॥ দাঁড়াও, ওপর থেকে আসছি—

রঞ্জিত॥ না। তা হচ্ছেনা। সেদিন যেমন বের হয়েছিলাম, আজো তেমনি বের হতে হবে। কিছু নিতে পারবে না। কিছু না, যেমনটি দাঁড়িয়ে

আছো—ঠিক অমনিভাবে আমার হাত ধরে বের হয়ে এস। যদি সেই রাত্রির আনন্দ চাও রানী, তবে এসো ঠিক তেমনি করে আমরা পালিয়ে যাই—

রানী ॥ [চোখে মুখে হাসি] চল…

রঞ্জিত ॥ পা টিপে টিপে এস—[রানী হাসি চাপিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া চলিল —এমন সময় হঠাৎ মধু আসিয়া পড়িল]

মধু ॥ দাদাবাবু—[সবিস্ময়ে] এ কি!

রঞ্জিত ॥ আঃ—নাও মধু—[পকেট হইতে যা ছিল সব বাহির করিয়া] আট টাকা ছ'আনা…যা আছে তোমায় দিলাম।

মধু ॥ তার মানে দাদাবাবু?

রঞ্জিত ॥ আমরা হাওয়া খেতে যাচ্ছি মধু!

[সদর দরজায় সজোরে করাঘাত হইতে লাগিল।]

রানী ॥ [চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল] ও কি?

রঞ্জিত ॥ আমরা পালাচ্ছি মধু। আমাদের জন্যে ভেবোনা—ভেবোনা তুমি। ও টাকা তোমার পাওনা। [সদর দরজায় ঘন ঘন করাঘাত]

রানী ॥ কে ওরা! কে ওরা?

রঞ্জিত ॥ যে ইচ্ছে সে হোক। চল, এবার আমরা পালাব।

রানী ॥ ওরা যে সদর দরজা ভেঙ্গে ফেলছে!

রঞ্জিত ॥ সেদিন রাত্রেও তুমি এমনি ভয় পেয়েছিলে রানী…এবং তার পরই পেয়েছিলে চরম আনন্দ। মনে নেই তোমার? সেদিন তোমায় যেমন করে বুকে নিয়ে পালিয়েছিলাম আজও তেমনি করে বুকে নিয়ে পালাব—

[তাহাকে বুকে লইতে গেল। সদর দরজায় ভীষণ আঘাত। বাহিরের কয়েকজন লোক চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল :—একি আচরণ আপনার মশাই। বাড়িভাড়া বাকি ফেলবার সময় মনে ছিলনা যে বাড়ি একদিন 'ভেকেট' করতে হবে? নোটিশ হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় বাড়ি 'ভেকেট' করবেন বলেছেন—এখনও জোচ্চুরি—?" সঙ্গে সঙ্গে দরজা ভাঙিয়া লোকজন বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল।]

রানী ॥ [ক্রমে সব বুঝিতে পারিল। ভয়ে আতঙ্কে ব্যথায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল] বুঝেছি…বুঝলাম—ওঃ [স্বামীর বুকে মূর্ছিত হইয়া পড়িল]

রঞ্জিত ॥ [সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে] দয়া করে একটু পথ দিন। [মূর্ছিতা রানীকে বুকে লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল]

——

পূর্বাশা, মাঘ, ১৩৪০

—ও যে অট্টহাসি! ও কি মা-ই হেসে উঠলেন বাবা?

—হ্যাঁ, বাবা, ও তিনি-ই

—তারপর?

—তারপর সকল চিকিৎসা যখন শেষ হ'ল, কিছুতেই কিছু হ'ল না, তখন আমার গুরুদেবের শরণাপন্ন হলাম।

—গুরুদেব? তা' তিনিও এসে খুব ঘটা করে এ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলেন নিশ্চয়?

—না বাবা, অবিশ্বাসের কথা নয়। তিনি সত্যিসত্যিই মহাপুরুষ। তাঁর পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। শ্মশানেই থাকতেন। এঁরা অবশ্য গৃহী। কিন্তু গুরুদেবের নিজের মুখেই শুনেছি গৃহী হ'তে পেরেছেন শুধু বৈরাগ্যে আর ভোগে তাঁর ভেদজ্ঞান দূর হয়েছিল ব'লে।

—এ সব কথা আমি ভালো বুঝিনা। তারপর বলুন শুনি।

—তিনি এসে যজ্ঞ করলেন। পরে আমাকে ডেকে হেসে বললেন—"কালিকাপ্রসাদ, প্রত্যাদেশ পেলাম এই বছরেই পুত্রমুখ দর্শন করবে।" হৈম পাশের ঘরেই ছিল, এক মুঠো মোহর নিয়ে ছুটে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করলে। গুরুদেব আশীর্বাদ করলেন "সুপুত্রবতী হও।"

—তারপরেই বুঝি আমি হলাম?

—না, অত সহজে তুমি আমাদের দয়া করনি বাবা। গুরুদেব বলতেন—"সুপুত্র কত আরাধনার ধন!" হৈম কি তোমার জন্যে কম তপস্যা করেছে!

—তপস্যা?

—হ্যাঁ বাবা, তপস্যা। গুরুদেব বললেন "শুধু ছেলে হ'লেই তো হবে না, ছেলের মতো ছেলে হওয়া চাই, নইলে এত বড় জমিদারী—একটা রাজ্য এটা তো চালিয়ে যেতে হবে!"

—বটে! আমি যে অন্নের গ্রাসটিও মুখের ভেতর ঠিকমত চালনা করতে শিখিনি—সেও যে মাসিমারই কাজ ছিল বাবা!

—হবে। বয়েস হ'লে, সব হবে। বি. এ. পাস দিলেই কি বয়স হ'ল বাবা?

—যাক। তারপর?

—তারপর তিনি আমাকে একদিন বললেন "কালিকাপ্রসাদ, হৈমীর মধ্যে মা যশোদার বিভূতি দেখতে পাচ্ছি।" এই ব'লে হ্লাদিনী, কুলকুণ্ডলিনী মূলাধার পদ্ম, ষট্‌চক্র··· কি সব বললেন, আমরা তো অতশত ধরতে পারিনা বাবা। শেষে বললেন—"সেই শক্তি ওতে সুপ্ত রয়েছে, তাকে জাগ্রত করতে হবে।" বললেন—"যোগনিদ্রা তোমরা বুঝবে না, কিন্তু আজকালকার হিপনটিক সাজেশন (hypnotic suggestion) হয়ত বুঝতে পারবে"···

—হ্যাঁ, ওটা বুঝি বটে।

—তারপর হৈমকে নিয়ে তাঁর কি সাধনা! দুপুর রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, কিন্তু তাঁদের...

—বাবা! ঐ···আবার! এবার চীৎকার করে, কাঁদছেন! মা, না? নিশ্চয়—

—হ্যাঁ বাবা, তিনিই। ওতে ভয় পেয়ো না তুমি—

—আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন না বাবা···

—ওটা একটু থামুক। সে-ই এ ঘরে আসবে নিশ্চয়।

—আমাকে তো চিনতে পারবেন না! কি হবে?

—আমি চিনিয়ে দেব।

—কিন্তু চিনিয়ে দিলেই কি চিনতে পারবেন?

—বোধ হয়না। তবু চেষ্টা করে দেখব। তুমি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটল। রাতদিন বিভীষিকা দেখত—ঐ গুরুদেবকেই। গুরুদেবকে চিঠি লিখলাম, তিনি উত্তরে লিখলেন ' ভগবানের ভার সহ্য করতে পারছে না।"

—গুরুদেবকে নিয়ে এলেন না কেন?

—তার আর সুযোগ পেলাম কই বাবা? সন্ধান করে জানলাম তাঁর ডাক এসেছিল, তিনি হিমালয়ে চলে গেছেন।

—তারপর?

—তারপর উন্মত্ততা ক্রমে চরমে গিয়ে দাঁড়াল। ঐ বিভীষিকা দেখতে দেখতে একদিন তোমাকে গলা টিপে মেরেই ফেলে আর কি!

—বেঁচে যেতাম বাবা তবে।

—ছিঃ বাবা! অক্ষয় অমর হও তুমি। তোমার জীবনেব একমাত্র সান্ত্বনা তুমি; তোমার মুখের দিকে চেয়েই এখনো আমি সংসারে রয়েছি··· কাছে এস বাবা। না, আরো কাছে এস। যখন দেখলাম প্রসূতির ঐ অবস্থা, তখন আমি অগত্যা তোমাকে তোমার মাসিমার ওখানে পাঠিয়ে দিলাম।

—হ্যাঁ বাবা, আমার সেই বন্ধ্যা মাসিমা যাগযজ্ঞ না করেও আমাকে পেয়ে পুত্রবতী হবার আনন্দ পেয়েছেন। তারপর ?

—তারপর এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলাম। তুমিও চোখের আড়াল হলে—সেও ভালোমানুষটি হয়ে গেল। কে বলবে যে সে মা হয়েছিল, পাগল হয়েছিল! যেন কিছুই হয়নি। সে যেন আমাদের সেই নববধূ হৈম। মাঝখানে যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, সে যেন আমরা সবাই একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম! তার বেশি আর কিছু নয়। ডাক্তাররা দেখে বললে—বেশ হয়েছে। ছেলের কথা আর মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই—হিতে বিপরীত হবে। সেই থেকে তুমি তোমার মাসিমার ওখানেই মানুষ হয়েছ, আমি চুরি

করে চুপি চুপি মাঝে মাঝে তোমাকে দেখে এসেছি। তুমিও এতদিন জেনে এসেছ ঐ মাসিমাই তোমার মা...যে তোমাকে গর্ভে ধরেছিল সে মরে গেছে।

—বাবা, তবে আজ আমাকে এখানে আনা আপনার উচিত হয়নি; আমি মাসিমার ওখানেই ফিরে যাই।

—না বাবা, তোমার মা তোমাকে দেখবার জন্তে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন।

—তবে তিনি শুনেছেন ?

—শুনেছেন।

—কে শোনালে ? কেন শোনালে ?

—সেই কথাই বলছি। গত মঙ্গলবারেও বেশ শান্ত ছিল, রাত্রে বেশ ঘুমচ্ছিল। হঠাৎ জেগে উঠল। আমার হাত ছুখানি তার হাতের মুঠোয় নিয়ে বুকের ওপর রেখে সহজ সরল ভাবে আমায় বল্লে—"সব সময় তুমি মুখখানি ভার করে থাক কেন ?" আমি একটু হাসলাম···হাসতে চেষ্টা করলাম। সে আমার হাত ছু'খানি নিয়ে খেলা করতে করতে বল্লে, "তোমার ছেলে হ'ল না বলে, না ? আমি কোন কথা বললাম না। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সারাটি রাত ঘুমালো না। পরদিন সকালবেলা উঠে গড় হয়ে আমায় প্রণাম করে নিজে জল এনে আমার পা ধুইয়ে দিয়ে বল্লে 'আজ আমার এ সাধে বাদ সেধো না'—এই বলে চুলের বেণী খুলে আমার পা ছু'খানি মুছে দিলো। মনে হ'ল গুরুদেবই এ প্রথাটির প্রচলন করেছিলেন ! তিনি বলতেন "ভক্তিমতী নারীর এই সেবাটুকু বড় মধুর।"

—তারপর তারপর···?

—তারপর উঠে আমায় পালঙ্কে বসিয়ে, সম্মুখে এসে আমার গলাটি জড়িয়ে ধরে বল্লে "একটি পুষ্যিপুত্র নিলে হয় না ?" মূর্খ আমি···মূঢ় আমি ! তখন আমি না বলে থাকতে পারলাম না তোমার কথা। যাগযজ্ঞ আর গুরুদেবের কথা সম্পূর্ণ গোপন করে বললাম—তোমার ছেলে হয়েছিল হৈম···কিন্তু সে হবার পরেই তোমার খুব অসুখ হয়, বাঁচবার কোন আশাই ছিল না ; ছেলের অযত্ন হবে জেনে তাকে তার মাসিমার হাতে সঁপে দিয়েছি। তোমার সোনার চাঁদ ছেলে সেইখানেই মানুষ হচ্ছে। শুনে সে যেন নেচে উঠল। আনন্দে বিস্ময়ে সে অপরূপ হয়ে উঠল ! তখনই জিদ ধরল তোমাকে তার কোলে এনে দিতে হবে। আমিও স্বীকৃত হলাম। তারপর থেকেই নিজের হাতে তোমার জন্তে ঘর সাজিয়েছে, খাবার তৈরি করেছে, তোমাকে বিয়ে দিয়ে ঘর-আলো-করা বৌ আনবে বলে ঘটক ডেকে পাঠিয়েছে। কি যে করেছে আর কি যে না করেছে, সে বলবার নয় ! আমি তোমাকে আনবার পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললাম। তিনি বললেন "না, আর ভয় নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে ছেলে নিয়ে আসুন।" কিন্তু···

—কিন্তু ?

—কিন্তু পুরোহিত মহাশয় পঞ্জিকা দেখে বলে পাঠালেন এ ছুদিন বড় খারাপ দিন, পুত্রমুখ দেখবার পক্ষে বড়ই অশুভ। আমি সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছি! কিন্তু বিলম্ব দেখে সে আবার উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, একদণ্ডও আর অপেক্ষা করবে না। আবার সেই আগের মত ক্ষেপে উঠেছে। কখনো কাঁদছে, কখনো হাসছে, যাকে দেখছে তারই হাত পা জড়িয়ে ধরে বলছে "আমার ছেলে এনে দাও···এখনি না এনে দিলে আমি আত্মঘাতী হব"।

—বাবা, আপনার পঞ্জিকা রেখে দিন, আমি তাঁর কাছে এই চললাম...

—হ্যাঁ বাবা, যাবে বৈকি! শুভ মুহূর্ত এসেছে বোধ হয়! বসো আমি ঘড়ি দেখছি···বাঃ, শুভ যোগের যে চার মিনিট পার-ই হয়ে গেছে দেখছি··· যাও বাবা, এসো···

—আপনি···

—না বাবা, আমি ঠিক এ সময়টায় যেতে চাইনা···আমার কান্না পাচ্ছে। এসো বাবা, এসো। ···রামচরণ, আরে রামচরণ! গেলি কোথা?

—এই এসেছি, আজ্ঞে.

—যে বাবুটি এই ঘর থেকে এখনি বেরিয়ে গেল, দেখলি?

—আজ্ঞে···

—ও তোদের ছোটকর্তা, আমারই ছেলে। সে-সব শুনিস 'খন। পথে আসতে নদীর ধারে হাঁস চরতে দেখে বাবা আমাব শিকারেব জন্যে যেতে উঠেছিল। আমার বন্দুকটা আনবার জন্যে ক্যাবলাকে কখন বলেছি, এখনো তো সে এল না..

—আজ্ঞে সে বন্দুক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। আমিও তো বন্দুকই খুঁজছিলাম—

—এই যে ক্যাবলা বন্দুক পেলি?

—আজ্ঞে, বন্দুক মার হাতে

—সে কি!

—হ্যাঁ কর্তা···আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন—

[পাশের ঘরে বন্দুকের গুড়্‌ম গুড়্‌ম গুড়্‌ম শব্দ]

—ওকি! ওকি! হৈম কি তবে আত্মহত্যা করলো?

—না···না ·না···হাঃ হাঃ হাঃ। . আত্মহত্যা করিনি···গুরুহত্যা···

—আমার ছেলে? আমার ছেলে? আমার ছেলে কোথায়?

—কে তোমার ছেলে? হাঃ হাঃ হাঃ···তোমার আবার ছেলে! গিয়ে দেখ গুরুদেব···গুরুদেব···অবিকল গুরুদেব···সেই চোখ···সেই মুখ···সেই স্বর! ···হাঃ হাঃ হাঃ।

সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

কানাই-বলাই

কানাই চৌধুরীর বাসভবন। বেলা তিনটা। কানাই চৌধুরী স্ত্রী দুর্গা এবং বলাই অধিকারীর স্ত্রী চণ্ডী—দুই সহোদরা বোনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপনে আলোচনা করিতেছে।

দুর্গা ॥ কি হ'বে দিদি ?

চণ্ডী ॥ হ'বে আর কি ! কপাল তোর পুড়েছে।

দুর্গা ॥ [ছল ছল চক্ষে] দিদি !

চণ্ডী ॥ বিয়ের আগেও তোকে বলেছি, বিয়ের পরেও তোকে বলেছি দুর্গা, —শত্রুকে বিশ্বাস করবি, তবু স্বামীকে বিশ্বাস করবি না। সে কথা শুনে তুই তখন হাসতিস্। এখন কাঁদতে হবে।

দুর্গা ॥ কিন্তু দিদি, উনি তো এমন ছিলেন না। আমাকে ছাড়া আর যে কাউকে জানতেন, এতো কংনো মনে হয়নি।

চণ্ডী ॥ বিয়ের পর থেকেই সঙ্গে সঙ্গে ছিলি। সঙ্গে থাকলে এক মূর্তি সঙ্গে না থাকলে আর এক মূর্তি—এও তোকে আমি বলেছি। পুরীতে যদি তুই সঙ্গে যেতিস্—সাহস পেতো না ; এ সব কেলেঙ্কারীও ঘটতো না।

দুর্গা ॥ তুমি জামাইবাবুকে একলা যেতে দিলে,—সঙ্গে গেলে না। তাই দেখেই তো আমি সাহস পেলাম দিদি। তার ওপর জামাইবাবুর সঙ্গে যাচ্ছে দেখে ভাবলাম, নাই বা গেলাম আমি সঙ্গে। পুজোর সময়ে দেনা করে বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম, সেই দেনাই এখনও শুধতে পারিনি। জানো তো, আমাদের খরচার সংসার। যাবো বললেই তো যাব হয়না।

চণ্ডী ॥ তা' না হয় না গেলি। কিন্তু কড়া শাসনে রাখতে তোকে কে মানা করেছিল ? কড়া শাসনে রেখেছি বলেই আজ আমি নিশ্চিন্ত। বলেতো, "চণ্ডী কি অভ্যেস করে দিয়েছো। বরং তুমি সঙ্গে থাকলে এদিক ওদিক চাই। কিন্তু যখন সঙ্গে থাকো না, তখন স্রেফ্ মাটির দিকে চেয়ে পথ চলি। তোমার শাসনে এ কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে।"

দুর্গা ॥ তুমি ঠিকই বলেছো দিদি। তোমার কথা না শুনে কী ভুলই করেছি। ভুল যে শুধরাবো, সে আশাও আর নেই দিদি। মনে হয়, শাসনের বাইরে চলে গেছে। ঐ নীল চিঠি যেদিন ওর নামে ডাকে এসেছে, সেদিনই আমার কপাল পুড়েছে। পড়েছো তো চিঠিখানা।

চণ্ডী ॥ পড়বো না ? কী ভাব বং, কী ঢং ! মুখপুড়ী চিঠিতে আবার এক তোলা আতর মাখিয়ে ডাক-বাক্সে ছেড়েছে।

দুর্গা ॥ কী জানি দিদি ! এসব কথা মনে হলেই মাথা ঘোরে, চোখে অন্ধকার দেখি। জামাইবাবুকে কি চিঠিটা দেখিয়েছো ? বের করতে পারলে কিছু ? মেয়েটা কে ?

চণ্ডী ॥ অ্যাদ্দিন জেরা করেও পারিসনি তো কানাইয়ের পেট থেকে কোন কথা বের করতে ?

দুর্গা॥ না দিদি। কই আর পারলাম? এ কথা তুললেই বলেন, "তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি এর কিছুই জানি না দুর্গা।"

চণ্ডী॥ ও বললে, আর তুই বিশ্বাস করলি! কতোবার তোকে বলবো শত্রুকে বিশ্বাস করবি, কিন্তু নিজের সোয়ামীকে বিশ্বাস করবি না কখনো। আমি তো তোর জামাইবাবুকে বললাম, "ভাল চাও তো, সব খুলে বল। পুরীতে গিয়ে দুই ভায়রায় মিলে কি সব কাণ্ড করে এসেছো বল। না বলো তো আজ আর রক্ষে নেই। সাঁড়াশি দিয়ে তোমার জিভ টেনে বের করে কথা আদায় করবো।

দুর্গা॥ ওরে বাবা! জামাইবাবু তবে বলেছেন?

চণ্ডী॥ বলবে না? বাবা সাধে আমার নাম রেখেছিলেন 'চণ্ডী'? কিন্তু তোর নাম কেন যে তিনি 'দুর্গা' রেখেছিলেন, আজও আমি তা' বুঝলাম না দুর্গা! একটা গোবেচারা স্বামীকে যে শায়েস্তা করতে পারলে না, সে হলো গিয়ে দুর্গা!

দুর্গা॥ জামাইবাবু কী বললেন দিদি? মুখপুড়ীটা কে?

চণ্ডী॥ একটা হাতী।

দুর্গা॥ হাতী!

চণ্ডী॥ আমি মিথ্যে বলছি না রে দুর্গা। সত্যিই একটা হাতীর মতো মেয়ে। আড়াই মন ওজন যেমন কালো তেমনি মোটা। কোথাকার খুব বড় জমিদারের একমাত্র মেয়ে। মা নেই, কিছুদিন হলো বাপও গেছে মারা। অগাধ সম্পত্তির মালিক। চিঠিতে নাম দিয়েছে না—"তোমারই নগেন?" আর কেউ দেখলে মনে করবে কোন ব্যাটা ছেলে। কিন্তু নামটা হলো গিয়ে ওর নগেন্দ্রনন্দিনী। তিনিই হলেন গিয়ে নগেন। পেটে পেটে এতো শয়তানী!

দুর্গা॥ তা' এতো বড়ো জমিদারের মেয়ে—এতো টাকার মালিক—বিয়ে হয়নি?

চণ্ডী॥ কে বিয়ে করবে ঐ কেলে হাতীকে? বললে তো তোর জামাইবাবু, যতো দিন যাচ্ছে ততো ফুলছে—চর্বির একটা পাহাড়। হ্যাঁ ঐটেই হলো গিয়ে ওর ব্যাধি। ঐ ব্যাধি সারাতেই গেছে পুরী। লোণা জল-হাওয়ায় যদি কয়েক সের কমে। পুরীতে এবার যতো লোক বেড়াতে গেছে, সবার মুখেই এই কেলে হাতীর কথা। এস্টেটের ম্যানেজার নাকি দু হাতে টাকা ঢালছে। যদি কেউ সারাতে পারে! এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবরেজ, ঝাড়ফুঁক, অবধূত—সবাই বেশ কিছু কামিয়ে নিচ্ছে। দিনের পর দিন এই না দেখে দুই ভায়রায় হলো যুক্তি। তোর জামাইবাবু বললে "বেশ, হরির কৃপায় দশ জনে খায়, আমরাই বা কেন খাবো না হে?"

দুর্গা॥ তার মানে?

চণ্ডী॥ তার মানে আমার বলাই অধিকারী পুরীতে রটিয়ে দিলেন তোমার কানাই চৌধুরী কী যেন এক ভৌতিক চিকিৎসা জানেন। ভূতের যদি

কৃপা হয়, হেন ব্যাধি নেই সারেনা। জমিদার বাড়ি থেকে তলব এলো। আসতেই হবে।

দুর্গা॥ তা' সে গেল?

চণ্ডী॥ যাবেনা? প্রথম দিনেই একশো টাকা ফি। আর সে কী খাতির-যত্ন!

দুর্গা॥ হায়, হায়, সেই খাতির-যত্নই আমার কাল হলো!· ·ঐ পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আপিস থেকে আসছেন। যা করতে হয়, তুমিই কর। আমার মাথা ঘুরছে, বুকটা কেমন করছে।

[অফিস হইতে সদ্য প্রত্যাগত কানাই চৌধুরীর প্রবেশ]

কানাই॥ ও বাবা! এ যে একেবারে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম—প্রয়াগ তীর্থ!

চণ্ডী॥ কানাই, ও সব ছেঁদো কথায় ভবি ভুলবে না। বোসো।

কানাই॥ বসছি দিদি। কিন্তু অফিসের এই জামা কাপড়গুলো?

চণ্ডী॥ ওগুলো গায়েই থাকবে। এটাও আদালত।

কানাই॥ ওরে বাবা! আচ্ছা থাক। কিন্তু এক পেয়ালা চা পাবোতো?

চণ্ডী॥ পাবে—যখন গলা শুকিয়ে যাবে। প্রাণ-পাখী ত্রাহি-ত্রাহি করবে।

কানাই॥ ব্যাপার কি চণ্ডীদিদি? সেই নীল চিঠিটা তো? সে তো আমি দুর্গার পা ছুঁয়ে বলেছি—কে আমাকে কেন লিখলে, আমি জানি না। বিশ্বাস না হয়, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি চণ্ডীদিদি।

চণ্ডী॥ দুর্গা! এক কেটলি জল গরম কর!

দুর্গা॥ কেন দিদি?

চণ্ডী॥ থামো। গরম জলের কেটলিটা সাঁড়াশি দিয়ে ধরে আনবি। হ্যাঁ, সাঁড়াশি।

কানাই॥ ওরে বাবা! বলাইদা আমাকে বলেছেন, তুমি নাকি একদিন—

চণ্ডী॥ নাকি! নাকি কেন? বলাইদা'. কখনো মিছে কথা বলে বলে না।···কই, তুই গেলি না দুর্গা?

দুর্গা॥ যাই দিদি।

চণ্ডী॥ আচ্ছা দাঁড়া। কথাগুলো তোরও শোনা দরকার।

কানাই॥ তা' দরকার। ওরই সব চেয়ে বেশী শোনা দরকার। [একটি চেয়ার আগাইয়া দিয়া] তুমি বোসো দুর্গা, বোসো।

চণ্ডী॥ খবরদার! কিছু লুকোবার চেষ্টা করো না। জেনো, আমি সব কিছু শুনেছি। কোনও বাইরের লোকের কাছ থেকে নয়—শত্রু-টক্রও নয়! শুনেছি তোমারই পেয়ারের বলাইদার কাছে। মিথ্যে বলবার লোক সে নয়—বিশেষ আমার কাছে। স্বামীকে বিশ্বাস করতে নেই, আমি জানি। কিন্তু তাকে আমি এমন গড়ে-পিটে মানুষ করেছি যে, হ্যাঁ, ওকে বিশ্বাস করা চলে। আমি শুধু একটি কথা জানতে চাই, কোনও বাজে কথা নয়—মোক্ষম একটি কথা।

তোমার প্রাণের নগেন্দ্র-সুন্দরী তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল?...যাক। তুমি তাতে রাজী হয়েছিলে কি না?

কানাই ॥ বিশ্বাস কর দিদি, আমি তাকে দেখিই নি। দুর্গার গা ছুঁয়ে বলেছি। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।

দুর্গা ॥ বটে।

কানাই ॥ হ্যাঁ। তাকে ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসা করতে গিয়েছিল বলাইদা'। আমি না। মা কালীর দিব্বি করে বলছি—আমি নই।

চণ্ডী ॥ দুর্গা, এক কেটলি গরম জল। না—আচ্ছা, দাঁড়া।

কানাই ॥ নিজে সব কিছু করে বলাইদা' যে এমন করে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাবে এ আমি কখনো ভাবিনি, ভাবতে পারিনি।

দুর্গা ॥ জামাইবাবু যদি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়েই চাপাবেন, তবে মেয়েটা, কেন লেখে—[চিঠি বাহির করিয়া] "প্রাণের কানাই!"

[দুর্গার হাত হইতে চিঠিটা কাড়িয়া লইয়া চণ্ডী বাকী অংশ ঢং করিয়া পড়িতে লাগিল।]

চণ্ডী ॥ "ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেলে—আর এলে না।" ছিঃ ছিঃ—পড়তেও ঘেন্না হয়।

দুর্গা ॥ [চণ্ডীর হাত হইতে চিঠিটা কাড়িয়া লইয়া] না পড়লে তো চলবে না দিদি। বর-সাজে সাজিয়ে ১লা ফাল্গুন পুরী পাঠিয়ে দিতে হবে যে। এই যে লিখেছে—[পত্রপাঠ] 'তোমার আসার আশায় আর কতোদিন সমুদ্রের ঢেউ গুণিব? তুমি বলিয়া গিয়াছিলে, ফাল্গুন মাসের প্রথমেই শুভকার্য্য ঘটিতে পারিবে। তোমার সেই কথায় ম্যানেজারবাবু পাঁজী দেখাইয়া ৩রা ফাল্গুন বিবাহের দিন ঠিক করিয়াছেন। কবে আসিতেছ তার করিয়া জানাও। তার না পাইলে আমার হার্টের অসুখ আরো বাড়িয়া যাইবে। কোন দিন এ অভাগীর প্রাণ পাখী খাঁচা-ছাড়া হইবে—"

আহা-হা! তাই হোক না। হলে তো বাঁচি। দিদি, আসল কথার জবাবটা এখনও আমরা পাইনি কিন্তু। কোন সাহসে মানুষটা সেই কেলে হাতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? সাহসটা কোত্থেকে এলো শুনি? আমি কি মরে গেছি?

চণ্ডী ॥ মরে গেছিস কি বেঁচে আছিস দেখাচ্ছি [কানাইকে] কি বলবে বল।

কানাই ॥ কী আর বলবো দিদি! এতো করেতো বললাম, তাওতো বিশ্বাস করছো না।

চণ্ডী ॥ বিশ্বাস করবার মতো কথা হলেই বিশ্বাস করা যায়। বিয়ে করতে না চাইলে কি করে তার সাহস হয় ঐ চিঠি লিখতে?

দুর্গা ॥ তা' নয়তো কি? দুনিয়ার এতো লোক থাকতে এই মানুষটার কাছে চিঠি লেখে কেন? আর তার ঠিকানাই বা পেলে কি করে?

চণ্ডী ॥ 'মানুষ-মানুষ' করিসনে দুর্গা। এরা আবার মানুষ! আঁস্তাকুড়ের সব জঞ্জাল। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া] ঝাঁটাগাছটা আন্। সব জঞ্জাল আজ ঝেঁটিয়ে সাফ করবো।

[ভৃত্য গণেশ খান দুই ডাকের চিঠি লইয়া আসিল।]

গণেশ ॥ বাবু, চিঠি।

দুর্গা ॥ এই গণশা, আমার হাতে দে।

[গণেশ চিঠিগুলি দুর্গার হাতে দিয়া চলিয়া গেল।]

কানাই। যাক্ নীল খাম-টাম নেই। আতরের গন্ধও পাচ্ছিনা।

চণ্ডী। ও– সেজন্যে বুঝি খুব আফশোস হচ্ছে? হ্যাঁরে দুর্গা, তোর মাছ কাটা বঁটিটা অতো ছোট কেনরে?

দুর্গা ॥ দ্যাখোতো দিদি এই চিঠিটা—পুরী থেকেই এসেছে। নাম লিখেছে .. তারানাথ রায়—ম্যানেজার। কী জানি বাপু, এতো পাকা লেখা আমি পড়তে পারি না।

চণ্ডী ॥ দে না পাকা হাতেই দে। [কানাইকে] পড। ঠিক ঠিক পোড়ো কিন্তু···বাদ-ছাদ দিও না।

[কানাই দ্রুত চিঠিটি লইয়া প'ড়তে লাগিল।]

কানাই ॥ মান্যবরেষু।

মাননীয় কানাইবাবু, আমার দুর্ভাগ্য···এক নিদারুণ দুঃসংবাদ আপনাকে জানাইতে হইতেছে। আমাদের এস্টেটের মালিক শ্রীমতী নগেন্দ্রনন্দিনী দেবী গত ২৩শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি আট ঘটিকায় হঠাৎ স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন।"

চণ্ডী ॥ জয় মা কালী! খুব বিচার করেছো মা।

দুর্গা ॥ খুব বাঁচিয়েছো। কালীঘাটে গিয়ে জোড়াপাঁঠা দিয়ে আমি তোমার পুজো দেবো মা।

কানাই ॥ কিন্তু একি! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? আমার মাথা ঠিক আছে তো?

দুর্গা ॥ কেন? কি হলো?

চণ্ডী ॥ মরেও বুঝি তবে আবার বেঁচে উঠেছে?

কানাই ॥ ওগো, তোমরা আমাকে ধর। আমার হাত-পা কাঁপছে— আমার মাথা ঘুরছে আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। এক লাখ নয়, দু লাখ নয়, দশ লাখ টাকা—দশ লাখ টাকার সম্পত্তি—

দুর্গা ॥ ওগো, অমন করছো কেন? বল না কি হলো?

চণ্ডী ॥ আ মর! লোকটা পাগল হলো না কি?

কানাই ॥ পাগল হবারই কথা। দশ লাখ টাকার সম্পত্তি—মরবার কিছু আগে উইল করেছে আমার নামে।

চণ্ডী ॥ হতেই পারে না।

দুর্গা ॥ না, না, তা' হতে পারে। কই দেখি কি লিখেছে ॥

[কানাইয়ের হাত হইতে চিঠি লইয়া পাঠ।]

"......আপনি কথা দিয়াও না আসায় তিনি সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। দিন দিন ওজন কমিতে থাকে। আড়াই মণ হইতে এক মাসেই দেড় মণে দাঁড়ায়। উহা আপনার ভৌতিক চিকিৎসার ফল মনে করিয়া আমরা আনন্দেই ছিলাম। কিন্তু তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন—আপনাকে না পাইলে আর বাঁচিবেন না। কি মনে করিয়া দশ লক্ষ টাকা মূল্যের সমুদয় সম্পত্তি আপনার নামে গোপনে উইল করেন। অন্তিমকালে ইহা প্রকাশ করিয়া যান। আপনিই এখন আমাদের মালিক। শীঘ্র আসিয়া এই বিশাল সম্পত্তি বুঝিয়া লউন।"

দুর্গা ॥ ওগো, তা হ'লে তো তোমাকে এখনই পুরী রওনা হ'তে হয়।

চণ্ডী ॥ না, না, সে কি করে হয় দুর্গা? চিকিৎসা করলেন তোর জামাই-বাবু...বিয়ের কথাও হ'লো তোর জামাইবাবুরই সঙ্গে—ঐ কানাই-ই তো সে কথা একশো বার বলেছে। পুরী তবে ও যাবে কেন? যাক তোর জামাইবাবু। আমি যাচ্ছি। আজ রাতের গাড়ীতেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দুর্গা ॥ জামাইবাবু গেলেই তো হবেনা। উইলটা হয়েছে আমার কর্তার নামে। কিগো বল না। ঘটনাটাতো তোমার সঙ্গেই ঘটেছিল। সত্যি কথা বলতে ভয় কি?

কানাই ॥ না, না, ভয় আবার কি! বিশেষ, এখন। তবে, শুনবে সত্যি কথা?

চণ্ডী ॥ সত্যি কথাটাই তো শুনতে চাইছি।

কানাই ॥ তবে শোনো। আমি মিথ্যে বলিনি। নাটের গুরুটি হচ্ছেন ঐ বলাইদা। যাতায়াত, ঝাড়ফুঁক—তা ছাড়া আর যা যা সব ঘটনা—

চণ্ডী ॥ তাই যদি হবে, সম্পত্তিটাও তবে তোমার বলাইদাই পাবে। কি বল ভাই?

কানাই ॥ উঁহুঁ। পাবো আমি।

চণ্ডী ॥ কেন?

কানাই ॥ তোমার জন্যে দিদি তোমার জন্যে। তোমার জিভকে

ধন্যবাদ...তোমার কেটলিভরা গরমজলকে ধন্যবাদ—তোমার সাঁড়াশি···ঝাঁটা-বঁটি—সব কিছুকে ধন্যবাদ।

চণ্ডী॥ মস্করা রাখো। ব্যাপার কি বল ?

কানাই॥ ব্যাপারটা অতি সোজা কথা। প্রেম করলেন বটে বলাইদা। কিন্তু তোমার কাছে কোনদিন ধরা পড়বেন ভয়ে তার কাছে নাম-ঠিকানা দিলেন আমার। আমি জানলাম ··বলাই অধিকারী···তিনি জানলেন···কানাই চৌধুরী।···হ্যাঁ আমাকে সব বলে-কয়েই দাদা আমার এই অঘটনটি পুরীতে ঘটিয়ে এসেছেন। ঐ যে দাদাও আমার এসে গেছেন। এসো দাদা—এসো ··

[বলাই অধিকারীর প্রবেশ।]

এই নাও···পুরীতে গিয়ে যা সব কাণ্ডকারখানা করে এসেছো, এখন তার ঠ্যালা বোঝো।

বলাই॥ আমি আবার কী কাণ্ড করেছি। আমি ও সবে নেই। [চণ্ডীকে] ওগো, সেই কখন এ বাড়িতে এসেছো। লোকটা যে আপিস থেকে ফিরে একলা ঘরে বসে আছি—এক পেয়ালা চা না পেয়ে গলা শুকিয়ে মরছে—সে ভাবনা বুঝি নেই ?

দুর্গা॥ বসুন—জামাইবাবু। আমি চা-জলখাবার আনছি।

কানাই॥ খালি চা-জলখাবার আজ আর চলবে না। সের দশেক সন্দেশ আনাও।

দুর্গা॥ তা আনবো বৈকি।

বলাই॥ ব্যাপার কি ?

চণ্ডী॥ ব্যাপার তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। চিঠিখানা পড়।

[চিঠিখানি দুর্গার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া বলাইয়ের হাতে গুঁজিয়া দিল। বলাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠিখানি পড়িতে লাগিল।]

বলাই॥ ওরে বাবা! [পুনরায় পাঠ] ওরে বাবা!! [পুনরায় পাঠ] ওরে বাবা!!!

[পাঠ শেষ হইলে চিঠিখানা হাত হইতে পড়িয়া গেল।]

[মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে] এ আমি কি করেছিরে—কি ভুলই আমি করেছিরে—হায় হায় হায়—

চণ্ডী॥ কি করেছো এখনো টের পাওনি। চল আগে বাড়ী—তারপর বুঝবে। ডুবে ডুবে জল খাওয়া! জাতও গেল, পেটও ভরলো না। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

দুর্গা॥ আহা—হা—দিদি, ছাড়ো—ছাড়ো। জামাইবাবু একবার না হয় ভুল করেছেন,—আর ভুল করবেন না। বুঝলেন জামাইবাবু, এবার থেকে যা করবেন, নিজের নামেই করবেন। দিদির শিক্ষা হয়েছে—আর কিছু বলবে না।

[কানাই ও বলাই উভয়ে হাসিয়া উঠিল।]

কানাই ও বলাই॥ [একযোগে] তা বটে! তা বটে!!

ভারতবর্ষ, কার্তিক, ১৩৬১

টিয়া

[একটি শয়নকক্ষ। খুব বড় একটি জানালার পাশে একখানি খাট। জানালার বাহিরেই সুবিস্তৃত বারান্দা। কক্ষের যেদিকে এই জানালা সেই দিকেই কক্ষের দরজা, দরজার সম্মুখেও ঐ বারান্দা। বারান্দার নিচে ছোট একটি ফুলের বাগান। তাহার পরই উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালে লতানো গোলাপের গাছ। ঘরে খাটের উপর রোগ-শয্যায় একটি ছোট মেয়ে, বছর দশেক বয়স হইবে। নাম টিয়া। তাহার মাথার কাছে তাহার মা করুণা বসিয়া আছেন। খাটের পার্শ্বে টিপয়, তদুপরি একটি ঘড়ি টিক টিক্ করিয়া চলিতেছে, এবং ঔষধপত্র, থার্মোমিটার প্রভৃতি। বারান্দায় কয়েকখানি চেয়ার। তাহাতে টিয়ার পিতা মন্মথনাথ এবং তাহারই আত্মীয়-স্বজন এবং ডাক্তার বসিয়া আছেন। বারান্দায় ঠিক জানালার সম্মুখে একটি টিয়া পাখীর খাঁচা ঝুলিতেছে। খাঁচাতে পাখী নাই, খাঁচার দরজাটি খোলা। টিয়াপাখীটি উড়িয়া গিয়া দেওয়ালের উপর বসিয়া আছে। মেয়েটির অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন। সকলেই অত্যন্ত বিষন্ন। ঘড়ির টিক টিক শব্দটাও ভালো লাগিতেছে না, তাহারই তালে তালে সকলের বুকের ঢুক ঢুক শব্দও বুঝি শোনা যায়।--- আসন্ন সন্ধ্যা]

মন্মথনাথ ॥ সন্ধ্যাটা কি পার পাবেনা ডাক্তার ?

ডাক্তার ॥ নিশ্চয়।

[পার পাইবে কি পাইবে না, কোনটা নিশ্চয়, ভাল বোঝা গেল না। কিন্তু এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতেও কেহ সাহসী হইল না]

মন্মথনাথ ॥ ডাক্তার তুমি আর একটা ইনজেকসন দাও-

ডাক্তার ॥ না।

ললিত ॥ ঐটুকু মেয়ে আর কত সইবে।

অমিয় ॥ বেশ ঘুমাচ্ছে ওকে আর জ্বালাতন

ডাক্তার। রোগ হলেই জ্বালাতন হতে হয়। আপনারা মনে ভাবছেন ঘুমুচ্ছে, কিন্তু ওকে ঘুম বলা চলে না। তবে ইনজেকসনেরও আর প্রয়োজন নেই।

[গভীর নিস্তব্ধতা]

মন্মথনাথ ॥ একি ! করুণা উঠে আসছে।

ডাক্তার ॥ এইবার যদি ওঁকে অন্য কোন ঘরে পাঠাতে পারেন। বিশ্রাম ওর নিতান্ত আবশ্যক। রাতের পর রাত জেগে, দিনরাত রোগীর পাশে থেকে থেকে ওঁর চেহারা যা হয়েছে, দেখলে আমারই ভয় হয়--ওঁর কোন গুরুতর অসুখ করেছে নিশ্চয়।

মন্মথনাথ ॥ টিয়া ওর প্রাণ। টিয়া না বাঁচলে ওকেও বাঁচানো যাবেনা

ডাক্তার। আহার নিদ্রা ও সাধ করে ত্যাগ করেনি।

ডাক্তার ॥ কিন্তু তবু-

মন্মথনাথ ॥ চুপ—

[করুণা তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন]

মন্মথনাথ ॥ কি করুণা ?

করুণা ॥ [দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া] টিয়া-টা এখনো…আছে ?

মন্মুজনাথ ॥ কিন্তু আমাদের টিয়া ? ঘুমাচ্ছে ? কি বুঝছ ?

করুণা ॥ হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে, কিন্তু কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে তবে ঘুমিয়েছে !

মন্মুজনাথ ॥ কি…কি বললে ?

করুণা ॥ ওর ঐ মিতার কথা ' তোমার কথা নয়, আমার কথাও নয়, ফল-ফুল-খেলনা…কোন কথাই নয়, শুধু ঐ টিয়ারই কথা ।

মন্মুজনাথ ॥ ওটাকে ধরবারও তো কোন উপায় দেখছি না। ধরতে গেলেই…

করুণা ॥ [আতঙ্কে] না না

ললিত ॥ কি করে ওটা খাঁচার বাইরে গেল ?

মন্মুজনাথ ॥ ডাক্তার কবরেজ নিয়েই আমরা ব্যস্ত সেই ফাঁকে—

ডাক্তার ॥ টিয়ার টিয়া টি—

করুণা ॥ চুপ । কথা আছে, শুনুন—

ডাক্তার ॥ [করুণাকে] আপনি বসুন না ·

করুণা ॥ না বসে গল্প করবার মতো শক্তি আমার নেই । শুধু একটা কথা জীবন মরণের কথা…

মন্মুজনাথ ॥ কি কথা করুণা ?

করুণা ॥ জীবন-মরণের কথা ।

মন্মুজনাথ ॥ সে কি করুণা ?

করুণা ॥ হ্যাঁ, জীবন-মরণের কথা । তন্দ্রায় আমি স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্ন কেন, আমার মনে, আমার প্রাণে সেই পরম সত্য ধরা দিয়েছে…

মন্মুজনাথ ॥ কি করুণা, কি ?

করুণা ॥ টিয়ার প্রাণ ঐ টিয়া । ঐ টিয়া যে-মুহূর্তে এখান থেকে উড়ে পালাবে, আমার টিয়াকেও সেই-মুহূর্তেই হারাবে। [বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া উদ্গত ক্রন্দন রোধ করিয়া মেয়ের কাছে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন]…

[গভীর নিস্তব্ধতা। সকলে দেওয়ালের উপর উপবিষ্ট পাখীটির দিকে চাহিয়া রহিল ।]

ডাক্তার ॥ ঐ টিয়া পাখীটি দেখছি রহস্যময় হয়ে উঠল ।

মন্মুজনাথ ॥ ডাক্তার, এ কখনো সত্যি হতে পারে ?

ডাক্তার ॥ কেন ঠাকুমা-ঠাকুর্দার মুখে শোনেননি এমনি ধারা রূপকথা : রাক্ষসের প্রাণ ভোমরা ? রাজকন্যা জানতে পেরে প্রাণ-ভোমরা মারতেই মরে গেল রাক্ষস ! বিশ্বাস হতো না কি, যখন হাঁ করে শুনতেন ?

মন্মুজনাথ ॥ কিন্তু ডাক্তার, কিন্তু…

ডাক্তার ॥ এখন তা সত্যি হয় কি না…এই তো ?

মন্মুজনাথ ॥ বল ডাক্তার, বল…

ডাক্তার ॥ 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর ।' বিশ্বাসে সব হয় ।

মন্মুজনাথ ॥ [চীৎকার করিয়া উঠিলেন] ডাক্তার ! ডাক্তার !

ডাক্তার ॥ চুপ। চীৎকার করবেন না, টিয়ার ঘুম ভেঙ্গে যাবে…

ললিত ॥ পাখীটাও ভয়ে উড়ে যেতে পারে.

ডাক্তার ॥ ঐ পাখীটির কি বিশেষ কোন ইতিহাস আছে?

মনুজনাথ ॥ কিছু না। আমার মার ছিল একটা পোষা টিয়াপাখী। আমাকে তিনি বেশি ভালবাসতেন কি ঐ পাখীটাকে বেশি ভালবাসতেন, এ প্রশ্নটা সকলের সঙ্গে আমারও মনে জাগতো। আমার ঐ মেয়ে হ'ল, আদর করে মেয়ের নামও তিনি রাখলেন টিয়া। কিছুদিন পরে পাখীটা মারা গেল। মা তখন ঐ টিয়াটাকে কিনে এনে নাতনীকে দিলেন, কিন্তু, নিজেও আর বেশি দিন বাঁচলেন না। এই তো ওর ইতিহাস।

ডাক্তার ॥ এ ইতিহাসে কোন বিশেষত্ব আছে কিনা সে কথা আলোচনা না করে আমি বরং এইটাই জানতে চাই, ঐ টিয়া টা নিয়ে কে বেশি মাথা ঘামায় …মেয়ে, না মা?

মনুজনাথ ॥ দুজনেই। আমার বাড়িতে ঐ পাখীটার যা আদর, আমারো সে আদর ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাই বলে কি এ কথা…করুণার ঐ কথা ..কখনো সত্যি হয় ডাক্তার?

ডাক্তার মনে-প্রাণে যখন কোন একটি বিশেষ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়, তখন সে বিশ্বাস বিশেষ শক্তিমান হয়ে দাঁড়ায়। সেই শক্তিতেই সে সত্যি হয়, এটা আমি সত্যি সত্যিই দেখেছি।

মনুজনাথ ॥ ডাক্তার--ডাক্তার—

ডাক্তার ॥ মা, এ বিশ্বাস মেয়ের মনে সংক্রামিত না হলেই মঙ্গল!

অমিয় ॥ সকলের চেয়ে মঙ্গল ঐ পাখীটি যদি উড়ে না পালায়।

ললিত ॥ এও তো হতে পারে, রাতদিন মেয়ের জন্য ভেবে ভেবে অনাহারে আর অনিদ্রায় করুণা-মাসীর এই মানষিক বিকার হয়েছে।

[করুণা আসিতেছেন দেখা গেল]

মনুজনাথ ॥ চুপ।

[নিস্তব্ধতার মধ্যে করুণা আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

করুণা ॥ [পাখীটার দিকে চাহিয়া] ওরে আমরা কি দোষ করেছি যে তুই পালাবি? ফিরে আয়! ওরে, ফিরে আয়!

মনুজনাথ ॥ [করুণাকে] ওদিকে যেয়ো না · ও হয় তো…হ্যাঁ, ঐ যে—

করুণা ॥ চুপ—চুপ—

[নিস্তব্ধতা]

ললিত ॥ না, আর ভয় নেই। ও স্থির হয়ে বসল।

করুণা ॥ ও খাঁচায় কেন ফিরে আসে না, কেউ বলতে পার? ওকে কি আদরই না করি…কি যত্নেই না ওকে রাখি, তবু আজ…! ওরে আয়—আয় —তোর পায়ে পড়ি, ফিরে আয়—

ডাক্তার ॥ আপনি বসুন। আপনার টিয়ার কথা বলুন—এখন কেমন বুঝছেন?

করুণা ॥ জেগেছে। জেগেই বললে মিতা কই? আমি দেখালাম। বললে, মা, ও আজ আকাশে উড়বে। এখানে আর ওর মন নেই। ও আমার সব গল্প শুনেছে, শুনে ওরও মন ছুটেছে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কে চলে জানতে, রামধনু কার ধনু তাই দেখতে, সূর্যিঠাকুর কোন পাটে ওঠেন, কোন ঘাটে ডোবেন জানতে, চাঁদের মাঝে যে বুড়ী চরকা কাটে তাকে দেখতে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষে বলে,—মাগো, আমার যদি পাখা থাকতো! ওর মত আমার যদি পাখা থাকতো! দুজনে একসঙ্গে উড়ে যেতাম আজ!

মনুজনাথ ॥ চুপ [অঙ্গুলিসঙ্কেতে টিয়াটির উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন]

করুণা ॥ সর্বনাশ! [ছুটিয়া ঘরে মেয়ের কাছে গেলেন]

অমিয় ॥ না, স্থির হয়ে বসেছে। আর ভয় নেই।

ললিত ॥ ওটাকে ধরবার কোন উপায় নেই?

মনুজনাথ ॥ [সাতঙ্কে] না—না—, ধরতে গেলে যদি উড়ে পালায়!

ডাক্তার ॥ জোর করে কি কাউকেই ধরে বাখা যায় ললিতবাবু?

মনুজনাথ ॥ করুণা আবার,—[ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন] কি করুণা?

করুণা ॥ ওর জন্যে যে নতুন শাড়ী এনেছো, নতুন জুতো, নতুন জামা, নতুন ওড়না…ও চাইছে। এখনি, এখনি—

মনুজনাথ ॥ ললিত, মল্লিকাকে বল—

ললিত ॥ [ছুটিয়া যাইতে যাইতে] এখনি আনছি।

করুণা ॥ বলে, এ পুরানো জামা-কাপড় আর নয় মা, নতুন জামা-কাপড় দাও, আজ আমি নতুন সাজে সাজবো—হাঁ,…খুব খুশি মনেই বললো।

ডাক্তার ॥ আমি বরং একবার দেখে আসি।

করুণা ॥ না, না দরকার নেই। কোন দরকার নেই। আপনাকে ও দেখতে পারে না। আপনি গেলে ওর মন আবার বিষিয়ে উঠবে।

ডাক্তার ॥ তবু…একটিবার…

করুণা ॥ না। কেন আপনি ভয় পাচ্ছেন ডাক্তারবাবু? বিশেষ এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে ওর অসুখই আর নেই। তবে কেন মিছিমিছি ওকে—

মনুজনাথ ॥ হাঁ ডাক্তার, তুমি বরং…ওরে, ডাক্তারবাবুকে চা দেওয়া হয়নি! [নতুন জামা-কাপড় লইয়া ললিত আসিল] এই যে ললিত—

করুণা ॥ [ললিতের দিকে ছুটিয়া গিয়া] দাও, দাও। নতুন এই জামা কাপড় পরলে ওর আর কোন অসুখই থাকবে না—এমনি খুশি হবে। ডাক্তার-বাবু, আপনি যাবেন না। দেখুন—কিন্তু কাছে গিয়ে নয়, দূর থেকে, আড়াল থেকে—

[জামা-কাপড় লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন]

মনুজনাথ ॥ ললিত—ললিত—তুমি ছুটে দোকানে-দোকানে গিয়ে এখনি আরো সব শাড়ী—আরো সব জামা—ওর সারাটি দেহ মুড়ে দিতে দোকানে যা আছে…সব—সব যত দামই হোক—যাও—যাও—

ডাক্তার ॥ কিন্তু, আচ্ছা, যাও। [ললিত চলিয়া গেল]

মন্মুজনাথ ॥ ডাক্তারের চা এলো না! অমিয় তুমি যাও ভাই।

অমিয় ॥ যাচ্ছি।

মন্মুজনাথ ॥ আচ্ছা, শোনো। তুমিও যাও অমিয়—খেলনা, বুঝলে অমিয়, রংবেরং-এর অ্যা-তো খেলনা···কাঠের, রবারের, কাঁচের। লাটিম, বল, নৌকো, হাতী-ঘোড়া, সাপ, একটা বাঁশি, লুডো, কিছু জলছবি, হাতীর দাঁতের একটা বাক্স—ঐ সওদাগরী দোকানে আছে, শ্বেত-পাথরের তাজমহল···। হ্যাঁ, আর রান্না বান্না ওর ভারী সখ—খেলনার কড়াই, ডেক, হাতা, খুন্তি, বেড়ী—জানো তো সব?

অমিয় ॥ জানি···

মন্মুজনাথ ॥ পুজো করতে ওর ভারী সখ। ছোট রেকাবি, পেতলের সাজি, চন্দনের বাটি, ধূপদানি, পঞ্চপ্রদীপ, মনে থাকবে?

অমিয় ॥ থাকবে।

মন্মুজনাথ ॥ দাঁড়াও। ও যেন আমার কাছে সেদিন কি চেয়েছিল, দিতে পারিনি,···কিন্তু আজ তো তা মনে পড়ছে না!···এইরে, ঐ টিয়া টিয়া—

অমিয় ॥ [illegible] ঐ দেখুন [অঙ্গুলিসঙ্কেতে পাখীটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। পাখীটি উড়িবার উপক্রম করিতেছিল মনে হইল।···গভীর নিস্তব্ধতা]

মন্মুজনাথ ॥ না—না, আর ভয় নেই। ও ভালো করে বসল।···কি চেয়েছিল—কি চেয়েছি[illegible] [স্মরণ করিতে না পারিয়া] মনে পড়ে না! আচ্ছা ভাই, তুমি এ[illegible]—ফিরতে কিন্তু ভাই বিলম্ব করোনা—কোনটাই ভুলো না।

[অমিয় যাইতেছিল]

ডাক্তার ॥ ভুলো না। খেলনা, পুজোর বাসন—এবং—

অমিয় ॥ এবং—?

ডাক্তার ॥ যাবার পথেই—

অমিয় ॥ বলুন—

মন্মুজনাথ ॥ কি ভুল করলাম ডাক্তার?

ডাক্তার ॥ এক পেয়ালা চা। [হাসিয়া অমিয় চলিয়া গেল। এদিকে করুণা আসিয়া দাঁড়াইল]

মন্মুজনাথ ॥ করুণা, খবর?

করুণা ॥ লণ্ঠনকে দেখেছ?

ডাক্তার ॥ লণ্ঠন!

করুণা ॥ রায়বাড়ির সেই ছেলেটা গো। লণ্ঠনকে এখনি না পেলে [illegible]। আর চলছে না।

মন্মুজনাথ ॥ কেন?—কেন?

করুণা ॥ পুরানো জামা-কাপড় ছেড়ে নতুন জামা-কাপড় পরতে এখন এক আপত্তি দাঁড়িয়েছে।

মনুজনাথ ॥ কি আপত্তি ?

করুণা ॥ বলে নতুন সাজে যে সাজব, খোঁপাতে কি দেব ?

মনুজনাথ ॥ কি চাই ?

করুণা ॥ তোমার কাছে সে তো চেয়েছিল। তুমি দাওনি।

মনুজনাথ ॥ চেয়ে যে ছিল তা, মনে পড়ছে, কিন্তু কি যে চেয়েছিল সেইটে কিছুতেই মনে পড়ছে না। কি চেয়েছিল ?

করুণা ॥ ফুল।

মনুজনাথ ॥ হ্যাঁ, ফুল। আমি এখনি দিচ্ছি

করুণা ॥ কিন্তু কি ফুল ?

মনুজনাথ ॥ [স্মরণ করিতে চেষ্টা।—না পারিয়া] কি ফুল ?

করুণা ॥ অভিমানিনী তা আজ আর তোমায় বলবে না। আমায়ও বললে না। বলে, ঘরের লোক যা দেয়নি, বাইরের লোক তাই দেবে। বাইরের সেই লোক, লণ্ঠন।

মনুজনাথ ॥ তা দিক্ · সেই দিক··· কোথায় সে ?

করুণা ॥ তার খোঁজে এখনি লোক পাঠাও, নইলে অনর্থ হবে—

মনুজনাথ ॥ [একজনকে] খুঁজে আনো। ভাই রায়বাড়ির সেই লণ্ঠনকে, তাকে এখনি যেখান থেকে পাব ধরে আনো—

করুণা ॥ তাকে গিয়ে বল, টিয়াকে তুমি কি ফুল দিতে চেয়েছিলে—দাওনি কেন ? টিয়া যে তোমার আশায় বসে আছে। শীগগির গিয়ে টিয়াকে সেই ফুল দিয়ে এস। বলো টিয়া কাঁদছে ··টিয়া রাগ করে তোমার পথ চেয়ে বসে আছে।

[সে চলিয়া গেল]

ডাক্তার ॥ লণ্ঠন ! বাপ-মা আর নাম পায়নি !

করুণা ॥ তাই টিয়া হেসে বলে সূর্য্যি যখন ডুবে যাবে, তুমি ভাই লণ্ঠন আমার পাশে থেকো, তোমার মুখের পানে চেয়ে থাকবো, আঁধারের মুখ দেখব না !

ডাক্তার ॥ সূর্য ডুবতে তো আর বিলম্ব নেই। কিন্তু কোথায় লণ্ঠন—আর কোথায় বা—

করুণা ॥ কি ?

ডাক্তার ॥ আমার সেই এক পেয়ালা চা !

মনুজনাথ ॥ মনে পড়েছে—মনে পড়েছে, কি ফুল আমার মনে পড়েছে—কিন্তু ওঃ [অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন]

করুণা ॥ ও কি ! অমন করছ যে ? কি ফুল ?

মনুজনাথ ॥ না—না—ওঃ।

করুণা ॥ [মনুজনাথের প্রতি] কি ফুল, ওগো বল না...কি ফুল ?

মনুজনাথ ॥ ঐ লতানে গোলাপ···হলুদ এ 'মার্শাল' নীল···দেওয়ালের ঐ মাথায়···টিয়াপাখীর ঠিক্ নিচে—ঐ যে ফুটে রয়েছে !

করুণা ॥ সর্বনাশ! ও ফুল এ গাঁয়ে…

মন্মথনাথ ॥ কোথাও নেই—কোথাও নেই—তাই আমি ও ফুল সেদিন তুলিনি…কিন্তু আজ—

করুণা ॥ আজ তুলবে?

মন্মথনাথ ॥ তুলব?

করুণা ॥ [ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন] না!

মন্মথনাথ ॥ চুপ…চুপ [পাখীটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। পাখীটি প্রায় উড়ে এই অবস্থা]

করুণা ॥ ওঃ [আর্তনাদ করিয়া, ছুটিয়া ঘরে]

[দেখা গেল দেওয়ালের ওপার হইতে একটি ছোট হাত পাখীটিকে চাপিয়া ধরিয়াছে। পরমুহূর্তেই দেখা গেল সে হাত আর কাহারও নয়, সেই লণ্ঠনের। সে টিয়াটিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দেওয়ালের উপর উঠিয়া বসিয়া নিচের সেই গোলাপটি ছিঁড়িয়া, একহাতে টিয়া এবং অন্য হাতে ফুল লইয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়া টিয়ার ঘরে লাফাইতে লাফাইতে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে যাহারা তাহাকে চিনিল, তাহারা সমস্বরে আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল লণ্ঠন! লণ্ঠন!]

ডাক্তার। হ্যাঁ, লণ্ঠন এল, কিন্তু আমার চা?

[ঘরের বাহিরের সকলেই হাসিয়া উঠিল]

উত্তরা (বেনারস), কার্তিক, ১৩৩৯

আমরা কোথায়

জবা। আবার এখুনি বেরুচ্ছ দাদাবাবু!

ইন্দ্র। ঘরে বসে কড়িকাঠ গুণে লাভ কি রে জবা!

জবা ॥ দাঁড়াও। চা করেছি। ট্রামে বাসে গুঁতো খেয়ে চাকরির উমেদারি করে পয়সা নষ্ট, শরীর নষ্ট। আর কত দেখবে? লাভটা কি?

ইন্দ্র ॥ একটা কিছু করতে হবে তো। নইলে চলবে কিসে?

জবা ॥ তোমার চলবে না, তাতে আর কি আসছে যাচ্ছে?

ইন্দ্র ॥ তবু দেখতে হয়। আজ একটা আশা আছে।

জবা ॥ চাকরি পাবে?

ইন্দ্র ॥ পেতে পারি। কই, চা হ'ল?

জবা। ঢালছি। চাকরি হবে তোমার! কী চাকরি তুমি করবে?

ইন্দ্র ॥ কেরানিগিরি। ষাট টাকা মাইনে।

জবা ॥ তোমায় দেবে? কি দেখে?

ইন্দ্র ॥ চেহারা দেখে। কী আবার দেখে।

জবা ॥ চেহারায় রাজপুত্তুর। পরিচয় নিলে জানবে জমিদারের ছেলে। ষাট

টাকা মাইনের কেরানি তোমাদেরই ছিল—ষাট জন। তাস পাশা খেলে দিন কাটিয়েছ, প্রজা ঠেঙিয়েছ। তুমি কেরানিগিরির কি জান?

ইন্দ্র ॥ দেখ জবা, কিছুতেই তোর শিক্ষা হবে না? আবার বকছিস?

জবা ॥ অমন আশা কত পেয়েছ। তোমারি কি শিক্ষা হল?

ইন্দ্র ॥ যাবনা, আর ঘরে বসে গুষ্টিশুদ্ধু তোর গায়ের গয়না বেচে খাব?

জবা ॥ যদ্দিন চলে তাই চলুক না।

ইন্দ্র ॥ খুব লম্বা লম্বা কথা বলছিস যে। হাতে কগাছা সোনার চুড়ি এখনো রয়েছে, তার গরবে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস যে জবা!

জবা ॥ তা আর পারছি কই। চোখের ওপর দেখলাম রাজা হলেন ফকির। যদি না দেখতাম, তাহলেও বা সোনা-দানার গরব করা চলত। গরব করে বলছিনা দাদাবাবু। বরং বলছি শহর ছেড়ে চল বনে—চল পাহাড়ে। ঝরণার জল, গাছের ফল, এন্তার খাও—গুহা আছে, শোও।

ইন্দ্র ॥ বাকল আছে পর। দিব্যি আরাম। চমৎকার বুদ্ধি। জংলী ভূত। ছোটজাতের বৌ—তোর মুখে লেখা। ভদ্দর লোকের সাধ্যি কি তোকে ভদ্দর করে! দে, চা দে।

জবা ॥ ভদ্দর হয়ে লাভ যা, তাও তো দেখলাম। জোতজমি জমিদারী। সাত পুরুষের ভিটে—তার চেয়েও বড়, ঠাকুর দেবতা—ধর্ম—জুজুর ভয়ে যেমন করে ছেড়ে দিয়ে, এক কাপড়ে প্রাণের ভয়ে সব পালিয়ে এলে নোয়াখালি থেকে কলকাতা, অভদ্দর চাষারা তা পারেনি।.. নাও চা।

ইন্দ্র ॥ [চায়ে চুমুক দিয়ে] এর নাম চা?.. এ চা তুই খা। [তার গায়ে নিক্ষেপ করে, পেয়ালাটা রেখে হন হন করে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল..] যতবড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

জবা ॥ [চকিতে সরে যাওয়ায়—চার বেশি ভাগটাই মাটিতে পড়ে গেছে। বাকিটা পড়েছে কাপড়ে। জবা শুধু বললে—বেশ, কোন মুখে আবার চা চাও দেখব।

বাড়িওয়ালা ॥ ছোটবাবুর গলা পেলাম, আছেন নাকি?

জবা ॥ বেরিয়ে গেলেন।

বাড়িওয়ালা ॥ বাইরেই তো থাকেন কাজকর্মের সুবিধা হল কি কিছু?

জবা ॥ জানি না।

বাড়িওয়ালা ॥ আমি জানি। হবে না কিছু, তা দেখছেন দেখুন। বড়বাবু কোথায়?

জবা ॥ ঘুমিয়ে রয়েছেন।

বাড়িওয়ালা ॥ কেমন আছেন?

জবা ॥ ভালো না, হাঁপানি বেড়েছে।

বাড়িওয়ালা ॥ বেড়েছে! সে কি! বাড়বার কথা নয় তো, সারবার কথা। কত লোকের সেরেছে, ওঁর সারলো না! ত্রিকুটের স্বপ্নাদ্য ওষুধ ফেল

হয়নি তো কখনো ! আমার গাদা গাদা সারটিফিকেট রয়েছে যে ! নিয়মভঙ্গ হয়েছে নিশ্চয় । হতেই হবে ।...চা বুঝি একপাট হয়ে গেছে ? তা বেশ—তা বেশ । [ইন্দ্র ফিরে এল] এই যে ছোটবাবু ! এরি মধ্যে ফিরে এলেন যে !

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ এলাম । পথে গিয়ে মনে হল চা খেয়ে বেরুইনি ।

[জবা সেখান থেকে চলে গেল]

বাড়িওয়ালা ॥ ভাগ্যিস ! তাই দেখা হল । কাজকর্মের সুবিধে হল কিছু ?

ইন্দ্র ॥ কই আর হ'ল মশাই ।

বাড়িওয়ালা ॥ হবে না মশাই, হবে না । বিশুব রাশিচক্রে রবি—রবিপুত্র—সিংহিকার সুত রৌদ্র, সঙ্গে দেব-সেনাপতি, ওরে বাবা ! 'তদা যুদ্ধাকুলা পৃথ্বী—ধনধান্য বিবর্জিতা ।'

ইন্দ্র ॥ কিন্তু আপনার তো বেশ হ'ল । পাঁচশ টাকা সেলামি নিয়ে আমাদের তিনখানি পায়রার খোপ ভাড়া দিয়েছেন ।

বাড়িওয়ালা ॥ হোল ! গৃহহানি হ'ল না আমার ? তিন তিনখানা ঘর হাতছাড়া হয়ে গেল না ?

ইন্দ্র ॥ তা বটে ।

বাড়িওয়ালা ॥ দ্বারে দ্বারে সোমত্ত বৌ-ঝি আর বুড়ো বাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন । আপনাদের কান্নাকাটি সইতে পারলাম না । ভাবলাম হিন্দুকে হিন্দু না দেখলে দেখবে কে ।—তাই নিজে বঞ্চিত হয়ে ঘর তিনখানা ভাড়া দিলাম ।

ইন্দ্র ॥ তা তো বটেই ।

বাড়িওয়ালা ॥ না, তা তো বটে নয় । আমি আপনাকে দেখছি, আপনিও আমায় দেখছেন । কিন্তু আমাদের কেউ দেখছে না । র‍্যাশনের চাল বলুন, পরণের কাপড় বলুন—আলু, পটল, বেগুন, মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ এমন কি ঐ পুঁই আর কলমি শাক—মুখ বাঁকিয়ে বসে আছে । কে আমাদের মুখের দিকে চাইছে বলুন ?

ইন্দ্র ॥ তা যা বলেছেন ।

বাড়িওয়ালা ॥ চলে না মশাই । সাধে কি আজ আবার ভাড়া চাইতে এসেছি ?

ইন্দ্র ॥ বলেন কি মশাই ? ভাড়া !

বাড়িওয়ালা ॥ একমাসের আগাম ভাড়া । দেবার কথা ছিল ।

ইন্দ্র ॥ কিন্তু মাসে মাসে ভাড়া তো মিটিয়ে দিচ্ছি । দিই নি ?

বাড়িওয়ালা ॥ কেন দেবেন না । কিন্তু এক মাসের ভাড়া আগাম জমা থাকে । নিয়ম ।...রসিদ পাবেন ।

ইন্দ্র ॥ আপনি তো জানেন নোয়াখালি থেকে কি অবস্থায় এখানে এসেছি । ভিটে-মাটি সব গেছে । গয়না-পত্র লুট হয়ে গেছে । প্রায় একবস্ত্রে শুধু প্রাণ কটি নিয়ে দেশ ছেড়েছি ।

বাড়িওয়ালা ॥ তা বটে—তা বটে। তবে মরা হাতী লাখো টাকা, এই যা। রিলিফ সেন্টারে যখন থাকলেন না—তখন বুঝতে হবে—

ইন্দ্র ॥ থাকলাম না নয়। থাকা গেল না।

বাড়িওয়ালা ॥ তবেই দেখুন বড়লোক না হ'লে—

ইন্দ্র ॥ বাবার অবস্থা দাঁড়াল, এখন-তখন। রিলিফ সেণ্টারে দারুণ বিশৃঙ্খলা। বাবা কাঁদতেন আর বলতেন, আমায় বাড়ি নিয়ে চল। হাতে টাকা নেই, পয়সা নেই ; চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়না, পথ্য পর্যন্ত দিতে পারি না বাবার এ দৃশ্য সইতে পারলে না দলের একটি মেয়ে এক নমঃশূদ্রের বৌ। ব্রাহ্মণ নমঃশূদ্র তখন এক হয়ে গেছে। দুঃখের মধ্যে দিয়ে আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে—সত্যিকার আত্মীয়তা।

বাড়িওয়ালা ॥ শাস্ত্রেও বলে স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। ঐ জবা বলে যাকে ডাকেন, সেই তো ?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ, জবা। প্রখর বুদ্ধি, খানকতক গয়না ছিল—সব কটাই বাঁচাতে পেরেছিল। তাই বেচে বাসা করলে। সেই বাসা এই বাসা।

বাড়িওয়ালা ॥ ভালোবাসা হলেই বাসা ভাল হয়। [চা নিয়ে জবা এলে] নিন—চা নিন [চায়ে চুমুক দিয়ে] চা-ও ভালো। বেশ চা।

জবা ॥ এ চা আপনার বাড়ির। চেয়ে আনলাম। আমাদের চা ছোটবাবু খেতে পারেন না।

বাড়িওয়ালা ॥ করেছ কি ! আমার বাড়ির চা আমি আবার খেতে পারিনা। কি সর্বনাশ ! কি খাচ্ছি ?

জবা ॥ কর্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছি। ঐ তো দোরের আড়ালে রয়েছেন।

বাড়িওয়ালা ॥ কি সর্বনাশ, এতো ভালো চা ! দেখেই তা বুঝেছি ! পরের বাড়ির চা আমার পোষায় না।

জবা ॥ ছোটবাবু আবার বাড়ির চা ছুঁড়ে ফেলে দেন। আপনার বাড়ির চা বলেই খাচ্ছেন।

বাড়িওয়ালা ॥ সে কি মশাই ।...নাঃ—দেখছি চা খাওয়াটাই কিছু নয়। আর যদি খেতেই হয়, বাড়ির চা খাবেন। আর বাড়ি-ভাড়াটা আগাম দেবেন ' চল গো, আমি যাচ্ছি। [প্রস্থান]

জবা ॥ [মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল]

ইন্দ্র ॥ হাসছ যে ?

জবা ॥ ভদ্দর লোক এখনি আবার ফিরে আসবে।

ইন্দ্র ॥ কেন ?

জবা ॥ ও বাড়ির চা—দোরের আড়ালে গিন্নী—সব মিছে কথা। বাড়ি গিয়ে কথা পাড়লেই কুরুক্ষেত্র বাধবে।

ইন্দ্র ॥ কি সর্বনাশ !

জবা ॥ ভেবেছে কি, ওকে আমি সহজে ছাড়ব ?

ইন্দ্র ॥ সেকিরে জবা ?

জবা ॥ করেছে কি জানো ?

ইন্দ্র ॥ কি ?

জবা ॥ ডাক্তারি ওষুধে বাবার হাঁপানি সারছে না। ও এসে বলেছে ত্রিকূট বাবার স্বপ্নাদ্য ওষুধ আছে—অব্যর্থ—১০৮ টাকা দিয়ে ত্রিকূট-যজ্ঞ করে সে ওষুধ দেন ত্রিকূট বাবা।

ইন্দ্র ॥ ১০৮ টাকা !

জবা ॥ যে কষ্ট পাচ্ছেন তা যদি সারে—১০৮ টাকা বড় কথা নয়। একদিন হাঁপানির খুব টান উঠেছে, প্রাণটা বেরিয়ে যায়—মীরাদিদি সেবা করছিল আর কাঁদছিল—তখন বাবা তাকে বললেন ঐ ওষুধ এনে আমায় বাঁচা মা মীরা।

ইন্দ্র ॥ মীরা টাকা পাবে কোথায় ? আমায় কেন বলেন নি ?

জবা ॥ কেন বলেননি বাবাই জানেন। আমায়ও বলেননি। রোগের যন্ত্রণায় মীরাকে কাছে পেয়ে মীরাকেই বলেছিলেন। মীরা সেই থেকে আহার নিদ্রা ছাড়ল। যে মেয়ে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খায়নি, সেই মীরা কাজের খোঁজে কোথায় ঘুরেছে আর কোথায় না ঘুরেছে !

ইন্দ্র ॥ সে কি ! আমি জানি না !

জবা ॥ তুমিও বাইরে বাইরে থাকো—কি করে জানবে !

ইন্দ্র ॥ মীরা। শেষে মীরা !

জবা ॥ মীরাকে আমার হাতের এই চুড়ি ক'গাছা বিক্রি করতে বলেছিলাম। মীরা বললে, না রে জবা, বাবা আমার কাছে চেয়েছেন, এই প্রথম চাওয়া…এই শেষ চাওয়া—আমাকেই তা দিতে দে।

ইন্দ্র ॥ মীরা দিয়েছে ? কী করে দিলে ? কোথায় পেলে টাকা ?

জবা ॥ কাজ পেয়েছে। শুশ্রূষার কাজ। আগাম টাকা নিয়েছে

ইন্দ্র ॥ আর সেই টাকা দিয়েছে ঐ পিশাচটাকে ?

জবা ॥ হুঁ—দিয়েছে।

ইন্দ্র ॥ অথচ ব্যারাম বাবার বেড়েই চলেছে। আর এই জন্যে আমার বোন—যে কোনদিন ঘরের বাইরে বের হয়নি—। আমি ঐ রাস্কালকে আজ খুন করব !—না—না, ছাড়ো, আমায় ছাড়ো—

জবা ॥ ছিঃ দাদাবাবু, ঐ যে বাবা আসছেন। বাবা কি বলেন শোন !

[কাসতে কাসতে মহেন্দ্র দাসের প্রবেশ]

ইন্দ্র ॥ বাবা !

মহেন্দ্র ॥ বল।

ইন্দ্র ॥ ত্রিকূটের ওষুধ খেয়েছ তুমি ?

মহেন্দ্র ॥ খাচ্ছি।

ইন্দ্র ॥ উপকার বুঝছ ?

মহেন্দ্র ॥ না।

ইন্দ্র ॥ ১০৮ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়েছে ?

মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। আমার মীরা মা দিয়েছে।

ইন্দ্র ॥ ওষুধ দিয়েছে ঐ বাড়িওয়ালা ?

মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁ বাবা।

ইন্দ্র ॥ শালাকে আজ আমি দেখছি—

মহেন্দ্র ॥ সে কি! এই দাঁড়াও।

ইন্দ্র ॥ এই সব বুজরুকি সহ্য করব ?

মহেন্দ্র ॥ বুজরু'ক! দুপাতা ইংরেজি পড়ে—এসব হল বুজরুকি! এই পাপেই আজ এল পাকিস্তান।

ইন্দ্র ॥ বলুন! আমিও বলতে পারি কেন এল পাকিস্তান। কিন্তু তর্ক থাক। ১০৮ টাকা দক্ষিণায় বাবা ত্রিকূটনাথের স্বপ্নাদ্য মাদুলি যদি অব্যর্থই হবে, কই সারল ব্যারাম ? বুজরুকি নয় ? আমি চিটিং কেস করব।

মহেন্দ্র ॥ ব্যারাম সারবে। ত্রিকূট বাবার কথ মিথ্যা হবেনা—হতে পারে না। বাড়িওয়ালা নিজে পাহাড়ে গিয়ে বাবার শ্রীমুখে শুনে এসেছে। কত শত লোক ভালো হয়ে গেছে। একটা নিয়ম আছে—সেই নিয়মটা পালন করতে পারছিনা—আমার ব্যাবাম তাই সাবছে না। অতি সাধারণ—অতি সহজ—অতি ছোট একটা নিয়ম—এত সোজা যে লোকে শুনলে হাসবে—কিন্তু এত চেষ্টা করেও সে নিয়মটা মানতে পারছি না। দোহাই ত্রিকূটেশ্বর। আমায় শক্তি দাও—ঐ নিয়মটুকু পালনের শক্তি দাও—আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও—

[কাঁদতে কাঁদতে কোনওমতে কথাগুলি শেষ করলেন। জবা তাঁকে ধরে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেল।...ক্ষণেক নিস্তব্ধতা। শুদ্ধ ইন্দ্রকে সচকিত করলে বাইরের দরজায় করাঘাত। দরজা অর্গলবদ্ধ ছিল না—খুলে গেল। দেখা গেল একজন রিলিফ অফিসার এবং একজন নমঃশূদ্র, নাম নটবর তলোয়ার ও পুলিশের প্রবেশ]

রিলিফ ॥ এই যে ইন্দ্রবাবু। ভেতরে আসতে পারি ?

ইন্দ্র ॥ নমস্কার আসুন।

[সকলে ভেতরে এল]

রিলিফ। ইনি পুলিস অফিসার।

ইন্দ্র ॥ নমস্কার। ব্যাপার কি ?

পুলিস ॥ আপনার বাসার চারদিকে পুলিস। মিথ্যা বলে ব্যাপারটা আর জটিল করবেন না। জবা দাসী নাম্নী একটি মেয়েছেলে আপনার বাড়িতে আছে ?

ইন্দ্র ॥ আছে।

জবা। [এগিয়ে এসে] আমারই নাম জবা দাসী।

নটবর ॥ হুজুর,—হুজুর, ঐ আমার স্ত্রী। হাঁরে জবা—আমারে ছেড়ে এদ্দিন কোথায় ছিলিরে তুই ?

পুলিস ॥ এই থামো। [জবাকে] এই লোকটি তোমার স্বামী। এই নটবর তলোয়ার ?

জবা ॥ 'না' বলব না। স্বামীই ছিল।

রিলিফ ॥ [ইন্দ্রকে] আপনি একে আপনার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে আমাদের রিলিফ সেণ্টারে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করেছিলেন।

ইন্দ্র ॥ তা, খাতায় স্বামী-স্ত্রী রূপেই লিখিয়েছিলাম।

পুলিস ॥ এ কথা জেনে—যে, এ অপরের স্ত্রী—

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ, তা জানতাম না—বলা চলে না।

পুলিস ॥ [রিলিফ অফিসারকে] এঁরা দুজনে একঘরে শুতেন ?

রিলিফ ॥ নিশ্চয় শুতেন।

ইন্দ্র ॥ আরো ত্রিশ চল্লিশ জন ঐ ঘরেই শুতেন। কোনোদিন পঞ্চাশ জনও শুতেন।

রিলিফ ॥ হ্যাঁ তারাও দেখেছে।

ইন্দ্র ॥ তা দেখবে বই কি। রিলিফ সেণ্টার তো আর শ্বশুরালয় নয়।

নটবর ॥ আরে জবা, শেষে তোর মনে এই ছিল রে ! শেষে কুলে কালি দিলিরে জবা !

পুলিস ॥ [নটবরকে] এই থামো। [ইন্দ্রকে] আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

জবা ॥ কি অপরাধ ?

পুলিস ॥ সেটুকু বোঝবার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি ওঁর আছে। তোমারও আছে। অ্যারেস্ট হিম।

ইন্দ্র ॥ দাঁড়ান স্যার। ব্যাপারটা অত সোজা নয়। এ আমার বিবাহিতা স্ত্রী। লাইসেন্স চান, প্রমাণ চান—সব পাবেন। চান ?

পুলিস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ

ইন্দ্র ॥ হাসির কথাই বটে। আমারও হাসি পাচ্ছে। ছোটলোক বলে যাদের ছায়া মাড়াইনি—তাদের এক মেয়ে আমার স্ত্রী। আর তারই অন্নে আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি। মহাকালই যে হাসছেন দারোগাবাবু।

জবা ॥ আমি হাসতে পারছি না দারোগাবাবু। আমাদের গ্রাম মুসলমানরা আক্রমণ করবে শুনেই ঐ অত বড় তলোয়ার খাঁ—আমার ঐ স্বামীদেবতা দাসীকে ঘরে ফেলে—সাতপুরুষের ভিটে ফেলে, কুকুরের মতো পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। ছেঁড়া জুতোজোড়া পায়ে নিতে ভোলেন নি—ঐ দেখুন। কিন্তু দাসীকে বাঘের মুখে ফেলে গেলেন। শুধু দাঁত আর নখ দিয়ে কতক্ষণ লড়াই করা যায় বলুন দারোগাবাবু ..পারলাম না—ওদের চাবুকেরই হল জয়। পিঠে আজও তার ঘা। দেখুন।

ইন্দ্র ॥ আমাদের গাঁয়ে আমরা রুখেছিলাম। বাপ মা ভাই বোনদের সরিয়ে দিয়ে আমরা গরিলা-লড়াই চালিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদেরই আত্মীয়-

কুটুম্বরা আমাদের ধরিয়ে দিলো। কলমা পড়তে আপত্তি করলাম না, কারণ সব ধর্মেই আমার বিশ্বাস আছে। ঘটনা-চক্রে এরা আর আমরা একই খোঁয়াড়ে আবদ্ধ হলাম। হুকুম হ'ল আমাদের সাদি দিয়ে ধর্মটা পাকা করে নেবে। উচ্চজাতের সঙ্গে অন্ত্যজের, অস্পৃশ্যের সাদি হবে—ভেদাভেদ দূর করা হবে। ভালো লাগল। আমার নামকরণ হল রহমৎ খাঁ। আমার বিবি হলেন পরিবানু বেগম...ঐ জবা দাসী। খানাপিনা হল খুব। নমাজ পড়তে ভুল হল না কোনোদিন।

নটবর ॥ হা গোবিন্দ!..

পুলিস ॥ হুঁ! প্রমাণ আছে?

নটবর ॥ আর প্রমাণে কি হবে দারোগা সায়েব! এমনি সব কাণ্ড-কারখানাই হয়েছে। তা আবার শুদ্ধিও হচ্ছে। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা বলেছেন, গঙ্গায় নেয়ে নিলেই হবে। আয় জবা, চল।

পুলিস ॥ [জবাকে] কি, যাবে?

জবা ॥ না।

নটবর ॥ সেকি রে জবা!

পুলিস ॥ না কেন? ধর্মে যখন বাধছে না—

জবা ॥ মুখ্যু মানুষ। ধর্মটর্ম বুঝিনা। বুঝি মানুষ, চিনি মানুষ। যাবনা।

পুলিস ॥ তা বুঝতে পারছি।—তা বেশ। সবাই তাহলে একবার থানায় চল। স্টেটমেন্টগুলো রেকর্ড করতে হবে। একটা এনকোয়ারীও করতে হবে।

নটবর ॥ কিন্তু—

পুলিস ॥ [সপদদাপে] চল।—তুমি মেয়ে, তোমাকেও যেতে হবে।

[পুলিস অফিসারের সঙ্গে সকলে থানায় চলে গেল মীরা লুকিয়ে এসব দেখছিল আর শুনছিল। সে পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে যখন দেখলে ওরা চলে গেছে—তখন সে ভেতরে যাবে এমন সময় বাড়িওয়ালাও পা টিপে টিপে এগিয়ে এল এবং ইসারায় মীরাকে দাঁড় করালো।]

বাড়িওয়ালা ॥ মীরা!

মীরা ॥ এসেছেন ভালোই করেছেন। নইলে আমিই আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।

বাড়িওয়ালা ॥ তাই নাকি! বা-বাঃ—বেশ। কিন্তু কি সব ব্যাপার! সব থানায় গেল?

মীরা ॥ হ্যাঁ। গেল। আপনাকেও যেতে হবে ললিতবাবু।

বাড়িওয়ালা ॥ কেন, কেন মীরা!

মীরা ॥ আপনি আমাদের চীট্ করেছেন। আপনি বদ লোক।

বাড়িওয়ালা ॥ ছিঃ মীরা, একথা বলো না। হঠাৎ এত রাগ কেন মীরা!

মীরা ॥ আপনি বাবাকে কী বুঝিয়েছেন, আপনিই জানেন। ত্রিকুটেশ্বরের

ওপর যতটা বিশ্বাস—আপনার ওপরও ততটা। ১০৮ টাকা নিয়ে আপনি তাঁকে কি স্বপ্নাদ্য ওষুধ দিয়েছেন, আপনিই জানেন। কিন্তু বাবার বিশ্বাস, তাতে তিনি সারবেনই। সারছেন না শুধু—কি একটা নিয়ম বলে দিয়েছেন—সেই নিয়মটা মানতে পারছেন না বলে। নিয়মটা কি?

বাড়িওয়ালা ॥ খুব সোজা একটা বিধি।

মীরা ॥ কিন্তু সেটা কি?

বাড়িওয়ালা ॥ সেটা গুপ্ত রাখাই যে বিধান মীরা। অপরে জানলে ওষুধে কিন্তু ফল হবে না।

মীরা ॥ না জানাতেও ফল হয়নি। জানলে বরং বুঝব।

বাড়িওয়ালা ॥ তা তুমি ধরলে বলতেই হয়। কিন্তু ওষুধে কাজ না হ'লে আমার দোষ নেই মীরা।

মীরা ॥ বলুন।

বাড়িওয়ালা ॥ বিধিটা হচ্ছে এই, ওষুধটা যখন খাবেন তখন কখনো যেন উষ্ট্রের কথা মনে না হয়।

মীরা ॥ উষ্ট্র!

বাড়িওয়ালা ॥ মানে উট। দেখেছ ত!

মীরা ॥ দেখেছি। কিন্তু উষ্ট্র কেন?

বাড়িওয়ালা ॥ সে ত্রিকূটেশ্বর জানেন।

মীরা ॥ কিন্তু এ বিধি দেওয়াতে উষ্ট্রের কথাটিই যে আরো বেশি করে মনে পড়বে—ওষুধের গুলটি যেই মুখে ধরবেন।

বাড়িওয়ালা ॥ উনি চেষ্টা করছেন। একদিন হয়তো পারবেন। সেদিন ব্যায়াম সারবে নির্ঘাৎ। জয় বাবা ত্রিকূটেশ্বর!

মীরা ॥ বুঝলাম। হুঁ, বুঝলাম। বেশ। আচ্ছা আর একটা কথা।

বাড়িওয়ালা ॥ বল—বল মীরা।

মীরা ॥ আপনার ১০৮ টাকা দক্ষিণা আমি যোগাড় করে দিয়েছি। জানেন?

বাড়িওয়ালা ॥ তা-না-হ্যাঁ, তা বুঝতে পারি বইকি। আর তো সব ভ্যাগাবণ্ড।

মীরা ॥ একশ আটটা টাকার জন্যে যখন আমি পাগলের মতো ঘুরছি, তখন একদিন একটা পোস্টকার্ডে চিঠি পেলাম। লিখেছে—"৩২৩ চৌরঙ্গীপার্কে ম্যাসাজ কিওর—মানে, গাত্রমর্দন চিকিৎসালয়ে নার্স নিযুক্ত হবে। মাসিক বেতন ১৫০ টাকা। আবেদন করুন।" স্বাক্ষর "হিতৈষী বন্ধু।" যেতেই চাকরী পেলাম। আগাম ১০৮ টাকা নিয়ে আপনার দক্ষিণা দিলাম।

বাড়িওয়ালা। তাই নাকি! এত সবও আছে নাকি!

মীরা ॥ ক্রমে বুঝলাম যে নার্সিংটা কি।

বাড়িওয়ালা ॥ কী?

মীরা ॥ শয়তান! ব্যবসাটা তোমার!

বাড়িওয়ালা ॥ না মীরা, তোমার মাথার ঠিক নেই আজ। তুমি বরং— আচ্ছা আমিই বরং—

মীরা ॥ শুধু আমি? আমার মতো কত মেয়ের সর্বনাশ তুমি করেছ! ১০৮ টাকা যোগাড করতে যেমন পাগল হয়েছিলাম, তেমনি পাগল হয়ে এই রিভলবার যোগাড় করেছি। [রিভলবার লক্ষ্য করল]

বাড়িওয়ালা ॥ মীরা! মীরা!

মীরা ॥ আমাদের জীবন তুমি মরুভূমি করে দিয়েছ। মরুভূমি! জীবন আমাদের মরুভূমি!

[চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। হাত থেকে রিভলবার মাটিতে পড়ে গেল]

বাড়িওয়ালা ॥ [রিভলবার তুলে নিয়ে] মীরা।

মীরা ॥ মরুভূমি দিয়ে চলেছি আমরা সব উট। বাবা কী করে আমাদের ভুলবেন! কী করে সারবেন তিনি!

মহেন্দ্র ॥ [নেপথ্য থেকে] মীরা! মীরা!

[বাড়িওয়ালা রিভলবার নিয়ে অদৃশ্য হল]

মীরা ॥ [দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল]

মহেন্দ্র ॥ [ওষুধের খল হাতে এসে, তাকে ঐ অবস্থায় দেখে] উট! মরুভূমিতে মুখ ঢেকে, রয়েছে!···হাঃ হাঃ হাঃ [হঠাৎ] এই যা—মনে পড়ে গেল! কী হবে আর ওষুধ! [খলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন] আয় মা! আমার বুকে আয়—এ মরুভূমিতে এইটুকুই যা ওয়েসিস!

বর্তমান, আশ্বিন, ১৩৫৫

নব একাঙ্ক

নব একাঙ্ক

উৎসর্গ

শ্রীমান প্রদীপ রায়
শ্রীমতী মিত্রা সেনগুপ্তা

শুভবিবাহে
স্নেহাশিস্

আশীর্বাদক
মন্মথ রায়

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫
২৮-৫-৫৮

অর্কেস্ট্রা

ক'লকাতার উপকণ্ঠে বড় রাস্তার ধারে একটি মধ্যবিত্ত পল্লী। তন্মধ্যে মধ্যবিত্ত কেরাণী মহারাজ মিত্রের বাড়ী। একটা বড় উঠোন—একদিকে বড় রাস্তা থেকে ভেতরে আসবার প্রবেশ পথ। আর একদিকে একটা বড় ঘরের চওড়া বারান্দা। উঁচু দেয়ালে বাড়ীটি বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে। এই দেয়ালেরই একটা অংশে টালীর ছাউনী দিয়ে একটা শোয়ার ঘর ক'রবার প্রয়াস হয়েছে তারও একফালি বারান্দা আছে। উঠোনে তুলসী বেদীও রয়েছে। শহরতলী বলে দুচারটে গাছ-গাছড়াও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। বাড়ীটির একটা সুবিধে—রাস্তার একটা বৈদ্যুতিক আলো এ বাড়ীর উঠোনটাকে সারারাত আলোকিত করে।

মহারাজ মিত্রের বড় ছেলে আনন্দ মিত্র—যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত—বয়স বছর পাঁচশ। আনন্দ নামটি সার্থক করবার মত চেহারা তার ছিল যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ার পর আনন্দকে নিয়ে এ দরিদ্র সংসারে বেদনার শেষ নেই। হাসপাতালে কোন 'বেড্' মেলেনি তাই দেয়ালটাকে কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে তার বাসের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বারান্দাটিতেই সে বেশীর ভাগ সময় কাটায় কারণ তার ঘরটিতে কোন জানালা নেই। একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ইজিচেয়ার, একটা 'টিপয়' টেবিল আর Crossword Puzzle-এর খাতা-পেনসিল—এই নিয়েই তার দিন কাটে। বিলাসও একটু আছে—সেটি হ'ল একটি মাধবীলতার গাছ। কোথা থেকে নিজের হাতে এনে সে তার এই ঘরের পাশে পুঁতে তুলে দিয়েছে লতাটি। বাড়ীর আর সবাই পরিচর্যা করে আনন্দের। আনন্দ পরিচর্যা করে এই লতাটির। বসন্তের সন্ধ্যা—দেখা গেল মাধবীলতার গোড়ার মাটি আলগা ক'রে আনন্দ বারান্দায় উঠে আসতে গিয়ে একটা দমকা কাশিতে খানিকটা হাঁফাতে হাঁফাতে উঠোনে পাতা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল। বাড়ীতে তখন মা ছাড়া আর কেউ ছিল না—তুলসীমঞ্চে তিনি সন্ধ্যাদীপ দিতে আসছিলেন—সেখানে প্রদীপটি তাড়াতাড়ি রেখে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম সেরে ছুটে এলেন কাছে—হাত পাখাটি দিয়ে তাকে হাওয়া করতে লাগলেন। আসুন, এই অবসরে তাঁকে একটু ভাল করে দেখে নিই। বাড়ীর কর্ত্রী তিনি—বয়স বছর চল্লিশ। সুখ-দুঃখের অনেক ঝাপটা তাঁর উপর ব'য়ে গেছে, সবই তিনি সহ্য করেছেন—হাসিমুখে কিনা জানি না—যদিও নাম তাঁর সুহাসিনী দেবী।

সুহাসিনী ॥ আবার তুমি বাইরে গিয়েছিলে বাবা ?

আনন্দ ॥ না-মা। মাধবীলতা গাছের মাটি টা একটু আলগা করে না দিলে আর চলছিল না।

সুহাসিনী ॥ বল্লেই সে আমরা কেউ দিতাম। তুমি কেন গেলে বাবা—আনন্দ ?

আনন্দ ॥ মাগো—এইটুকুই আমার আনন্দ ? ও আর তোমরা কেড়ে নিও না।

সুহাসিনী ॥ (তার কপালে হাত দিয়ে দেখে) আজ জ্বরটা কম আছেরে আনন্দ।

আনন্দ ॥ তা আছে। মনে হচ্ছে মা—আমি সেরে উঠবো—শীগ্‌গিরই আমি সেরে উঠবো। আবার কাজে যেতে পারবো—আবার তোমার মুখে হাসি ফুটবে। (মার মুখে কোন ভাবান্তর না দেখে) কই মা—হাসি তো ফুটলো না তোমার মুখে ! বাপ-মা কি দেখে তোমার নাম রেখেছিল সুহাসিনী—বলতে পারো ? যক্ষা রোগী ছেলে নিজে বলছে সেরে উঠবে—তাও তোমার মুখে হাসি নেই ? বল মা—তুমি কি ভাবছো ?

সুহাসিনী ॥ (চমকে উঠে) ভাবছি—সেরে উঠলে তোকে আমি 'চেঞ্জে' পাঠাবো।

আনন্দ ॥ এইবার তুমি আমাকে হাসালে মা। আজ পর্যন্ত একটা Free Bed যোগাড় হ'ল না আমার—ওষুধ-পথ্যি যোগাতে ফতুর হ'লে তোমরা—না মা সেজন্য আমি দুঃখ করছিনা—তা'তেও আমার আনন্দ বুঝলে মা। মা মা আমার ঐ Crossword-এর কাগজগুলো এগিয়ে দাও না—আচ্ছা ঐ 'টিপয়'টাই নামিয়ে দাও—

[সুহাসিনীর তথাকরণ]

(মার চিবুক নেড়ে) Free Bed পেলে এ নার্সটিকে তো আমি কাছে পেতাম না মা। তবে হ্যাঁ—বাবা ফতুর হচ্ছেন। তা' আমিও সেরে উঠছি। আর—জানো মা—এবার আমি যা রোজগার করবো—হাজার হাজার টাকা—এই Crossword Puzzle-এ ! হাসছো—হাসো ! কিন্তু যেদিন সত্যি হ'বে সেদিন যদি হাসো—আমি দেখে নেবো মা।

সুহাসিনী ॥ শোন বাবা—ডাক্তারবাবু বলেন—এসব নিয়ে তোমার এত মাথার পরিশ্রম ভালো না।

আনন্দ ॥ ডাক্তারকে ব'লো তার সেই ধিঙ্গি মেয়েটাকে যেন আমার কাছে রাতদিন বসিয়ে রাখে। পাঠাবে সে ? —পাঠাবে না তো ! তবে আমার সময় কাটবে কিসে ? নাও—সরো—(Puzzle-এর কাগজটা দেখে) না—না দাঁড়াও—আচ্ছা মা বল দেখি সেটা কি— 'যাহা নিশাকালে যুগপৎ সুখ ও দুঃখ দান করে—চাঁদ না মদ ?'

সুহাসিনী ॥ না—বাবা—ওসব আর আমাকে নয়। আমি বরং তোর 'ওভালটিন'টা ক'রে আনি—

[সুহাসিনী যাইতে উদ্যত এমন সময় গৃহকর্তা মহারাজ মিত্রপ্রবেশ করলেন। মোটা-সোটা ভাল মানুষটি—একহাতে বাজারের থলে আর একহাতে একটা ইলিশ মাছ।]

মহারাজ ॥ একটু দাঁড়িয়ে যাও গিন্নী।

[সুহাসিনী দাঁড়িয়ে যান]

সুহাসিনী ॥ পই পই করে এতবার বলে দিয়েছি আজকে বাজার এনো না—তাও তুমি—

মহারাজ ॥ দেখ গিন্নী—মাসের পয়লা তারিখ—চিরকেলের অভ্যেস একটু ভাল মন্দ—

সুহাসিনী ॥ ঘরে যে বাগানের আনাজগুলো জমে রয়েছে—সেগুলো খাবে কে ? বেশ—আমি বিলিয়ে দিচ্ছি।

মহারাজ ॥ তা' বেশ তো—দাও না—

সুহাসিনী ॥ দাও না ! মাইনের টাকা পকেটে উঠলেই হাত চুলকায় না।

· মহারাজ ॥ এই রে—মনে করে দিলে তো ! হ'ল সুরু (রেগে গিয়ে) নাও ধরো—আমার দাদ চুলকাচ্ছে—

[এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হ'ল। চটপট করে মহারাজবাবু তাঁর জামা গেঞ্জি ইত্যাদি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন - কতকগুলো গিন্নীর গায়েই গিয়ে পড়লো। সুহাসিনী বাজারের থলি, মাছ ও জামা কাপড় তুলে নিয়ে অন্দরে যাওয়ার উপক্রম করলেন।]

মহারাজ ॥ (প্রচণ্ড বেগে কোমরের দাদ চুলকাইতে চুলকাইতে) আঃ—কি সুখ ! এ আনন্দের জুড়ি নেই রে বাবা ! গিন্নী বাজার করেছি—সাড়ে তিন টাকা—বাকী একশ' চুয়াল্লিশ টাকা আট আনা—ঐ ঘড়ির পকেটে—গুণে নিও -বুঝলে ! আঃ—কি সুখ—কি আনন্দ ! আ-হা-হা—ও-হো-হো—

[আরও বিষম জোরে চুলকাইতে সুরু করিলেন।]

সুহাসিনী ॥ চুলকোচ্ছো—চুলকোও—যত পার চুলকোও। কিন্তু জ্বলুনী—পড়ুনী সুরু হলে আমি কিন্তু হাওয়া করতে পারবো না।

[অন্দরে চলে গেলেন।]

মহারাজ ॥ সে যখন তখন। (চুলকাইতে চুলকাইতে) এখন তো—একে বারে স-শ-রী-রে স্ব-র্গ-বা-স !

আনন্দ ॥ নাঃ—কিছুতেই মিলছে না। এঃ—এই একটুর জন্যে Prizeটা বেহাত হয়ে যাবে ? তীরে এসে তরী ডুববে ? আঃ—এ দুঃখ আমি রাখবো কোথায় ?

মহারাজ ॥ দুঃখ আবার কোথায় বাবা। এ যে কি সুখ !

[প্রচণ্ড বেগে চুলকাইতে লাগিলেন।]

আনন্দ ॥ তুমি তো দেখছি সুখের মহাজন ! আচ্ছা বাবা—বল দেখি। কি—যাহা নিশাকালে যুগপৎ সুখ ও দুঃখ দান করে—চাঁদ না মদ ?

মহারাজ ॥ ও চাঁদ নয় রে বাবা—মদও নয়—ওটা দাদ ! এই তো দেখ বাবা যতক্ষণ চুলকোচ্ছিলাম সুখের সাগরে ভাসছিলাম—চুলকোনো থেমেছে

দুঃখের আগুনে, জ্বলে পুড়ে মরছি—উঃ কে আছিস—একটু হাওয়া কর বাবা—আঃ উঃ—(আর্তনাদ)

আনন্দ ॥ দাদ ! তা হতে পারে—আচ্ছা দেখছি—

[crossward-এ মনোনিবেশ। ইতিমধ্যে ভেঁপুর প্রবেশ—বয়স চোদ্দ পনের, হাফপ্যাণ্ট ও সার্ট।]

ভেঁপু ॥ মার দিয়া কেল্লা দাদা—মার দিয়া কেল্লা। তিন তিন খানা গোল দিয়েছে ঠুকে মোহনবাগান। ইষ্টবেঙ্গল কু—পো—কা—ৎ।

মহারাজ ॥ এদিকে তোর বাবাও কুপোকাৎ রে—তোর বাবাও কুপোকাৎ। একটু হাওয়া কর বাবা—বাঁচা—

[ভেঁপু হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলো। এমন সময়ে সুহাসিনীর প্রবেশ—হাতে একটা দাদের মলমের শিশি।]

সুহাসিনী ॥ আজ আর শুনবো না। আজ দাদের মলম—

মহারাজ ॥ (আঁতকে উঠে) ও-রে বাবা—ও-আমি লাগবো না—

সুহাসিনী ॥ (কঠোর কণ্ঠে) লাগবে না ?

মহারাজ ॥ না।

সুহাসিনী ॥ দাদ তুমি সারাবে না ?

মহারাজ ॥ না, আমি সারাবো না।

সুহাসিনী ॥ জ্বলে পুড়ে মরবে ?

মহারাজ ॥ আঃ ত্রিশ দিন রোজ এই এক কথা কেন ?

সুহাসিনী ॥ ভেঁপু !

ভেঁপু ॥ কি—মা !

সুহাসিনী ॥ ফুটবলারের মাঠে খুব তো দেশোদ্ধার করেছিস্ ! এবার নিজের বাড়ীতে বাপকে উদ্ধার কর দেখি। পাখা রাখ। তোর সেই যুযুৎসু প্যাচ—বুড়োকে মাটিতে ফেল—

[ভেঁপুর তথাকরণ]

ভেঁপু ॥ ফেলেছি মা—

আনন্দ ॥ আমিও পেয়ে গেছি মা—

সুহাসিনী ॥ এবার পায়ের ওপর চেপে বসে বুড়োর দু'হাত চেপে ধর—

মহারাজ ॥ আমাকে মেরে ফেল্লোরে বাবা—আমাকে মেরে ফেল্লো—

সুহাসিনী ॥ (ভেঁপু আদেশ পালন করেছে দেখে) হ্যাঁ ঠিক হয়েছে।

আনন্দ ॥ হ্যাঁ মা—মনে হচ্ছে ঠিক হয়েছে।

সুহাসিনী ॥ এইবার আমি মলমটা লাগিয়ে দিচ্ছি—

[সুহাসিনী শিশি খুলে যেই মলম লাগাতে যাবে এমন সময় মহারাজ মরীয়া হয়ে ভেঁপুকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।]

ভেঁপু ॥ আঁ—ইষ্টবেঙ্গল ক্ষেপলো মা ! মোহনবাগান ছাড়বে না—

[পুনরায় ধরবার চেষ্টা]

মহারাজ ॥ (রুদ্রমূর্তিতে বজ্রকণ্ঠে) খবরদার ।

[মা ও ছেলে থমকে দাঁড়াল ।]

আনন্দ ॥ এ সব কি হচ্ছে বাবা ? তোমরা এসব কি করছো মা ?

সুহাসিনী ॥ ঐ দাদ উনি পুষে রাখবেন । কোন চিকিৎসা করবেন না—সারাবেন না । রোজ আফিস থেকে এসেই অভদ্রের মত ঐ চুলকানী—জ্বলুনী পুড়ুনী । তারপরেই সব বসে হাওয়া কর । এ কি রকম পাগলামী—বল দেখি বাবা ?

মহারাজ ॥ আমিও বলি তবে—শোন বাবা । যেদিন জন্মেছিলাম গনকে বলেছিল—লগন চাঁদ ছেলে জন্মাল—দুঃখী বাপ-মা আদর করে নাম রাখলো 'মহারাজ' । আমি সেই মহারাজ মিত্র । কেমন মহারাজ ? কিনা সওদাগরী অফিসে তিরিশ টাকায় ঢুকে আজ বুড়ো বয়সে দেড়শ' টাকায় উঠেছি । বছরের পর বছর অফিসের বড়বাবুর দাঁতখিচুনী আর বাড়ীতে তোমার এই মা জননী সুহাসিনীর মুখ নাড়া—এই খেয়ে পেট ভরেছে—তার ওপর ঘরে বাইরে খাই পাওনাদারের গুঁতো । জীবনটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে বিষ । তার মধ্যে এক বিন্দু অমৃত—আমার এই দাদ—

আনন্দ ॥ বুঝেছি বাবা—মরুভূমিতে যেমন ওয়েসিস্ ।

মহারাজ ॥ তবেই বোঝ বাবা । এ দাদ আমি কেন সারাবো ? এটুকু যদি যায় কি আনন্দ নিয়ে আমি বাঁচবো ? তোরা ভাবছিস্ আমার মাথা খারাপ হয়েছে—আমি পাগল হয়েছি । তোদের দোষ দেব না—দোষ দেব আমার কপালের ।

[অন্দরে প্রস্থান]

ভেঁপু ॥ মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল 'ড্র'—মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল 'ড্র' !

[হাতপাখাটা নিয়ে বাবার পেছনে ছুটলো অন্দরে ।]

আনন্দ ॥ আচ্ছা মা—বালকদের মানুষ করতে কোনটা বেশী প্রয়োজন—আহার না প্রহার ?

সুহাসিনী ॥ কি জানি বাপু ! আহারও দিচ্ছি প্রহারও দিচ্ছি—মানুষ হবে কি গরু হবে, কে জানে ?

[ঠিক এই সময়ে বাইরে থেকে উঠোনে এসে দাঁড়াল মহারাজের কনিষ্ঠা কন্যা রাত্রি এবং সঙ্গে একটি তরুণ যুবক, নাম প্রদীপ চৌধুরী । রাত্রি অষ্টাদশী তরুণী—সাদাসিধে পোশাক পরিচ্ছদ গয়নার বালাই নেই—তবু সুশ্রী । হাতে একটা সাধারণ ভ্যানিটি ব্যাগ । প্রদীপের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা—দীর্ঘ সুগঠিত দেহ—ফ্যাসনদুরস্ত পোশাক—দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের একজন ইঞ্জিনীয়ার ।]

রাত্রি ॥ মা ! প্রদীপদাকে ধ'রে নিয়ে এলাম—উনি আজ রাতের ট্রেনে মাইথন পালাচ্ছেন ।

সুহাসিনী ॥ এ মাসটা ক'লকাতায় থাকবে—এই কথাই তো ছিল প্রদীপ !

প্রদীপ ॥ সরকারী চাকুরীর বিপদই এই । কখন যে কি হবে কেউ জানে না । সাধে কি মাসীমা আমি বলি—এ চাকুরীতে লাথি মেরে একবার ক্যানাডা ঘুরে আসবো !

সুহাসিনী ॥ ব'স বাবা বসো !

প্রদীপ ॥ (ঘড়ি দেখে) বেশীক্ষণ বসতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না মাসীমা—রাত ন'টায় ট্রেন—

[রাত্রি ছুটে গিয়ে একখানা হাতভাঙা চেয়ার এনে দিয়েছে । প্রদীপ তা'তে বসলো ।]

সুহাসিনী ॥ বসো বাবা—আমি একটু চা করে আনি ।

আনন্দ ॥ আমার ওভালটিনের কথাটা মা তুমি ভুলে গেছ ।

সুহাসিনী ॥ কিছুই ভুলিনি বাবা । বরং তুমিই ভুলে গেছো আনন্দ, সন্ধ্যের পর আর তোমার বাইরে থাকতে নেই । রাত্রি ! তোর দাদাকে ঘরে রেখে আয় ।

[সুহাসিনী অন্দরে চলে গেলেন । রাত্রি তার দাদাকে তুলতে গেল ।]

রাত্রি ॥ ওঠো দাদা !

আনন্দ ॥ কিন্তু আগে বল্ দেখি রাত্রি—আচ্ছা তুমিও বল না প্রদীপ—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোন্‌টা বেশী প্রয়োজন—খাওয়া না হাওয়া ?

প্রদীপ ॥ সেটা আমাদের চেয়ে তুমি ভালো বলতে পারবে আনন্দদা ।

আনন্দ ॥ কেন প্রদীপ ?

প্রদীপ ॥ দাঁত থাকতে আমরা দাঁতের মর্যাদা বুঝিনা কিনা—তাই ।

আনন্দ ॥ ওঃ ! হ্যাঁ—আমার স্বাস্থ্যটা গেছে—তাই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে কোনটা বেশী প্রয়োজন তা' বলবার 'অর্থারিটি' আমি—হ্যাঁ—আমিই । (উঠে দাঁড়িয়ে) তা আমি বলবো—খাওয়ার চেয়ে হাওয়ার প্রয়োজন বেশী । তাতে হয়ত পাজ্‌ল্‌টা মিলবে না—কিন্তু তবু বলবো—তোমরা বরং আমাকে খেতে দিওনা—কিন্তু আমার ঐ অন্ধকার একরত্তি ঘরটায়—অন্ততঃ আর একটা জানালা—কেটে দাও—যাতে দুনিয়ার আলো আর বাতাস আমি আশ মিটিয়ে পাই ।

[বলতে ব'লতে রাত্রির দেহে ভর দিয়ে তার নিজের ঘরে চলে গেল । ইতিমধ্যে ভেঁপু এসে প্রদীপের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ।]

ভেঁপু ॥ এই যে জামাইবাবু !

প্রদীপ ॥ সে কি রে পাগলা ! আমি আবার তোর জামাইবাবু হলাম কবে

ভেঁপু ॥ আজকালই হবে—বাড়ির সবাই বলে যে ! আচ্ছা জামাইবাবু

প্রদীপ ॥ (রেগে গিয়ে) ফের জামাইবাবু—

ভেঁপু ॥ আচ্ছা প্রদীপদা,—তোমাকে আমি আর কথ্খনো জামাইবাবু ব'লবো না যদি তুমি আমায় শীল্ড ফাইনালটা দেখিয়ে দাও।

প্রদীপ ॥ স্কুল ফাইনালটা পাশ করতে পারলেনা—তার আবার শীল্ড ফাইনাল—

ভেঁপু ॥ বা-রে! সে বুঝি আমার দোষ! পরীক্ষার ফিসের টাকা যদি জুটতো—দেখতে স্কুল ফাইনালকে আমি শীল্ড ফাইনাল করে ছেড়ে দিতাম। একটি পাস্ সঙ্গে সঙ্গে সুট্—সঙ্গে সঙ্গে গোল—ফার্স্ট ডিভিসনে ফার্স্ট

প্রদীপ ॥ বাঃ!

[রাত্রি আনন্দের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে—তা দেখে ভেঁপু চাপা গলায় প্রদীপকে বললে।]

ভেঁপু ॥ আমি চলি—

প্রদীপ ॥ কোথায়?

ভেঁপু ॥ ভেতরে—

প্রদীপ ॥ কেন?

ভেঁপু ॥ তোমার সঙ্গে ছোড়দি এখন একলা কথা কইবে কি না—এখন এখানে থাকলে ও চটে গিয়ে চকোলেট দেবে না—যাচ্ছি ছোড়দি—যাচ্ছি—

[ভেঁপু ভেতরে চলে গেল। রাত্রি আনন্দের ঘর থেকে একটা মোড়া এনেছে —সেই মোড়াতে প্রদীপের সামনে বসলো।]

প্রদীপ ॥ ভেঁপু খুব বড় 'ফুটবলার' হবে।

রাত্রি ॥ তা' হয়ত হবে—কিন্তু তোমার চেয়ে বড় নয়—

প্রদীপ ॥ আমি আবার 'ফুটবলার' হ'লাম কবে?

রাত্রি ॥ সে-টা আর কেউ জানে না—জানি শুধু আমি।

প্রদীপ ॥ বা-রে! তুমি ফুটবল খেলতে আমায় কখনো দেখেছো?

রাত্রি ॥ কেন দেখবো না? আমার সঙ্গে খেলছো!

প্রদীপ ॥ বাঃ তাই না কি!

রাত্রি ॥ নয় তো কি! 'বল'টা হ'লাম আমি—'ফুট্'টা হ'ল তোমার—

প্রদীপ ॥ রাত্রি!

রাত্রি ॥ আমি এতটুকু মিথ্যে বলিনি প্রদীপদা—কথাটা মনে ভেবে দেখ।

[সুহাসিনী চা ও খাবারের প্লেট নিয়ে এলেন।]

প্রদীপ ॥ (খাবার দেখে) চা না হয় খাচ্ছি। টা—নয়। আর কি খাবার সাধ্য আমার নেই।

সুহাসিনী ॥ বেশী তো কিছু নয়—সামান্য একটু!

রাত্রি ॥ সামান্য বলেই চলবে না মা।

প্রদীপ ॥ না-না—সে কি? একথা তুমি কেন বলছো, আমি কি তোমাদের এখানে কোনদিন খাইনি?

সুহাসিনী ॥ তা' খেয়েছো বৈ কি বাবা—সেই সাহসেই তো—

রাত্রি ॥ তুমি জান না মা—প্রদীপদার সে-দিন আর নেই। আজ তাঁদের বাড়ী গিয়ে দেখি বিরাট এক চায়ের আসর—হোমরা-চোমরা কত সব বড়লোক। পরে অবশ্য বুঝতে পারলাম তাঁরা হচ্ছেন গিয়ে পাত্রী পক্ষ—অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা, একসঙ্গে প্রদীপদা'র হাতে তুলে দিতে চাইছেন—তারপর আর এসব চলে কি মা?

সুহাসিনী ॥ তবে থাক। ভরা পেটে কিছু না খাওয়াই ভাল।—আমার হ'য়েছে জ্বালা—এক একজন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়—রাজ্যের ভাবনা এসে জ'ড় হয় আমার মাথায়—ক'লকাতা সহর পথঘাট তো নয়, মরণের ফাঁদ!

রাত্রি ॥ কেন? জয়ন্তী দেবী এখনো অফিস থেকে ফেরেননি বুঝি? বাবা ফিরেছেন তো?

সুহাসিনী ॥ তিনি ফিরেছেন—কিন্তু জয়ন্তী ফিরছে না কেন? মাইনে পেয়ে সবার আগে ফেরে সে—আজ এত দেরী কেন, ভেবে পাইনে। তোরা ব'স্—আমি রান্নাঘরটা দেখি।

[খাবাবের প্লেট নিয়ে অন্দরে চলে গেলেন।]

রাত্রি ॥ তা' চা-ও তো খেলে না প্রদীপদা! কি ভাবছো?

প্রদীপ ॥ এই চায়ের কথাই ভাবছি। সমাজটা আজ এমনি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে মনের কথা খুলে বললেই প্রলয়—

রাত্রি ॥ চায়ের পেয়ালা থেকে একেবারে প্রলয়—ওরে বাবা, সে আবার কি?

প্রদীপ ॥ আজ আমাদের ওখানে যা খাওয়া-দাওয়া হ'য়েছে—তা'তে আর এক পেয়ালা চা খাওয়া—এ একেবারে অসাধ্য। শুধু আমার কেন—তোমারও। কিন্তু তবু এ চা আমাকে খেতেই হবে। যদি না খেয়ে চ'লে যাই, তবে প্রলয় হবে কি না, বলো! Yes! Tempest in a Tea pot?

রাত্রি ॥ তুমি খেয়োনা প্রদীপদা। কে তোমাকে খেতে বলেছে?

প্রদীপ ॥ ঝড়ের পূর্বাভাষ!

[কথাটা শোনামাত্র রাত্রি চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে চা-টা ছুঁড়ে ফেলে দিল।]

প্রদীপ ॥ ঝড়! ....প্রলয়ের পূর্বাভাষ!!

রাত্রি ॥ তুমি যাবে কি না বল?

প্রদীপ ॥ প্রলয় ছাড়া আর কি!

রাত্রি ॥ এখন না গেলে প্রলয়ই হবে প্রদীপদা। আজ আর ট্রেন ধরতে পারবে না, ফলে, তোমার বড় সাহেবকে ধরে তিনমাসের ছুটি যোগাড় করতে একটা দিন যাবে পিছিয়ে, তাতে রাজকন্যাকে বিয়ে ক'রে অর্ধেক রাজত্বের

মালিক হ'য়ে ক্যানাডা যাবার সব প্ল্যান হয়ত গোলমাল হয়ে যাবে প্রদীপদা। নাও—ওঠো। জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়।

প্রদীপ ॥ কথাটা মিথ্যে নয়, রাত্রি! তাঁদের প্রস্তাবটা এই ধরনেরই বটে! ক্যানাডায় গিয়ে সেতুবন্ধন বিদ্যেটা ভাল ক'রে শিখে আসবো—এ ছিল আমার অনেক কালের স্বপ্ন—আমার সে স্বপ্ন ওঁরা সফল করতে প্রস্তুত আছেন, আমাকে দশহাজার টাকা বরপণ দিয়ে—আমি কি করি ব'ল তো রাত্রি!

রাত্রি ॥ এক মিনিট দেরী না ক'রে ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নাও—সোজা চলে যাও হাওড়া স্টেশন—ধরো মাইথনের ট্রেন—এ ট্রেন মিস্ ক'রলে জীবনে সব কিছুই মিস্ ক'রবে প্রদীপদা'।

[প্রদীপ হেসে উঠলো।]

প্রদীপ ॥ হ্যাঁ সব কিছুই মিস্ ক'রবো। তুমি ঠিক বলেছো রাত্রি—তুমি ঠিক বলেছো। মিস্ করবো না শুধু তোমাকে!

রাত্রি ॥ প্রদীপদা!

প্রদীপ ॥ সে মেয়েটির নাম সূর্যা। সূর্যের আলোতে প্রদীপ যায় মরে। প্রদীপ বেঁচে থাকে রাত্রির বুকে। চলি রাত্রি।

[রাত্রি তার হাত চেপে ধরল।]

রাত্রি ॥ দাঁড়াও। এতে আমি রাজী নই। দয়া ক'রে তুমি আমাকে এত দয়া কোরো না।

প্রদীপ ॥ দয়া করে তুমি আমাকে অন্য কথা বোলো না।

রাত্রি ॥ তোমার জীবনটা এমন ক'রে মাটি কোরো না প্রদীপদা।

প্রদীপ ॥ (হঠাৎ চেঁচিয়ে) আমার জীবনটা এমন ক'রে মাটি কোরো না রাত্রি!

[সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে চ'লে গেল। রাত্রি থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ভেঁপু ছিল পাশেই লুকিয়ে। এবার সে ছুটে রাত্রির কাছে এসে দাঁড়ালো।]

ভেঁপু। আমার চকোলেট্।

রাত্রি ॥ না—চকোলেট্ নয়।

ভেঁপু ॥ বা—রে!

রাত্রি ॥ (ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটি চমৎকার গোলাপ ফুল বের করে) নে

ভেঁপু ॥ (ফুলটি নিয়ে) আরে বাপ্‌স্। এ যে একেবারে মোহনবাগানী গোলাপ! (প্রদীপকে ইঙ্গিত করে) আজ দিয়েছে বুঝি তোকে ছোড়্‌দি।

রাত্রি ॥ হ্যাঁ।

ভেঁপু ॥ তোদের বিয়েটা হ'য়ে গেলে আমি বাঁচি ছোড়্‌দি।

রাত্রি ॥ কেন বল তো?

ভেঁপু ॥ লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছিলাম কি না—। কখনো দেখলাম তুই সুট্ করলি—প্রদীপদা খুব কষ্টে গোলটা বাঁচালো—কখনো দেখলাম প্রদীপদা সুট্ করলে—তুই কোনোমতে 'বডি থ্রো' ক'রে গোলটা বাঁচালি। শেষটা দেখলাম একটা কর্ণার কিকে তোকে গোল দিয়ে বেরিয়ে গেল—ও হল গিয়ে মোহনবাগানী চাল—আমরা তো বলি, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে বাবা!

রাত্রি ॥ ডেঁপো ছেলে! এতে বিয়ের কথা উঠছে কিসে?

ভেঁপু ॥ তুই যে দিদি হেরে যাবি, এ-ও আমি চাই না। বিয়েটা হ'য়ে গেলে—সে হবে একেবারে 'ড্র'—মন্দের ভাল বুঝলি দিদি!

[মহারাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা জয়ন্তীর প্রবেশ। ব্যক্তিত্বসম্পন্না রূপসী। বছর বাইশ বয়স। পরনে সাদাসিধে পোশাক। হাতে দুটি ভ্যানিটি ব্যাগ, একটি সাদাসিধে পুরাতন আর একটি সদ্যক্রীত মূল্যবান। জয়ন্তীর পেছনে তিনটে মুটে—নানারকম সাংসারিক জিনিসপত্তর বহন করে এনেছে—তার মধ্যে একটি বড় নতুন ট্রাঙ্কও আছে।]

ভেঁপু ॥ এই যে বড়দি এসে গেছে। আরে বাপ্স্—এ সব কি বড়দি?

রাত্রি ॥ সত্যি দিদি—ব্যাপার কি! আজ মাস পয়লা—মাইনে পেয়েছ—কিন্তু এ যে বাজার শুদ্ধ কিনে এনেছো দেখছি।

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁ—রে রাত্রি। আজ সাধ মিটিয়ে বাজার করেছি! (মুটের মাথা থেকে চট্ করে ফুটবলের প্যাকেটটা নামিয়ে) ভেঁপু—তোমার বল। কিন্তু খবরদার! পড়াশুনোর সময় খেললে আমি ফুটো করে দেখো।

[ভেঁপু বলটা পেয়ে বার দুই আনন্দে লাফাল তারপর একেবারে ফ্ল্যাট্ হয়ে মাটিতে পড়ে বড়দির পায়ে প্রণাম জানালো।]

জয়ন্তী ॥ হয়েছে—হয়েছে। এখন ওঠ দেখি (টেনে তুললো) মাল-পত্তরগুলো ভেতরে নিয়ে যা। (রাত্রিকে নতুন ভ্যানিটি ব্যাগটা দিয়ে) এটা তোর—

রাত্রি ॥ একি দিদি! আজ যে দেখছি তুমি রানী ভবানী গো!

জয়ন্তী ॥ কথা রাখ। এদের নিয়ে এখন ভেতরে মার কাছে যা' দেখি—জিনিস-পত্তরগুলো নামিয়ে গুছিয়ে রাখ।

[ভেঁপু ইতিমধ্যে ফুটবলের ব্লাডারটা বের করে ফুঁ দিয়ে ফোলাতে ব্যস্ত।]

জয়ন্তী ॥ এই ভেঁপু গেলি!

[ভেঁপুর মুখ বন্ধ, সে ইশারায় মুটেদের ডেকে নিয়ে অন্দরে চলে গেল।]

রাত্রি ॥ ব্যাপার কি—বল না দিদি? তোমার এমন রানী ভবানীর রূপ তো কখনও দেখিনি! আর তুমি এখানে দাঁড়িয়েই বা কেন? ভেতরে যাচ্ছ না যে?

জয়ন্তী ॥ বলবো—সব বলবো। এখন নয়। জিনিসপত্তরগুলো

সব গুছিয়ে রেখে মা-বাবা-ভেঁপু সবাই তোরা এখানে আয়। বাজনাগুলো সব এনে আসর ক'রে বোস—যেমন মাসপয়লার রাতে আমরা বসি—আমি দাদাকে দেখে আসি—

[রাত্রি অন্দরে চলে গেল। জয়ন্তী আনন্দের ঘরের দিকে এগোতে যাবে এমন সময় আনন্দ বেরিয়ে এল।]

আনন্দ ॥ তোর গলা শুনে আমার আর তর সইলো না জয়ন্তী। তুই ছাড়া আমার এসব কেউ কিছু বোঝে না।

[বলতে বলতে এসে নিজেই ভাঙ্গা চেয়ারটার ওপর বসলো জয়ন্তীকে মোরাটা দেখিয়ে]

এখন বোস দেখি। মাথাটা ঠাণ্ডা করে বল দেখি—"বিবাহিত জীবনে সুখী হইতে হইলে অবশ্য প্রয়োজনীয় কি, প্রেম না হেম ?"

জয়ন্তী ॥ (হেসে উঠলো) এ প্রশ্নের উত্তর এ বাড়ীতে একমাত্র দিতে পারেন—হয় বাবা নয় মা। প্রশ্নটা বরং তুমি তাঁদের জিজ্ঞেস ক'রো দাদা।

আনন্দ ॥ বিবাহ তাঁদের হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু একদিনের জন্যেও কি ওঁরা সুখী হয়েছেন যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। দেখলাম তো তাঁদের জীবনে না আছে প্রেম, না আছে হেম।

জয়ন্তী ॥ এই দাদা চুপ। ওঁরা আসছেন।

[প্রথমে মুটের দল ঢুকে গেল। তাদের পেছনেই এলো ভেঁপু এবং রাত্রি। রাত্রি একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে দিলো উঠোনে। ভেঁপু খোলটি সেখানে রেখে অন্যসব বাজনার যন্ত্র আনতে পুনরায় ভেতরে চলে গেল। রাত্রি দাদাকে একটু সরিয়ে বসিয়ে আসর রচনার কাজে ব্যাপৃত হ'ল। জয়ন্তী গিয়ে আনন্দের ইজিচেয়ারটি টেনে এনে যথাস্থানে রাখলো। ইতিমধ্যে ভেঁপু অন্যান্য বাজনার যন্ত্র নিয়ে এসে পড়েছে, যথা : গৃহকর্ত্রীর করতাল, আনন্দের বেহালা, রাত্রির বাঁশী এবং নিজের জন্যে একটা একতারা।]

আনন্দ ॥ ও—আজ মাস পয়লার আনন্দ আসর ! কিন্তু তোড়জোড়টা আজ একটু বেশী মনে হচ্ছে—জয়ন্তী !

রাত্রি ॥ তুমি তো দেখনি দাদা—আজ দিদি মাসের গোটা মাইনেটাই খরচ করে বাজার শুদ্ধু কিনে এনেছে আমাদের জন্যে।

আনন্দ ॥ (জয়ন্তীকে) সে কি রে !

জয়ন্তী ॥ চিরকালই কি আমরা দুঃখে থাকবো। একদিনও কি আমরা প্রাণভরে একটু আনন্দ করবো না দাদা !

আনন্দ ॥ কিন্তু গোটা মাস পড়ে রইলো। খাবি কি ? চলবে কিসে ?

জয়ন্তী ॥ সে পাগলটা তুমিই solve করেছ দাদা। সবাই আসুক—বলছি।

[মহারাজের প্রবেশ।]

মহারাজ ॥ ব্যাপার কি রে খুকী !

॥ খুকী বললে তো আমি জবাব দিই না বাবা।

মহারাজ ॥ ও—তুই ধরিস না মা। এই তো আমি মহারাজ মিত্র। সবাই ডাকছেও মহারাজ বলে—হঁ্যা মনে মনে হাসিও বটে! কিন্তু উত্তর তো দিই। ঐ যে তোমার মা আসছেন—নাম হ'ল গিয়ে সুহাসিনী। হাসলেন কবে? হাসতে দেখেছো কখনো? কিন্তু ডাকবে সুহাস—উত্তর দেবে ঠিকই!

[সুহাসিনীর প্রবেশ।]

সুহাসিনী ॥ হ্যাঁরে খুকী—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে। পূজোর বাজার করে এনেছিস যে! বেনারসী শাড়ি আবার আমি কবে পরি যে তুই এনেছিস আমার জন্যে!

মহারাজ ॥ পঁচিশ টাকা পনের আনা দিয়ে আমার জন্যে জুতো কিনে এনেছিস। আমায় এ জুতো তুই কেন আনলি মা?

আনন্দ ॥ এ দেখছি Crossword Puzzle-এর বাবা।

জয়ন্তী ॥ ভেবোনা দাদা—এখনই solve করে দিচ্ছি। তোমরা সবাই যার যার জায়গায় আসরে ব'স। ভেঁপু—সদর দরজা দিয়ে আয়। (ভেঁপুর তথাকরণ) টুংটাং সুরু ক'র। আমি চোখেমুখে একটু জল দিয়ে কাপড়টা বদলে আসছি।

[একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো—জয়ন্তী অন্দরে যাচ্ছিল - হঠাৎ মহারাজ মিত্র রুদ্রমূর্তিতে তার হাত চেপে ধরলো।]

মহারাজ ॥ চরিত্র নষ্ট করেছিস তুই। কারো কাছ থেকে এ টাকা তুই পেয়েছিস। মাইনের টাকা তুই খরচ করিস নি—সে আমি জানি। কারণ তুই ভাল করেই জানিস তোর আমার দুজনের বেতনেও এ সংসার চলে না।

জয়ন্তী ॥ চরিত্র নষ্ট করেছি—আমি!

মহারাজ ॥ হ্যাঁ করেছিস। তোদের আফিসের সেই বড় সাহেব—তার সঙ্গে তোর প্রেম চলছিল। গরীব হলেও আমি সব বুঝি। তুই তাকে বিয়ে করতে ক্ষেপে উঠলে কি হবে? তোকে আমি কতদিন বলেছি—বড়লোকেরা বড়ঘরেই বিয়ে করে—গরীবের মেয়ে বিয়ে করে না—গরীবের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের খেলাই খেলে। তোর বড় সাহেবের সেই টোপ্ তুই গিলেছিস। এ টাকা—সেই টাকা।

জয়ন্তী ॥ (এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমার ঘেন্না হচ্ছে। মা! তোমাকে আমি বলছি—বাবার ও কথা এতটুকু সত্যি নয়। (Vanity Bag খুলে Crossword Puzzle-এর একটা ছাপানো নোটিশ বের করে আনন্দের হাতে দিয়ে) Crossword Puzzle তুমিই Solve করেছ। এ Puzzle-টাও Solve কর তুমি—দাদা।

[ছুটে অন্দরে চলে গেল।]

আনন্দ ॥ (কাগজটা দেখে) এ কি ! (নোটিশটি পাঠ) "২১৩ নম্বর জনমঙ্গল শব্দ-সন্ধান প্রতিযোগিতায় একমাত্র নির্ভুল উত্তর দিয়া শ্রীমতী জয়ন্তী মিত্রের বিশ হাজার টাকার প্রথম পুরস্কার লাভ। নিম্নে তাহাদের নাম ও পুরস্কারের পরিমাণ ঘোষিত হইল। আগামীকল্য বিকাল ৩টায় হেড অফিসে পুরস্কার বিতরণ করা হইবে।"

সকলে ॥ এ্যাঁ !

বল কি—

দেখি কাগজটা দেখি—

আর একবার পড় তো—

মহারাজ ॥ আমার চশমাটা—আমার চশমাটা—

ভেঁপু ॥ Three cheers ror Mohunbagan—Hip—Hip Hurrah। Hip—Hip—Hurrah !

[সময়ক্ষেপণ সূচক অন্ধকার নেমে এলো মঞ্চের ওপর—মঞ্চ যখন আবার আলোকিত হ'ল তখন দেখা গেল একে একে এই পরিবারের লোকগুলি গানের আসরে সমবেত হচ্ছেন। বেশ ভাল একটা ভোজ খেয়ে উঠেছেন এই রকম একটা চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে সকলেরই চেহারায়। ভেঁপু পানের রেকাবীতে পান এনে সকলকে পান দিচ্ছে। রাত্রি তামাক সেজে এনে হুঁকো'টি মহারাজকে দিল। বাজনাগুলোর সমাবেশ করে যথাস্থানে সকলকে বসল। উদ্যমও দেখা গেল রাত্রির।]

মহারাজ ॥ এতবড় ভোজের পর এখন এসব গান বাজনা—এসব কি আর পারবো ? তোরা সুরু কর—আমি বরং এখানেই একটু গড়াগড়ি দেই—

রাত্রি ॥ না বাবা তা হবে না। মাসপয়লায় আমদের আনন্দের আসর—কতদিনের এ নিয়ম— এ আমরা ভাঙবো না। বিশেষ করে আজ।

মহারাজ ॥ আমি কি—না বলছি ? খোল না বাজিয়ে যদি আমি চোখ বুজি—বাজনা আমার বাজবেই—নাকের বাজনা—

সুহাসিনী ॥ না না রক্ষে ক'রো। তুমি নাক ডাকাতে সুরু করলে সব বাজনা যাবে তলিয়ে। সে সব চলবে না। আজ এমন দিনে ঠাকুরকে আমরা সবাই ডাকবো—তাঁর এত দয়া !

জয়ন্তী। দয়াটা ঠাকুরের সন্দেহ নেই ! পুরস্কারটা আমার নামে উঠেছে এটাও সত্যি কিন্তু যে লোকটি সমস্যার সমাধান করেছেন তাঁকে যেন আমরা না ভুলি। তিনি হচ্ছেন আমার লক্ষ্মী দাদাটি—

[আনন্দকে আদর করলো।]

আনন্দ ॥ বুঝলে মা—Puzzle-টা Solve করে আমি বুঝতে পারলাম এ Prize আমি মারবোই। কিন্তু ভেবে দেখলাম T. B.-র সৌভাগ্য যার হয়েছে

তার ভাগ্যে এ শিকে ছিঁড়বে না। তাই সমাধানটা খুকীকে দিয়ে বললাম, আমার ভাগ্যে ঢের হয়েছে এবার তোর বরাতটা দেখ।

ভেঁপু ॥ মানে বড়দা তুমি বলটা চট করে পাস্ করে দিলে আর বড়দিও সঙ্গে সঙ্গে সুট। (লাফিয়ে চিৎকার) গো···ল!

জয়ন্তী ॥ (ভেঁপুর চিবুক ধরে আদর করে) গোল—হ্যাঁ সত্যিই গোল। আমরা বোধ হয় এই প্রথম গোল দিলাম—আর জীবনের knockout-এ জিতলাম। কিন্তু এ জয় কোন জয়ই নয় দাদা যদি তুমি না বাঁচ। তুমি আমাদের জীবনের আনন্দ। তৈরী হও দাদা। টাকায় কি না হয়। কোন Sanatorium-এ তুমি যাবে বলো—কোন ডাক্তারের চিকিৎসায় তুমি থাকবে বলো? হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। আমাদের জন্য তোমাকে বাঁচতে হবে।

আনন্দ ॥ দূর—দূর! গাছের গোড়া কেটে জল দিলে, গাছ কি আর বাঁচে! যদি আমি বাঁচি—আমি আমার এই মায়ের, এই বোনের, ঐ বাবার, ঐ ভায়ের sanatorium এই—বাঁচবো। তুই আমার জন্য ভাবিসনা। বাবা মা আমার নাম রেখেছিলো আনন্দ—T. B.-র সাধ্য কি আমার সে নাম—সে আনন্দ কেড়ে নেয়! এসব কথা থাক—এখন বল দেখি "মানুষের জীবন ধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন কি—অশন না বসন?"

জয়ন্তী ॥ অশনও নয় বসনও নয়—দরকার শাসন। কারণ—তুমি আমাদের কথা শোন না, চল দাদা—শোবে চল।

সুহাসিনী ॥ বাড়ী ছেড়ে আনন্দ কিছুতেই কোনখানে যাবে না। বাড়ীতেই সবচেয়ে বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা হোক।

মহারাজ ॥ সবচেয়ে আগে দরকার ওর জন্য একটা ভাল ঘর করে দেওয়া।

রাত্রি ॥ তা ঠিক বাবা। ও আবার একটা ঘর না কি। যে দেখে সেই ঠাট্টা করে—বলে ওটা আঁতুর ঘর না—গোয়াল!

মহারাজ ॥ ওর বেশী তো আর সাধ্য ছিলনা মা! এখন যখন সাধ্য হ'য়েছে আমি বলি ঘরটা ভেঙ্গে দোতলা ঘর তোলা হোক। মনের মত আলো হাওয়া পেলেই আনন্দ আমার হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে!

সুহাসিনী ॥ তাতে কত খরচ পড়বে?

মহারাজ ॥ তা' হাজার দশেক।

সুহাসিনী ॥ বেশ তো, তবু তো দশ হাজার থাকবে—তা'তে আমার দুই মেয়ের বিয়ে কোনমতে হ'তে পারে—কি বল?

মহারাজ ॥ তা' হয়ত হ'ত—কিন্তু হবে কি? দেনা শোধ দিতে হবে না?

সুহাসিনী ॥ কত টাকা দেনা ?

মহারাজ ॥ তা' প্রায় পাঁচ হাজার—

সুহাসিনী ॥ দেনা শোধ এখন থাক। মেয়েদের বিয়েই আগে হোক।

মহারাজ ॥ বাড়ীটা বাঁধা রয়েছে যে গিন্নী! তা' বেশ তো—মেয়ের বিয়েই আগে হোক! তারপর পথে বসতে হয় বসবো।

রাত্রি ॥ না—না বাবা, আমাদের বিয়ে এখন থাক।

সুহাসিনী ॥ আচ্ছা আনন্দের ঘরটা যদি দোতলা না করে একতলাই করা হয়—খুব বড় দরজা-জানালা রেখে—তবে বোধ হয় পাঁচ হাজারেই হয়—কি বল ?

মহারাজ ॥ না-না, এ টাকা আনন্দেরই উপার্জন। তার যাতে আনন্দ হয় —সেটা আমরা দেখবো না!

সুহাসিনী ॥ কিসে তার আনন্দ—আমার চেয়ে তোমরা বেশী জান না। তোমরা কে কতটুকু তার কাছে থাকতে পার ? থাকি আমি—তাই আমি জানি। এক আনন্দ, তার ঐ Crossword Puzzle—রাতদিন রাজ্যের যত প্রশ্ন—সেইসব চিন্তা করা আর তার উত্তর বের করা—এই তো ওর আনন্দ। আর এক আনন্দ—ঐ মাধবীলতার গাছটি—ঐ গাছটির সেবা যত্ন। এ দুটি বাদ দিয়ে যদি ওকে সাত তলা বাড়ীতেও রাখো ও বাঁচবে না।

রাত্রি ॥ মাধবীলতা গাছটি দাদার শুধু আনন্দ নয়—দাদার প্রাণ। ওর একটি পাতা যেদিন খসে পড়ে, দাদার 'টেম্পারেচার' যায় বেড়ে। এই শরীর নিয়ে নিজে ওর মাটি আলগা করবে, গোড়ায় ঢালবে জল। আমরা দিতে গেলে বলবে—না, তোরা জানিস না। ঐ গাছে ফুল ফুটবে—এই হ'ল গিয়ে ওর পণ। আর সে পণ কেন তা' তোমরা জান না—জানি আমি।

মহারাজ ॥ কি ?

রাত্রি ॥ ডাক্তারের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসে দাদাকে দেখতে—ডাক্তারের মেয়ে সুনন্দা। ডাক্তারবাবু ভিজিট নেন—তাতে সুনন্দা একদিন হেসে বলেছিল, আনন্দবাবু—আমায় ভিজিট দিলেন না ? দাদা বলেছিল—কি ভিজিট দেব বলুন ? সুনন্দা বলেছিল, আপনার ঐ মাধবীলতার প্রথম ফুলটি—বলেই হেসে উঠেছিল সুনন্দা। কেন জান ?

মহারাজ ॥ কেন ?

রাত্রি ॥ মাধবীলতার গাছটি ছিল তখন মর মর। বাঁচবার তার কোন লক্ষণই ছিলনা। সুনন্দার মনে কি ছিল কে জানে—সেই থেকে সেও আর আসেনি। কিন্তু সেই থেকে দাদারও ধনুকভাঙ্গা পণ—ফুল আমি ফোটাবোই!

[ঘর থেকে জয়ন্তী বেরিয়ে এল]

মহারাজ ॥ বয়সকালে উপন্যাসেই এসব পড়তাম বটে! কি বল গিন্নী ?

সুহাসিনী ॥ তুমি এসব বুঝবে না। শোন খুকী—টাকাটার কি করবি

বল তো ? আনন্দের জন্যে দোতলা ঘর করতে গেলে তোদের বিয়ে হয় না—তোদের বিয়ে দিতে গেলে দেনা শোধ হয় না। টাকা যখন ছিল না—তখন অভাবটা এত বুঝিনি—আজ যত বুঝছি।

মহারাজ ॥ তা' ঠিক। এ যেন নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি এমন থাকতো যার হাতে টাকাটা তুলে দিয়ে বলতে পারতাম—'এই নাও মশাই—আমার যা ছিল সব দিলাম। এইবার আমার ছেলে মানুষ কর, মেয়ের বিয়ে দাও, অসুখ বিসুখে ওষুধপত্র দাও—সবাইকে খেতে পরতে দিয়ে একটু ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখো। আমার যা আছে সব নিয়ে আমাকে দায়দৈন্য থেকে রেহাই দাও—আমায় একটু আনন্দে বাঁচতে দাও।' তা' এ জন্মে আর হবে না। নাও, ঘোরাও ঘানি—ধরো গান—করো আনন্দ—

সুহাসিনী ॥ আনন্দ কিছু বাকি নেই—এত আনন্দে ঠাকুর প্রণামটুকুও আমরা ভুলে গেছি। ঠাকুর ঘরে প্রণাম সেরে এসে, তবে বসুক তোমাদের আনন্দের আসর—

মহারাজ ॥ তা ঠিক—তা ঠিক—

[মহারাজ ও সুহাসিনী যথাক্রমে খোল ও করতাল তুলে নিলেন এবং বাকী সবাই হাতে তালি দিয়ে "পার কবো হে দযাময়" জাতীয় একটা কীর্তন গাইতে গাইতে অন্দরে চলে গেল—সবার পেছনে ছিল জয়ন্তী। জয়ন্তীও অদৃশ্য হচ্ছিল এমন সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। জয়ন্তী ফিরে দাঁড়ালো—চলে গেল সদর দরজায়—দরজা খুলে দিল—ভেতরে এলেন একজন হব্যভব্য পোশাকপরা অফিসার-জাতীয় ভদ্রলোক। জয়ন্তী তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে এলো।]

জয়ন্তী ॥ আসুন—কাকে চাইছেন ?

অফিসার ॥ শ্রীমতী জয়ন্তী মিত্রকে। এইটেই তো ২৭।৩, নবাব বাহাদুর রোড ?

জয়ন্তী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—আর আমারই নাম জয়ন্তী মিত্র। আপনি কোথেকে আসছেন ?

অফিসার ॥ জনমঙ্গল শব্দসন্ধান প্রতিযোগিতার ক'লকাতার হেড অফিস থেকে—আমার নাম শ্রীগদাধর দত্ত—লোকে অবশ্য আমাকে জি. ডি. ডাট বলেই জানে।

[পকেট থেকে বিশেষ কায়দায় একটা কার্ড—জয়ন্তীর হাতে দিল।]

ওঃ—আপনার এই বাড়ী খুঁজে বের করতে যা' কষ্ট হয়েছে—কি আর বলবো ! তবে আপনাকে খুঁজে বের করতে পেরেছি—সব কষ্ট সার্থক হ'ল।

জয়ন্তী ॥ দয়া ক'রে বসুন। এত রাত্রে এত কষ্ট করে কেন আপনি এলেন ? আপনাদের ঘোষণা তো আমি পেয়েছি।

গদাধর ॥ আরে ঐ ঘোষণার জন্যেই তো আসতে হ'ল এত কষ্ট ক'রে এই

ধপ্‌ধপা গোবিন্দপুরে। ম্যানেজার সন্ধ্যে ছ'টায় আমাকে জরুরী তলবে ডেকে হুকুম দিলেন—বুঝলে ডাট্, যেমন করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে—আজই রাত্রে—সে যত রাতই হোক—এই জয়ন্তী মিত্রকে। তা, আমি বলেই পারলাম। কোম্পানির প্রেস্টিজ রাখতে কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে করে না জি. ডি. ডাট্।

জয়ন্তী ॥ ধন্যবাদ। আপনার শুভাগমনের উদ্দেশ্যটা জানবার সৌভাগ্য এখনো হয়নি। আমি আপনাদের শব্দসন্ধান প্রতিযোগিতায় বিশ হাজার টাকার প্রথম পুরস্কার পেয়েছি তা' জানি। কাল বিকেল পাঁচটায় হেড অফিসে টাকা দেওয়া হবে তাও জানি। আর কিছু জানাবার আছে কি? থাকে তো দয়া করে শীগ্‌গির বলুন। আমাদের পারিবারিক উপাসনায় আমি যোগ দিতে পারছি না—

গদাধর ॥ পুরস্কারের ঘোষণা শুনেই এই সব পুজোটুজো হচ্ছে। সে কি আর আমি বুঝছি না। হিন্দু বাড়ীতে এসব হয়েই থাকে। লোকে পাশ করলে পুজো দেয়—আমি B. A. ফেল করলাম তাও আমার মা কালীঘাটে পাঁঠা দিলেন—বলেন B. A. ফেল সেই বা কম কি—I. A. পাশের চেয়ে তো ঢের বেশী—

জয়ন্তী ॥ (ধৈর্যচ্যুত হ'য়ে) দেখুন এই রাত দশটায় আপনার গালগপ্প শোনার মত সময় নেই—ধৈর্যও নেই আমার। যদি নতুন কিছু বলবার থাকে বলুন—নইলে নমস্কার।

গদাধর ॥ আপনি তাড়িয়ে দিলেও আমাকে আমার কর্তব্য সম্পাদন ক'রে যেতেই হবে শ্রীমতী জয়ন্তী মিত্র। আপনি হয়ত মনে করেছেন রাতদুপুরে আমি আপনার ফটো নিতে এসে আপনাকে বিরক্ত করছি—

জয়ন্তী ॥ না—আমি তা' মনে করছি না। আমার চোখ আছে—আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনার সঙ্গে কোন ক্যামেরা নেই।

গদাধর ॥ তা' ঠিক। কিংবা হয়ত ভাবছেন—আমি হয়ত আপনার কাছে কিছু কমিশন চাইতে এসেছি। না—না, আপনি জানেন না—এমন অনেক ভুঁইফোঁড় কোম্পানি আছে—যারা এমন চায়। Beware of them, Miss Mitra!

জয়ন্তী ॥ আপনি বেরিয়ে যান বলছি।

[ডাট্ সাহেবের এইবার চৈতন্য হল। খানিকটা বিনীত হ'য়ে সে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করলো।]

গদাধর ॥ যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি। যে কাজে এসেছি তা' সারতে আর এক মিনিটও লাগবে না। কোম্পানির এই চিঠিটা দয়া ক'রে দেখুন।

[পত্রটি জয়ন্তীর হাতে দিল]

জয়ন্তী ॥ (চিঠিটা নিয়ে) ধন্যবাদ—আপনি এখন যেতে পারেন।

গদাধর ॥ না—না, আপনি দয়া করে ওটা এখনি পড়ুন। ওতে এমন সব ব্যাপার আছে যার মৌখিক উত্তর দিতে হবে আমাকে—ক্ষমাও চাইতে হবে আমাকে। বড়ই সব অপ্রীতিকর ব্যাপার হবে কি না—তাই—

জয়ন্তী ॥ (চিঠিটা এর সামনে পড়বে কি পড়বে না ভেবে শেষে পড়াই ঠিক করলো—চট্‌ ক'রে খামটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠি পড়ে—) সে কি! আমি তবে পুরস্কার পাই নি !!

গদাধর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—

জয়ন্তী ॥ তবে আপনাদের ঘোষণায় ছাপা হল কেন?

গদাধর ॥ নামটা ছাপতে ভুল হয়নি শ্রীমতী মিত্র। ভুল হ'য়েছ ঠিকানায়—

জয়ন্তী ॥ তার মানে?

গদাধর ॥ তার মানে প্রতিযোগীদের মধ্যে দুজন ছিলেন জয়ন্তী মিত্র। তিনজন থাকলেও আমি অবাক হতাম না—কারণ এ নামটা আজকাল খুব ফ্যাশন। সত্যি সত্যি Prize যিনি পেয়েছেন সে জয়ন্তী মিত্রের ঠিকানা—৭২, পাঁচু খানসামা লেন—ভুলে ছাপা হয়ে গিয়েছে আপনার ঠিকানা ২৭।৩, নবাব বাহাদুর রোড। খানসামা হয়েছে নবাব।

জয়ন্তী ॥ আপনি চলে যান। দয়া করে আপনি এখনই চলে যান।

গদাধর ॥ এই মারাত্মক ভুলের জন্যে কোম্পানি অবশ্য আপনার কাছে এই পত্রে ক্ষমা চেয়েছেন—আপনি পড়েছেন নিশ্চয়ই। না—না, আমাকে আবার মৌখিক ক্ষমা চাইতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জয়ন্তী ॥ আমি আপনার পায়ে পড়ছি মিঃ দত্ত—আমার বাড়ীর লোকজন এখানে আসবার আগে আপনি দয়া করে চলে যান। জীবনে এই একটি দিন ওরা আনন্দ করছে—এটুকু আনন্দে আপনি আর বাদ সাধবেন না!

গদাধর ॥ না—না, আমি যাচ্ছি। আপনি শুধু বলুন যে আপনি আমাদের ক্ষমা করছেন।

জয়ন্তী ॥ করেছি আমি—ক্ষমা করেছি আমি—

গদাধর ॥ আঃ বাঁচলাম। আমি চলি। এইবার আপনি ওদের সঙ্গে যত পারেন আনন্দ করুন। নমস্কার।

[গদাধরের প্রস্থান। মর্মাহত হলেও গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল জয়ন্তী—বন্ধ ক'রে দিয়ে এল দরজাটা। ইতিমধ্যে কীর্তন গাইতে গাইতে অন্দর থেকে পারিবারিক দলটি আসরে এসে দাঁড়াল। রাত্রি ও ভেঁপু যথাক্রমে বাঁশী ও একতারা তুলে নিল। জয়ন্তী ছুটে গিয়ে বেহালাটি তুলে নিয়ে তাদের সঙ্গে বাজাতে সুরু করলো। এতে সকলের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল—সকলে আসরে বসে কীর্তনটি আরও প্রাণবন্ত ক'রে তুললো।

জয়ন্তী মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে আসরের মধ্যমণি হ'য়ে বেহালা বাজিয়ে চলেছে যেন জন্মের মত। এরই মধ্যে আর একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। কিন্তু এরা সকলে এই কীর্তনে এতটা মত্ত ও বিভোর হয়েছিল যে, সে ঘটনার প্রতি কারও নজর পড়লো না। ঘটনাটি আনন্দের উপস্থিতি। আনন্দ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো জলসেচন পাত্র হাতে—কি এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তার আনন—চোখ দুটি সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর। জল সেচন পাত্র হাতে নিয়ে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মাধবীলতার গাছটার দিকে। নীচু হয়ে গাছের গোড়ায় জল দিতে গেলেই বুকে কি একটা ব্যথা অনুভব ক'রে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো আনন্দ। হঠাৎ আর্তনাদ শুনে থেমে গেল কীর্তন—সকলে ছুটে এলো আনন্দের কাছে।]

সুহাসিনী ॥ একি বাবা—একি !

মহারাজ ॥ কি হ'য়েছে বাবা !

আনন্দ ॥ বুকের সেই ব্যাথাটা—হঠাৎ উঠ্‌লো।

[সুহাসিনী তাড়াতাড়ি তার মাথাটা কোলে তুলে নিলেন—জয়ন্তী তার বুকে হাত বোলাতে লাগলো- রাত্রি ছুটে গিয়ে পাখা নিয়ে এসে হাওয়া করতে লাগলো—ভেঁপু ঘরে গিয়ে একটা বালিশ নিয়ে এসে আনন্দের মাথার তলায় দিয়ে দিল। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় মহারাজ একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। বলাবাহুল্য যে, আনন্দের চোখেমুখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।]

সুহাসিনী ॥ এ তুই কি করলি বাবা ! রাতদুপুরে কেউ কখনো গাছে জল দিতে আসে !

আনন্দ ॥ কিছুতেই ঘুমোতে পারছিলাম না মা। কেবলই মনে হচ্ছিল কি যেন একটা ভুল হয়েছে। হঠাৎ মনে হ'ল মাধবীলতার গাছে জল দিতে ভুলে গেছি। তাই না উঠে এলাম !

সুহাসিনী ॥ কেন এলি বাবা।

আনন্দ ॥ কেন এলাম ? আমার মনে হয়, এ বাড়ীতে তোমরাও যেন সব এক একটি গাছ—সময়মত কারও যত্ন হ'ল না। না পেলে সার—না পেলে জল। তাই এ বাগানে কোনও ফুলই তো ফুটলো না মা ! (থেমে) মাধবীলতায় ফুল চাইব—আর জল দেব না ! ওঃ আঃ।

সুহাসিনী ॥ তোর এ কষ্ট আর দেখতে পারি না বাবা।

আনন্দ ॥ এ আর কি কষ্ট মা ! তোমাদের কপালে যে কষ্ট—যে যন্ত্রণা আজ রয়েছে সে কথা ভেবে আমি আকুল হচ্ছি মা।

মহারাজ ॥ তুই যদি বেঁচে থাকিস আনন্দ, সব দুঃখ কষ্ট আমা হাসিমুখে সহ্য করতে পারবো বাবা।

আনন্দ ॥ পারবে বাবা ? পারবে মা ?

সুহাসিনী ॥ তা' কি তুই দেখিসনি বাবা ? তুই বেঁচে থাকলে কোন কষ্টই আমাদের কষ্ট নয়।

আনন্দ ॥ নয় ? (থেমে) তবে শোন মা, শোন বাবা। রাত্রি, ভেঁপু, তোরাও শোন—তোরা জানিস জয়ন্তী বিশ হাজার টাকা প্রাইজ পেয়েছে—

জয়ন্তী ॥ (আর্তকণ্ঠে) দাদা—

আনন্দ ॥ জানি জয়ন্তী, জানি। অন্ধকারে শুয়ে ছিলাম, তোর জি, ডাটের সব কথাই আমার কানে গেছে। বুঝলে বাবা, বুঝলে মা—তোমরা যখন ঠাকুর ঘরে ভজন গাইছিলে, শব্দসন্ধান অফিস থেকে লোক এসে জানিয়ে গেছে পুরস্কারটা আমাদের জয়ন্তী পায়নি—পেয়েছে আর এক জয়ন্তী—মানে ঠিকানাতে হয়েছিল ভুল।

সুহাসিনী ॥ সে কি!

মহারাজ ॥ বলিস কি বাবা!

আনন্দ ॥ হ্যাঁ বাবা। দেখছোনা জয়ন্তীর চোখে জল। এ কথা শুনে, বল বাবা, বল মা, আমার এই বুকের যন্ত্রণার চেয়ে তোমাদের মনের এই যন্ত্রণা বেশী কিনা বল—

সুহাসিনী ॥ না না আমাদের এ যন্ত্রণা কোন যন্ত্রণা নয়—এ আমাদের গা সহা হয়ে গেছে—বাবা।

মহারাজ ॥ তা' নয় তো কি? এই জয়ন্তী—খবরদার কাঁদবি না। বাপের বেটী যদি হোস কাঁদবি না। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এমন সব ঘটনা আমার জীবনেও কত ঘটেছে। এই ধর আমার বিয়ে। শোন তবে আজ বলি। ধল দিঘির জমিদারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হ'ল—পাকা দেখা—আশীর্বাদ সব হ'য়ে গেল। জমিদারের ঐ একটি মাত্র সন্তান—তার মানে যে কি তা' বুঝতে পারছিস তো? মানে মহারাজ মিত্র সত্যি সত্যি মহারাজ হ'ত—এই আর কি। তা' বিয়ের তিনদিন আগে জমিদারের ঐ সবেধন নীলমণি—সাপের কামড়ে মারা গেল। তা যাক। তা ভালই হ'ল।—তবেই না তোদের মা এই সুহাসিনী দেবীর হাসিতে আমার ঘর ঝলমল হ'য়ে উঠলো। কাঁদিস না, কাঁদিস না—জয়ন্তী, আয় মা—আমার বুকে আয়।

[জয়ন্তীকে বুকে লইলেন]

আনন্দ ॥ এতক্ষণে আমার বুকের যন্ত্রণাটা বুঝি গেল মা।

সুহাসিনী ॥ সত্যি, বাবা সত্যি?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ মা, সত্যি। এই তো—তোমার মুখে হাসি ফুটে উঠছে মা।

সুহাসিনী ॥ তোদের মুখে হাসি থাকলে আমার হাসি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না বাবা। কিন্তু আর রাত নয়—এবার তুমি শুয়ে পড় বাবা। রাত্রি, জয়ন্তী, হাঁ করে তোরা দেখছিস কি? আনন্দের বিছানা ঠিক করে দে। এই ভেঁপু শুতে যা—

আনন্দ ॥ এই ভেঁপু শোন—ব্যাপারটা কি হ'ল বুঝলি ?

ভেঁপু ॥ কেন বুঝব না দাদা—দিদি মোহনবাগানের হয়ে অনেক কষ্টে ইষ্টবেঙ্গলকে একটা গোল ঠুকে দিয়েছিল—রেফারী সেটা disallow করে দিল।

মহারাজ ॥ সাবাস বেটা সাবাস। মোহনবাগান এখন কি করবে ভেঁপু ?

ভেঁপু ॥ মোহনবাগান এসব থোড়াই কেয়ার করে—উঠে পড়ে লেগে আবার একদিন গোল দিয়ে দেবে।

মহারাজ ॥ (উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া) আমরাও দেবো—আমরাও দেবো—গোল একদিন আমরাও দেবো। নাও, রাত অনেক হয়েছে—এখন সব শুয়ে পড়।

হরে কৃষ্ণ - হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম—হরে রাম—রাম রাম হরে হরে।

[সকলেই মহারাজ মিত্রের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ মিলাইল। যবনিকা নামিল।]

মধ্যবিত্ত, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৩

রক্ত কদম

পশ্চিম বাংলার কয়লার খনি-অঞ্চলে পাহাড়তলির এক উঁচু টিলার উপর কুলি সর্দার মংলুর বাসাবাড়ি। ঠিক তাহার নিচেই কুলিদের ব্যাবাক এবং তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ছোটখাটো দোকান। অপরাহ্ণ। মংলু সর্দারের ঘরখানিতে মংলু সর্দারের যুবতী স্ত্রী 'কদম' একখানি ছোট আয়না সামনে রাখিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে গান গাহিতেছিল এবং বারবার উন্মুক্ত দরজার দিকে তাকাইয়া কাহারো আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

শাল গাছে শাল পঙ্গড়া
কদম গাছে কলি রে—
বঁধার গায়ে লাল গামছা
ছটক দেখে মরি রে।

[কোলিয়ারির হাজরি-বাবু মোহন মিত্রের প্রবেশ। বয়স বছর ত্রিশ। প্রসাধনের পরিপাট্য আছে। ঢেউ তোলা চুল। বগলে একটি খাতা।]

কদম ॥ (অভ্যর্থনা জ্ঞাপক হাস্যে) ..হাজরিবাবু ! মোহনবাবু !

মোহন ॥ আরে এ সর্দারনী—তু আজ আবার গরহাজির !

[কদম তাহাকে দেখিয়া মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া গানটি গাহিয়াই চলিল। সমীহ করিল এইটুকু যে গলার স্বরটি উঁচু পর্দা হইতে নীচু পর্দায় নামাইয়া আনিল।]

সাঁঝে ফুটে ঝিঁগা ফুল
সকালে মলিন রে—
আজ বঁধা ছেড়ে গেলে
পরের অধীন রে!
এতদিন যে দেখি কালার কানে
জবার ফুল,
আজ কেন কালার বদন
মলিন রে—!

মোহন ॥ ওতে আমি ভুলছি না। আজ কাজে যাসনি কেন কদম?

কদম ॥ তু আসবি বলে।

মোহন ॥ একটা দিনের হাজরী কাটা যাবে না তোর!

কদম ॥ যাবে না। যদি যাবে, তু দিবি।

মোহন ॥ আমি না হয় দেবো, কিন্তু তোর মানুষটা—সে তো তা জানবে না। একটা দিন গর-হাজির হলি, মংলু সর্দার তোকে ছাড়বে না। আজ তোকে পিট্‌বে।

কদম ॥ (হাসিয়া) পিট্‌বে না। (গা মোড়ামুড়ি দিয়া) হামি বলবে হামার বেমারি হ'লো—ও শুনবে তো ওর মাথাটা ঘুরে যাবে—চোখে আঁধার দেখ্‌বে—পাখা আনবে—হামারে হাওয়া করবে—হামার গা টিপবে—পা টিপ্‌বে।

মোহন ॥ তোর কি সত্যি বেমারি হ'লো কদম!

কদম ॥ না।

মোহন ॥ না—না—সত্যি বল। আমি তোকে হাওয়া করছি—করবো?

কদম ॥ কর। (হাসিয়া) তোর মাথাটা যদি যাবে—আমার দোষ না দিবি!

মোহন ॥ মাথাটা যাবে! কেন, তুই আমাকে মারবি নাকি?

কদম ॥ হামি না মারবে—মারবে আমার সর্দার। উ ত এখন ঘরে ফিরবে! তু হামাকে হাওয়া করছিস—উ দেখবে ত তুর মাথাটা লিবে না?

মোহন ॥ তোর মতলবটা আমি বুঝি না কদম! সেদিন তুই আমাকে বললি, চল্ বাবু, কলকাতা চল্। তা' তোর যাওয়ার কোনো মতলব দেখছি না তো কদম! যাবি না তুই কোলকাতা?

[কদম সঙ্গে সঙ্গে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া গান ধরিল।]

হুগলী হাবড়া নিতুমতেগী মারাংয়া
সিহুড়ী কোলকাতা সহর বাজার সরসগিয়া
হাবড়া ক্ষণ হো সিহুড়ী ক্ষণ হো
মাওাওয়ালে তার দো জ্যোদাগিয়া
আখরালাতার তার দো জ্যোদাগিয়া।

[এমন সময় বাহিরে একটা শব্দ শোনা গেল। ঘরের ভিতর ইহারা দুজনেই চমকিয়া উঠিল। মোহন চট্ করিয়া দরজায় গিয়া দাঁড়াইল—কিছু দেখিতে না পাইয়া, ফিরিয়া আসিল।]

কদম ॥ —কে ?

মোহন ॥ কেউ না।

কদম ॥ তুই আমার গানটা বুঝলি বাবু ?

মোহন ॥ সবটা বুঝলাম না।

কদম ॥ হুগলী, হাবড়া, সিউড়ী, কোলকাতা—খুব বড়ো শহর আছে। —তা' উদের নামটাই বড়ো। আমরা যেখানে বসে আছি—আমাদের এই গ্রামটা, এর চেয়ে কিছু ছোটো না আছে।

মোহন ॥ দূর পাগলী! এই কথা বলে সর্দার বুঝি তোকে ভুলিয়েছে ? ছিঃ—ছিঃ! ঝুট্ বাত বলেছে। আমার কলকাতার মতো শহর দুনিয়ায় না আছে। ওখানে গঙ্গা নদী আছে। অতো বড়ো নদী তুই কোথায় দেখলি ! গঙ্গার উপুর যে পোল্‌টা আছে, ও দেখ্‌লে তো তোর মাথা ঘুরবে !

কদম ॥ মাথা ঘুরবে ত আমি দেখ্‌বে না।

মোহন ॥ না—না, ওটা দেখলে মাথা ঘুরবে না—না দেখ্‌লে ঘুরবে।

কদম ॥ তবে আমি দেখবে ! আর কী আছে বলনা বাবু ?

মোহন ॥ কতোবার তোকে বলবো ?

কদম ॥ না—না আবার বল্ বাবু। কোলকাতার কথা যখন তুই বলিস্ বাবু আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়—মনটা কেবল বলবে, চল্ কদম চল্—কলকাতা চল্। বুধু—ওরাও কোলকাতা দেখলো—উ আমাকে বললো, উখানকার সব বাড়ি উ আকাশ ছুঁলো ! যাদুঘর দেখলে—চিড়িয়াখানা দেখ্‌লো—সাহেব দেখলো—মেম দেখলো ! আমিও দেখবে।

মোহন ॥ (ফিস্ ফিস্ করিয়া) দেখবি তো চল।

কদম ॥ যাবে—সর্দারের সাথে আমি যাবে।

মোহন ॥ সর্দার গেলে কবে যেতো ! সর্দার ত বলে, কোলকাতায় দানো আছে, পরী আছে। যে ওখানে যাবে—হয় মরবে—না হয় ভেড়া বনবে।

কদম ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সর্দার ত ওই কথা বলবে—উ কথা কেন বলবে, জানিস বাবু।

মোহন ॥ না, কেন ?

কদম ॥ কোলকাতা গেলে ওর অনেক খরচ হবে—অনেক টাকা খ'সবে। লোকটা এমন কিপটা আছে, জানিস বাবু !

মোহন ॥ জানি—জানি। তোকে একটা সোনার হার দিলোনা—ভালো একটা গয়না দিলোনা। কাঁচের চুড়ি, বনের ফুল আর জংলা শাড়ী এতেই তুই ভুললি কদম ?

কদম ॥ না—না, আমি ওতে না ভুললাম। ওর তাগদ দেখে আমি ভুললাম। অমন জোয়ান, এ-মুলুকে কে আছে—বল্‌!

মোহন ॥ ও বাত ঠিক আছে—তাই ও সর্দার হ'লো—একশ' টাকা ওর তলব হ'লো—তাতে কি আছে! ও যা তলব পাবে, বুদ্ধির জোরে আমি তা উপরি পাবে। আর তার ওপর আমি দেড়শ' টাকা তলব পাই। পাই কি না বল্‌?

কদম ॥ পাস্‌—আমি জানে বাবু তা' তুই পাস্‌। তোর তাগদ না আছে—তবে বুদ্ধিটা আছে খুব। দেখতেও তুই ভালো আছিস্‌ বাবু—কথাটাও তোর মিষ্টি আছে—তু যখন আমার দিকে তাকাস আমি পাগলা হই বাবু (একটু থামিয়া) আমি কি ভাবি জানিস বাবু?

মোহন ॥ কি ভাবিস্‌ কদম?

কদম ॥ এমন একটা লোক—যে তাগদটা পেলো আমার সর্দারের, আর বুদ্ধিটা পেলো তোর—দরদটা পেলো আমার সর্দারের—আর চেহারাটা পেলো তোর—ধরমটা পেলো আমার সর্দারের—আর রোজগারটা পেলো তোর—এমন একটা লোক আমার খসম কেন হোলো না!

মোহন ॥ দূর পাগলী, তা কখনো হয়!...আমি কি ভাবি জানিস কদম?

কদম ॥ কি ভাবিস্‌ বাবু?

মোহন ॥ আমার এতো বুদ্ধি—আমার এতো টাকা সব মিছা হোলো। কেন জানিস কদম?

কদম ॥ কেন বাবু?

মোহন ॥ তোকে আমি পেলাম না, তাই।

কদম ॥ আমাকে নিয়ে তু ঘর করবি বাবু?

মোহন ॥ ঐ তো আমি চাই কদম!

কদম ॥ আমাকে কোলকাতা নিবি বাবু?

মোহন ॥ এতো টাকা তবে আমি কেন জমালাম কদম?

কদম ॥ আমার সর্দার তোকে খুন করবে বাবু।

মোহন ॥ পারবে না। যার বুদ্ধি আছে—যার টাকা আছে—তাকে কে ছোঁবে।

কদম ॥ ও বাত ঠিক আছে—আমি জানে বাবু।...আমার কি মন চায় জানিস বাবু?

মোহন ॥ কি কদম?

কদম ॥ তোর সাথে আমি পালাবো—সর্দারটাকে কি করে আমি দেখবো—ওকে আমার পিছু পিছু টান্‌বো। না—না—তোর ভয় নেই বাবু—আমি ধরা না দেবো—আমি তোর আড়ালে থাকবো।

মোহন ॥ আমার আড়ালে নয় কদম—আমার বুকের ভেতর তোকে রাখবো।

কদম ॥ (হাসিয়া) হ্যাঁ-হ্যাঁ—আমি সেখান থেকে ওকে দেখবো—ও আমাকে দেখবে না।

মোহন ॥ (চুপি চুপি) চল্ তবে আজ।

কদম ॥ আজ!

মোহন ॥ হ্যাঁ, আজ। কাল থেকে এ-ক'দিন পূজার ছুটি আছে—আজ রাতে চ'লে গেলে কেউ কিছু ভাববে না।

কদম ॥ তারপর?

মোহন ॥ তারপর কোলকাতা। কোলকাতায় আমরা হারিয়ে যাবো। লাখো লাখো লোকের মাঝে কেউ আমাদের খোঁজ না পাবে। আমি ওখানে চাকরি করবো—তুই আমার ঘর করবি—ঘর দেখবি—কোলকাতা শহর দেখবি—আর অবাক হবি—

কদম ॥ তোর কথা শুনে আমার গা-টা কাঁটা দেয়। পালাতে আমার খুব সখ বাবু—কখন যাবি?

মোহন ॥ আজ রাতে—সর্দার যখন খাদে নাম্‌বে—ওভার টাইম কাজের তদ্বির করতে—তখন।

[কোলিয়ারির ভোঁ বাজিয়া উঠিল। ইহারা দুইজনেই চমকিয়া উঠিল।]

কদম ॥ তুই পালা বাবু—সর্দারের আসবার সময় হ'লো।

মোহন ॥ হ্যাঁ, সর্দার আসবে। ও যখন আবার যাবে খাদে, তুই লণ্ঠনটা জ্বালবি—তোর খোলা জানালায় বসিয়ে দিবি—দূরে অন্ধকারে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো, জানলায় যেই দেখবো লণ্ঠন জ্বলছে, আমি এসে তোকে নিয়ে যাবো। কিচ্ছু নিতে হবেনা তোর—ভালো একটা শাড়ী প'রে তৈরী থাকবি—থাকবি তো কদম?

কদম ॥ (আনন্দে) থাকবো···থাকবো—আঁধার রাতে তোর হাত ধ'রে আমি পালাবো বাবু—আমি পালাবো।

মোহন ॥ লক্ষ্মী—তুই আমার লক্ষ্মী! চলি।

[মোহন যাইবার জন্য ছুটিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসিল।]

কদম ॥ এ কি! তুই ফিরলি যে বাবু।

মোহন ॥ তোকে দেখলে আমার সব ভুল হয়! তোর জন্যে এনেছিলাম দুটো ফুল—বাইরে গিয়ে পকেটে হাত দিয়েই দেখলাম তোকে দিতে ভুলে গেছি আমি—নে।

[হাতের কদম ফুল দুটি দিল।]

কদম ॥ কদম ফুল!

মোহন ॥ হ্যাঁ কদম!—যে ফুলের জন্যে আমি জান্ দিতে পারি। ভুলিস

নি কদম—আমার চোখ দুটো প'ড়ে থাকবে তোর ঐ জানলায়—লণ্ঠনের আলোর আশায়।

[মোহন বাহিরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কদম ফুল দুটি বুকে চাপিয়া পরে ফুল দুটি মাথায় গুঁজিয়া লণ্ঠনটি ঘরের তাকে রাখিল—এসবই সে গান গাহিতে গাহিতে করিল।]

সাঁঝে ফুটে কদম ফুল
সকালে মলিন রে—
আজ বধা ছেড়ে গেলে
পরের অধীনে রে!
এতদিন যে দেখি কালার কানে
কদম ফুল—
আজ কেন কালার বদন
মলিন রে!

[গানের শেষে কদম আয়নায় মুখ দেখিল—এবং ফুল দুটি মনের মতো করিয়া খোঁপাতে পরিল ঠিক এমন সময় অন্ধকার হইতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘরে প্রবেশ করিল তাহার স্বামী মংলু সর্দার।]

মংলু ॥ কদম ফুল!

কদম ॥ (চমকিয়া উঠিয়া বলিল) তুই!

মংলু ॥ এ-কদম ফুল তু কুথা পেলি কদম!

কদম ॥ কদম গাছটা দিলো—নইলে কি তু দিবি?

মংলু ॥ কদম ফুল হামার এ-দিকে না হবে—হবে আসানসোলে—একটা ফুলওয়ালা আসানসোল থেকে আনবে—সায়েবদের বাংলোতে বেচবে—আজ আনলো—ভারী একটা ঘটনা ঘটলো।

কদম ॥ কি ঘটলো?

মংলু ॥ হাজরি বাবুকে তু ত জানিস- যে বাবুটা তোর ঐ চাঁদপানা মুখখানা দেখলো আর মজলো।

কদম ॥ তা' মজলো। তাতে কি হ'লো!—তুই ভি মজলি! বুধু ভি মজলো ঝবু ভি মজলো! তাতে কি হ'লো!

মংলু ॥ কি আবার হবে—হামার কান বাড়লো! যে-মুখ দেখে সবাই মজলো—সে-মুখে চুমো খাবো হামি একেলা—

কদম ॥ তু থাম। তু বল—কি ঘটনা ঘটলো। হাজরি বাবুটা কি কাণ্ড করলো!

মংলু ॥ চুরি ক'রলো।

কদম ॥ কি চুরি ক'রলো?

মংলু। দুটো কদম ফুল। ফুলওয়ালাকে উ ডাকলো—কদমগুলো হাতে

তুলে নিলো—দরদাম করলো—দাম শুনে চমকে উঠলো। বললে—না না, হামি নেবে না। ফুলগুলো ফেরত দিলো। ফুলওয়ালা কদমগুলো গুণে দেখলো—দুটো কদম কম আছে—আর দেখলো হাজারি বাবুর পকেটটা উঁচু আছে। ভয়ে সে মুখ ফুটে কুছু বললে না—বাবুটা যে-ই চলে গেলো—ফুলওয়ালা হামাদের কাছে নালিশ করলো।

কদম ॥ ঝুট বাত। ওর টাকা আছে—ও চুরি করবে কেন ?

মংলু ॥ ওর যে-টাকা আছে—চুরির টাকা—ঘুষের টাকা। ও চুরি না করবে, ত কে করবে ?

কদম ॥ ঝুট বাত।

মংলু ॥ ফুল চুরি করলে—তোর মন ভি চুরি করলো। ফুল নিয়ে লুকিয়ে ও এখানে এলো—কুলি লোক তাই ওকে ধরতে পারলো না। ও যেই ঘর ফিরবে—দেখবে ফুলওয়ালা আর কুলি লোক, ওর ঘর ঘেরাও করবে।

কদম ॥ কুলি লোক! ওর ঘর ঘেরাও করবে কেন ?

মংলু ॥ ওকে মারবে—তাই। গরীব গরীবকে দেখবে না তো কে দেখবে!

কদম ॥ হামি চললাম!

মংলু ॥ কুথা ?

কদম ॥ গরীব গরীবকে দেখবে। ফুলওয়ালাকে এ-ফুল হামি ফেরত দেবে।

[খোঁপা হইতে ফুল দুটি খুলিয়া হাতে লইল এবং বাহিরের দিকে পা বাড়াইল।]

মংলু ॥ তাতে তোর মন-চোর বাঁচবে না।

কদম ॥ বাঁচবে কি না—দেখিস।

[মংলুর অট্টহাস্য। কদম তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। মংলুও বাহিরের দিকে ছুটিল এবং অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। কিছুপরেই মংলু ঘরে ফিরিয়া আসিল। এই ক্ষণকালেব মধ্যেই তাহার চেহারায় একটি রুদ্রমূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে প্রথম জানালাটি খুলিল। কিছুক্ষণ বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল। তৎপর দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠে জানালা হইতে চলিয়া আসিল—দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠে লণ্ঠনটি মুখের সামনে ধরিয়া তাহার দীপশিখাটি উজ্জলতর করিল। পরে লণ্ঠনটি লইয়া ধীরে ধীরে জানালার দিকে অগ্রসর হইল—এবং জানালার কাছে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া লণ্ঠনটি জানালায় বসাইয়া দিল। তৎপর সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া উন্মুক্ত একপাট দরজার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া রহিল—এবং শিকারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্ষণপরে নিঃশব্দে পদসঞ্চারে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল মোহন। মোহন নিম্নস্বরে কদমকে ডাকিল—]

মোহন ॥ কদম! কদম!

[পশ্চাৎ হইতে মংলু মোহনের গলা টিপিয়া ধরিল। অস্ফুট আর্তনাদে মোহন ভূপতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মংলু তাহাকে ছাড়িয়া ছুটিয়া গেল জানালায় এবং লণ্ঠনটি নির্বাপিত করিল। অন্ধকার কক্ষে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। ক্ষণপরে বোঝা গেল তথায় ছুটিয়া আসিল কদম।]

কদম॥ একি! ঘরটা আঁধার কেন?

[একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলিল। সেই আলোতে চকিতে দেখা গেল উহা জ্বালিয়াছে মংলু। সে লণ্ঠন জ্বালিতে ব্যস্ত। লণ্ঠনটি যে তাকে ছিল সেখানেই রহিয়াছে দেখা গেল। মংলুর মুখমণ্ডল ভাবলেশহীন—আশ্চর্যরূপ শান্ত। লণ্ঠনটি জ্বালা হইল—কিন্তু মোহনের দেহ দেখা গেল না—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।]

কদম॥ তু আঁধার ঘরে ছিলি!

মংলু॥ মনটা যদি আঁধার হবে—ঘরটা আঁধার হবে না কদম! কি হলো বল—তোর হাজরি বাবু বাঁচলো?

কদম॥ জরুর বাঁচবে—কেন বাঁচবে না! তোর সব বাত ঝুটা আছে—হাজরিবাবুর কুঠি খাঁ খাঁ করছে—না আছে হাজরিবাবু, না আছে একটা আদমি। তোর বাত ঝুটা—তু ঝুটা।

মংলু॥ আর তু সাঁচ্চা আছিস?

কদম॥ জরুর—সাঁচ্চা আর ঝুটা একসাথ আর না থাকবে। থাক তুই—হামি চললাম।

মংলু॥ কুথা যাবি?

কদম॥ আমার যেখানে খুসী।

মংলু॥ পূজার ছুটিতে বেড়াতে যাবি কদম?

কদম॥ যাবে।

মংলু॥ কোলকাতা যাবি?

কদম॥ জরুর যাবে।

মংলু॥ আজ রাতে যাবি?

কদম॥ আভি যাবে।

মংলু॥ হামার সাথ যাবি?

কদম॥ না।

মংলু। হাজরি বাবুর সাথে যাবি?

কদম॥ হ্যাঁ—যাবে।

মংলু॥ তবে লণ্ঠনটা জানালায় দে। তবে তো উ আসবে।

কদম॥ তু আছিস—উ কেনে আসবে! হামি যাবে।

মংলু॥ না না কদম—হামি চললাম—তু থাক্—হামি উকে আনছি।

[লণ্ঠনটি জানালায় রাখিতে গেল। কদম মংলুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বাধা দিল এবং জোর করিয়া লণ্ঠনটি নিজেই নিভাইয়া দিলো।]

মংলু ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ! তোর ভয় জানালায় লণ্ঠন রাখলে উ ভাববে হামি নাই, তু উকে ডাকছিস। উ আসবে—হামি উকে মারবে। লণ্ঠনটা তাই তুই নিবালি। না কদম—সে-ভয় তোর নাই—উ এখানে আসিয়া গেছে—উ এখানেই আছে—উ তোর এই ঘরেই আছে তোর বিছানাতেই আছে—কম্বলের আড়ালে সরমে মুখ ঢাকিয়া আছে—আর সরম কেন! উ যখন এল—হামিই চললাম—চললাম কলকাতায়—লাখো লাখো লোকের মাঝে হামি হারিয়ে গেলাম। তুরাই থাক—হামি চললাম।

[সেই নিদারুণ অন্ধকারের মাঝেও বোঝা গেল মংলু চলিয়া গেল—হয়তো জন্মের মতো। ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। হঠাৎ সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া কদমের চীৎকার শোনা গেল -]

কদম ॥ বাবু—বাবু—হাজরি বাবু [তু কথা বল! তু কথা বল···

যবনিকা

দীপালী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৪

অসাধারণ

দক্ষিণ কলিকাতায় বড়রাস্তার ধারে একতলা একটি বাড়ি। গৃহস্বামী শ্রীপবিত্র বসু এম. এ., পি-আর-এস, কোনও কলেজে বাঙলা ভাষার অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার পরীক্ষক। স্ত্রী অমলা, পুত্র অমিয় ও কন্যা কৃষ্ণাকে লইয়া অধ্যাপক বসুর ক্ষুদ্র সংসার। সন্ধ্যা। অধ্যাপক বসু লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া ফোনে কাহার সহিত আলাপ করিতেছেন।

পবিত্র ॥ হ্যাঁ, আমি পবিত্র বোসই কথা বলছি।...হ্যাঁ, এইমাত্র বাড়ি ফিরছি। হ্যাঁ, বি. এ.-র রেজাল্ট আজ বেরিয়েছে।···তা ঠিক, এবার পাশের পার্সেন্টেজ খুব কম।....হ্যাঁ, অমিয়, আমার ছেলে—পাশ করতে পারেনি। কম্পালসরি বাঙলার পরীক্ষক আমিই ছিলাম বটে....না, আমি কর্তৃপক্ষকে আগেই জানিয়েছিলাম আমার ছেলের কাগজ যেন অন্য পরীক্ষককে দেওয়া হয়।···না···এ আর আশ্চর্য কি—এইটাই আমার কর্তব্য ছিল।···আপনার ছেলেও পাশ করতে পারেনি! শুনে দুঃখিত হলাম। আমার কাছেই কাগজ

পড়েছিল ?···তা তবে...কিন্তু তাতো আমার জানবার কথা নয় !···না মশাই না। নমস্কার।

[টেলিফোনে এই কথোপকথনের মধ্যে কৃষ্ণা এক গ্লাস ওভালটিন লইয়া আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে।]

পবিত্র ॥ একি মা! চা কই ?

কৃষ্ণা ॥ চা আর তুমি পাবেনা বাবা। এখন থেকে তোমাকে দুবেলা ওভালটিনই খেতে হবে—ডাক্তারের হুকুম।

পবিত্র ॥ অত দাম—জুটলো কোত্থেকে ?

কৃষ্ণা ॥ সে আমি জানি না বাবা। মা আনিয়েছেন।

পবিত্র ॥ বেশ-বেশ। চা-টা এমন নেশা—কিন্তু ধাতে আর সইছে না। ছাড়া উচিত—বুঝি, কিন্তু, ছাড়তে পারছি কই, ওভালটিনের পয়সা কোথায় ?... একদিন দুদিন চলে, কিন্তু রোজ তো আর চলবে না।

কৃষ্ণা ॥ খাবে তো এক গ্লাস ওভালটিন ; তার জন্য এত ভাবছ কেন বলতো। তুমি খেয়ে ফেলো—

[পবিত্র ওভালটিন খাইতে লাগিলেন।]

পবিত্র ॥ তা খেতে বেশ। (হাসিয়া) এক টিন ওভালটিন কিনে তোমাদের দুধের বরাদ্দটা বোধ হয় উঠিয়ে দিলেন তোমার মা।

[বাহির হইতে পুত্র অমিযের প্রবেশ গায়ে সদ্য কেনা দামী বুশ সার্ট ট্রাউজার। হাতে রঙীন সিনেমা-পত্রিকা।]

পবিত্র ॥ ব্যাপার কি অমিয় ? এত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে নতুন পোশাক গায়ে তুলেছ যে !

অমিয় ॥ কিনলাম বাবা। অনেক দিনের সাধ পুরলো।

পবিত্র ॥ কিন্তু দাম পড়ল কত ?

অমিয় ॥ সবশুদ্ধ উনষাট টাকা পনেরো আনা।

পবিত্র ॥ পেলে কোত্থেকে ?

অমিয় ॥ কেন ! মা দিয়েছেন।

পবিত্র ॥ কিন্তু, তিনি পেলেন কোথায় ?

অমিয় ॥ তুমি দিয়েছ !

পবিত্র ॥ আমি দিয়েছি ! কোথায় পাব ?

অমিয় ॥ সে আমার জানবার কথা নয় বাবা।

পবিত্র ॥ হ্যাঁ, আমার জানবার কথা। তিনশো টাকা যার বেতন, তার ছেলের গায়ে উঠবে ষাট টাকার পোশাক। তোমার মা কোথায় কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা ॥ রান্নাঘরে বাবা।

পবিত্র ॥ যাকে হাত পুড়িয়ে দুবেলা রাঁধতে হয়, তার ছেলের গায়ে—

তাও এমন দিনে—! (অমিয়ের প্রতি) তোমার বি. এ. ফেল করবার লজ্জাটা ঢাকবার জন্যই বুঝি তোমার ঐ সজ্জা অমিয় ?

অমিয় ॥ বাপ হয়ে নিজে আমার বাঙলার কাগজ না দেখে, অন্যের হাতে ফেল করিয়ে দিয়েছ তুমি—সেটা যখন সইতে পেরেছি, তোমার ও আঘাতও আমার সইবে বাবা।

পবিত্র ॥ সেটা ছিল আমার কর্তব্য। কর্তব্য পালন করেছি বলে যদি তুমি দুঃখিত হও, তাতে আমি দুঃখিত নই।

অমিয় ॥ বেশ তো ফেল করেছি বলেও আমার কোন দুঃখ নেই। তুমিই তো বল—Failures are but the pillars of success !

[অমিয় বীরদর্পে অন্দরে চলিয়া গেল।]

পবিত্র ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ—এসব কী হচ্ছে! কী হচ্ছে এসব। তোমার মায়ের প্রশ্রয়ে—আর তিনি এত টাকা পেলেনই বা কী করে। এই, মাসের শেষে ?···তুই বলতে পারিস মা ?

কৃষ্ণা ॥ তা তো জানি না বাবা। মা আজ আমাকেও একটা খুব ভালো শাড়ি কিনে দিয়েছেন।

পবিত্র ॥ তোর ভালো শাড়ি ছিল না আমি জানি—দেখেছি। আসছে মাসে মাইনে পেলে কিনে দেব বলেছিলাম। তিনি কিনে দিয়েছেন ভালই করেছেন। কিন্তু এসব টাকা পাচ্ছেন কোথেকে—আমি সেইটেই বুঝে উঠতে পারছি না মা।

কৃষ্ণা ॥ আমিও না।

পবিত্র ॥ অবিশ্যি তোমার মা মাঝে মাঝে আমাকে অবাক করে দেন—রীতিমতো চমকে দেন আমাকে। হিসেব করে চলেন বলেই পারেন, আর কতকটা পারেন নিজেকে বঞ্চিত করে—পান আর জরদা খাওয়াটা ছিল কত কালের নেশা—টানাটানি দেখে, দিলেন সেটা ছেড়ে। একটা ভালো শাড়ি, একটা নতুন গয়না, মাঝে মাঝে সিনেমায় নিয়ে যাওয়া, এসব কিছুই আমি পারিনি—মুখ ফুটে বলেন না অবিশ্যি কিছু—কিন্তু···আমিই বা কি করব ! সম্বল তো মাস গেলে তিনশোটি টাকা।

কৃষ্ণা ॥ তাই বা কি কম ! চলে যাচ্ছে তো।

পবিত্র ॥ চলে যাচ্ছে মানে একটা লড়াই চলছে—কোনও মতে বেঁচে থাকবার একটা লড়াই। একদিন নয়—দুদিন নয়, রোজ। পারতাম না, ভেঙে পড়তাম। মা, শুধু তোরা মুখ বুজে সব সয়ে যাচ্ছিস বলেই ভেঙে পড়িনি। শাড়িটা তোর পছন্দ হয়েছে তো মা ? কই ? কোথায় ? আন দেখি—পরে আয়—

কৃষ্ণা ॥ না বাবা। অত দামী শাড়ি—ও আমায় মানাবে না বাবা !

পবিত্র ॥ সে কি ? কত দাম ?

কৃষ্ণা ॥ ঐ যে নতুন উঠেছে—ফিল্ম স্টার শাড়ি—দামী সিল্ক। দাম খুব কম করেও ষাট টাকা। আমি তো ফিল্ম স্টার নই বাবা। কলেজে যাবার জন্য দরকার ছিল আমার খান দুই আটপৌরে শাড়ি—তা হলো না।

পবিত্র ॥ না—না, আমায় উঠতে হ'ল। কী হচ্ছে এ সব? এ সব কী হচ্ছে।

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্দর হইতে অমলা দেবীর প্রবেশ।]

অমলা ॥ কী আবার হচ্ছে! দপ করে জ্বলে উঠলে যে?

পবিত্র ॥ এই সব খরচপত্র—অযথা অন্যায় এসব খরচপত্র—কী করে হয়—যেখানে তুমি রয়েছ! আর এসব টাকা এলই বা কোত্থেকে?

অমলা ॥ হিসাব তো তুমি কোন দিনই চাওনি—আজ চাইছো যে?

পবিত্র ॥ আমি বুঝছি না—বুঝতে পারছি না—এত সব টাকা এল কোত্থেকে? কোত্থেকে এল?

অমলা ॥ যেখান থেকে আসার—সেখান থেকেই এসেছে—আমার বাপের বাড়ী থেকে আসেনি।

কৃষ্ণা ॥ আমি খাবার যোগাড় করবো মা?

অমলা ॥ রান্না এখনো শেষ হয়নি। পোলাওটা বোধহয় এতক্ষণ হয়ে গেছে। গিয়ে দেখ।

[কৃষ্ণা চলিয়া গেল।]

পবিত্র ॥ পোলাও!

অমলা ॥ হ্যাঁ পোলাও। নরেশদা একদিন খেতে চেয়েছিলেন। আজ খেতে বলেছি। কোনদিনই একটু ভালো কিছু খাওয়াতে পারিনি ওঁকে। আজ তাই একটু আয়োজন করেছি। তুমি সেই কোন ভোজে কাটলেট খেয়ে এসে বলেছিলে—একটাই দিল, দিলে আর একটা খেতে—সেই কাটলেটও করেছি আজ—আশ মিটিয়ে খেতে হবে কিন্তু তোমাকে। না—না গুরুপাক হবেনা, দেখো তুমি। চারটি ভাত, মুরগির মাংস আর একটু ঝোল আর সেই সঙ্গে খান কতক কাটলেট্...এতে তোমার কোন অসুখ হবে না—দেখো!

পবিত্র ॥ কী ক'রে তুমি এসব—এত সব—পারো. তাই আমি ভাবি। আজ তবে তোমায় বলি, শোনো। সেদিনকার সেই ভোজে কবরেজি কাটলেট্ খেয়ে—সে যেন মুখে লেগে রইল। ভাবলাম তোমাদেরও খাওয়াতে হবে। গেলাম সেদিন কলেজ স্ট্রীটের সেই বড় রেস্তোঁরাতে—চারটি কাট্‌লেট চাইলাম—প্যাকেটে পুরে দিল—দাম শুনে চক্ষু কপালে উঠল—ছ'টাকা। বললাম তবে যে শুনেছি একটাকা ক'রে! লোকটা বললে পথে ঘাটে তাই বিক্রি হয় বটে। দুটো টাকা কম পড়ল—ফেরত দিলাম—তা বলে কিনা—মিছি মিছি ভাজালেন—এ সব দোকানে আসেন কেন?

অমলা ॥ অসভ্য। ইতর। কেন তুমি কিনতে গিয়েছিলে? এই তো

আমি করে দিচ্ছি আজ। এককুড়ি কাট্‌লেটে আমার দশ টাকা খরচ পড়েছে মাত্র—

পবিত্র ॥ দশ টাকা! এল কোত্থেকে?···না-না অমলা—এতসব খরচ—মাসের শেষ—আমি ভেবে পাচ্ছিনা—না না এসব বাড়াবাড়ি—এ সব আমাদের মতো ছা-পোষা গেরস্ত ঘরে চলেনা—চলা উচিত নয়—

অমলা ॥ কী দোষ করেছি আমরা যে অন্ততঃ একটি দিনও একটি বারও একটু ভালো খাবার—একটু ভালো পরবার সখ মেটাতে পারব না আমরা?

পবিত্র ॥ ক্ষমতায় যদি কুলোয় কেন পারবে না অমলা?

অমলা ॥ কেন কুলোবে না! বিদ্যাবুদ্ধি কি তোমার কারো চেয়ে কম? এম. এ., পি.আর.এস এই যে এতবড় একটা ল্যাজ ঝুলিয়ে বেড়াও—তবে বল এর কোন দাম নেই! আর যদি দাম না-ই থাকে তবে কেন এই মিথ্যা ভড়ং? কেন তবে এই শিক্ষিত সভ্য সমাজে বাস করার এই প্রাণান্তকর মোহ? যে সমাজে প্রতিটি মুহূর্তে চলছে বাঁচবার জন্য এই নিদারুণ লড়াই। যে লড়াইয়ে হারিয়ে ফেলেছি আমরা জীবনের সকল আনন্দ ও উৎসব। উত্তর দাও আমাকে প্রফেসার বোস—উত্তর দাও—?

পবিত্র ॥ 'Plain living and high thinking'—এই হলো গিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ। ৩০০ টাকা আমি বেতন পাই—এজন্য এই বেতন যথেষ্ট - অমলাদেবী।

অমলা ॥ তুমি এযুগের লোক—প্রফেসর বোস! এ যুগের আদর্শ—'Plain living and high thinking'—একথা বললে তোমাদের পণ্ডিত নেহেরু তোমাকে 'Zero' mark দেবেন। এ যুগের আদর্শ high living and high thingking. Standard of living বাড়াবার জন্যই আজ সকল দেশ, সকল জাতির প্রয়াস। তাই এত Five year Plan' Ten year Plan' Twenty year Plan. থাক তর্ক করতে চাইনা আমি তোমার সঙ্গে। বাথরুমে তোমার গরম জল দেওয়া হয়েছে। স্নান করবে এসো। আজ সব একসঙ্গেই খাবো।

পবিত্র ॥ ছেলে ফেল করলে সেজন্য উৎসব হয় এটাও বুঝি এযুগের সভ্যতা?

অমলা ॥ পাশ ফেলের কোন দাম নেই এযুগে। এ যুগের সভ্যতা হলো, যেন-তেন-প্রকারেণ টাকা রোজগার এবং সেই টাকায় জীবনকে ষোল আনা উপভোগ করা।

পবিত্র ॥ অমলাদেবী! এ তুমি কি বলছো?

অমলা ॥ বড় দুঃখেই একথা বলছি প্রফেসার বোস। হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, এযুগে সাধুতার কোন দাম নেই। বিদ্যার কোন মান নেই। এটা কাঞ্চন কৌলিন্যের যুগ। চোখের উপর দেখছি, সৎ, সাধু, সুবিদ্বান অধ্যাপক

সপরিবারে শুকিয়ে মরছে। সমাজে তার নাই কোন প্রভাব, নাই কোন প্রতিপত্তি। চোর জোচ্চোর টাকার জোরে নাম কিনছে। খেতাব পাচ্ছে। সমাজে হয় তারই অভিনন্দন, তারই অভ্যর্থনা। সমাজ আমাদের যা শেখাচ্ছে তাই আমরা শিখছি প্রফেসার বোস। এ তোমার পুঁথিপড়া জ্ঞান নয়, এ আমাদের হাড়ে হাড়ে শেখা অভিজ্ঞতা। এতটুকু মিথ্যা বলিনি প্রফেসার বোস। ওঠো, চলো।

পবিত্র ॥ তুমি যাও। স্নান আজ আমি করবো না। খাবার দেওয়া হলে আমায় ডেকো।

অমলা ॥ আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। আমি জানি আমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখার জন্য তোমার চেষ্টার অন্ত নেই। বিদ্যে, বুদ্ধিও তোমার কিছু কম নয়। সংসারের জ্ঞান ভাণ্ডার তোমার থিসিসে, তোমার রিসার্চে সমৃদ্ধতর হয়েছে। কিন্তু তোমার সমৃদ্ধি বেড়েছে কতটুকু? শরীর ভেঙে পড়েছে। টাকার অভাবে—হয়নি তোমার উপযুক্ত চিকিৎসা, উপযুক্ত পথ্য। দুবেলা চায়ের বদলে একটু ওভালটিন, তাই আমি তোমায় দিতে পারিনি এতদিন। কিন্তু আর না—আর এসব সইবো না। আমি যাচ্ছি, তুমি এসো।

[অমলার প্রস্থান। ফোন বাজিতে লাগিল। পবিত্র বোস ফোনটি তুলিয়া ধরিল।]

পবিত্র ॥ হ্যালো…কে? অনিল রায়? কাকে চান? অমিয়? হ্যাঁ বাড়ী আছে। ধরুন, আমি খবর দিচ্ছি—বেশ তো বলুন, কি বলতে হবে। ওঃ আপনারা তার জন্য বসে আছেন। কোথায়? ফারপোতে? এক্ষুনি তাকে যেতে বলছেন? বলবো। নমস্কার।

[ফোন রাখিয়া দিলেন। বাহিরে যাইবার পোশাকে সজ্জিত হইয়া অমিয়র প্রবেশ।]

পবিত্র ॥ অনিল রায় কে? তোমাকে ফোনে এক্ষুনি ডাকছিলেন।

অমিয় ॥ কেন। অনিল রায় কে তুমি চিনলে না বাবা? ব্যারিস্টার মহিম রায়ের ছেলে। বি. এ. পাশ করলো এবার। কি করে যে পাশ করলো তাই ভাবি! সে আজ ফারপোতে আমাদের পার্টি দিচ্ছে। সেই পার্টিতেই আমি যাচ্ছি।

পবিত্র ॥ দাঁড়াও। মহিম রায়ের ছেলে অনিল রায়? হ্যাঁ ওর পেপার ছিল আমার কাছেই। রোল…থারটি ফাইভ?

অমিয় ॥ হ্যাঁ বাবা, রোল থারটি ফাইভ। বাংলার 'ব' জানে না। ইংরেজী ছাড়া যে কথা বলে না, সে তোমার কাছে পাশ হলো?

পবিত্র ॥ সাট্ আপ। সে আমার কাছে পাশ করেনি। সে যে কে তাও আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু জানতে আমি বাধ্য হয়েছি। প্রকাণ্ড বড়লোক এরা। আমাকে ঘুষ দিয়ে পাশ করিয়ে নিতে চেয়েছিল ওরা অনিলকে। কিন্তু আমি…সে পাশ করেছে?

অমিয় ।। শুধু পাশ করেনি। তার পাশের ভোজ খেতে আমি যাচ্ছি ফারপোতে।

[অমলাদেবীর প্রবেশ]

অমলা ।। আমার ইচ্ছা ছিল না, এ ভোজে তুমি যাও। ইচ্ছা ছিল আজ আমরা সব একসঙ্গে খাবো।

অমিয় ।। সে তো আমরা রোজই খাই মা। আজকের এ নেমন্তন্নটা এড়ানো গেলনা। যাই, আমার দেরী হয়ে গেছে। [প্রস্থান]

অমলা ।। এসো ! খাবে এস।

পবিত্র ।। খাওয়া চুলোয় যাক্। তুমি বসো অমলা।...তোমার মনে আছে হয়তো, তোমাকে আমি বলেছিলাম, তোমার নরেশদা মহিম রায়ের ছেলে অনিল রায়কে পাশ করিয়ে দেবার জন্য আমাকে ধরেছিলো। তিন হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে চেয়েছিল। আমি নরেশকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সে যেন এ বাড়ীতে আর কখনও না আসে। সেদিন তুমি আমাকে সমর্থনই করেছিলে।

অমলা ।। হ্যা করেছিলাম।

পবিত্র ।। সব খাতার নম্বরগুলো আমি যোগ দিয়ে তোমাকে দিয়েছিলাম চেক্ করতে। সেই সময় তুমিও দেখেছিলে—রোল থার্টি ফাইভ মানে ঐ অনিল রায়—আমার পেপারে পেয়েছিল মাত্র পনেরো।

অমলা ।। পনেরো না একান্ন ?

পবিত্র ।। একান্ন। তোমায় আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। পনেরো। এই নিয়ে কত কথা হলো। তোমার মনে পড়ছে না— ?

[অমলা নীরব রহিল।]

তারপর ফি বছর যেমন তুমি করো, মার্কের ফরমগুলি তুমি পূরণ করে ছিলে। আমি বিশ্বাস করে, তাতে সই দি। আমি বিশ্বাস করে তাতে সই দিয়ে খাতাপত্র মার্কসিট সব পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ইউনিভারসিটিতে।

অমলা ।। দিয়েছিলে।

পবিত্র ।। সে পাশ হয়ে পাশের ভোজ খাওয়াচ্ছে বন্ধুদের আজ। তোমার ছেলে সেই ভোজ খেতে গেল। কী করে এটা হলো ? কী করে এটা হয় অমলা ?

[অমলা নীরব রহিল।]

পবিত্র ।। এ কাজ তোমার।

অমলা ।। শোন...

পবিত্র ।। না, না, প্রতিবাদ করো না। খাতা আর মার্কসীট খুললেই

দেখা যাবে। পনেরো হয়েছে একান্ন তোমারই হাতে। নীচে সই আছে অবশ্য আমার। প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই অমলা। আমি সব বুঝেছি। নরেশের হাতের ঐ তিন হাজার টাকা তুমি নিয়েছো। তাই আজ আমার মুখে উঠেছে ওভালটিন, ছেলের গায়ে উঠেছে ষাট টাকার পোশাক, মেয়ে পেয়েছে ষাট টাকার শাড়ী। তুমি হয়তো নিয়েছো একজোড়া বেনারসী। স্যাকরা হয়তো গয়নার অর্ডারও পেয়ে গেছে। আজ আমাদের জন্য রান্না হচ্ছে পোলাও, কালিয়া, কোর্মা, কাবাব—এই তোমার High living and high thinking। standard of living বাড়াবার চমৎকার পথ তুমি করে নিয়েছো তো!

অমলা ॥ নিয়েছি এবং আশ্চর্য, প্রফেসার এজন্য আমার এতটুকু লজ্জা হচ্ছেনা। অনুশোচনাও হচ্ছেনা। কেন জানো প্রফেসার? এ ঘুষ যে দিয়েছে, সে হচ্ছে, এই সমাজের একজন মাথা। অতবড় ব্যারিস্টার! কত সভা সমিতির প্রেসিডেন্ট। কাগজে কাগজে কত তাঁর জয়গান!

[পবিত্র বোস উঠিয়া তাঁহার কোটটি পরিলেন। ছড়িটি হাতে লইলেন।]

অমলা ॥ এ কী? তুমি কোথায় যাচ্ছো?

পবিত্র ॥ এখন আমার যা কর্তব্য তাই করতে।

অমলা ॥ মানে?

পবিত্র ॥ আমি ভাইস চ্যান্সেলারের সঙ্গে দেখা করবো।

অমলা ॥ বলবে তোমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে? যেখানে নিজের সই রয়েছে! বিশ্বাস করবেন তিনি এসব কথা?

পবিত্র ॥ করবেন না? আমি সব খুলে বলবো, তবু করবেন না?

অমলা ॥ তবু করবেন না। শুধু বলবেন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে প্রফেসার বোস। তুমি একটি Fool, ছুটি নাও। চিকিৎসা করাও। এসব ঘেটে আমি ইউনিভারসিটির বদনাম কিনবো না।

পবিত্র ॥ হুঁ। (কিছুক্ষণ ভেবে—কোট খুলিয়া ফেলিলেন। ছড়িটি যথাস্থানে রাখিলেন। চেয়ারে বসিলেন।)

অমলা ॥ চল খেতে চলো। খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

পবিত্র ॥ আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

[অমলা প্রফেসারের কাছে আসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।]

অমলা ॥ আমি যা করেছি—এ যুগে তা কিছু অন্যায় হয়নি। যুগটাই এখন এই। যা করেছি, শুধু ভালভাবে বাঁচবার জন্য।

পবিত্র ॥ বাঁচাই যায় এতে। ভালভাবেই বাঁচা যায়। বেশ—তোমরাই বাঁচো, কিন্তু আমি এতে বাঁচবো না অমলা। তুমি বলছো বাঁচবো, কিন্তু আমি দেখছি, আমরা মরে গেছি। সমাজটাই মরে গেছে। পচে গেছে।

[কৃষ্ণার প্রবেশ।]

কৃষ্ণা ॥ খাবার যে সব জুড়িয়ে গেল।

পবিত্র ॥ ও পচে গেছে—ও খাবার আমার মুখে উঠবে না! আমি চলে যাচ্ছি। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

[চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

কৃষ্ণা ॥ এ কী বাবা? তুমি কোথায় যাচ্ছো?

পবিত্র ॥ ভয় নেই। মরতে যাচ্ছিনা। তোমরা যে নাগপাশে আমায় বেঁধেছো—সাধ্য কি আমার তা কেটে বেরিয়ে পড়ি। যাচ্ছি আমি পার্কে। একটা বেঞ্চে শুয়ে আকাশের তারাগুলো চেয়ে দেখবো আজ সারারাত। চেয়ে চেয়ে ভাববো, ওরা কত কি দেখল, আমরা কত কি দেখছি। [প্রস্থানোদ্যত]

কৃষ্ণা ॥ বাবা! দাঁড়াও, আমি আসছি। আমিও আজ ক'দিন থেকে কিছু কম দেখছি না। আমি বুঝতে পেরেছি কি তোমার দুঃখ। কিন্তু মা, তাই বলে তোমাকেও আমি ভুল বুঝছি না। সাধারণে যা করে তুমি তাই করেছ। কিন্তু আমার বাবা অসাধারণ—অসাধারণ।

[পিতার অনুগমন]

অমলা ॥ কিন্তু আমার কি দোষ! ঐ অসাধারণ লোকটাকে ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আর আমার কী পথ আছে? কী পথ ছিল।

[অমলা কাঁদিতে লাগিল।]

ভগ্নদূত, ২৯ বর্ষ : ৪৩ সংখ্যা. ১৯৫৫

সূর্যমূখী

কলিকাতার উপকণ্ঠে বিখ্যাত ধনী অশোক চৌধুরীর গৃহ। অশোক চৌধুরীর বয়স পঞ্চান্ন—বিপত্নীক, স্বাস্থ্যবান এবং সুদর্শন। তাঁহার একমাত্র পুত্রসন্তান কুনাল চৌধুরীর বয়স ছাব্বিশ। কুনাল সদ্য এম এ. পাশ করিয়াছে—কিন্তু ছাত্রজীবন হইতেই সোসিয়ালিস্ট। কুনালের মাতার মৃত্যুর পর দুইটি প্রাণীর এই ছোট সংসারটি দেখা-শোনা করার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া একজন তত্ত্বাবধায়িকাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বেতনভুক এই গৃহকর্ত্রীটির নাম সুপ্রিয়া রায়। বয়স সাতাশ। কর্মকুশলতায় সুপ্রিয়া সকলেরই প্রিয় হইয়া নিজের নাম সার্থক করিয়াছে। সংসারে দাসদাসী

প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলেও একমাত্র ভৃত্য কেষ্ট—বয়স কুড়ি—এই খাসমহলের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। মাঘ মাসের অপরাহ্ন। রবিবার। অশোক চৌধুরীর উপবেশন কক্ষে একটি বহিরাগত যুবকের সহিত কেষ্ট-র কথোপকথন হইতেছে।

যুবক ॥ অশোক চৌধুরী শুনেছি বিরাট বড়লোক। বাড়িটাও দেখছি তাঁর বিরাট। কিন্তু এত বড় বাড়িতে লোকজন তো তেমন দেখছি না।

কেষ্ট ॥ মার্জনা করবেন—আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারছিনা। আমি ভৃত্য, প্রভুর সাংসারিক বা পারিবারিক আলোচনায় যোগদান করা গৃহকর্ত্রীর আদেশ অনুসারে নিষিদ্ধ।

যুবক ॥ ওরে বাবা—তুমি—মানে আপনি গ্র্যাজুয়েট ?

কেষ্ট ॥ বিষয়টি ব্যক্তিগত—এ-রূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা অভ্যস্ত নই।

যুবক ॥ ও। আমি সুপ্রিয়া রায়ের দর্শনপ্রার্থী।

কেষ্ট ॥ কার্ড ?...নেই। (ভিসিটার স্লিপ আনিয়া) লিখে দিন।

[যুবক কার্ড লিখিযা দিল। দর্শনেব উদ্দেশ্য 'ব্যক্তিগত' তাহাও লিখিযা দিল। অশোক চৌধুবীব প্রবেশ।]

অশোক ॥ (যুবককে দেখিয়া, কেষ্টর প্রতি) কে ?

[কেষ্ট ভিসিটিং স্লিপখানি তাঁহাব সম্মুখে ধবিল]

অশোক ॥ (পাঠ কবিলেন) শ্রীসুকুমার রায—সুপ্রিয়া রায়ের দর্শন-প্রার্থী। উদ্দেশ্য 'ব্যক্তিগত'। (ভিসিটিং স্লিপটি টেবিলে চাপা দিযা রাখিয়া সুকুমারকে বলিলেন) বসুন।

[কেষ্ট ভিতবে চলিযা গেল । অশোক চৌধুবী ও সুকুমাব মুখোমুখি বসিল।]

অশোক ॥ আপনি সুপ্রিয়ার সঙ্গে কেন দেখা কবতে এসেছেন ?

সুকুমার ॥ আমি তার ভাই। পাবিবারিক কিছু কথাবার্তা আছে।

অশোক ॥ কিন্তু আপনাকে—তোমাকে তো এখানে এব আগে কখনো দেখিনি।

সুকুমার ॥ দিদি যে আপনার এখানে গৃহকর্ত্রীব কাজ নেন—এটা আমার ইচ্ছা ছিল না। দিদি তখন বলেছিলেন—বেশ তো, তুমি এম. এ পাশ করো—চাকরী-বাকরী করো—আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসব। এদ্দিন এম. এ. পাশ করতে পারিনি বলে আসিনি—এবার এম এ. পাশ করেছি, তাই দিদিকে ফিরিয়ে নিতে এলাম।

অশোক ॥ চাকরী-বাকরী কিছু পেয়েছে।

সুকুমার ॥ এখনো পাইনি—সবে দোরে দোরে ঘোরা শুরু করেছি।

[একটি গরম শাল-লইয়া কেষ্টর প্রবেশ।]

কেষ্ট ॥ (কর্তাকে) দিদিমণি দিলেন।

অশোক ॥ তোমার দিদিমণির ঐ এক ভয় আমার ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু ঠাণ্ডাটা কোথায়—যে লাগবে। ও…হ্যাঁ…ওহে কেষ্ট…তুমি যেন কী পাস দিয়েছে? (কাশিতে লাগিলেন।)

কেষ্ট ॥ আজ্ঞে বি. এ. পাস করেছি।

অশোক ॥ (কেষ্টর প্রতি) ইনি এম-এ পাস—যাও।

[কেষ্ট চলিয়া গেল।]

সুকুমার ॥ হ্যাঁ…তা…চাকরীর আজকাল এইরকম বাজারই বটে।

অশোক ॥ তোমার দিদি আমার এখানে কী পোস্টে আছেন জানো?

সুকুমার ॥ অ্যাজ্ঞে হ্যাঁ…গভর্নেস।

অশোক ॥ গভর্নেস কী না জানি না…তবে গৃহকর্ত্রী বলতে পারো। কাগজে কী ব'লে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

সুকুমার ॥ আমার মনে আছে।…'লক্ষপতি বিপত্নীক এবং তাঁহার এক-মাত্র তরুণ পুত্রের ছোট সংসার পরিচালনার জন্য একজন নির্ঝঞ্ঝাট গভর্নেস আবশ্যক। বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী।'

অশোক ॥ বাঃ। তুমি দেখি বিজ্ঞাপনটা মুখস্থ করে রেখেছ হে।

সুকুমার ॥ তার কারণ ছিল। বিজ্ঞাপনের প্রত্যেকটি কথা আমরা ওজন ক'রে দেখেছিলাম কি না! এই ধরুন—আপনি লক্ষপতি বিপত্নীক—এই শব্দ দুটোতেই আমাদের নানা কম সন্দেহ এসেছিল মনে।

অশোক ॥ সন্দেহ! কেন?

[অশোক কাশিতে লাগিলেন।]

সুকুমার ॥ বিজ্ঞাপনদাতা একে লক্ষপতি—তায় বিপত্নীক। এদিকে দিদির বয়েসটাও ছিল কম—আর সে অনুপাতে রূপটাও ছিল বেশী। সন্দেহটা কোথায় এবং কেন বুঝতেই পারছেন?

অশোক ॥ ও। তাই বুঝি তুমি আপত্তি করেছিলে!

সুকুমার ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

অশোক ॥ তবু দিদি এলেন। (কাশিতে লাগিলেন।)

সুকুমার ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—এলেন। ইন্টারভিউ দিয়ে এসে বললেন—'না, আমার ভাল লেগেছে। তা'ছাড়া, বেতনটাও বেশ।'

অশোক। বেতনটা কত বলেছিলেন।

সুকুমার ॥ মাসে তিনশ'।

অশোক ॥ সেটা এখন কততে দাঁড়িয়েছে জানো?

সুকুমার ॥ না। তবে বেড়েছে বুঝেছি। তার কারণ, দিদি আগে আমাকে দু'শ পাঠাতেন—এখন পাঠাচ্ছেন তিনশ'।

অশোক ॥ এখন তোমার দিদির বেতন পাঁচশ।

[কেষ্টর একটি মাঙ্কি ক্যাপ ও মাফ্‌লার লইয়া প্রবেশ ।]

কেষ্ট ॥ দিদিমণি দিলেন।

অশোক ॥ এই যা ! আমি কেশেছি—শুনতে পেয়েছে।

[অশোক কাশি চাপিতে গিয়া আবার কাশিয়া ফেলিলেন। মাঙ্কি ক্যাপটি পরিয়া মাফলারটি গলায় জড়াইলেন। কেষ্ট ভেতরে চলিয়া গেল।]

অশোক ॥ দিদিকে নিয়ে যেতে এসেছ—তা তোমার দিদি যাবেন ?

সুকুমার ॥ টাকাটাই যদি সব হয়—তবে যাবেন না। কিন্তু তা' যদি না হয় কেন যাবেন না ?

অশোক ॥ না—না, টাকাটাই যে দুনিয়ায় সব এ-কথা আমি বলিনা। মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি এ-সব জিনিস মানুষেব জীবনে আছে। টাকাতে এ-সব খানিকটা পুষ্ট হয় নিশ্চয়—কিন্তু টাকার অভাবে যে একেবারে মরে যায় তা' আমি বলব না। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কেষ্ট ছুটিযা আসিল !) আমি বাগানে যাচ্ছি। (ভিসিটিং শ্লিপখানি কেষ্টর হাতে দিয়া) তোমার দিদিমণিকে দাও (কেষ্ট শ্লিপ লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।) you are quite an interesting young man ! পালিও না, আমি আসছি।

[অশোক চৌধুবী বাহিবে চলিযা গেলেন। ভিতব হইতে কুনাল চৌধুবীর প্রবেশ। কুনাল সুকুমারকে দেখিযাই চমকিয়া উঠিল। সুকুমাবও কুনালকে দেখিযা চমকিয়া উঠিল।]

কুনাল ॥ সুকুমার ! তুমি।

সুকুমার ॥ কুনাল ! কী আশ্চর্য। তুমি এখানে ?

কুনাল ॥ কেন, এই তো আমাদেব বাড়ি।

সুকুমার ॥ তাই নাকি ! এ তবে একটা আবিষ্কাব দেখছি !

কুনাল ॥ ব'সো ব'সো।

সুকুমার ॥ এবারকার এম. এ.র ইকনমিক্সের ফার্স্ট আর সেকেণ্ড প্রেস হয় আমার নয় তোমার, সবাই বলতেন। তুমি ফার্স্ট হয়েছ, অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কুনাল ॥ আমার কাছে হেরে গেছ ব'লে তোমার মনে দুঃখ নেই তো সুকুমার ?

সুকুমার ॥ না—না তা' কেন ? You thoroughly deserve your success, তা' হলে এই তোমাদের বাড়ি—আর তুমি তোমার যে-প্রিয়ার উদ্দেশ্যে কবিতা লিখে লিখে আমাদের প'ড়ে শোনাতে—তোমার সেই প্রিয়াও তবে এই পাড়াতে থাকেন।···হ্যাঁ। তাই তো বলেছিলে···মনে পড়ছে ?

কুনাল ॥ পাড়াতে বলছ কী, এই বাড়িতেই থাকেন। তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই—হঠাৎ এ বাড়িতে তোমার পায়ের ধুলো পড়ল যে ! এখন করছ কি ?

সুকুমার ।। বেকার।

কুনাল ।। ও। তাই বুঝি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো। How funny। ...এটা না জেনে আমি তাঁরই ছেলে!

[কেষ্ট একখানি গরম শাল আনিয়া কুনালের সম্মুখে ধরিল।]

কুনাল ।। না—না। শাল কেন?

কেষ্ট ।। দিদিমণি বললেন—আপনার ভারি সর্দি হয়েছে।

কুনাল ।। সর্দি হয়েছে! (নাক ঝাড়িয়া) হ্যাঁ তাই তো। এই সেরেছে—আজ তবে--

কেষ্ট ।। চানের আগে আপনার বুকে গরম তেল মালিশের হুকুম হয়েছে।

[কেষ্ট অন্দরে চলিয়া গেল।]

কুনাল ।। এই বাড়িতেই যে তিনি—এখন তা' বুঝছ?

সুকুমার ।। হুঁ। এরপরেই আবার হনুমানটুপি আর মাফলার আসবে?

কুনাল ।। (সম্মতিভাবে) হ্যাঁ তা' আসে। আসবে। বুঝলে হে, এতেই গভীরতাটা মাপা যায়।

সুকুমার ।। গভীরতাটা কি তবে তোমরা দুজনেই মাপছে।

কুনাল ।। দুজনেই মানে?

সুকুমার ।। (অশোক চৌধুরীর কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। বিষয়টা অন্যদিকে লইল।) দুজনে মানে পরস্পর—

কুনাল ।। সে সব ভাই অনেক কথা। একবার যখন ভাই তোমাকে বাড়িতে পেয়েছি—আজ কিন্তু ছাড়ছি না। রাত্রে এখানে কিন্তু খেতে হবে। বিকেলে তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের বস্তি-উন্নয়ন কাজ দেখাতে।

সুকুমার ।। তুমি তা'হলে এখন হাতে-কলমে ষোল আনা সোস্যালিস্ট ব'নে গেছ কুনাল?

কুনাল ।। হ্যাঁ। ভাবের ঘরে আমার লুকোচুরি নেই। আর এই নিয়েই বাবার সঙ্গে আমার বেঁধেছে বিরোধ। যে-বস্তিটায় আমি প্রথম হাত দিয়েছি, সে-বস্তিটার Landlord ছিলেন আমার বাবা। 'স্বার্থে স্বার্থে বেঁধেছে সংঘাত'—আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন ব'লে বাবা নোটিশ দিয়েছেন। (হনুমান টুপী এবং মাফলার লইয়া কেষ্টর প্রবেশ) না—না। আমি বাইরে যাচ্ছি না। কিন্তু যা শীত পড়েছে তা'তে এ-গুলো দরকার বটে। গিয়ে বলো আমি রাখলাম। (কেষ্ট চলিয়া যাইতেছিল) আর শোনো—ইনি আমার সঙ্গে আজ রাতে খাবেন। ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি এখন আমার ঘরে। কেউ যেন না বিরক্ত করে। (কেষ্ট ভিতরে চলিয়া গেল) এ-সব আমার জন্য নিজ হাতে বুনেছে।

সুকুমার ।। তোমার বাবাকেও তো এসব পরতে দেখলাম—সেগুলি বুঝি কেনা?

কুনাল ।। আমার তাই মনে হয়। এসো না, সব বলছি।

[তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল। অন্য দ্বার-পথে সুপ্রিয়া প্রবেশ করিল। স্পষ্ট বোঝা গেল সুপ্রিয়া নেপথ্য হইতে সুকুমার এবং কুনালের সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছে। সুপ্রিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। কী করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এমন সময় বাহিরের দ্বার-পথে অশোক চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

অশোক ॥ মালী, তোমায় আমি এই শেষবার বলে দিচ্ছি—আর একটি সূর্যমুখীর গাছ যদি মরে তবে তুমিও মারা গেছ।

[অশোক চৌধুরী একগুচ্ছ সূর্যমুখী হস্তে প্রবেশ করিলো।]

এই যে সুপ্রিয়া, এই নাও তোমার সেই সূর্যমুখী—যেমনটি আশা করেছিলাম তা' হয়নি অবশ্য।

সুপ্রিয়া ॥ কেন এ তো বেশ হ'য়েছে।

অশোক ॥ না, হয়নি। মালীটা কেবল ফাঁকি দিচ্ছে! আমার আশা ছিল—

সুপ্রিয়া ॥ কার আশা কবে পূর্ণ হয় বলুন!

অশোক ॥ ও, হ্যাঁ তা'ও তো বটে। ভাল কথা সুকুমার রায় নামে একটি ছেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল—তোমার ভাই?

সুপ্রিয়া ॥ হ্যাঁ।

অশোক ॥ তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে?

সুপ্রিয়া ॥ হ্যাঁ, সেইরকমই কথা ছিল। ওকে পড়াবার জন্যেই আমি চাকরী নিয়েছিলাম। আমাদের ছোট কর্তার সঙ্গে এবার এম. এ. পাস করেছে। ছোট কর্তা ফার্স্ট হয়েছেন—ও হয়েছে সেকেণ্ড। আমি চাকরী করি এটা ও সইতে পারেনা। আমি বলেছিলাম, বেশ তো, তুমি এম. এ.টা পাস করো, তারপর না হয় চাকরী ছেড়ে দেব।

অশোক ॥ তোমার জীবনের এই কয়েকটা পাতা আমায় পড়তে দাওনি সুপ্রিয়া। কেন বলো তো?

সুপ্রিয়া ॥ আমার জীবনের এসব খুঁটিনাটি আপনার জেনে লাভ? তা, ছাড়া আমার অভাব-অনটনের কথা আপনাকে জানানো মানেই আপনার কাছে আরো ছোট হওয়া। চাকরী ক'রে যতটা ছোট হ'য়ে আছি তার চেয়েও ছোট হওয়া।

অশোক ॥ আমি জানি—আমি বুঝি—চাকরী করবার মেয়ে তুমি নও।

সুপ্রিয়া ॥ আপনি আমায় বাঁচালেন। (হাত জোড় করিয়া) এবার তবে আমায় ছেড়ে দিন।

অশোক ॥ আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার স্ত্রী যখন মারা গেলেন

—আমি চোখে আঁধার দেখলাম। সংসারে দ্বিতীয় লোক নেই। আমার বিরাট ব্যবসা নিয়ে আমি তখন হাবুডুবু খাচ্ছি। একটি মাত্র ছেলে—আদুরে গোপাল—একগেলাস জল গড়িয়ে খেতে জানেনা—রাতদিন পড়াশোনা আর সমাজ-সেবা নিয়ে হৈ হৈ করছে। দেখাশোনা কেউ নেই, না তাকে, না আমাকে—সংসারটা নয় ছয় হ'য়ে যাচ্ছিল—অসহায়ভাবে দেখছিলাম—আর ভাবছিলাম কি করি—

সুপ্রিয়া ॥ এ-বিপদ থেকে উদ্ধার করতে বাংলাদেশে সুপাত্রীর কী কোনো অভাব ছিল কিছু ?

অশোক ॥ কিছুমাত্র না। কিন্তু বাধা ছিল।

সুপ্রিয়া ॥ কিসের বাধা ?

অশোক ॥ বাধা ছিল—ঐ ছেলে। ছেলে মনে আঘাত পাবে এই ছিল বাধা। ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম আমাদের দেখাশোনার জন্যে ভালো মাইনে দিয়ে গৃহকর্ত্রী করে কাউকে রাখব। পেলাম তোমায়। শ্মশানে নাকি ফুল ফোটেনা। ফুটলো তো ?

সুপ্রিয়া ॥ আপনার এইসব কবিত্ব আর উচ্ছ্বাস একবার শুরু হ'লে আমি বড় ভয় পাই। আমি এখন চলি।

অশোক ॥ চলি মানে ? সত্যি সত্যিই কি তুমি চ'লে যাচ্ছো ?

সুপ্রিয়া। কোথায় ?

অশোক ॥ আমার এ-ঘর সংসার ছেড়ে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ?

সুপ্রিয়া ॥ ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি এখনো।

অশোক ॥ দেখা হয়নি ! সে কোথায় ?

সুপ্রিয়া ॥ ছোট কর্তা তাকে টেনে নিয়ে গেছেন তাঁর ঘরে !

অশোক ॥ তোমার ভাইও সোসালিস্ট না কি ?

সুপ্রিয়া ॥ সোসালিস্ট কি কমিউনিস্ট তা' আমি জানি না, তবে ভারী মরালিস্ট। ...ওকে আমিও ভয় পাই। এ-বাড়ির পরিবেশটি ও বেশ ভাল করে দেখবে—দেখে ও যদি বোঝে এখানে আমি নিরাপদ নই—আমাকে ছাড়বে না, টেনে নিয়ে যাবে এখান থেকে। তা'তে ওর নিজের লাভ-ক্ষতি তলিয়ে দেখবে না—তিনশ' টাকা মাসহারা কাটা যাবে, তাও একটিবার ভাববে না।

অশোক ॥ আজকালকার ছেলেরা বড় dangerous। স্বচক্ষেই তো দেখছি, আমার ঐ ছেলে গাছের যে-ডালে ব'সে আছে সেই ডালই কাটছে। তিলজলায় আমার অত বড় বস্তিটা কুনালের নামে কিনেছিলাম—মাসে পাঁচটি হাজার টাকা আয় ছিল ঐ এক বস্তি থেকে—

সুপ্রিয়া ॥ আমি জানি। সে বস্তির মোটা আয়টা একটা বস্তি-উন্নয়ন সমিতি ক'রে তাদের লিখেপড়ে দিয়েছেন ছোটকর্তা।

অশোক ॥ আমার রক্ত-জল-করা টাকা উনি খোলাম কুচির মতন বিলিয়ে দিচ্ছেন সমাজ সেবার নামে। বে-আক্কেল। আর আমি ওকে একটি পয়সাও দিচ্ছি না। আমি ভাবছি—আমি ভাবছি—

সুপ্রিয়া ॥ কী ভাবছেন ?

অশোক ॥ আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করব। ওরই মুখ চেয়ে, সুপ্রিয়া, আর আমি বিয়ে করিনি। আজ মনে হচ্ছে কী ভুল আমি করেছি !

সুপ্রিয়া ॥ আপনার উচ্ছ্বাস আর উত্তেজনা দেখে আমি বড় ভয় পাই। (হাতঘড়ি দেখিয়া) এই দেখুন আপনাব ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেছে—চলুন—

[সূর্যমুখীব গুচ্ছটি হাতে নিযা অশোক চৌধুরীকে লইযা অন্দবে যাইতেছিল এমন সময কুনাল এবং সুকুমাব উচ্চ হাস্যবোলেব মধ্যে কক্ষে প্রবেশ কবিল]

কুনাল ॥ (তাহার পিতাকে দেখিযাই যেন ভূত দেখিল এই ভাবে) ও (সে আবার তখনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।)

সুকুমার ॥ দিদি !

[অশোক চৌধুরী এবং সুপ্রিযা ফিবিযা দাঁড়াইলেন]

সুপ্রিয়া ॥ (অশোক চৌধুরীকে) আজ কতদিন পর ভাইটির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা, আমি দুটো কথা বলে আসছি।

অশোক ॥ (সুকুমারেব প্রতি) সুকুমার তুমি মবালিস্ট শুনে খুসী হয়েছি—পালিয়োনা, আমি তোমাব সঙ্গে কথা কইব।

[অশোক চৌধুরীব অন্দবে প্রস্থান]

সুকুমার ॥ কখন এসেছ, তোমাব দেখা নেই।

সুপ্রিয়া ॥ আমাব সে অভিযোগ নেই। আড়াল থেকে তোমাকে দেখেছি—তোমাদের কথাও সব শুনেছি।

সুকুমার ॥ বাঁচিয়েছ। তবে তো দেখছি নতুন করে আর বলবার কিছু নেই। আমরা—আমবা কখন রওনা হচ্ছি ?

সুপ্রিয়া ॥ কিন্তু আমি যাব কেন বল।

সুকুমার ॥ যাবেই বা না কেন ?

সুপ্রিয়া ॥ তুই এম.এ. পাস করেছিস। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবি। কিন্তু আমিই বা নিজের পায়ে দাঁড়াব না কেন ?

সুকুমার ॥ এ-রকমতো কোনো কথা ছিল না দিদি। কথা ছিল আমি এম.এ. পাশ করলেই তোমার কাজ শেষ হ'লো। ছিল কি না ?

সুপ্রিয়া ॥ ছিল। সে কথা হ'য়েছিল তখন যখন নিজেকে আমি জানতাম না।...তখন—যখন আমার নিজের কতটা শক্তি আমি খবর রাখতাম

না। কিন্তু চাকরী করতে এসে আমি যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। যখন দেখছি নিজের কিছুটা ক্ষমতা আছে তখন আমিই বা কেন অক্ষম হ'য়ে ব'সে থাকব—তোর গলগ্রহ হয়ে?

সুকুমার ॥ চমৎকার। দশ-পনের বছর আগে এ-সব কথা কোন ভাই শুনলে মনে ব্যথা পেত। কিন্তু আজ এ কথা শুনে আমার আনন্দই হচ্ছে দিদি। চাকরী করতে এসে কতটা দক্ষতা তুমি দেখিয়েছ সে আমি জানি না কিন্তু এ বাড়ির লোকদের যে তুমি বশ করেছ সে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি। আমি জানতাম আমার দিদির রূপ আছে কিন্তু এবার তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে একটি আধুনিক পরিবারের কষ্টিপাথরে তুমি পরখ হয়ে বাস করছো। আর তা যখন হ'য়েছে এই আশাই আমি রাখব দিদি, নিজের মূল্য নিরূপণে তুমি ঠকবে না—কি বলো?

সুপ্রিয়া ॥ তুই মিথ্যে বলিস নি—আমারও মনে হয় আমি ঠকব না। আজকাল মানুষের জীবন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একটা হিসাব। সংসার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেনা-পাওনার হাটবাজার। এই দু'বছরে এখানে চাকরী ক'রে নাগরিক সভ্যতার যে রূপটা আমি দেখতে পাচ্ছি তাতে এই নগ্ন সত্যটাই বড় হযে দাঁড়িয়েছে—ত্যাগের চেয়ে ভোগ বড়। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ, দয়া-মায়া-মমতা নেই তা বলব না, আছে, কিন্তু সেটা নিষ্কাম নয়। কিন্তু সে যাক, তুই যখন ছোট কর্তার বন্ধু আর ছোট কর্তা যখন তোকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে তখন তোকে লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে বসিয়ে দিতে পারি। এ লাইব্রেরির একটি বিশেষত্ব আছে—এর প্রায় পনের আনা বই হয় ধনতন্ত্র নয় সমাজতন্ত্র নিয়ে।

সুকুমার ॥ তার মানে একখানা ধনতন্ত্রের বই বড় কর্তা কিনলে ছোটকর্তা দু'খানা সমাজতন্ত্রের বই কিনবেন, এই তো?

সুপ্রিয়া ॥ (হাসিয়া) হ্যাঁ। আমার তো মনে হয় যে রেটে এ-সব বই বেড়ে চলেছে তাতে আলমারিতে আলমারিতেই ঠোকাঠুকি লাগবে কোনদিন।

[কুনাল চৌধুরীর প্রবেশ। তাহার হাতে socialism-এর নূতন একখানি ভারি বই]

কুনাল ॥ কি তোমাদের এত সব গল্প হচ্ছে—আমাকে বাদ দিয়ে?

সুকুমার ॥ বাদ যাবে কেন ভাই? ···এসো। ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র আলোচনা হচ্ছিল আমাদের।

কুনাল। তা' যদি বলো ভাই তবে এ আলোচনার শেষ কথাটি পাবে এ-বইয়ে। আজ ডেলিভারী পেয়েছি। (বইখানি সুকুমারের হাতে দিয়া) নাও, ঐ লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে বসো। আমি তোমার দিদির সঙ্গে দুটো জরুরী কথা ব'লে আসছি।

সুকুমার ।। শুধু এ-কথাটা মনে রেখো আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে।

[হাসিয়া লাইব্রেরি ঘরের দিকে প্রস্থান]

কুনাল ।। এই শোনো, তোমার ভাইকে আমি সব বলে ফেলেছি। আমার সঙ্গে তোমার বিয়েতে তার আপত্তি নেই। আর তবে দেরী নয়—চলো আজই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে নোটিশটা দিয়ে আসি।

সুপ্রিয়া ।। ধীরে ছোটকর্তা—ধীরে। আপনি কী জানেন যে আপনার বাবা আপনাকে ত্যাজ্যপুত্র করবার নোটিশ দিয়েছেন।...জানেন আপনি?

কুনাল ।। হ্যাঁ, কথাটা কানাঘুষা শুনছি বটে—তাঁর নিজের মুখে কিছু শুনিনি। তোমাকে কিছু বলেছেন নাকি?

সুপ্রিয়া ।। হ্যাঁ, আজই বলেছেন?

কুনাল ।। আমি সোসালিস্ট—বোধ হয় এ-জন্য নয়। তাঁর বস্তিটাতেই আমি আমার কাজ প্রথম শুরু করেছি—এই রাগে বোধ হয়?

সুপ্রিয়া ।। (হাসিয়া) হ্যাঁ, তাই। তিনি তোমার সোসালিস্ট বুলিতে এদ্দিন ভয় পাননি। হাতেনাতে যেই কাজ শুরু করেছ—সেটা গিয়ে বিঁধেছে ওঁর বুকে গুলির মতো। আর কেনই বা তা' বিঁধবে না? ওঁর রক্ত-জল-করা সম্পত্তি—সেটা খোলামকুচীর মতো তুমি দশজনের মধ্যে বিলিয়ে দেবে তা' ওঁর সইবার কথা নয়।

কুনাল ।। তুমি সইতে পারছ তো?

সুপ্রিয়া ।। না—আমিও পারছি না। নিজের উপার্জিত সম্পত্তি যদি তুমি বিলিয়ে দিতে তবে আমি তোমায় শ্রদ্ধায় নমস্কার করতাম। কিন্তু পরের সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে তোমার পৌরুষটা কোথায়?

কুনাল ।। অন্যায় শোষণ আর উৎপীড়ন ক'রে যে-সম্পত্তি বাবা জমিয়েছেন সেই বে-জন্মা-সম্পত্তি আমি ধ্বংস করব। একে তুমি পৌরুষ না বলতে চাও ব'লো না—কিন্তু পৌরুষ বলতে তুমি কী বোঝ—তবে সেটা আমায় বলো।

সুপ্রিয়া ।। পৌরুষের আদর্শ আমার কাছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—একটি পয়সা অন্যায়ভাবে উপার্জন করেননি। কিন্তু ভোগও করেছিলেন চরম, দানও করেছিলেন চরম। ...ভারতের আদর্শ বলতে আমি এইটাই বুঝি কুনাল। আমার নিজের কথা যদি বলো আমি ভোগও করতে চাই ত্যাগও করতে চাই। কিন্তু সেটা নিজের উপার্জনে।

কুনাল। তাই ক'রো। কিন্তু, এতে, তোমাতে আমার বিয়েতে বাধা কি?

সুপ্রিয়া ।। বিয়ে করতে চাও কোন মুখে? একটি পয়সা আজও তুমি রোজগার করোনি কুনাল!

কুনাল ।। ও, তাই না কী!

[কেষ্টর প্রবেশ। তাহার হাতে Socialism-এর সেই বৃহদাকার বইখানি।]

কেষ্ট ॥ বাবুটি বললেন, বইখানি তিনি যত পড়ছেন তত তাঁর খিদে পাচ্ছে। বইটা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে বললেন।

কুনাল ॥ চলো, আমি যাচ্ছি। হ্যাঁরে কেষ্ট, তুই তো বি. এ.—পাস করেছিস, কত না তোর বেতন ?

কেষ্ট ॥ ষাট। দিন গেলে দু-টি টাকা ছোটকর্তা।

কুনাল ॥ এম. এ. পাস দিলে কত বেতন হ'ত তোর ?

কেষ্ট ॥ সর্বনাশ! চাকরীই হ'ত না।

কুনাল ॥ চাকরীই হ'ত না! কেন ?

কেষ্ট ॥ আমাদের কর্তাই যে এম. এ. পাস ন'ন।

[বলিয়াই কেষ্ট পলাইয়া গেল]

কুনাল ॥ তোমার ভাই, আজ তোমাকে নিতে এসেছে—চলে যাবে না কী তুমি ?

সুপ্রিয়া ॥ হ্যাঁ, যাবো।

কুনাল ॥ এই পাঁচশ' টাকার চাকরী ছেড়ে ?

সুপ্রিয়া ॥ তোমরা বলো চাকরী—কিন্তু আমি তা মনে করিনা। চাকরীর বাজার তো দেখছি, বি. এ, এম এ. পাস করে আশি বা একশ'। তা' সে-চাকরীও সবার জোটে কই ? আমি মাত্র ম্যাট্রিক পাস—রোজগার করছি মাসে—পাঁচশ' এটা চাকরি নয়, তোমাদের এখানে রক্ষিতা হয়ে বাস করছি—এটা তার মাসোহারা। যখনই কথাটা ভাবি তখনই আমার গা ঘিনঘিন করে কুনাল। কিন্তু সবকিছু সয়েছিলাম এদ্দিন—আমার ঐ ভাইটার জন্য—ওকে মানুষ করবার জন্য। কিন্তু আর নয়। এ চাকরী আমি ছেড়ে দিচ্ছি—আজই ছেড়ে দিচ্ছি।

কুনাল ॥ কিন্তু তারপর ?

সুপ্রিয়া ॥ বিয়ের চেষ্টা দেখব। বিয়ে না হয়, চাকরীর চেষ্টা দেখব।

কুনাল ॥ আমি তো বিয়ের কথাই বলছি সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া ॥ বিয়ের উপযুক্ত পাত্র তুমি নও। একটি পয়সা তোমার রোজগার নেই। প্রেমের বাজারে তুমি মহাজন। কিন্তু বরের বাজারে তুমি দেউলিয়া। তোমার প্রেমে আমি পড়েছি সত্য কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে পারিনা আমি কুনাল। এখনকার মেয়েরা বিয়ে করতে গিয়ে দেখবে সিকিউরিটি—তোমার কাছে সেটা আমি কিছুমাত্র আশা করতে পারি না কুনাল।

[অশোক চৌধুরীর কাশি শোনা গেল।]

কুনাল ॥ তোমার নগ্ন মূর্তিটা আজ আমি দেখলাম সুপ্রিয়া। মনে হচ্ছে আরো বেশী করে তোমার প্রেমে পড়লাম। প্রেমের বাঁধনে ধরা যদি না পড়ো,

স্নেহের বাঁধনও রয়েছে, বাবার। দেখি তুমি কি করে পালাও। কিন্তু আমাকে পালাতে হচ্ছে, বাবা আসছেন!

[কক্ষান্তরে কুনালের পলায়ন। অশোক চৌধুরীর প্রবেশ।]

অশোক ॥ কে গেল?

সুপ্রিয়া ॥ ছোটকর্তা।

অশোক ॥ আজ কদিন আমাকে এড়িয়ে চলছে—পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে যে ত্যাজ্যপুত্র করব, এ কথাটা নিজমুখে শোনাতে পারিনি এখনো আমি।

সুপ্রিয়া ॥ কথাটা ছোটকর্তা শুনেছেন—আর সেটা বিশ্বাসও করেছেন, কাজেই আপনার ভয় নেই। নিজমুখে না বললেও আপনি যা' চাইছেন তা' হবে। ছোটকর্তা হয়তো আমার সঙ্গেই যাবেন।

অশোক ॥ তার মানে তুমি সত্যি সত্যিই যাচ্ছো?

সুপ্রিয়া ॥ আপনাকে তো আমি সব বলেছি।

অশোক ॥ তোমার ভাই তোমাকে যেতে বলেছে? এখানকার পরিবেশটা নোংরা বলেছে?

সুপ্রিয়া ॥ না, তা অবশ্য বলেনি।

অশোক ॥ ছেলে আমার সোসালিস্ট বনেছে, এই যা, নইলে ওর আর কোনো দোষ নেই। বরং আমি বলবো he is too good. আর আমি আমার নিজের সম্বন্ধে জোর গলায় বলতে পারি, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, কিন্তু তার দায়িত্ব নিতেও প্রস্তুত আছি। আকারে ইঙ্গিতে একথা এর আগেও তোমাকে অনেকবার বলেছি। অবশ্য তেমন কোনো সাড়া পাইনি। কিন্তু আজ এসে গেছে, যাকে বলে কি না একটা চরম মুহূর্ত। আজ আর তুমি চুপ ক'রে থেকোনা সুপ্রিয়া—উত্তর দাও সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া ॥ আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান?

অশোক ॥ চলো, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে আজই নোটিশ দিয়ে আসি—

সুপ্রিয়া ॥ একটু দাঁড়ান। আপনার চাকরী আর করবনা ঠিক করেছি। চাকরী ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করতেই ইচ্ছে—

অশোক ॥ আমার মনের কথাটি তুমি বলছো সুপ্রিয়া। আমি তোমার কোনো অভাব রাখব না সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া ॥ আমি জানি! টাকা পয়সার অভাব একেবারেই হবে না আমার—আর টাকা দিয়ে যা কেনা যায়, সবই পাব আমি। মেয়েরা এই সিকিউরিটিই চায় আজকাল।

[কেষ্টর প্রবেশ]

অশোক ॥ (ক্রোধে) কী? এখানে কেন?

কেষ্ট ॥ (থতমত খাইয়া) কী জানি কেন!

অশোক ॥ Get out (কেষ্ট পলাইতেছিল) শোনো।

কেষ্ট ॥ এ্যাঁ !

অশোক ॥ ড্রাইভারকে বলো—এখুনি গাড়ী বের করতে ।

কেষ্ট ॥ ছোটকর্তারও সেই হুকুম—তাই না আমি যাচ্ছিলাম ।—আমার দোষটা কোথায়—যে আপনি আমাকে এরকম Get out করলেন ?

অশোক ॥ ও, হ্যাঁ, তুমি তো আবার গিয়ে Graduate. Excuse me কেষ্টধন। আশি থেকে একশ'—তোমার সেই আর্জি আজ মঞ্জুর। যাও, ড্রাইভারকে গিয়ে বলো, এখুনি আমার গাড়ী চাই ।

[কেষ্টর ছুটিয়া আদেশ পালন করিতে গেল]

সুপ্রিয়া ॥ ছোটকর্তা গাড়ীটা চেয়েছিল—কী এমন জরুরী কাজ যে আপনি দিলেন না ?

অশোক ॥ নিজের গাড়ী বস্তি-উন্নয়নের কাজে দান করেছেন ছোটকর্তা—এখন আমারটা নিয়ে টানাটানি ।

সুপ্রিয়া ॥ কোথায় যাচ্ছেন ?

অশোক ॥ কেন, তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি—ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে ।

সুপ্রিয়া ॥ তা' এতো তাড়া কেন ?

অশোক ॥ আমার শুধু ভয়—আবার তোমার কখন কি মত হয় । তাই শুভস্য শীঘ্রম্ ।

সুপ্রিয়া ॥ আপনি আমাকে সত্যিই সাংঘাতিক ভালোবেসে ফেলেছেন দেখছি ।

অশোক ॥ (হাসিয়া) বিয়েতে যখন তোমার মত হয়েছে, তখন একথা আমি জোর করে বলতে পারি, যে এ ভালোবাসাটা উভয়তঃ—নয় কি সুপ্রিয়া ?

সুপ্রিয়া ॥ এ প্রশ্ন আমাকে করবেন না আপনি ।

অশোক ॥ কেন ? কেন সুপ্রিয়া ?

সুপ্রিয়া ॥ উত্তর দিতে আমার বড় লজ্জা হচ্ছে মিস্টার চৌধুরী—ও থাক । আপনার বয়েস পঞ্চান্ন—আমার বয়েস সাতাশ, মনে রাখবেন কিন্তু ।

অশোক ॥ কেন ? কেন সুপ্রিয়া ?

সুপ্রিয়া ॥ রেজিস্ট্রি অফিসে জিজ্ঞেস করবে যে ।

অশোক ॥ তোমার মনের কথাটা আমি এতক্ষণে ধরতে পাচ্ছি সুপ্রিয়া । তুমি বলতে চাও পঞ্চান্ন বছরেব লোক সাতাশ বছরের মেয়েকে ভালোবাসতে পারলেও সাতাশ বছরের মেয়ে পঞ্চান্ন বছরের লোককে ভালোবাসতে পারেনা—কেমন এই তো ?

সুপ্রিয়া ॥ না—না, তা কেন ? আমার বাবাকে আমি কম ভালোবাসিনা মিস্টার চৌধুরী ।

[কেষ্টর প্রবেশ । সঙ্গে সঙ্গে মোটরের হর্ণ শোনা গেল]

কেষ্ট ॥ গাড়ী রেডী স্যার ।

অশোক ॥ ছোটকর্তাকে গিয়ে বলো—তার জন্য গাড়ী রেডী। (আদেশ পালন করিতে কেষ্টর প্রস্থান) তোমাকে ধন্যবাদ—বিষয়টা ভেবে দেখব আমি।

[অশোক চৌধুরীর কক্ষান্তরে প্রস্থান। সুপ্রিয়া মুহূর্তকাল কী ভাবিল। কুনাল ও সুকুমারের উচ্চহাস্য শোনা গেল। সুপ্রিয়া ত্বরিতপদে বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। ইহার একটু পরেই কেষ্ট ছুটিয়া আসিয়া চারিদিক দেখিয়া লইয়া চাপা গলায় কুনালের উদ্দেশ্যে বলিল—]

কেষ্ট ॥ এখানে এখন কেউ নেই ছোটকর্তা।

কুনাল ॥ (সুকুমারকে) সত্যি দেখছি, কেউ নেই। বাঁচা গেল। চলো ভাই, বেরিয়ে পড়ি।

সুকুমার ॥ আবার বলছি এ তোমার ভারী অন্যায় হচ্ছে কুনাল—আমাকে ডিনারের নেমন্তন্ন করে নিজে বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছো! এটা কী ভদ্রতা হচ্ছে ভাই?

কুনাল ॥ বললাম তো, বস্তিতে চলো, ডিনার খাওয়াচ্ছি আমি—আর এখানে খেতে চাও, আমার প্রিয়া খাওয়াবেন এখন। (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল) আমি বলি গাছেরও খেয়ো, তলারও কুড়িয়ো—(জোর হর্ণ শোনা গেল) আঃ! যাচ্ছি। চলো।

[সুকুমাবকে একপ্রকাব জোর করিয়া টানিযাই বাহিরে চলিয়া গেল]

কেষ্ট ॥ (আপন মনে) Get out! Get out! ঘাটের মড়া—আমাকে কিনা বলে Get out!

[অশোক চৌধুবীর পুনঃ প্রবেশ]

অশোক ॥ এই রাসকেল, এতো হর্ণ দিচ্ছে যে গাড়ী?

কেষ্ট ॥ ছোটকর্তার কাণ্ড। আমি কী বলব স্যার?

[সুকুমারেব পুনঃপ্রবেশ—সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চলিয়া যাওয়ারও শব্দ শোনা গেল]

অশোক ॥ আরে, এসো এসো মিস্টার,—কী যেন তোমার নাম?

সুকুমার ॥ মিস্টার নয়—শ্রীসুকুমার রায়। আপনি আমার সঙ্গে কি আলাপ করতে চেয়েছিলেন?

অশোক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো—বোসো। তোমার দিদিকেও ডাকছি। ওরে কেষ্টা, যা তো দিদিমণিকে গিয়ে বল—

কেষ্ট ॥ যাচ্ছি।

[অন্দরের দিকে প্রস্থানোদ্যত]

সুকুমার ॥ না, না, তিনি ভেতরে নেই। আমরা গিয়ে দেখি গাড়ীতে বসে রয়েছেন।

অশোক ॥ তা' গাড়ী তো চলে গেল!

সুকুমার ॥ হ্যাঁ, ঐ গাড়ীতেই তিনিও চলে গেলেন।

অশোক ॥ কোথায়—কোথায় গেলেন?

সুকুমার ॥ গেলেন—আপনার ত্যাজ্যপুত্র ছোটকর্তার সঙ্গে।

অশোক ॥ মানে ?

সুকুমার ॥ প্রথমে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে—বিয়ের নোটিশ দিয়ে, তারপর একেবারে বস্তিতে, মানে ওখানেই পাকাপাকি ভাবে ঘর বাঁধতে।

অশোক ॥ (কেষ্টকে) এই রাসকেল, ফ্যানটা খুলে দে।

কেষ্ট ॥ এই শীতে ? আপনার যে ঠাণ্ডা লাগবে স্যার !

অশোক ॥ ও, হ্যাঁ থাক। কিন্তু লাইটগুলো জ্বালতে হবে না—এই অন্ধকারে ? না-না থাক্। আচ্ছা জ্বেলেই দে। ফ্যানটাও খোল—

[কেষ্ট পটাপট সুইচগুলি অন করিতে লাগিল। একে একে সমস্ত আলোগুলি জ্বলিয়া অন্ধকার ঘুচাইল]

যবনিকা

স্বদেশ, নববর্ষ ও পৌষালী সংখ্যা, ১৯৫৬

বলো হরি হরি বোল

মাণিকতলার বস্তি অঞ্চলে বড়রাস্তার ধারে অতি ছোট একটি চায়ের দোকান। তা' যতো ছোটোই হ'ক সাইনবোর্ড একটি আছে। তাতে দোকানের নাম লেখা : 'চাতালের বৈঠক।' খান দুই লম্বা বেঞ্চি। আর তারই সামনে কেরোসিন কাঠের লম্বা টেবিল। টেবিলের ওপর অয়েল ক্লথের আচ্ছাদন। ঘরটির পেছন দিকে ঘেরা একটুকু জায়গা, সেখানে চা, চপ, কাট্‌লেট প্রভৃতি তৈরি হয়। 'চাতালের বৈঠকে'র মালিক চৈতন্য চরণ দাস। দোকানের দুটি বয় আছে। একজনের নাম সুখ আরেক-জনের নাম শান্তি। চায়ের দোকানের টেবিলে একটি বাংলা খবরের কাগজ থাকে। খদ্দেরদের কাছে ইহাও একটি আকর্ষণ। চায়ের দোকানটিতে আরেকটিতে হাতে লেখা বিজ্ঞাপনও টাঙানো রয়েছে। তাতে লেখা : 'শ্মশান বন্ধু সমিতি'। চৈতন্যবাবু হিসাব লিখছেন। অপরাহ্ণ। এখন পর্যন্ত কোন খদ্দের নেই। দোকানের ঘেরা-অংশ থেকে চৈতন্য দাসের স্ত্রী শিবানীর গলা শোনা গেল।

শিবানী ॥ কোনো মতে দশখানা চপ হ'ল। টোস্টের পাঁউরুটি কেটে রাখলাম। আর যা করবার সুখ শান্তিই ক'রবে। খদ্দের তো এখনো কেউ আসেনি মনে হ'চ্ছে ! আমি এবার কেটে পড়ি। আস্‌ব ?

চৈতন্য ॥ এসো।

শিবানী ॥ আজ টাকা দেবে ব'লেছিলে।

চৈতন্য ॥ (বাক্স খুলে দেখিয়ে) গড়ের মাঠ।

শিবানী ॥ তবে গড়ের মাঠের হাওয়া খেয়েই থেকো—হাড়ি চ'ড়বে না কিন্তু,—আমি বলে যাচ্ছি—হ্যাঁ, আর শোনো, বাড়িয়ালা শাসিয়ে গেছে আজ সন্ধ্যের মধ্যে অন্ততঃ একমাসের ভাড়া না দিলে, কাল দারোয়ান দিয়ে আমাদের তুলে দেবে। তুমি তো দোকানে প'ড়ে থাকো—বড়জোর শ্মশানে যাও মড়া পোড়াতে—ছেলে দুটো তোমারই সাথী—ঘর সামলাতে হয় একা আমাকে!—এ আর চলে না! এখন আমার কি ইচ্ছা হয় জানো—গলায় দড়ি দিয়ে মরি! আজ টাকাকড়ি না দিলে তুমি আমার মরা মুখ দেখবে!

[শিবানী চ'লে যাচ্ছিল। চৈতন্য হঠাৎ তার হাত চেপে ধ'রল।]

শিবানী ॥ এ কি!

চৈতন্য ॥ আমি দেখ্‌বো।

[চৈতন্য হঠাৎ শিবানীর শাড়ীর একাংশ সরিয়ে দেখতে পেল আলাদা আর একটি ন্যাকড়ায় বাঁধা কিছু চপ্। শিবানী ঐ চপগুলি লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। চৈতন্য বাঘের মতো থাবা মেরে সেগুলি হস্তগত ক'রল।]

চৈতন্য ॥ তাই আমি ভাবি, মাল কিনে দিই, পুরো জিনিস পাইনা কেন! চোর! ঘরের বউ চুরি করে, এ-ও দেখতে হ'ল আমাকে!

শিবানী ॥ ভাতার যদি ভাত না দেয়—ঘরের বৌর উপায়? তুমি বাপ হ'য়ে মদ ভাং খেয়ে মড়া পুড়িয়ে বুঁদ হ'য়ে ব'সে থাকতে পারো—কিন্তু ছেলে দুটোর মুখে আমি কি ছাই তুলে দেব মা হ'য়ে! আমার গায়ের গয়না বিক্রি ক'রে, তুমি দিলে দোকান—নাম দিলে 'চাতালের বৈঠক'—এ-দোকানে কে খায় শুনি! কোত্থেকে খাবে! হাফ্ কাপ চা ছাড়া, আজ দেশের লোকের খাবার মুরোদ আছে কিছু! দোকানটা তুলে দাও! শ্মশানবন্ধুর ব্যবসটাই জাঁকিয়ে তোলো! দেখ্‌ছো কি—এর পর লোক খেতে না পেয়ে, মাছির মতন পড়বে আর মরবে! এন্তার লাস পোড়াও—আর মদ ভাং খাও! এ আমি ব'লে গেলাম—'চাতালের বৈঠক' মাতালের আড্ডা হ'ল ব'লে—

[শিবানী চলে যাচ্ছিল -]

চৈতন্য ॥ তবে তো বাঁচিরে শালী বাঁচি! তা'—এই গুষ্টির পিণ্ডি ফেলে যাচ্ছিস কেন? নিয়ে যা! (কিন্তু শিবানী ততক্ষণে পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে)—এই যা—চলে গেল! এতো লোক মরে—আমরা মরি না কেন! (আপন মনে হাসতে হাসতে) আমরা মরলে, আমাদের পোড়াবার লোক জুটবে না, বোধ হয় তাই!

[চৈতন্য চপ্‌গুলি ভেতরে রাখতে গেল। এমন সময় তার দুই ছেলে সুখ ও শান্তি স্কুল থেকে সোজা এখানে ফিরল। বই, শ্লেট, খাতাপত্র রাখবার জায়গায় রেখে জামা খুলে চায়ের দোকানে বয় হয়ে দাঁড়াল। এর মধ্যে চৈতন্য তাদের কাছে এসে দাঁড়াল]

চৈতন্য ॥ কিরে, তোরা যে আজ আগে ভাগেই ইস্কুল থেকে চলে এলি! পালিয়ে এলি বুঝি!

সুখ ॥ ভূগোলের বই কিনে দিতে পারোনি মাস্টার বললে কেলাস থেকে বেরিয়ে যা—

চৈতন্য ॥ করপোরেশনের ফ্রি ইস্কুল—তাড়িয়ে দিলেই হ'ল। মাস্টারটার নাম কি, বল দেখি ?

শান্তি ॥ দীনবন্ধু সেন।

চৈতন্য ॥ লোকটা এতোবড়ো একটা ভুল করল কেন! দীনবন্ধু কেন, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর নামটা নিতে বাধা ছিল কি!—আচ্ছা, সে দেখা যাবে—ভেতরে যা—দুজনে এক-একটা চপ খেয়ে নে—

সুখ ॥ সে কি বাবা! দোকানের চপ আমরা একদিন খেয়েছিলাম বলে, তুমি জুতো পেটা করেছিলে—কিরে শান্তি, মনে নেই ?

শান্তি ॥ মনে আবার নেই! বুঝ্‌লি না সুখ, উনি আমাদের বাজিয়ে নিচ্ছেন!

চৈতন্য ॥ না, না—আমি ব'লছি—যা গিয়ে খা—তোদের মা তোদের জন্যে তৈরি করে রেখে গেছে—

সুখ ও শান্তি ॥ তাই বলো।

[ছুটে দুজনেই ভেতরে চলে গেল। রামবাবু ও যদুবাবুর প্রবেশ।]

রাম ॥ 'বলো হরি—হরি বোল!'

যদু ॥ 'বলো হরি—হরি বোল!' বুড়ীটাকে আমরা পুড়িয়ে এলাম দাদা!

চৈতন্য ॥ পুড়িয়ে এলে তো একটা বুড়ী ভিখিরী—তা' এতো দেরী হ'ল যে ?

রাম ॥ তা' দেখলাম ভিখিরীর হাড়ই বেশী শক্ত হয় চৈতন্যদা—

যদু ॥ বোধ হয় খেতে পায় না বলেই হয়! নাঃ! আজকের দিনটা মাঠে মারা গেল। শ্মশানবন্ধু হয়েও না জুটলো একটা বিড়ি—না জুটলো একখানা বাতাসা!

রাম ॥ বরং নিজেদের ধারকরা বিড়িগুলোই গেল। এই সুখ, এককাপ খুব কড়া চা দে বাবা!

যদু ॥ আমাকেও।—এই শান্তি, তার আগে আমাকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে শান্ত কর দেখি বাবা!

চৈতন্য ॥ বুড়ীটা চোখের ওপর মরে গেল! এক ফোঁটা ওষুধও মুখে নিয়ে ম'রল না! তা' ওর শেষ কাজটা তোমরা করে এলে—পুণ্যের কাজই করলে! কোন বাড়ীতে কে মরছে—কোন বাড়ীতে ডাক্তার ঢকছে, দরকারী খবরটবরগুলো ঐ আমাদের এনে দিতো। তা সেও চলে গেল! যাক, খদ্দেররা আসছে! ওহে, মধুবাবুর হার্টের ব্যারামটা বেড়েছিল বলেই শুনেছিলাম—আজ তো দেখছি, বেশ হাসতে হাসতেই আসছেন।

[অফিস-ফেরতা মধু ও শ্যামবাবুর প্রবেশ। মধুর হাতে একখানি খবরের কাগজ]

মধু ॥ ওহে চৈতন্য, আজকের খবরের কাগজের সবচেয়ে বড় খবর জানো ?

চৈতন্য ॥ সে যা-ই থাক্, ভেজাল সরষের তেলের সের হয়েছে আড়াই টাকা, ইলিসের সের সাড়ে তিন টাকা আর চালের মণ বাইশ, এর চেয়ে কোন খবরই বড় হতে পারে না স্যার।

রাম ॥ না হে না, ও কি আর পড়ে জানতে হয়! সে তো হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

চৈতন্য ॥ তবে ?

মধু ॥ পশ্চিম বাংলায় মৃত্যুর হার নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম। আজ কাগজে বেরিয়েছে।

চৈতন্য ॥ তাই নাকি! তবে বলব আমাদের মাণিকতলাটা ঐ দুনিয়ার বাইরে।

শ্যাম ॥ তা নয় তো কি! মধুবাবু আর আমি বলাবলি করছিলাম—এ পাড়ায় তো 'বলো হরি—হরি বোলের' চোটে রাতে ঘুমাতে পারিনা। বুঝলে চৈতন, তোমার ঐ শ্মশানবন্ধুদলকে বলে দিয়ো একটু কম চেঁচাতে।

চৈতন্য ॥ ওরা কি সাধে চেঁচায়! সব বেকার বসে আছে। পেট ভরে খেতে পায়না। কতটা বেঁচে আছে চেঁচিয়ে পরখ করে নেয়।

শ্যাম ॥ কিন্তু শুনে আচমকা আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। এমন আঁৎকে উঠতে হয়, কোনদিন পীলে ফেটে মরব। এই সুখ—এক পেয়ালা চা, একখানা টোস্ট্। (মধুকে) তুমি কি খাবে দাদা, বলো।

মধু ॥ চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ওহে ছোকরা, আণ্ডার পোচ্ একটা—

রাম ॥ এই শান্তি, আর একটা হাফ্ কাপ চা দে।

[শান্তির তথাকরণ]

মধু ॥ তোমার চাতালের বৈঠকে 'সুখ' 'শান্তি' মূর্তিমান করে রেখেছো হে চৈতন!

শ্যাম ॥ তা যা বলেছো! চায়ের দোকান তো কতোই আছে—কিন্তু 'চাতালের বৈঠক' শহরে এই একটি—যেখানে 'সুখ' 'শান্তি' একেবারে বাঁধা!—

মধু ॥ সন্ধ্যে হ'লো—চলি হে চৈতন!

চৈতন্য ॥ এতো সকাল সকাল বাড়ি ফিরছেন যে কর্তা! হার্টের অসুখটা বুঝি বেড়েছে ?

মধু ॥ তুমি জানলে কী করে ?

চৈতন্য ॥ পাড়ার লোক, খবরাখবর রাখবো না!

মধু ॥ তা' একটু বেড়েছে! দেখছো কি ? কোনদিন টুক ক'রে চলে

যাবো! সেদিন আর কেউ না জানুক, তোমরা জানবে বৈ কী! আমার ছেলেপুলেগুলো তো নাবালক! শ্মশানে নিয়ে যাবে তোমরাই!...তা' নিও! কিন্তু, 'বলো হরি—হরি বোল' ব'লে অমন ক'রে চেঁচিও না!

শ্যাম ॥ তা' যা বলেছেন মধুবাবু! এরা এমন ক'রে চেঁচায়—আমার তো ভয় হয়, কোনদিন বাঁধন ছিঁড়ে কাঁধের মড়া খাট থেকে উঠে না পালিয়ে যায়! যাই, আমিও যাই। সুখ, এই নে পয়সা। শান্তি একটু মশলা দে।

[পয়সা দিয়ে মশলা নিয়ে মধুবাবুর সঙ্গে শ্যামবাবু চ'লে গেল।]

রাম ॥ (চৈতন্যকে) নাও দাদা সন্ধ্যের বিক্রি খতম!

যদু ॥ এ-বেলা কতো বিক্রি হ'ল দাদা?

চৈতন্য ॥ কতো আর হল! সারা দিনে চারটে টাকাও হ'ল না। এই সুখ, যা এই টাকাটা তোর মাকে দিয়ে আয়!

সুখ ॥ ছটা লোকের খ্যাঁট—ও একটাকা মা ছোঁবেও না!

চৈতন্য ॥ শালী মরেও না—হাড় জ্বালিয়ে খেলে!

সুখ ॥ খবরদার বাবা! মাকে তুমি ফের শালী বলেছ তো, তোমার এই দোকান ঘরে আমি আগুন দেবো।

[শান্তি রুখে আসে]

শান্তি ॥ তাতে হবে না রে সুখ—বুড়োর দাড়িতে আগুন দেবো আমি।

চৈতন্য ॥ দাড়িতে না বাবা, একেবারে মুখে। তোমরা মুখে আগুন না দিলে আমার স্বর্গবাস হবে না তো বাবা!

রাম ॥ আহা! কি সুখ!

যদু ॥ আহা! কি শান্তি দাদা! একেবারে সশরীরে স্বর্গবাস!

সুখ ॥ দেখুন মশাই, বেশী কথা বলবেন না।

শান্তি ॥ আমাদের ঘরের কথায় আপনি ফোঁড়ন দিতে আসেন যে! আমার বাপ তো তবু দুটো টাকা পরিবারের হাতে তুলে দিতে পারছে—আপনাদের তো সে মুরোদও নেই!

সুখ ॥ যতো সব শকুনের দল—হা-পিত্তেশ ক'রে ব'সে আছে—কখন কে মরবে—মড়া পোড়াতে ডাকবে—

শান্তি ॥ মদ ভাং খেয়ে, মড়া কাঁধে নিয়ে, 'বলো হরি—হরি বোল' করতে করতে শ্মশান ঘাটে গিয়ে মড়া পুড়িয়ে সিকিটা আধুলিটা রোজগার করবে—এই তো মুরোদ—তার আবার কথা!

চৈতন্য ॥ চুপ বাবারা চুপ! তোদের পায়ে পড়ছি—থাম—ঐ যে হাবুলবাবু আসছে—বোধ হয় হয়ে গেছে!

রাম ॥ সুখ! এক পেয়ালা চা!

যদু ॥ এই শান্তি, করছিস কি! কখন না বলেছি টেংরীর সুপ এককাপ দে!

[হন্তদন্ত হ'য়ে হাবুলের প্রবেশ]

চৈতন্য ॥ ওরে হাবুলবাবু এসেছে—এক পেয়ালা চা— (হাবুলের প্রতি) আর ডবল ডিমের মামলেট তো ?

হাবুল ॥ মামলেট খাওয়া চুকে গেল—মামা দেহ রাখলেন !

চৈতন্য ॥ কে ? মৃত্যুঞ্জয়বাবু ?

হাবুল ॥ হ্যাঁ মশাই। জানেন তো—যমে মানুষে লড়াই চলছিল ! তা' মশাই, আমরাই হেরে গেলাম—একটু ভালোর দিকে গিয়ে এই একটু আগে হার্ট ফেল—

যদু, রাম, চৈতন্য ॥ আ—হা—হা !

চৈতন্য ॥ নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়—ছিলেনও শিবতুল্য !

রাম ॥ নাও—পাড়ার একটা ইন্দ্রপাত হ'য়ে গেল !

হাবুল ॥ আমরা দাদা পথে বসলাম !

যদু ॥ না—না। শোকের সময় ঢের পাবেন—এখন যা' করবার তাই করুন।

হাবুল ॥ সেই জন্যেই তো আপনাদের কাছে এসেছি।

রাম ॥ আত্মীয়-স্বজনদের সব খবর দিয়েছেন তো ?

হাবুল ॥ পাকিস্তান থেকে এসেছি—আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে পেরেছে মাথা গুঁজে আছে, কাছেভিতে কেউ তো বড়ো একটা নেই—এ-বিপদে এখন আপনারাই আত্মীয়-স্বজন ! (চৈতন্যকে) আপনার হাতে তো একটা দল আছে—শ্মশানবন্ধুর দল—

চৈতন্য ॥ আছে বৈকী !—এমনি সব বিপদে আপদে দাঁড়াবার জন্যই—একটা সমিতি করেছি বৈ কী আমরা। তা' ভাববার কি আছে ! এই তো রামবাবু—যদুবাবু—এরাই সব যাবে। ওহে, তোমাদের দলবলকে খবর দাও !

রাম ॥ দিতেই হবে। আপনার ক'জন শ্মশানবন্ধু চাই হাবুলবাবু ? খাট—না খাটিয়া ?

হাবুল ॥ না, না, খাটেই নেব। উদ্বাস্তু হয়েই না অবস্থাটা পড়ে গেল। নইলে একদিন ছিল—

যদু ॥ সে তো আমরা জানি মশাই। মরা হাতী লাখ টাকা—কে না জানে ! তা হলে চৈতনদা—সমিতির খাতাটা বের করো—রসিদটা লিখে দাও।

চৈতন্য ॥ আ-হা—হিসেবটাই হল না—রসিদটা লিখে দাও ! (হাবুলকে) তা হলে খাটেই যাবেন—কেমন ? এবং যাবেন সঙ্কীর্তনে ?

হাবুল ॥ (মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল)

চৈতন্য ॥ (একটি ফরম্ বের করে) সুখ ! এই ফরমটা রামবাবুকে দাও তো বাবা। শান্তি ! পাইলট পেনটা এনে দে বাবা ! হরি হে পার করো !

[আদেশমত চট্‌পট্ কাজ হ'ল। রামবাবু ফরম্ ফিল আপ করতে বসলো]

রাম ॥ (লিখে যাচ্ছে) মৃতের নাম...মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। বয়স... ?

হাবুল ॥ ষাট।

রাম ॥ (লিখে যাচ্ছে) বয়স···ষাট।

হাবুল ॥ জাতি—হিন্দু ব্রাহ্মণ।

যদু ॥ ও-ঘরটা আমাদের নেই।

চৈতন্য ॥ আমাদের কোনো জাতবিচার নেই।

যদু ॥ তা' নয় তো কি! ও বাবা, যতো মত—ততো পথ! ডাকলে আমরা শ্মশানেও যাবো—কবরেও যাবো।

রাম ॥ ঠিকানা ?

হাবুল ॥ ৭।২, বাঘমারি রোড।

রাম ॥ (ঠিকানা লিখে নিয়ে) ওয়ারিশ ?

হাবুল ॥ আমি—ভাগ্নে, হাবুল রায়।

যদু ॥ Congratulation মশাই! খুব মেরে দিয়েছেন!

হাবুল ॥ কি যে বলেন! কি বা আছে—যে মারবো!

রাম ॥ আরে তবু মশাই—মরা হাতী লাখ টাকা।

যদু ॥ প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা তো! তাইবা কে পাচ্ছে? আপনার তো মশাই মামা! আমার তো মশাই বাপই ছিল—কি পেলাম! একপাল পুষ্যি—আর একরাশ দেনা!

রাম ॥ কাজের সময় কাঁদুনি—তাই আজো তুই বেকার, বুঝলি যদু! হাতে একটা ভালো কাজ এসেছে, স্ফূর্তি করে লেগে যা—তা না কেবল কাঁদুনি। (হাবুলকে) আপনি বলুন হাবুলবাবু—লাশের ওজন ?

হাবুল ॥ তা' মণ আড়াই হবে—

সুখ ॥ ওরে বাবা!

শান্তি ॥ ওরে বাবা কিরে? গেল মাসে সেই মাড়োয়াড়ীটা—তিন মণ তেরো সের—

চৈতন্য ॥ এই, তোরা থাম্‌লি ?

রাম ॥ (মুখে মুখে হিসাব) চার আড়াই দশ—ঘাড় বদলাতে আর এক দশ—রিসার্ভ পাঁচ—মোট তা' হলে পঁচিশ জন শ্মশানবন্ধু লাগবে হাবুলবাবু।

হাবুল ॥ আপনারা যা ভালো বোঝেন—করুন, কিন্তু একটু চটপট্ করুন—

রাম ॥ বোঝাবুঝি এতে কিছু নেই—এ' হলো গিয়ে সমিতির নিয়ম মাফিক কড়ায়গণ্ডায়! এইবার টাকার অঙ্কটা—Admission fee পাঁচ টাকা—Carrying fee পঁচিশ জনের মাথা পিছু এক টাকা হিসাবে পঁচিশ টাকা—না না, হাবুলবাবু—শ্মশানবন্ধুরা সব অনারারি কাজ করে—তবে মাথা পিছু এই ফি-টা সমিতিকে advance দিতেই হবে! সমিতি এই টাকা দিয়ে দুঃস্থের সেবা করে

থাকে। জানেন তো হাবুলবাবু—কতো সব সম্ভ্রান্ত লোক দুঃস্থ হ'য়ে পড়েছে—আমাদের সমিতি এ-টাকাটা তাদের মধ্যে গোপনে দান ক'রে থাকে।

হাবুল ॥ করুন মশাই—যতো পারেন করুন! (চৈতন্যকে) এই নিন্ আপনাদের ত্রিশ। কিন্তু দয়া করে এখন চলুন।

[চৈতন্য টাকা বাক্সে পুরিল]

চৈতন্য ॥ দাও হে রসিদটা দাও—সই করে দিচ্ছি—

হাবুল ॥ রাখুন মশাই আপনার রসিদ—দয়া করে চলুন।

চৈতন্য ॥ Law is Law. রসিদও দেবো—কাজও ক'রবো। বিড়ি-টিড়ি আর এ-টা ও-টার জন্যে সঙ্গে কিছু নেবেন—এ-সব তো জানাই আছে—কি বলেন?

হাবুল ॥ জানি মশাই—জানি। এইবার আসুন।

রাম ॥ হিন্দু যখন জানবেন বৈ কী! শ্রাদ্ধের দিনে শ্মশান বন্ধুদের ভুরি ভোজ খাওয়ালে তবে পরলোকগত আত্মার উদ্ধার—এ-সবও যদি হিন্দুকে মনে করিয়ে দিতে হয়, আপনি আমাকে বল্‌বেন ঠ্যাটা।—তাই ও আর বললাম না—ও-তো আছেই—এইবার (চৈতন্যকে) চৈতনদা, কতো নম্বর স্কোয়াড্?

চৈতন্য ॥ এক নম্বর বেলা পাঁচটায় ফিরে এসেছে—একটু rest চাই। দুনম্বর এখনো ফেরেনি। রিসার্ভ স্কোয়াড্‌কে খবর দাও—যাও বেরিয়ে পড়ো।

রাম ও যদু ॥ বলো হরি হরি বোল্! চলুন হাবুলবাবু—

[হাবুলসহ রাম ও যদুর প্রস্থান]

চৈতন্য ॥ ব্যাটাচ্ছেলে তোরাও তো রিসার্ভ—যা না—

সুখ ॥ না—আমরা দু'ভাই যাব না।

চৈতন্য ॥ যাবি না! কেন যাবি না রে হারামজাদা—এমন একটা দাঁও ছেড়ে দিবি?

শান্তি ॥ ছাড়তেই হবে। মা ব'লে দিয়েছে—আজকের রাতের মধ্যে যদি তুমি বকেয়া বাড়ি ভাড়া শোধ না করো—বাজার দেনা শোধ না করো—আর বাড়ির সবাইকে পুরো পেট খেতে না দাও, মা বিষ খাবে। সে লাশ টান্‌বে কে—তোমার এই শ্মশানবন্ধু শকুনের দল?

চৈতন্য ॥ ভিখিরী সেই বুড়ীটাকে গাঁটের পয়সা খরচ করে ওরা আজ পুড়িয়ে এল—সে খবর রাখিস্? ওরা শকুন নয়রে—ওরা মানুষই! তবে অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, ওদেরও তা-ই হচ্ছে! আমারই হয়েছে। হ্যাঁ রে, তোদের মা কি সত্যি আজ বিষ খাবে! বিষের পয়সা জুটবে কোত্থেকে শুনি?

সুখ ॥ বিষ মা আজ কি খাবে! ও তো কবে থেকে খাচ্ছে। বিষ পয়সা লাগে না বাবা। কোনোদিন আধপেটা খাচ্ছেন—কোনোদিন খাচ্ছেন না—এই তো বিষ। মরা নিয়ে তো কথা—সে বিষ খেয়েও মরা যায়—কিছু না খেয়েও মরা যায়।

চৈতন্য। দোকানপাট বন্ধ করে চল বাড়ি চল।

শান্তি ॥ শুধু হাতে বাড়ি যেও না বাবা। তিরিশটা টাকা পেয়েছো নিয়ে মাকে দাও।

চৈতন্য ॥ না, না! ও টাকা তো আমার নয়। যারা মড়া পোড়াতে গেল, এ-টাকা দিতে হবে তাদের। কাল সকালে এই টাকায় ওদের বাজারে হবে। আজকের বিক্রীর চারটে টাকাই নিয়ে যাচ্ছি—এই দিয়েই আজ ঠেকাবো—চল।

সুখ ॥ চপ্‌গুলো তো বিক্রিই হল না—খানদশেক রয়েছে—নিয়ে যাবো?

চৈতন্য ॥ নিয়ে যাবি?……নে।…না, থাক্।…ঐ তো আমার কালকের মূলধন। গরম করে দিলেই চলে যাবে।

[নেপথ্যে 'বলো হরি - হরি বোল' ধ্বনি শ্রুত হ'ল। ধ্বনি ক্রমশঃ নিকটবর্তী হতে লাগলো। সুখ শান্তি দোকান বন্ধ ক'রবার উদ্যোগ ক'রতে লাগলো। চৈতন্য একমনে 'ব'লো হরি হরি বোল' ধ্বনি শুনছিল। সুখ শান্তি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বাপের কাছে দাঁড়াল]

সুখ ॥ কি ভাবছো বাবা?……যাবে না?

চৈতন্য ॥ ……ভাবছি, তোরা কবে আমাকে এমনি ক'রে নিয়ে যাবি। (হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো) বল হরি—হরি বোল—(চাবিগোছা তুলে নিয়ে) বল হরি—হরি বোল—চল বাবা, চল

[তিনজনে দোকানঘর থেকে বেরিয়ে গেল বর্দ্ধমান 'বলো হরি—হরি বোল' ধ্বনির মধ্যে যবনিকা প'ড়ল।]

যবনিকা

স্বদেশ শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৩

টোটোপাড়া

প্রস্তাবনা

[প্রেক্ষাগৃহে সমবেত দর্শকদের উদ্দেশে সূত্রধারের ভাষণ]

সূত্রধার ॥ আমাদের এই ভারতে সবচেয়ে কম সংখ্যক লোকের যে জাতটি তার নাম জানেন কি? সে জাতটি হল গিয়ে একটি উপজাতি! নাম টোটো। ১৯০১ সালের আদমসুমারীতে এদের মোট সংখ্যা ছিল ৩৩৪ জন।

২০ বছর বাদে, গেল ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মোট ৩১৪ জন। হ্যাঁ, মাত্র ৩১৪ জন। এতে বোঝা যায় যে, এদের সংখ্যা কমতির মুখে। দেখেছেন কোন টোটো? না দেখে থাকেন, যাবেন সেখানে? কোথায় জানেন? টোটোপাড়া। হ্যাঁ, ছোট্ট একটি গ্রাম। আর ছোট এই গ্রামটিতেই বাস করে সমগ্র টোটো উপজাতি, যার লোকসংখ্যা মাত্র ৩১৪। ও, নামও শোনেন নি? তা না শোনবারই কথা। কিন্তু এখন তো শুনতে হবে, সংখ্যায় ৩১৪ জন হলেও এরাও ভারতসাধারণতন্ত্রের অংশীদার। হাতের পাঁচটি আঙুলের ক'ড়ে আঙুলটিকে ভোলা চলে না। চলুন টোটোপাড়ায়। জলপাইগুড়ি জেলার ভুটান সীমান্তে ছোট্ট গ্রাম সেই টোটোপাড়া, হিমালয়ের ছায়ায় দুর্গম বনের অন্তরালে ঢাকা টোটোপাড়া, দুরন্ত তোরসা নদীর ধারে উঁচু নীচু মাটির বুকে, ওই টোটোপাড়া গ্রামে বাস করছে ৩১৪ জন টোটো; পাশেই বাস করছে, গভীর অরণ্যে বুনো হাতী আর গণ্ডার, বাঘ আর ভালুক, সাপ আর ময়ূর। এত সব অসুবিধে থাকলেও এরা কিন্তু এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার কথা কোনদিন মনেও আনেনি। ভারি ভালবাসে এরা এদের গ্রামটিকে। চাষবাসই টোটোদের প্রধান উপজীবিকা। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্তও লাঙল দিয়ে চাষ করা তারা একেবারেই জানতো না। পরিবার পিছু জমি এদের আলাদা করে ভাগ করা নেই, গোটা মৌজাটাই এদের সর্দারের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া আছে। মৌজার মধ্যে এরা যার যেখানে সুবিধা ভুট্টা, মারোয়া, কাউন প্রভৃতি শস্যের ঝুম চাষ করে। টোটোদের আর একটি প্রধান উপজীবিকা হল কমলালেবুর ব্যবসা। ভুটান থেকে কমলালেবু বয়ে এনে এরা সমতল অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে।

এদের বাসের পদ্ধতি শুনবেন? জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে এরা বাঁশের মাচার ওপরে ঘর তৈরি করে। তারই নীচে শুয়োর, মুরগি প্রভৃতি জীবজন্তু খোয়াড়ের মত করে রাখে। গৃহপালিত জন্তু নিয়ে একই আশ্রয়ে থাকতে হয় বলে এদের গৃহ-পরিবেশটি নোংরা।

বারো রাজপুতের তেরো হাড়ি—একটা কথা আছে। শুনে আশ্চর্য হবেন, তেমনি এই ৩১৪ জন লোকের মধ্যে ১৫টি গোষ্ঠী। একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ের প্রচলন নেই। কোন্ গোষ্ঠীর লোক কোন্ গোষ্ঠীতে বিয়ে করতে পারে তা নির্দিষ্ট আছে। এর ফলে অল্পসংখ্যক লোকের মধ্য থেকেই পাত্র-পাত্রী বাছাই করতে হয়। দশ বছরের ছেলের সঙ্গে বিশ বছরের যুবতীর বিয়ে বিরল নয়। এদের মধ্যে সন্তান হওয়ার আগে বিয়ে পাকাপাকি হয় না এবং এর আগে প্রথা-মত এরা সঙ্গী বদল করে নতুনভাবে ঘর বাঁধতে পারে। কিন্তু সেটা প্রথামত হওয়া চাই।

এবার শেষ কথাটি বলি। জাতটি খুব শান্তিপ্রিয়। মারামারি ও রক্তপাত তারা করে না। সে রকম হাতিয়ারও এদের নেই। সংখ্যায় এরা এত কম

বলেই জীবনের দাম এদের কাছে অত্যন্ত বেশী। মারামারি কাটাকাটি করে মরলে ৩১৪ জন লোক শেষ হতে কদিন! এরা যে আজও টিকে আছে, তার কারণই হচ্ছে নরহত্যা এদের ধর্মের নিষেধ। এদের দেবতা হলেন ইসফা, তিনি বাস করেন বাদুপাহাড়ে। আর চিমা হলেন গিয়ে গৃহদেবী। এদের কোন পুরোহিত নেই। টোটোরা নিজেরাই এদের পুজো করে।

হোক না কেন এরা ৩১৪ জন লোক। কিন্তু আমার আপনার মতই এদেরও সুখ আছে, দুঃখ আছে, আনন্দ আছে, বেদনা আছে। দেখতে চান? ওই দেখুন টোটোপাড়ায় অপরাহ্ন ঘনিয়ে আসছে। খোলা জায়গায় ওই নাগকেশর-গাছটিকে কেন্দ্র করে একটি বাঁশের মাচা বসবাস জন্য তৈরি হয়েছে, দেখুন। দু পাশে দুটি বাড়ি গাছপালায় ঢাকা পড়েছে। একটি বাড়ি হল গিয়ে পেন্তা টোটোর। পেন্তার বয়স চল্লিশ। তার বউ যমনার বয়স কুড়ি।

অন্য বাড়িটি হচ্ছে পেন্তারই ছোট ভাই লাবেজের। পঁচিশ বছরের ফুর্তিবাজ ছোকরা। তারও বউ আছে। নাম হল কুপিনী। বছর আঠারো বয়স হবে।

নাগকেশর গাছের তলে পেন্তা টোটো এক মনে একটি অর্ধসমাপ্ত দোলনা সমাপ্ত করবার কাজে নিযুক্ত। লাবেজ টোটো তার বাড়ী হতে এল হাতে একটি দা, পিঠে একটি ঝোলা, হাতে একটি কলসী। তার পিছে পিছে এল তারই স্ত্রী কুপিনী।

কুপিনী ॥ লাবেজ! লাবেজ! হি লাবেজ! বনে তু একলা না যাবি।

লাবেজ ॥ একলা না যাবে তো আর কে যাবে?···তু যাবি?

কুপিনী। ও-বাবা, বনে হামি না যাবে, তোর মতলবটা হামি বুঝি, হামাকে বনে নিবি—বনে বাঘ আছে, ভালুক আছে, গণ্ডার আছে, উদের মুখে হামাকে ঠেলে দিবি, তু হামাকে মারবি, নতুন বহুর সখ তোর, তোকে হামি জানে।

লাবেজ ॥ (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) দূর পাগলী, তোর মাথাটা খারাপ হোল, তু এলি, তবে না আমার ঘর হোল, বাড়ী হোল, এখন একটা বাচ্চা হবে, তুকে যদি হামি মারবে, তবে হামার কি থাকবে? তু হামার আঁধার ঘরের পিদিম আছিস, চালি, হামি চলি।

কুপিনী ॥ তু কি আনবি? হামার জন্যে বন থেকে কি আনবি?

লাবেজ ॥ মৌ ভাঙবে—মধু আনবে।

কুপিনী ॥ সেদিন তু বললি--মধু আনবি, আনলি তু বাঘা ওল, আর কুকুর—কচু।

লাবেজ ॥ আজ হামি ঠিক মধু আনবে।

কুপিনী ॥ তু একলা যাবি, হামার বড় ডর লাগে। কাল শুনলাম, উ বনে একটা বুনো হাতি এলো। এ লাবেজ, দ্যাখনা, তোর পেন্তা দাদা, উ যদি তোর সাথে যায়।

[পেন্তার প্রতি লাবেজর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল]

লাবেজ ॥ এ কুপিনী, তু কি বলছিস ? হামার পেন্তা দাদার বহুটাকে জে তু জানিস, যমনা বুড়ি উকে না ছাড়বে ।

কুপিনী ॥ তু বলনা—তু দ্যাখ না ।

লাবেজ ॥ আচ্ছা বলবে, তু হামাকে আজ পান না দিলি, গুয়া না দিলি, যা যা—চটপট আন ।

[কুপিনীকে বাড়ীর দিকে লাবেজ ঠেলিয়া দিল । কুপিনী পান আনিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল । এক হাতে হুঁকো ও অপর হাতে পানের বাটা লইয়া পেন্তার স্ত্রী যমনা তাহার বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া লাবেজ ও কুপিনীর কথাবার্তা তাহাদের অলক্ষ্যে শুনিতেছিল । লাবেজ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল পেন্তার সম্মুখে । যমনা একটু আড়াল হইয়া রহিল ।]

লাবেজ ॥ এ পেন্তা দাদা !

পেন্তা ॥ হামি না যাবে ।

লাবেজ ॥ কুথা না যাবে ?

পেন্তা ॥ বনে না যাবে ?

লাবেজ ॥ তু কি করে জানলি হামি বনে যাবে ?

পেন্তা ॥ তোর বহুকে তু যা বললি উ তো চুপি চুপি না বললি, হামি শুনলাম । এ লাবেজ, তোর গলা আছে, হামার ভি কান আছে ।

লাবেজ ॥ আছে, তো আছে । তবে দ্যাখ দাদা—তোর বুদ্ধিটা কম আছে ।

পেন্তা ॥ কম আছে ! বুদ্ধি হামার কম আছে !

লাবেজ ॥ না আছে ? ইটা তু কি বানাস্ ? (দোলনটাকে দেখাইয়া) দিনের পর দিন—মাসের পর মাস বোকার মত বসি বসি ইটা তু কি বানাস্ ?

পেন্তা ॥ দোলনা ।

লাবেজ ॥ কেনে ?

পেন্তা ॥ তু একটা চ্যাংড়া আছিস, তু কি বুঝবি ?

লাবেজ ॥ কিছু কিছু বুঝি—কিছু কিছু না বুঝি । কুপিনীর বাচ্চা হলে হামি ভি একটা দোলনা বানাবে, চলি ।

[হাতে হুঁকো ও পানের বাটা লইয়া যমনা আসিয়া দাঁড়াইল । পেন্তার হাতে হুঁকোটি তুলিয়া দিল এবং পানের বাটাটি লইয়া লাবেজের মুখোমুখি দাঁড়াল ।]

লাবেজ ॥ (যমনাকে) পান ?

যমনা ॥ (যাদুকরীর দৃষ্টিতে) হুঁ ।

লাবেজ ॥ (কুপিনী আসিল কিনা দেখিল, আসে নাই দেখিয়া) হামাকে একটা দিবি ?

যমনা ॥ হামি কেনে দেবে ? কুপিনী দেবে ।

লাবেজ ॥ কৈ দিল, না দিল । তু দে ।

যমনা ॥ কেনে দেবে ? তু হামাকে কি দিবি ?

লাবেজ ॥ মধু দেবে লিবি ?

যমনা ॥ (পেন্তাকে দেখাইয়া) উ হামাকে মধু না দেবে, কেনে জানিস ?

লাবেজ ॥ কেনে ?

যমনা ॥ উ বলবে হামি ওর মধু আছে, উ বলবে যমনার চেয়ে মধু মিষ্টি না আছে।

পেন্তা ॥ এ যমনা, তু এসব কি বলছিস ? ভাগ—

যমনা ॥ (লাবেজকে) ভাগ ছোড়া—ভাগ—

লাবেজ ॥ পান দিবি তবে ভাগবে।

যমনা ॥ আমাকে যদি আবার একটা পরগাছা ফুল দিবি—সেই দুধের মত ধবধবে সাদা পরগাছা ফুল, তবে হামি পান দেবে।

লাবেজ ॥ আচ্ছা, দেবে।

যমনা ॥ লে।

[লাবেজ পানে হাত দিয়াছে, এমন সময় পান লইয়া হেই লাবেজ ! কুপিনীর প্রবেশ]

কুপিনী ॥ (দৃশ্যটি দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল) লাবেজ !

যমনা ॥ এ কুপিনী, একটা ঝাঁটা আন, তোর মানুষটাকে মার, তোর পানে ওর মন না ভরবে -হামার পান খাবে। (লাবেজকে) ভাগ—

[তখন কুপিনী লাবেজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কুপিনীকে দেখিয়া ভয়ে প্রকাণ্ড একটি হাঁ করিল। কুপিনী সঙ্গে সঙ্গে নিজের হস্তস্থিত পানটি লাবেজের মুখে পুরিয়া দি লাবেজ সঙ্গে সঙ্গে মখ বুজিল।]

কুপিনী ॥ (লাবেজকে ঠেলা দিয়া) ভাগ—

[কুপিনী লাবেজকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া চলিল এবং উভয়ে দৃশ্য হইতে অন্তর্হিত হইল। যমনা খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।]

পেন্তা ॥ (দোলনাটি রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া যমনার কাছে দাঁড়াইল এবং চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল) থাম। রাতভর হাড়িয়া খালি. তু পাগলা হলি, তু মরবি।

[পেন্তার ধমক খাইয়া যমনার তৎক্ষণাৎ কেমন ভাবান্তর হইল। হাত হইতে তাহার পানের বাটা পড়িয়া গেন। মুহূর্তে যেন সে স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গেল—দৃষ্টি হইল অপলক, দেহ হইল নিশ্চল। যমনা যেন এক ভূতাবিষ্টা মূর্তিতে পরিণত হইল। তাহার এই রূপান্তরিত মূর্তি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল সে যেন পাথরে খোদাই একটি দেবী মূর্তি। কণ্ঠে যেন তাহার দৈব বাণী। পেন্তা তাহার এই রূপান্তর দেখিয়া ভয় পাইল।]

যমনা ॥ শুন। দুনিয়ার তিনশ চৌদ্দ টোটো, শুন।

পেন্তা ॥ যমনা—যমনা—

যমনা ॥ হামি কাল রাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম, স্বপ্নে হামি আমাদের দেবতা দেখলাম।

পেন্তা ॥ যমনা!

যমনা ॥ খোদ ইসফাকে দেখলাম।

পেন্তা ॥ (সাশ্চর্যে) ইসফা?

যমনা ॥ ইসফা!

[হঠাৎ আর্তনাদ করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পেন্তা তাহাকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ডাকিতে লাগিল।]

পেন্তা ॥ যমনা—যমনা—যমনা—তু কি দেউসী হলি?

[ক্রমাগত ঝাঁকুনি খাইয়া যমনার মোহ কাটিয়া গেল—তাহার ঘুম যেন ভাঙ্গিয়া গেল। সে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।]

যমনা ॥ কি হোল?

পেন্তা ॥ যমনা তু কি দেউসী হলি?

যমনা ॥ হামি জানিনা। কি যেন হামি সব সপনো দেখলাম। ইসফাকে হামি দেখলাম। স্বপ্নে হামি একটা গান পেলাম।

পেন্তা ॥ স্বপ্নে তু গান পেলি? এ তু কি বলছিস্ যমনা।

যমনা ॥ পেলাম, পেলাম, হামি একটা গান পেলাম। হামি—হামি ঘুমুবে। আবার হামি ঘুমুবে। হামাকে শুইয়ে দে পেন্তা, হামার বিছানায় শুইয়ে দে।

[ঘরের দিকে অগ্রসব হইল। পেন্তা তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল…এদিকে নেপথ্যে বহুলোকের কণ্ঠ শোনা গেল। ক্রমশঃ মনে হইতে লাগিল একদল টোটো ঢ্যাট্রা সহযোগে কি যেন ঘোষণা করিতে করিতে আসিতেছে। কাজী পরিচালিত সেই টোটোর দল ক্রমশঃ এখানে আসিয়া পড়িল এবং তাহাদের ঢ্যাট্রা সহযোগে ঘোষণা করিতে লাগিল। এই ঘোষণার মধ্যে ওদিক হইতে কুপিনী এবং এদিক হইতে পেন্তা আসিয়া দাঁড়াইল এবং ঘোষণা শুনিতে লাগিল।]

কাজী ॥ হামাদের টোটোপাড়া যে না জানবে সে মানুষ না আছে।

টোটোগণ ॥ কাজীর বাৎ ঠিক আছে। (ঢ্যাটরা)

কাজী ॥ ভর দুনিয়ায় তিন শ চৌদ্দ টোটো আছে। যদ্দিন ভুটান পাহাড় আছে—

টোটোগণ ॥ ভুটান পাহাড় আছে—

কাজী ॥ ইসফা দেবতা আছে—

টোটোগণ ॥ ইসফা দেবতা আছে—

কাজী ॥ টোটোলোকের সর্দার আছে—

টোটোগণ ॥ . টোটোলোকের সর্দার আছে—

কাজী ॥ তোরসা নদী আছে—

টোটোগণ ॥ তোরসা নদী আছে—

কাজী ॥ জঙ্গল ভরা জানোয়ার আছে—

টোটোগণ ॥ জঙ্গল ভরা জানোয়ার আছে—

কাজী ॥ হোক না কেন তিনশ চৌদ্দ টোটো, টোটো কাউকে ডরে না।

টোটোগণ ॥ টোটো কাউকে ডরে না। (ঢ্যাট্রা)
টোটো কাউকে ডরে না। (ঢ্যাট্রা)
টোটো কাউকে ডরে না। (ঢ্যাট্রা)

কাজী। তিন শ চৌদ্দ টোটো আছে, আজ একটা টোটো বাড়লো।

টোটোগণ ॥ উবু, উবু উবু······

কাজী ॥ কার ঘরে বাড়লো ?

টোটোগণ ॥ তিতরী টোটো—

কাজী ॥ তিতরীর ঘরে আজ ছেলে হোল/আঁধার ঘর আলো হোল
সর্দারের হুকুম হোল/সব টোটো হাড়িয়া দেবে।
সেই হাড়িয়া এই কাজী খাবে / তবে কাজী মন্তর পড়বে
তিতরীর ব্যাটা চাঙ্গা হবে/কোথা পেস্তা কোথা লাবেজ
হাড়িয়া দে হাড়িয়া দে ॥

টোটোগণ ॥ কোথায় পেস্তা কোথায় লাবেজ
হাড়িয়া দে হাড়িয়া দে। (ঢ্যাট্রা)

[সকলে সবিস্ময়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইল। যমনা একটা সাদা কাপড়ে সারা দেহ জড়াইয়া পূর্ববৎ ভূতাবিষ্টের মত অট্টহাস্য হাসিতে হাসিতে এখানে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে তাহাকে দেখিয়া স্তব্ধ স্তম্ভিত হইল।]

পেস্তা ॥ কাজী ! কাজী ! উ আর মানুষ না আছে, দেউসী হোল।

কাজী ॥ চুপ ! সব চুপ !

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

যমনা ॥ কাল রাতে ইসফা আমার কাছে এল / কাঁদতে কাঁদতে এল।
গাইতে গাইতে বলল / যমনা, তুই এই গান গা।
লাখো লাখো টোটো ছিল আমার ছেলে আর মেয়ে
মরতে মরতে সব গেল—/ আঙ্গুল দিয়ে গোণা যায় আমার ছেলে
যে ছেলে মরল সে ছেলে আর না ফিরিল
কমতে কমতে আমার সব গেল। /ওরে যমনা তোর কোল খালি কেন ?
তোর ঘর আঁধার কেন ? / তোর পূজা আমি না নিবে।
তোর হাড়িয়া আমি না খাবে। / যেদিন তু মা হবি

সেদিন আবার আসব / সেদিন আবার হাসব

আজ আমি কাঁদছি / আজ আমি চললাম।

কাজী ॥ (সভয়ে চীৎকার করে)·····দে-উ-সী !

যমনা ॥ (গান শেষ হইলে অট্টহাস্যে চিৎকার করিয়া উঠিল) আগুন জ্বালবে। টোটোপাড়ায় হামি আগুন জ্বালবে।

[অট্টহাস্য করিতে লাগিল। টোটোগণ ভয়ে হাঁটু গাড়িয়া হাত জোড় করিয়া বসিয়া পড়িল।]

কাজী ॥ এটা দেউসী না, এটা ডাইনী, সবাই ওকে ধর, এ পেন্তা এক জোড়া মুরগি আন, বলি হবে, হামি মন্তর পড়বে, এখনি সব ঠাণ্ডা হবে।

[সকলের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য। পেন্তা উদভ্রান্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এমন সময় এক গাছা পরগাছা ফুল হাতে লাবেজের প্রবেশ।]

লাবেজ ॥ কি হোল, এখানে কি হোল ?

[লাবেজকে দেখামাত্র যমনার অট্টহাস্য চট করিয়া থামিয়া গেল। লাবেজ ধীরে ধীরে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেই যমনা ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল। জনতা এ দৃশ্য দেখিয়া স্তব্ধ হইল এবং যে যেখানে ছিল সেখানেই চিত্রার্পিতের ন্যায় পরবর্তী ঘটনার জন্য সাগ্রহে স্তব্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।]

যমনা ॥ (লাবেজের প্রতি সানুরাগে তাকাইয়া) পরগাছা ফুল ?

লাবেজ ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল) হ্যাঁ।

যমনা ॥ তু আনলি ?

লাবেজ ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল) হ্যাঁ।

যমনা ॥ কুপিনীর জন্যে আনলি ?

লাবেজ ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল)—না।

যমনা ॥ ই তবে হামার ?

লাবেজ ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল)—হ্যাঁ।

[যমনা তাহার হাত হইতে পরগাছা ফুলগুচ্ছ পরমাগ্রহে ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া লইল এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফুলগুচ্ছের দিকে এবং লাবেজের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।]

কাজী ॥ ফুলপরী ! ফুলপরী ? ফুল যেই দেখল, ঠাণ্ডা হোল।

টোটোর দল। বাঁচা গেল। (ঢ্যাট্‌রা)

কাজী ॥ এ লাবেজ, তু বাহাদুর বটে। এ পেন্তা, তোর বাড়ীর চার কোণে চারটা ফুলগাছ পুতবি। জবাফুল, গাঁদাফুল, ইন্দ্রফুল, মিন্দ্রফুল। ফুল ফুটবে, ফুলপরী খুসী থাকবে। তোর বহুর ঘাড়ে ভর না করবে। সব কিছু ঠাণ্ডা থাকবে। চল, চল সব, চল। তিতরী টোটোর বাড়ী চল। হাড়িয়া লিয়ে চল—সেই হাড়িয়া হামি খাবে, তিতরীর ব্যাটা চাঙ্গা হ'বে।

[ঢ্যাট্‌রা বাজিয়া উঠিল ।]

টোটোর দল । তিতরী টোটোর বাড়ী চল / এক কলসী হাঁড়িয়া মিলবে
কাজী খাবে, হামরা খাবে / তিতরীর ব্যেটা চাঙ্গা হবে ।

[ঢ্যাট্‌রা দিতে দিতে সকলের প্রস্থান ।]

পেস্তা ॥ যাবি যমনা, তু যাবি ?

যমনা ॥ তু যা, হামি না যাবে । হামি আজ এ ফুল মাথায় পরবে, হামি আজ মনের মত সাজবে । তু যদি যাবি, যা ।

[ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল ।]

পেস্তা ॥ আলবাৎ যাবে । তু ঠাণ্ডা হলি হামি এখন ভরপেট হাঁড়িয়া খাবে ।

কুপিনী ॥ (লাবেজের কাছে আসিয়া) হামার মধু ?

লাবেজ ॥ বুনো হাতী পথে পড়ল ।

কুপিনী ॥ তার ভয়ে তু গাছে চড়্‌লি ?

লাবেজ ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল) হঁ্যা ।

কুপিনী ॥ পরগাছা ফুল পাড়্‌লি ?

লাবেজ ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল) হঁ্যা ।

কুপিনী ॥ ভাগ্যিস্‌ পাড়্‌লি, তাইনা আমার যমনা দিদি ঠাণ্ডা হোল ।

[কুপিনী নিজের বাড়ীর দিকে চলিল ।]

লাবেজ ॥ কুপিনী, কুপিনী !

[কিন্তু কুপিনী তাহাতে কর্ণপাত করিল না—সে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল ।]

লাবেজ ॥ (কি করবে বুঝিতে পারিল না, বিপন্ন হইয়া বলিয়া উঠিল) হামাকে বকবে না, হামাকে মারবে না, এমনি করে, ও শালী হামাকে চাবুক মারবে । কুপিনী, কুপিনী !

[কুপিনীর উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়া গেল । যমনা মাচার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল । লাবেজকে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল । হঠাৎ থামিয়া গেল । পরে পুষ্পগুচ্ছের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল । হঠাৎ তাহাও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, এবং দুহাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল । এমন সময় হাঁড়িয়া লইয়া ঘর হইতে পেস্তা বাহির হইয়া আসিল এবং যমনাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া, সে ধীরে ধীরে যমনার কাছে আসিয়া, যমনার মুখ হইতে তাহার হাত দুখানা সরাইয়া দিল ।]

পেস্তা ॥ তু কাঁদছিস্‌ কেনে যমনা ?

যমনা ॥ তু হামাকে ফুল না দিলি ।

পেস্তা ॥ দেবে দেবে । বাড়ির চার কোণে চারটা ফুলগাছ পুঁতবে ।

একটা জবা ফুল, একটা গাঁদা ফুল, একটা ইন্দ্র ফুল, একটা মিস্রি ফুল। চল্, ওঠ, চল!

যমনা ॥ কুথা?

পেস্তা ॥ তিত্‌রী টোটোর বাড়ী।

যমনা ॥ কেনে?

পেস্তা ॥ তিতরী টোটোর খোকা হোল, টোটোপাড়ার এক টোটো বাড়লো। টোটোর আজ একটা মস্ত পরব। আজ নাচের দিন, গানের দিন, ফুঁতির দিন। এসব দিনে হামরা ঘরে না থাকবে। আজ পেট ভরে সব হাড়িয়া খাবে, চল যমনা।

যমনা ॥ না।

পেস্তা ॥ না যাবি?

যমনা ॥ না।

পেস্তা ॥ থাক্—হামি যাবে।

[পেস্তা চলিয়া যাইতেছে। যমনা তাহাকে আর্তকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল।]

যমনা ॥ এ—শুন—'লেলাই এটা'।

[পেস্তা কাছে আসিল।]

পেস্তা ॥ বল্।

যমনা ॥ তুই ভাবিস না, হামার ভি ছেলে হবে।

পেস্তা ॥ দূর।

যমনা ॥ দূর বলবি তো হামার ছেলে তোকে বাপ না বলবে।

পেস্তা ॥ দূর—দূর—। তোর ছেলে হবে তো কবে হোতো। তিন তিনটে বছর গেল। মিছা কথা। তোর কথায় হামি আর না ভুলবে, ঐ দোলনাটা হামি তিতরীর বেটাকে দেবে, হামি নিলাম, চললাম।

[পেস্তা ছুটিয়া চলিয়া গেল। যমনা ক্ষণকাল সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হঠাৎ সম্মুখে নিক্ষিপ্ত পরগাছা ফুলটির দিকে তাকাইল। এদিকে ওদিকে চোরের মত তাকাইয়া হঠাৎ পরগাছা ফুলটি তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল এবং ছুটিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল।]

কালক্ষেপক অন্ধকারান্তে

অপরাহ্ন

[লাবেজের স্ত্রী কুঁপনী কমলালেবুর শূন্য ঝুড়ি নিয়ে যমনাকে সঙ্গে নিয়ে ভুটান পাহাড়ে কমলালেবু আনতে যাবার উদ্দেশ্যে এসে নাগকেশর ফুল কুড়িয়ে মাথায় গুজছে, আর ডাকছে—।]

কুঁপনী ॥ হে দিদি! বেলা পড়ল, ঘুম ভাঙল না তোর? 'লেলাই-এটা'—চলে আয়—চলে আয়।

[কুপিনী গান ধরিল]

পাহাড়তলীর কমলা গাছ
কাঁদছে বেদনায়—
ফলের ভারে নুয়ে তারা
করছে "হায় হায়"।
ফলের ভারে নুয়ে তাদের
কান্না খালি পায়।
টোটোপাড়ার মেয়ে তোরা
আয় রে ছুটে আয়॥'

* [রচনা সজনীকান্ত দাস]

[বাঁশের ঝুড়ি তৈরি-রত যমনার প্রবেশ। তাকে দেখেই কুপিনী খিল খিল করে হেসে উঠল।]

কুপিনী॥ কি রে বুড়ী, যাবি না তুই ?

যমনা॥ না, যাবে না! হামার ঘরে কমলালেবুর পাহাড় আছে।··হেই কুপিনী—

কুপিনী॥ কি যমনা দিদি ?

যমনা॥ 'লেলাই-এটা'—কাছে আয়।

[কুপিনী কাছে এসে দাঁড়াল।]

কুপিনী॥ বল্ বুড়ী, কি বলবি, বল্।

যমনা॥ তোর আয়না নেই ? না থাকবে তো তোরসা নদী তো আছে। নদীর জলে নিজের মুখটা দেখবি, দেখে বলবি কে বুড়ী—কে ছুঁড়ী। আর তা যদি না দেখবি তোর ঘরের লোককে পুছবি—কে বুড়ী—কে ছুঁড়ী। (কুপিনীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল যমনা) যা।

কুপিনী॥ দেমাক দেখে বাঁচি না। এত তোর বয়েস হল—কোলে একটা ছেলে না এল। রূপ ধুয়ে তুই জল খা। লোকে তোকে ডাইনী বলে, ঠিক বলে, ঠিক বলে।

[কুপিনী ছুটে চলে গেল। যমনা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর নাগকেশরের নীচে মাচার ওপরে বসে বাঁশের ঝুড়ি বোনবার কাজে লেগে গেল। হাটে যাবার সাজে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তার স্বামী পেস্তা টোটো।]

যমনা॥ এই, কোথায় চললি ?

পেস্তা॥ যাবে মাদারিহাট।

যমনা॥ এই শোন্, শোন্।

[পেস্তা যমনার কাছে এসে দাঁড়াল।]

পেস্তা॥ কি বলবি বল্ ?

যমনা ॥ মাদারিহাট তু ক্যানে যাবি ?

পেস্তা ॥ সর্দারের গাড়ি নিয়ে যাবে। সর্দার চাল কিনে আনবে, তেল কিনে আনবে, নুন কিনে আনবে।

যমনা ॥ তু কি কিনবি ?

পেস্তা ॥ হামি কি কিনবে ? পয়সা মিলবে কোথায় ?

যমনা ॥ চিনির বস্তা বয়ে বয়ে মরে সর্দারের বলদটা, একদানা চিনি বলদটা না খাবে। তু সর্দারের আর একটা বলদ, চালের বস্তা বয়ে বয়ে মরবি, একদানা চাল না পাবি।

পেস্তা ॥ তু হামাকে বলদ বলছিস্ ?

যমনা ॥ বলছি। ক্যানে বলবে না ? তু মরদ না আছিস

পেস্তা ॥ হামি মরদ না আছে !

যমনা ॥ না, মরদ আছে সর্দার। উরা ভাত খায়—তোর মত কচু না খায়। সর্দারের তিন-তিনটা ছেলে। এত বয়স হোল তোর, একটা ছেলে না হল। তু মরদ না আছিস। তোর ভাই, ওই লাবেজ ছোঁড়া, ও-ও মরদ আছে—তু না আছিস।

পেস্তা ॥ লাবেজ ভাত খায় ?

যমনা ॥ খায়—এক বেলা খায়।

পেস্তা ॥ লাবেজ ছেলের বাপ আছে ?

যমনা ॥ হবে—একদিন হবে।

পেস্তা ॥ হামিও হবে।

যমনা ॥ তিন তিনটা বছর এমনি গেল, লাবেজের বহু ওই কুপিনী পেত্নীটা—উ হামাকে শুনাল, আমার কোলে ছেলে এল না, আমাকে ডাইনী বলল। (ছলছল চোখে) ক্যানে বলবে না, তু বল্।

পেস্তা ॥ যমনা !

যমনা ॥ তু আমাকে কি দিলি ? ভাত না দিলি, কাপড় না দিলি, ছেলে না দিলি—

পেস্তা ॥ দেবে, একদিন দেবে—তু থাম্, তু থাম্ যমনা।

[পেস্তা তাকে আদর করছিল, লাবেজ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সে চলেই যাচ্ছিল। যমনা তাকে ডাকল।]

যমনা ॥ এ লাবেজ, 'লেলাই-এটা'। শুন্।

[লাবেজ এদের কাছে-এসে দাঁড়াল। যমনা তার গলা থেকে হারটি (টিসা) খুলে নিয়ে লাবেজের সামনে ধরল।]

তোর যদি আঁখ থাকে তো তবে দেখে লে। এমন টিসা টোটোপাড়ায় আর কার আছে বল্ ?

লাবেজ ॥ না আছে।

যমনা ॥ কত দাম আছে বল্।

লাবেজ ॥ হামি জানে। ওঁর দাম সাত টাকা আছে।

যমনা ॥ ইটা আমাকে কে দিলে জানিস ?

লাবেজ ॥ দাদা দিলে।

যমনা ॥ তোর বহুকে দিবি ? ইটা তু নিবি ?

পেস্তা ॥ (আগুনের মত দপ করে জ্বলে উঠে) যম্না !

যমনা ॥ তু থাম। তু দিলি—এ এখন হামার আছে। হামার যা খুশী করবে—তু বোলবার কে ? এই লাবেজ, সাত টাকার মাল হামি পাঁচ টাকার তোকে দিবে। পাঁচটা টাকা দে—লে।

পেস্তা ॥ (বজ্র নির্ঘোষে) লাবেজ !

যমনা ॥ (লাবেজকে) তু তো মরদ আছিস লাবেজ, কিসের ডর তোর ? লে।

লাবেজ ॥ (ট্যাঁক থেকে দশ টাকার একটি নোট বের করে) হামি লিবে-পাঁচ টাকা ক্যানে ? সাত টাকা দাম আছে, হামি দশ টাকা দিবে।

যমনা ॥ তুই তো রাজা আছিস লাবেজ '

[লাবেজ দশ টাকার নোটখানি যমনাকে দিয়ে টিসাটি হাতে নিয়ে দেখতে লাগল।]

পেস্তা ॥ (যমনাকে) উ টাকা তু কী করবি ?

যমনা ॥ তোকে দিবে। না দিবে তো, তু আর হামি কি খাবে ?

পেস্তা ॥ দে দে, এ টাকায় দু জোড়া মুরগি হবে। এ—ত ডিম হবে। প্রাণ ভরে খাবি—বাড়তি ডিম বেঁচবি। সেই পয়সায় আবার হবে তোর ওই টিসা।

[যমনার কাছে গিয়ে নোটখানি হাতে নিয়ে লাবেজের দিকে একবার তাকাল।]

পেস্তা ॥ (লাবেজকে) হ্যাঁ, তু মরদ আছিস। (যমনাকে) দিবে, দিবে—একদিন হামিও তোকে দিবে এমনি সব নোট। দশ টাকা হামার না ছিল—আজ হল। যাই আগে মাদারিহাট, কিনে আনি দু জোড়া মুরগি—ফুলপরী মুরগি—তোর মত। চলি—

যমনা ॥ দাঁড়া, মুরগি কিনবি হামার মত ?

পেস্তা ॥ হ্যাঁ রে যমনা, হ্যাঁ।

যমনা ॥ আর মোরগ ? তোর মত কিনবি তো, মুরগি ডিম না দেবে।

পেস্তা ॥ তু বড় ইয়ে—

[পেস্তা ছুটে হাটে চলে গেল। লাবেজ ও যমনা খিল খিল করে হেসে উঠল।]

যমনা ॥ (হঠাৎ তার হাসি বন্ধ করে—চটে গিয়ে) তু হাসবি কেনে ?

হামার স্বামী বোকা আছে, গরিব আছে, বুড়া আছে, হামার আছে। তোর কি ? তু হাসবি কেনে ?

লাবেজ ॥ তু মিছে বলিস নি যমনা ভাবী, এটা হামার হাসবার কথা নয়, তোর জন্যে হামি হাসি না, কাঁদি।

যমনা ॥ তু ভাগ্। কাঁদবার কথা তোর নয়। হামার গলার টিসা তোর বহুর গলায় দে, আজ তোর কাঁদবার কথা নয়, দাঁত বের করে হাসবার কথা—ভাগ্।

লাবেজ ॥ ভাগবে না। টিসাটা ক্যানে হামি কিনলাম, তা তুই জানলি না। হামার মনের মানুষটার গলায় নিজ হাতে পরিয়ে দেবে, তাই না কিনলাম।

যমনা ॥ হামি জানি—তু বলবি, সে মানুষটা হামি।

লাবেজ ॥ হ্যাঁ, তু। তোকে একটা টিসা দিব—এ হামার অনেক কালের সাধ। গোটা বছর মেহনত করে তাই এই টাকা হামি জমালাম। এই নে তোর টিসা, তোকেই হামি দিলাম।

যমনা ॥ এ টিসা হামি গলায় পরবে ?

লাবেজ ॥ পরবে না তো কি করবে। টিসা কি কেউ বাক্সে রাখে ?

যমনা ॥ বেশ, হামি গলায় পরবে—তোর দাদা যখন দেখবে তখন কি বলবে ?

লাবেজ ॥ না, না, দাদা না দেখবে। বনে যাব মৌচাক থেকে মৌ ভাঙতে, তু যাবি হামার সঙ্গে ওই টিসা পরে। তু পরবি, খালি হামি দেখবে। দু আঁখ ভরে দেখবে।

যমনা ॥ তোর দাদা না দেখবে ?

লাবেজ ॥ না দেখবে। তুকে নিয়ে হামি পালাবে।

যমনা ॥ কুথা পালাবে ?

লাবেজ ॥ তোরসার উ পারে। উ বনে।

যমনা ॥ তু পাগলা হলি। বনে হাতী আছে, গণ্ডার আছে, বাঘ আছে, —তু ভুলে গেলি !

লাবেজ ॥ ছোঃ। গাছের মাথায় হামরা ঘর বাঁধবে।

যমনা ॥ দূর ! তু হাড়িয়া খেলি, তু মাতলা হলি—তু মরবি।

লাবেজ ॥ মরবে, হামি তুর জন্যে মরবে।

যমনা ॥ ভাগ্। তু মরদ না আছিস।

লাবেজ ॥ হামি মরদ না আছে ! তুই কুঁপনীকে পুছ, হামি কি আছে।

যমনা ॥ (হেসে) হামি জানে—হামি জানে।

লাবেজ ॥ জানবে তো হামার সাথ চল্ ।

যমনা ॥ না, যাবে না । লোকটা কাঁদবে ।

লাবেজ ॥ বুড়ার ভয়ে তু বুড়ী বনলি ! এ বুড়ী ! তোর বুড়া কুথা ? ছেলে-পেলে কুথা গেল ? নাতি-পুতি হল তুর ? বল্—বুড়ী, বল্ ।

[লাবেজ হাসতে লাগল ।]

যমনা ॥ এ ছোঁড়া ! হামি বুড়ী—কি জোয়ানী—তু দেখবি ?

[যমনা খিল খিল করে হেসে উঠল ।]

লাবেজ ॥ তু অমন করে হাসছিস ক্যানে, বল্ যমনা, বল্, তু হাসছিস ক্যানে ?

যমনা ॥ তু কেমন মরদ আছিস হামি দেখবে । এ টিসা হামি হামার স্বামীর সামনে পরবে । বলবে—লাবেজ হামায় দিলে । দাও নিয়ে কাটতে যাবে হামার স্বামী তোকে, তখন তু কি বলবি, তাই হামি দেখবে, পরখ হবে, তু হামার না কার !

[কথা বলতে বলতে যমনা টিসাটা নিজের গলায় পরে ফেলল—এমন সময় কুপিনী সেখানে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এল, কমলালেবুর শূন্য ঝুড়ি হাতে—]

কুপিনী ॥ পালা—পালা—এখান থেকে পালা ।

লাবেজ ॥ ক্যানে রে ? পালাবে কেনে ?

কুপিনী ॥ একটা বুনো হাতী গাঁয়ে সেঁধিয়েছে । হামরা পালালাম । ওই শোন্, গোলমাল এদিকে আসছে, (লাবেজের হাত ধরে টানতে টানতে) চল্—চল্ ।

লাবেজ ॥ (যমনাকে) তু চল্ যমনা ।

যমনা ॥ হামি যাবে না ।

লাবেজ ॥ ক্যানে যাবে না ?

যমনা ॥ মরতে হয় মরবে, হামি যাবে না ।

লাবেজ ॥ না—না—

যমনা ॥ তোরা পালা—তোদের সব আছে—হামার কি আছে !

কুপিনী ॥ (লাবেজকে) উ ভাবছে—ওর রূপ আছে । হাতীকে জাদু করবে, যেমন তুকে করেছে । (চেঁচিয়ে) তু যাবি কি না বল্ ।

লাবেজ ॥ উকে ফেলে হামি না যাবে ।

[কুপিনী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল । অভিমানে অপমানে সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল ।]

লাবেজ ॥ তু মরবি ?

যমনা ॥ মরবে । হামার একটা ছেলে নাই, লোকে আমাকে বাঁজা বলে, মাগীগুলো হামাকে দেখে আর হাসে । ক্যানে হামি বাঁচবে ?

লাবেজ ॥ (যমনার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি) তু যা পাস নি, তু যা চাস, হামি তুকে দিবে।

[লাবেজ যমনাকে চট্ করে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় তাদের সামনে এসে পড়ল পেস্তা টোটো। পেস্তা হেসে উঠল। লাবেজ যমনাকে মাটিতে নামিয়ে দিল। প্রথমটা সকলেরই একটু ইতস্ততঃ ভাব। ক্ষণপরে—]

পেস্তা ॥ সাবাস লাবেজ। তু মরদ বটে।

লাবেজ ॥ বুনো হাতী গাঁয়ে সেঁধিয়েছে, উ পালাবে না। জোর করে উকে তুলে নিলাম হামি।

পেস্তা ॥ হামার ভাবনা ছিল, উকে কে বাঁচাবে। ভাবলাম লাবেজ আছে, উ দেখবে।

লাবেজ ॥ তা তু এলি, এবার চল্, সবাই পালাই চল্।

পেস্তা ॥ (হেসে) কে পালাবে, হামরা ? ছুঃ ! সর্দার আর হামরা এমন আগ জ্বালালাম—বুনো হাতী দেখল আর পালাল—হামরা হেসে মরি।

লাবেজ ॥ বাঁচা গেল।

পেস্তা ॥ তোর বহু কোথায় ?

লাবেজ ॥ উ পালাল।

পেস্তা ॥ একা ?

[লাবেজ মাথা নীচু করল]

যমনা ॥ একা। উ হামার জন্য রয়ে গেল।

পেস্তা ॥ বহুর চেয়ে ভাবী বড় হল। (লাবেজকে) যা তু যা, বহুটা কোথায় দ্যাখ্—যা।

[লাবেজ যাচ্ছিল]

যমনা ॥ (লাবেজকে) দাঁড়া।

[লাবেজ দাঁড়াল]

টিসাটা লাবেজ হামাকে দিলে (পেস্তাকে গলার টিসাটা দেখাল)।

পেস্তা ॥ ভাল হল—ভাল হল—সারাটা পথ হামি কেবল তোর টিসাটার কথা ভাবলাম। ভাবলাম মুরগি হামার থাক্। টাকাটা লাবেজকে ফিরিয়ে দিয়ে টিসাটা ফিরিয়ে নেবে—তোর গলায় আবার পরিয়ে দেবে। তা টিসাটা ফেরত নিলি এবার টাকাটা ফেরত দি-ই—(ট্যাঁক থেকে টাকা বের করে) নে লাবেজ, তোর টাকা নে।

যমনা ॥ নে লাবেজ, তোর টাকা নে।

লাবেজ ॥ টাকা হামি আর না নিবে।

[বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল লাবেজের উপর পেস্তা।]

পেস্তা ॥ নিবি না—ক্যানে নিবি না? উ তোর বন্ধু আছে যে তু উকে টিসা দিবি? নে ব্যাটা, টাকা নে।

[যমনা খিল খিল করে হেসে উঠল]

যমনা ॥ (লাবেজকে) হামি তোর কে আছে?—বল্—বল্—

পেস্তা ॥ (বজ্র নির্ঘোষে লাবেজকে) বল্।

[যমনা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। লাবেজ তার দিকে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল।]

যমনা ॥ (লাবেজকে) আরে, তু কেমন মরদ আছিস্—বল্।

[লাবেজ ক্ষিপ্ত হয়ে যমনার গলা থেকে টিসাটি ছিনিয়ে নিল]

লাবেজ ॥ হামি টাকা না নিবে—টিসাটা নিলাম। (যমনাকে) তু টাকা ধুয়ে জল খা।

[লাবেজ চলে গেল। যমনা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল]

পেস্তা ॥ যমনা, তু কাঁদছিস ক্যানে?

যমনা ॥ উ হামার টিসাটাই ছিনিয়ে নিলে। উ ক্যানে ছিনিয়ে নিয়ে গেল না হামাকে তোর ঘর থেকে!

পেস্তা ॥ বটে!

যমনা ॥ হ্যাঁ।

পেস্তা ॥ তার আগে হামার দাও ওর মাথাটা ছিনিয়ে নিত।...একটা ভুটানীকে হামি দেখেছি—যে উর বন্ধু নিয়া ভাগল—তাকে উ ধরল—বুকে তার ছুরি মারল। হামরা দেখলাম।

যমনা ॥ বটে!

পেস্তা ॥ হ্যাঁ, লাবেজের রক্তে টোটোপাড়ার মাটি লালে লাল হবে তবে উ তোকে হামার কলিজা থেকে ছিনিয়া নেবে!

যমনা ॥ তোর মাথাটা গোলমাল হল—তু বোস্ (তাকে ধরে মাচার উপর বসিয়ে দিলে) হামি তামাকু আনি, তু মাথা ঠাণ্ডা কর্।

[যমনা তামাক সেজে আনতে গেল। বাঁশের ঝুড়ি করার জন্য যমনার আনা একখানা দাও মাচার কাছে পড়ে ছিল, পেস্তা সেখানে কুড়িয়ে নিয়ে তার ধার পরীক্ষা করতে লাগল। লাবেজের স্ত্রী কুপনী এল। কুপনী পেস্তাকে দেখে চলে যাচ্ছিল।]

পেস্তা ॥ কুপনী—

[কুপনী দাঁড়াল]

পেস্তা ॥ শোন্—লেলাই এটা।

[কুপিনী কাছে এল]

পেস্তা ॥ লাবেজ কুথা ?

কুপিনী ॥ লাবেজ কুথা—তোরা বল্।

পেস্তা ॥ তোর মানুষ কুথা—হামরা বলবে !

কুপিনী ॥ তু না বলবে—তোর বহু বলবে। যমনা বলবে—ওই ডাইনী বলবে।

পেস্তা ॥ হামি বুঝি—কথাটা হামি বুঝি।

কুপিনী ॥ তু কচু বুঝিস। তু অন্ধ আছিস।

পেস্তা ॥ লাবেজকে হামি কাটবে—দাও দিয়ে কাটবে। ভুটিয়ারা যেমন কাটে দুশমনকে।

কুপিনী ॥ কাটবে। কেন কাটবে ? তু তো ভুটিয়া না আছিস। মানুষ মারলে টোটোর ধরম যাবে—তু জানিস না ?

পেস্তা ॥ জানে—জানে—হামি জানে। আচ্ছা শুন্। তু কেমন বহু আছিস—মানুষটাকে তু ধরে রাখতে পারবি না ?

কুপিনী ॥ তু কেমন মরদ আছিস—তোর বহুটাকে তু ধরে রাখতে পারবি না ?

[এমন সময় যমনা তামাক সেজে হু'কো নিয়ে এল]

কুপিনী ॥ (যমনাকে) বল্ ডাইনী, হামার লাবেজ কুথা ?

যমনা ॥ লাবেজ যদি তোর হবে—তু জানবি—হামি না জানবে।

কুপিনী ॥ সর্দারকে হামি আজ বলবে—ডাইনীটাকে মার—মার সর্দার—টোটোপাড়া তবেই টিকবে—না মারলে—টিকবে না—টিকবে না।

[কুপিনী ছুটে চলে গেল। পেস্তা হু'কোতে সুখটান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে হু'কা রেখে দাওটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।]

পেস্তা ॥ মারতে হবে ওই লাবেজটাকে—

যমনা ॥ মারবি ?

পেস্তা ॥ মারবে।

যমনা ॥ তু মারবি ! তোর ধরম ? ভর দুনিয়ায় তিন শো চোদ্দ টোটো আছে—এত কম আদমি হামাদের—দুনিয়ার সব লোক দ্যাখে আর হাসে—তাই টোটোর ধরম টোটোকে টোটো মারবে না। এটা ধরম আছে কিনা বল্ ?

পেস্তা ॥ ধরম। তাই আজও ওটা বাঁচি আছে।

যমনা ॥ ভর দুনিয়ায় তিনশ চোদ্দ টোটা আছে—দুনিয়ার সব লোক দ্যাখে আর হাসে, তাই টোটোর ধরম্, ছেলে না হবে তো টোটোর সাদি পাকা না হবে—

টোটোমেরে পুরুষটা ছাড়িয়া দিবে—ভিন পুরুষ নিয়ে ঘর বাঁধবে—এও টেটোর ধরম আছে। আছে কিনা বল্ ?

পেস্তা ॥ আছে। তবে কি তু হামাকে ছাড়িয়া যাবে ? চিমি আমাকে ছাড়িয়া গেল। ঘরে এলি তু। হামার পূজা তুকে হামি দিলাম—তু কেন যাবে ?

যমনা ॥ চিমি ছেলে না পেল—চলে গেল। হামার কোল খালি আছে—হামি ছেলে চাই। হামি থাকবে কেনে ?

পেস্তা ॥ শুন্—যমনা—শুন্।

যমনা ॥ না, হামি শুনবে না।

পেস্তা ॥ তিন তিনটা বছর একসাথ ঘর হল—বাঁচবার জন্য হামারা দুজন একসাথ কত লড়াই করলাম—তোকে খুশী করতে কত না মেহনত করলাম ! তু ফুল ভালবাসিস—জমিতে মারোয়া না বুনে ফুলের গাছ পুঁতলাম—সেই গাছে ফুল ফুটল।...তু যাবি ?

যমনা ॥ যাবে। কি হবে ফুলে—যদি না হামার ঘরে ছেলের হাসি ফুটল !

পেস্তা। ছেলে—ছেলে—ছেলে ! (হতাশ হয়ে) যা তু চলে—হোক্ তোর ছেলে—বাড়ুক একটা টোটো—তু মা হ—তু সুখী হ—যা।

[যমনা তার ঘরে চ'লে গেল। পেস্তা নীরবে হুঁকো টানতে লাগল। ক্ষণকাল পর—যমনা তা ঘর থেকে বেরিয়ে এল, নিরাভরণা। আগের শাড়ি বদলে আর একটা মলিন শাড়ি পরে এসেছে সে। এক হাতে তার একটি ছোট পুঁটলি—তাতে গায়ের গয়নাগুলি, আর এক হাতে একটি কলের পুতুল—গ্যাটাপার্চারের। যমনা ধীরে ধীরে এসে পেস্তার পাশে দাঁড়াল]

পেস্তা ॥ সেই পুতুলটা !

যমনা ॥ হ্যাঁ।

পেস্তা ॥ মাদারিহাট গেলাম—দোকানে দেখলাম ওই পুতুলটা—পেট টিপলে ট্যা-ট্যা করবে—এমনি উর কল। পরনের কাপড় না কিনে তিন টাকায় কিনলাম উটা তোর জন্যে। তু দেখে কি খুশী হলি ! পুতুল নিয়েই ভুলে রইলি। হামি বললাম—উ পুতুলটা হামি ফেলে দেবে, ভেঙে ফেলবে। ভয় পেয়ে তু লুকালি। এমন লুকোন লুকালি খুঁজে হামি না পেলাম আর।

যমনা ॥ পুতুল নিয়ে তু থাক্। এ আর হামি চাই না। তিন-তিনটে বছর খেলনাতে হামি ভুললাম—গয়নাতে হামি ভুললাম—আর হামি ভুলবে না। এই নে তোর খেলনা—এই নে তোর গয়না।

[যমনা পুতুলটা ও গয়নার পুঁটলিটি পেস্তার পাশে রেখে দিল।]

যমনা ॥ হামি চললাম।

[[illegible] চলে যাচ্ছিল। এমন সময় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। [illegible] দেখল তার সামনে এসে দাঁড়াল টোটোদের সর্দার, তার পশ্চাতে লাবেজ, তার পশ্চাতে কুঁপিনী। পেন্তা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল এবং অভিবাদন করল।]

পেন্তা ॥ সর্দার!

সর্দার ॥ বিচার হবে—আজ ভীষণ বিচার হবে—টোটো সব ছাড়বে—তার ধরম না ছাড়বে।

[সর্দার মাচার ওপর গিয়ে বসল। সকলে হাত জোড় করে তার দুদিকে দাঁড়াল।]

সর্দার ॥ ভুটিয়া—নেপালী—সবাই বলবে সর্দার তো টোটো সর্দার—ভয়ে তার বাঘ-গরু এক সাথ জল খায়। বলবে কি না?

সকলে ॥ বলবে।

সর্দার ॥ টোটোর ধরম যদি যাবে কী থাকবে?

কুঁপিনী ॥ কিচ্ছু থাকবে না সর্দার, তু বিচার কর্—ওই ডাইনীর বিচার কর্।

সর্দার ॥ চুপ যা মাগী। কার বিচার হবে সে হামি জানে। পেন্তা, লাবেজ তোর ভাই লাগে?

পেন্তা ॥ লাগে সর্দার, লাগে।

সর্দাব ॥ ভাই হয়ে ওই লাবেজ তোর বহুকে টানল—তোব ঘর ভাঙল—এ খবর তু রাখিস?

পেন্তা ॥ রাখি সর্দার, রাখি।

সর্দার ॥ (পেন্তাকে ভীষণ একটি চড় মেরে) তু কেমন মরদ আছিস রে শালা?

পেন্তা ॥ হামি কি করবে? টোটোর ধরম মানুষ না মারবে—হামি কি করবে?

সর্দার ॥ মানে তা হামি মানে। তা মানবে বলে দুশমনির সাজা না হবে?

লাবেজ ॥ কি দুশমনি হামার!

সর্দার ॥ সে জানে তোর বহু। উ নালিশ করলে তবে না হামি জানলাম। (কুঁপিনীকে) বল্ বহু, বল্।

কুঁপিনী ॥ দোষ করল ওই ডাইনী সর্দার। হামার মানুষটাকে জাদু করল—গুণ করল।

সর্দার ॥ চুপ যা মাগী। হামি যদি মরদ হই কোন্ শালী হামাকে জাদু করবে—গুণ করবে? দেওর হয়ে ভাবীর ঘরে সেঁধুল—তবে না উ মাগী এগিয়ে এল।

পেন্তা ॥ তু ঠিক বলেছিস সর্দার।

যমনা ॥ না সর্দার। (পেন্তাকে দেখিয়ে) উর ঘর হামি করবে না। তাই (লাবেজকে দেখিয়ে) উ হামার কাছে এল।

সর্দার ॥ না-না-না। আগে (পেন্তাকে দেখিয়ে) উ তোকে তালাক দেবে—তবে (লাবেজকে দেখিয়ে) উ আসবে। আগে কেন আসবে ?

যমনা ॥ উ হামাকে তালাক দিছে।

সর্দার ॥ কবে দিছে ?

যমনা ॥ এখন দিল।

সর্দার ॥ তবে ? আগে লাবেজ পেন্তার ঘর ভাঙল, তবে পেন্তা তুকে তালাক দিল। টোটার ধরম বলে, সব পাপের মাপ আছে—ঘর-ভাঙার মাপ না আছে। লাবেজ ! লেলাই-এটা।

[লাবেজ কাছে এসে দাঁড়াল]

সর্দার ॥ (লাবেজকে) হামি কে বল্ ?

লাবেজ ॥ টোটোর সর্দার।

সর্দার ॥ কে হামাকে তোদের সর্দার করল ?

লাবেজ ॥ ইসফা—টোটোর দেবতা।

সর্দার ॥ হামার কাজ ?

লাবেজ ॥ বিচার।

সর্দার ॥ (ইসফার উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে) দোহাই ইসফা—দোষ না নেবে। হামার বিচারে লাবেজ দুশমন—দোষী। হামি উকে সাজা দেবে। দোহাই ইসফা দোষ না নেবে। (সকলের প্রতি) বিচার হল, লাবেজ এ-গাঁয়ে আর না থাকবে। উ আর টোটো না আছে। এখনি উকে যেতে হবে, টোটোপাড়া জন্মের মত ছাড়ি, তোরসার ওপারে ওই বনে।

[সকলে আর্তনাদ করে উঠল]

যমনা ॥ সূর্যটা ডুবছে। সব আঁধার হয়ে আসছে।

কুপিনী ॥ তোরসাতে বান—সর্দার, দয়া কর—দয়া কর—

যমনা ॥ বনে বাঘ আছে—গণ্ডার আছে—বুনো হাতী আছে—এই রাতে বনে সেঁধুলে উ বাঁচবে না—উ মরবে সর্দার—উ মরবে।

সর্দার ॥ ইসফার ইচ্ছা—হামি কি করবে ?

কুপিনী ॥ না—না। ইসফার ইচ্ছা উ বাঁচবে—হামার পেটে উর ছেলে আছে—দুদিন বাদে যখন ছেলে হবে—তাকে কে খাওয়াবে ? তার খাবার জোটাবে কে ? ছেলেটাকে মানুষ করবে কে—হামার স্বামী যদি না বাঁচে ?

সর্দার ॥ বটে ?

কুপিনী ॥ হ্যাঁ, সর্দার। হামি তোদের কাছে কি দোষ করলাম—হামার ছেলেটা বাঁচবে না। এর তোর কি বিচার সর্দার ?

যমনা ॥ একটা ছেলে—একটা ছেলে—হামি পাইনি, উ পেয়েছে—উ পেটে ধরেছে—ছেলেটা বাঁচুক সর্দার।

সর্দার ॥ বাঁচবে—ইসফার ইচ্ছা—টোটোর বাচ্ছা বাঁচবে। তিন শো চোদ্দ টোটো ইসফার কাছে কাঁদে আর বলে—বাড়াও, হামাদের বাড়াও। একটা বাচ্ছা যখন উর পেটে টোটোপাড়ায় আসছে—আসুক—বাঁচুক। লাবেজ, তু খালাস।

সকলে ॥ জয় সর্দার জয়! জয় ইসফার জয়!

সর্দার ॥ থাম্ তোরা। ঘর ভাঙার বিচার হতেই হবে। এ বিচার না হবে তো ইসফা মাপ না করবে। সব টোটোর ঘর চুরমার হবে।—যমনা, লেলাই এটা। (যমনা কাছে এল) তু কুপিনীর ঘর ভেঙেছিস। ইসফার ইচ্ছা—হামার হুকুম—তু এ গাঁয়ে আর না থাকবে। তু আর টোটো না আছিস। এখুনি তুকে যেতে হবে জন্মের মত টোটোপাড়া ছাড়ি—তোরসার উ পারে ওই বনে। (পেস্তা ও লাবেজের আর্তনাদ অগ্রাহ্য করে, লাবেজ ও কুপিনীর প্রতি) চল্, তোদের ঘরে হামি যাবে—তোদের বাচ্ছাটার যাতে ভাল হয় ইসফার সেই মন্তর হামি এখনি পড়বে।

[সর্দার এক হাতে লাবেজ আর এক হাতে কুপিনীকে ধরে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ সর্দার ঘুরে দাঁড়িয়ে যমনা ও পেস্তার উদ্দেশ্যে বললে—]

সর্দার ॥ হামি এখনি এখানে ফিরবে—হামি তখন কি দেখবে?

যমনা ॥ যমনাকে না দেখবে সর্দার।

সর্দার ॥ ব্যস্! মন্তর পড়ব—চল—

[কুপিনী ও লাবেজ সহ সর্দারের প্রস্থান]

যমনা ॥ এ হামার সাজা না আছে—হামি চলি।

[পেস্তা কোন কথা বলতে পারেনা—ফ্যাল ফ্যাল করে যমনার দিকে চেয়ে থাকে]

যমনা ॥ একটা জিনিস যাবার আগে যমনা তোর নিবে। (পুতুলটি তুলে নিয়ে)—ই-টা। (পুতুলটির পেট টিপতে পুতুলটি প্যাক করে উঠল। পেস্তার দিকে তাকিয়ে পাগলীর মত হেসে) এই তোর ছেলে—এই ছেলে তু হামাকে দিলি। একেই নিয়ে হামি চললাম।

[যমনা ছুটে বেরিয়ে গেল। পেস্তা দাঁড়িয়ে দেখল—কি ভাবল—হঠাৎ তার ঘরে গেল। ক্ষণপর কুপিনী ও লাবেজ সহ সর্দার ফিরে এল]

সর্দার ॥ যমনাটা গেল। পেস্তাটা কাঁদবে। পেস্তা! (কোন সাড়া না পেয়ে সর্দার আবার ডাকল) পেস্তা! (লাবেজ ও কুপিনীর প্রতি) তোরা ঘরটা দ্যাখ।

[লাবেজ ও কুপিনী ছুটল]

সর্দার ॥ যমনাকে যেতে হামরা দেখলাম। পেস্তা কুথা গেল?

[কুপিনী পেস্তার ঘর থেকে আবার এখানে ছুটে এল]

কুপিনী ॥ উ তো ঘরে নেই। উর ঘরে আগুন জ্বলছে।

[লাবেজের প্রবেশ]

লাবেজ ॥ হাঁ সর্দার, ঘরে আগুন দিয়ে পেন্তা ফেরার।

কুপনী ॥ ওই ডাইনীটার পেছু নিয়েছে সর্দার।

সর্দার ॥ তবে উটাও গেল—আ-হা-হা, টোটোর একটা ঘর ভাঙি গেল—পুড়ি গেল। লাবেজ! লাবেজ! আগুনে জল ঢাল। আর যেন একটা ঘর না ভাঙে—না পোড়ে। চল্—চল্—ছুটে চল্।

[আগুন নেবাতে সকলে ছুটল]

যবনিকা

শনিবারের চিঠি : কার্তিক : ১৩৬০

* পরিবর্ধিত সংস্করণ

সাংঘাতিক লোক

প্রৌঢ় ধনঞ্জয় বসু লক্ষপতি ব্যবসায়ী, নিঃসন্তান। গৃহিণী কমলা সন্তান-হীনতার ব্যথায় ব্যথিতা। ধনঞ্জয় বসুর কক্ষ। সন্ধ্যারাত্রি। ধনঞ্জয় ও কমলা।

ধনঞ্জয় ॥ দার্জিলিং চল—

কমলা ॥ না।

ধনঞ্জয় ॥ তবে শিলং—

কমলা ॥ না।

ধনঞ্জয় ॥ পুজোর ছুটিটা কি এবার তবে এই কলকাতাতেই কাটাবে? পচে মরবে যে—!

কমলা ॥ মরলে বাঁচতাম! শোন—এবার কোন তীর্থে চল—

ধনঞ্জয় ॥ কোন তীর্থ যে তোমার বাদ রয়েছে মনে হচ্ছে না তো কমলা?

কমলা ॥ এবার আমি হরিদ্বার যাবো।

ধনঞ্জয় ॥ এবার নিয়ে হরিদ্বার তবে কবার হবে কমলা?

কমলা ॥ সেদিন বকুলমালা এসে বলে গেল, সেখানে নাকি কোন সাধু আছেন—

ধনঞ্জয় ॥ যিনি আমায় দেবেন এক চরু—আমি তোমায় দেব তা খেতে এবং তুমি তা খেয়েই রাতারাতি মা হয়ে যাবে—নাকি?

কমলা ॥ তোমার বিশ্বাস নেই বলেই তো···হয় না। নইলে···এমন তো কত দেখলাম মন্ত্রে তন্ত্রে তাবিজ কবজে—হয়েছে তো!

ধনঞ্জয় ॥ কেমন করে যে কি হ'ল···কে তা দেখতে যাচ্ছে!

কমলা ॥ আবার ঠাট্টা! ভারী অন্যায় কিন্তু।

ধনঞ্জয় ॥ তা বেশ তো, হরিদ্বারেই যাবে। ব্যবস্থা করছি—

কমলা ॥ কবে যাচ্ছো?

ধনঞ্জয় ॥ আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না—! দার্জিলিং শিলং—ওদিকটায় এই ছুটিতে আমায় যেতেই হবে—খানকতক বাড়ী করে ভাড়া দিলে চলে বেশ! তাই একটু ঘুরে দেখে আসতে হচ্ছে। তা ছাড়া, এবার কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হয়েছি, হাতে অনেক কাজ। এসেম্বিলর মেম্বার হবারও একটা সুযোগ এসেছে। কি করে যাই? তা তুমি একা গেলেই তো চলবে। মা—তো আমি হচ্ছিনা, হবে তুমি।

কমলা ॥ ভাল হচ্ছেনা বলছি!···তুমি না গেলে নাকি হয়!

ধনঞ্জয় ॥ আজ বার বছরই তো সঙ্গে ছিলাম—সঙ্গে গেছি—একবার না গেলে হয়তো ফল হ'তে পারে।

কমলা ॥ তোমার সঙ্গে কথা কইলেও পাপ। কি দেখে বাপ মা যে আমায় তোমার হাতে দিয়েছিলেন জানি না।

ধনঞ্জয় ॥ কে যে তাতে ঠকেছে বুঝছি না!

কমলা ॥ বটে! টাকার গরবেই মেতে আছ, না? কিন্তু এ টাকা ভোগ করবে কে? কার জন্য এই ছাই জমৃছে?

ধনঞ্জয় ॥ সে আমি জানিনা। পুরুষ মানুষ—টাকা রোজগার করতে হয়, করে যাচ্ছি—না করলে অপৌরুষ হতাম!

কমলা ॥ কি আমার পৌরুষ রে!

[বেয়ারা কার্ড লইয়া আসিল]

ধনঞ্জয় ॥ (কার্ড দেখিয়া) এখন দেখা হবেনা। (বেয়ারা চলিয়া গেল)

কমলা ॥ কে?

ধনঞ্জয় ॥ কে এক সোমেশ বসু।

কমলা ॥ সোমেশ বসু! কে এই লোকটা? প্রায়ই সন্ধ্যার সময় এসে কার্ড পাঠায়। অনেকদিন থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঘুরছে।

ধনঞ্জয় ॥ কোন চাকুরীর উমেদার হয় তো!···তা হ'লে তুমি হরিদ্বার যাচ্ছ।

কমলা ॥ যাচ্ছি এবং তুমিও।

ধনঞ্জয় ॥ তা হলে তোমার আর কিছু হ'ল না। জানতো এ বিষয়ে আমি কি অপয়া! এই বার বছর তো দেখলে।

কমলা ॥ যা খুসী তাই বলছ, না?

[বেয়ারার পুনঃপ্রবেশ]

বেয়ারা ॥ ও আদমি তো নেহি যাতা হ্যায়। বহুৎ হল্লা শুরু কিয়া।

ধনঞ্জয় ॥ উস্কো নিকাল দেও—

[কিন্তু···এক অসম্ভব ব্যাপার ঘটিল। সোমেশ বসু চাকর-বাকরদের হটাইয়া ঘরে আসিয়া উপস্থিত।]

কমলা ॥ কি সর্বনাশ!

ধনঞ্জয় ॥ কে এই বেয়াক্কেল? খুনে না ডাকাত?

সোমেশ ॥ (২০।২২ বৎসরের যুবক। সুগঠিত দেহ। দেখিলে তুচ্ছ করা চলে না। ধীর ভাবে উত্তর দিল) আপনি আমায় চিনতে পারছেন না, কিন্তু আপনি আমার মাকে চিনতেন। দেখুন তো—(বলিয়াই বুক পকেট হইতে একখানি ফটো বাহির করিয়া ধনঞ্জয়ের সম্মুখে ধরিল)।

ধনঞ্জয় ॥ (মুহূর্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত এদিক ওদিক চাহিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে)—হ্যাঁ চিনি বলেই তো মনে হচ্ছে। মোহিনী না? হ্যাঁ, মোহিনীই তো।···এ্যা, তুমি মোহিনীর ছেলে? এত বড়টি হয়েছ? (স্ত্রীকে) কমলা শীগ্‌গির চা জল খাবার আনো। আমাদের মোহিনীর ছেলে!

[চাকর-বাকব চলিয়া গেল]

সোমেশ ॥ আপনি ভুল করছেন। মার নাম তো মোহিনী নয়—

ধনঞ্জয় ॥ তুমি আর কি জান হে ছোকরা, তুমি তখনো হওনি, ঐ নামেই আমরা তাকে—ডাকতাম?—কমলা, চা—চা—

কমলা ॥ কে মোহিনী?

ধনঞ্জয় ॥ আমার এক বিশেষ বন্ধুর মেয়ে—চা নিয়ে এস শুনবে এখন—

[কমলার প্রস্থান]

সোমেশ ॥ আপনি মিথ্যা বললেন—

ধনঞ্জয় ॥ না বলে আমার উপায় ছিল না। (দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া) উনি আমার স্ত্রী, মনে রেখো। তুমি বিরজার ছেলে?

সোমেশ ॥ আজ্ঞে হাঁ।

ধনঞ্জয় ॥ সে কি এখনও বেঁচে আছে?

সোমেশ ॥ আজ ছ'মাস হ'ল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যেই আমি সন্ধান পেয়েছি যে আমি পিতৃহীন নই।

ধনঞ্জয় ॥ দাঁড়াও—দাঁড়াও। বিরজার ছেলে হয়েছিল আমি জানি। কিন্তু সে যে তুমি—তার কি প্রমাণ তোমার আছে?

সোমেশ ॥ ফটো আছে—আমাকে কোলে নিয়ে মার বুকে মাথা রেখে আপনি বসে আছেন। আপনার ছিল ক্যামেরা—কোন ফটো তুলতেই আপনি বাকি রাখেন নি। মাও ছিলেন বুদ্ধিমতী। আজ আমায় যে প্রশ্ন আপনি করছেন—সেই প্রশ্ন কোনদিন উঠতে পারে ভেবে তিনিও সযত্নে সব ফটোই লুকিয়ে রেখেছিলেন—আপনার বহু চিঠি—আমি ভালো আছি কিনা, আমার সর্দি জ্বর সারছে না কেন—আমি এত কাঁদি কেন—এমনি সব উদ্বিগ্ন প্রশ্নে

আপনার প্রত্যেক চিঠি ভরপুর থাকতো। মাকে আপনি সত্য সত্যই তখন ভালোবাসতেন—কাজেই ভবিষ্যতের ভয় তখন আপনার ছিলনা।

ধনঞ্জয় ॥ তুমি কি চাও ?

সোমেশ ॥ আমি আপনার পুত্ররূপে আপনার সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে চাই। আমার ন্যায্য অধিকার আমি চাই।

ধনঞ্জয় ॥ কিন্তু তোমার মা আমার বিবাহিতা পত্নী ছিলেন না।

সোমেশ ॥ নাইবা থাকলেন।

ধনঞ্জয় ॥ বিরজা কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে এমন কোন দাবী কোনদিন করেনি—এমন কি সে তোমার খোরপোষের দাবীও করেনি—

সোমেশ ॥ তার কারণ তিনি আপনাকে সত্যিই ভালবাসতেন। সেটা আপনি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই, সহজেই ঐ কুমারী মেয়েকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন—তাঁর সর্বনাশ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু,—অভিমান ছিল তাঁর অতিশয় বেশী। আপনার ভালোবাসাই তিনি যখন হারালেন—টাকা চেয়ে অধিকতর অপমানিতা হতে তিনি চাননি।

ধনঞ্জয় ॥ তারই ছেলে হয়ে তুমি—!

সোমেশ ॥ আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি শুধু তার একার ছেলে নয়, আপনারাও। অর্থে আপনার দুর্দান্ত লোভ—সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করবার জন্যে আপনার অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা। যশের কাঙ্গাল আপনি···। আপনার এই সদ্‌গুণগুলিও আমার রক্তেও আছে—

ধনঞ্জয় ॥ আমার স্ত্রীর আসবার সময় হয়েছে—তুমি আজ চলে যাও। অথবা চুপ করে চা খেয়ে চলে যাও। পরে একদিন বরং আমি তোমাকে খবর পাঠাবো—। অনেক কিছু ভাবনার—অনেক কিছু বিবেচনা করবার আছে।

সোমেশ ॥ কিন্তু কোথায় আমি যাব ? অর্থহীন সম্বলহীন বেকার যুবক, আমি। সে যে কি দুঃখ আপনি তা ধারণা করতে পারেন না বলেই আমায় চলে যেতে বলছেন। চায়ের কথা বললেন—ঐ চা আমি ক'দিন খাইনি জানেন ?

ধনঞ্জয় ॥ না—না তুমি চা খেয়েই যাও। কিন্তু আমার স্ত্রীর সামনে আমার কোন কথার প্রতিবাদ করোনা, বুঝলে ?

সোমেশ ॥ অনেক কিছু মিথ্যা বলে যাবেন আপনি—না ?

ধনঞ্জয় ॥ তা না বলে উপায় কি ? তুমি বরং আজ তাহলে চলেই যাও—আমি কিছু টাকা দিচ্ছি—কত চাও ?

সোমেশ ॥ দু-দশ টাকা আমি চাইছি না।

ধনঞ্জয় ॥ না-না, দু'দশ টাকা কেন ? সেই ফটো আর চিঠিগুলো আমায় তুমি ফেরত দাও—দশ হাজার টাকা আমি তোমায় দেব—

সোমেশ ॥ না।

ধনঞ্জয় ॥ বেশ, পনেরো হাজার। না তার বেশী আর আমি উঠতে পারি-না।—ঐ আমার স্ত্রী আসছেন···তুমি চলে যাও—চলে যাও।

সোমেশ ॥ আমি যেতে আসিনি—আমি থাকতেই এসেছিলাম। এই ফটো আর আপনার চিঠির তাড়া—নমস্কার—[প্রস্থানোদ্যত]

ধনঞ্জয় ॥ পনেরো হাজারের একখানা চেক দিচ্ছি।

সোমেশ ॥ মাপ করবেন, টাকার জন্য আমি আসিনি—আপনার স্নেহের জন্য এসেছিলাম।···সে স্নেহ যখন পেলাম না—টাকা আমি চাই না। আমি আমার মায়েরই ছেলে—ভুলবেন না।

[দরজা খুলিয়া ঝড়ের মত প্রস্থান। খাবারের থালা হাতে কমলার প্রবেশ।]

কমলা ॥ কী মানুষ গো! ঝড়ের মতো চলে গেল যে? দোর বন্ধ করে—তোমরা কি বলেছিলে বলত?

ধনঞ্জয় ॥ (সামলাইয়া লইয়া) ইংরেজীতে যাকে বলে ব্ল্যাক্‌মেলার। সাংঘাতিক লোক—। না পারে এমন কাজ নেই। ও চা ফেলে দাও। ওখান থেকে ই-আই-আর-এর টাইম টেবলটা দাও দেখি—হরিদ্বারের ট্রেন কখন ছাড়ছে—দেখছি।

দীপালি, পূজা সংখ্যা, ১৩৪২

মাসতুতো ভাইরা

সুষুপ্ত কলিকাতা ॥ রাত্রি প্রায় দুটো ॥

অন্ধকার শয়নকক্ষে মাঝে মাঝে খুট খুট শব্দ। হঠাৎ সুইচ টেপার শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে ইলেকৃট্রিক আলো জ্বলে উঠল। সুইচের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ভদ্রলোক দেখতে পেলেন একটি মজুর শ্রেণীর লোক একটি বড় ট্রাঙ্কের তালা খুলছে এবং তার যন্ত্রপাতি।

ভদ্রলোক ॥ ভাগ্যিস ঘুমটা ভেঙেছিল।···কিন্তু ঢুকলে কি করে তাই ভাবছি।...ও, জানালার গরাদ বেঁকিয়ে···বাহাদুর বটে। না না নড়ো না। রিভালবারটা নিয়েই আমি শুই। এটা যদি আমার হাতে না থাক" , তবে আরো খানিকটা দুঃসাহস তুমি দেখাতে পারতে। কিন্তু (রিভালবার তার দিকে লক্ষ্য করে) হাত তোল—

[লোকটি বুঝল উপায় নেই। সে দু হাত ওপরে তুলে আত্মসমর্পণ করল]

পাইপ বেয়ে দোতালা উঠে জানালার গরাদ বেঁকিয়ে—ডেঞ্জারাস !···দরকার হলে হয়তো খুনও কর্তে—কি বল।

লোকটি ॥ দেখুন—সংসার চলে না—পেট ভরে খেতে পাইনা তাই, নইলে প্রাণ হাতে করে কে এসব কাজে আসে ! আমায় মাপ করুন স্যার। আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

ভদ্রলোক ॥ দিব্যি হাত পা রয়েছে। খেটে খেতে কি হয় ? তোমরা মুটে মজুর—এখন তো তোমাদেরই পোয়া বারো। মজুরি তো বেড়েই চলেছে। তবু এসব কেন ?

লোকটি ॥ আজ্ঞে, স্ট্রাইক আর লক-আউটে যে মারা যাচ্ছি, পূর্ব্ববঙ্গ থেকে একপাল গুষ্টি কুটুম্ব ঘাড়ে চেপেছে—তাদের মুখেও দুটি অন্ন দিতে হয়।···নেহাৎ চলে না বলেই—

ভদ্রলোক ॥ আমার ওপর ভর করেছ। কিন্তু কলকাতা শহরে এত লোক থাকতে আমার ওপর নেক নজর কেন বাবা ? বিয়ে থা করিনি—একা থাকি—আজ কলকাতা—কাল দিল্লী—রোজগারের ধান্ধায় ঘুরছি—আমার ঘরটি বেছে নিলে কেন ?

লোকটি ॥ আজ্ঞে দারোয়ানের কাছে খবর নিয়ে জেনেছিলাম—মাসের মধ্যে বিশ দিনই আপনি স্যার বাইরে থাকেন। এঘর খালি পড়ে থাকে—তাই।

ভদ্রলোক ॥ হুঁ।···কিন্তু আমি একা লোক। স্ত্রী নেই যে সোনাদানা থাকবে। টাকাকড়ি যদিও বা থাকে, ব্যাঙ্কেই আছে। কি আশায় তুমি এমন দুঃসাহস—

লোকটি ॥ শালা দারোয়ান গল্প করে স্যার, ব্যাঙ্কে আপনি টাকা রাখেন না। শালা বলে আপনার সব চোরাকারবার। ঐ শালা আমায় ফাঁসিয়েছে স্যার। আমায় এবারটির মতো মাপ করুন—জেলে দিলে দশ দশটা মুখ—অনাহারে মারা যাবে।

ভদ্রলোক ॥ তোমার কথা শুনে কষ্ট হচ্ছে। যাও—এবারকার মতো তোমায় মাপ করলাম। কিন্তু খবরদার এ সব পথে আর এসো না—দাঁড়াও। এই দশটা টাকা নিয়ে যাও। তোমার কথা শুনে সত্যি বড় কষ্ট হচ্ছে। খাবার কষ্ট—বড় কষ্ট। যাও—না না পায়ের ধুলো নিতে হবে না। না না, এদিক দিয়ে গেলে কারো না কারো কাছে তুমি ধরা পড়বে। তুমি যেমন এসেছিল—তেমনি নেমে যাও।

[লোকটি বাতায়ন পথে নেমে গেল। ভদ্রলোক বাতায়নটি বন্ধ করে দিলেন। হাতঘড়িটি দেখলেন। তারপর একগোছা চাবি বের করে কয়েকটা ট্রাঙ্ক ও আলমারী খুলে কিছু টাকাকড়ি এবং মূল্যবান জিনিস একটা এটাচিকেসে ভরলেন। পকেটেও কিছু

বাইরে কার পদশব্দ পাওয়া গেল। ভদ্রলোক বাতিটি 'সুইচ অফ্' করে দিলেন। ক্ষণপর ল্যাচ-কি-যোগে বাহির থেকে কে একজন ঘরে এলেন—এবং তিনি আবার বাতি জ্বাললেন। নবাগত দেখলেন জিনিসপত্র সব ছড়ানো। স্পষ্ট বুঝলেন—ঘরে কোন একটা কাণ্ড ঘটেছে। তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন—এমন সময় বাথরুম থেকে প্রথমোক্ত ভদ্রলোক সপ্রতিভভাবে বেরিয়ে এলেন।]

নবাগত ।। আরে! একি! রণেন যে!

ভদ্রলোক (রণেন) ।। আর বল কেন! পেটের দায়ে। কিন্তু তোমার তো আজ রাতে ফেরবার কথা ছিল না বীরেন ?

বীরেন ।। তা ছিল না বটে। কিন্তু আমার ঘরে তুমি এত রাতে ঢুকলে কি করে—আর এসব কি ব্যাপার ?

রণেন ।। এক কথায় বলেছি তো, পেটের দায়! চোখের ওপর দেখছিলাম ইউনিভার্সিটির দরজা না মাড়িয়েও চোরাবাজারে তুমি অঢেল টাকা কামাই করছ—আর আমি বি. এ.—এম. এ. পাশ করেও সাংসারিক পরীক্ষায় ফেল! এ বাজারে দেড়শো টাকা মাইনেতে বাড়ীশুদ্ধ লোক আধপেটা খেয়ে মরছি। তাই—

বীরেন ।। দ্যাখ রণেন! তুমি আমার ছোট বেলার বন্ধু, তাই এখনো তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার অবকাশ পাচ্ছ। কিন্তু চোরাবাজারের সঙ্গে আমায় তুমি জড়াবে আর আমি তোমায় ক্ষমা করব—এ আশা তুমি করো না। টাকা রোজগার করা মানেই চোরাবাজার নয়।

রণেন ।। টাকা রোজগার করা মানেই যে চোরাবাজার নয় তা জানি। কিন্তু তোমার রোজগার যে চোরাবাজারে, তার দলিলপত্র আমি আজ এখানেই কিছু পেয়েছি কিনা। এই ধরো বুলাকিদাসের সঙ্গে তোমার কারবারটা।

[রণেন পকেটে হাত দিয়ে দলিলটা বের করতে গিয়ে কাগজপত্রের সঙ্গে রিভলভারটা বেরিয়ে এল। সে রিভলভারটা সামনে রেখে- একটা টাইপ করা চিঠি বীরেনের সামনে ধরল।]

রণেন ।। এই যে চুক্তিটা, এটা কি ধর্মবাজারের চুক্তি ?

বীরেন ।। তুমি আমার কাগজপত্রই শুধু চুরি করনি, রিভলভারটাও—

রণেন ।। হ্যাঁ ভাই। তাই এতক্ষণও তুমি আমার ওপর বাঘের মতো লাফিয়ে পড়নি। সে যাক। আমি এখন কি করবো শোন। আমি তোমার টাকাপয়সা কিচ্ছু ছোঁব না। টাকাপয়সা তোমার যেমন ছিল তেমনি রইল। এই যে। ও, হ্যাঁ দশটা টাকা আমি আমার আর এক ভাইকে দেবার জন্য নিয়েছি এই যা। কিন্তু তোমার এই কাগজপত্রগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি। এগুলো এনফোর্সমেণ্টে দাখিল করে ওদের ওখানে একটা ভাল চাকরি পাব—এই আশায়। দেশেরও কাজ হবে—পরিবার শুদ্ধ আমিও দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বাঁচব।

বীরেন ॥ টাকা তোমার যা লাগে আমি—আমি দিচ্ছি রণেন।

রণেন ॥ না ভাই মাপ করো। তোমাদের মতো এইসব হঠাৎ বড়লোকদের আমি একেবারেই সইতে পারিনা। তোমাদের মোটরগাড়ী কাদা ছিটিয়ে বহুদিন আমার কাপড় নোংরা করেছে। তোমাদের—যাদের কোন গুণ নেই—কোন বিদ্যা নেই—শুধু দেশের সর্বনাশ করে টাকা রোজগারের ফন্দী ফিকিরে আছো, আর দুদিন বাদে—লোকে তোমাদের গুলী করে মারবে। এই সৎসাহসটা—এই দায়িত্ববোধটা আজো আমাদের হয়নি বলেই, আজ তুমি বেঁচে গেলে। আসি ভাই। মনে কিছু করো না।

[রণেন চলে গেল। বীরেন চেঁচামিচি করতে গিয়ে, নিজের বিপদ হবে বুঝে হঠাৎ থেমে গেল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।]

পরাগ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫১

রফা

প্রাণধন বসুর বসিবার ঘর। প্রাণধনের বিবাহযোগ্যা অরক্ষণীয়া কন্যা সুনয়নীকে আজ পাত্রপক্ষ দেখিতে আসিতেছেন। প্রাণধনের পুত্র কৃষ্ণধন ছুটিয়া আসিল। প্রাণধন হুঁকা টানিতেছিল।

কৃষ্ণধন ॥ (স্বগতঃ) হাড় কেপ্পণ বুড়ো—এইবার মরো! (প্রকাশ্যে) এতো ক'রে আমি তোমায় বললাম বাবা—দশটা টাকা দাও, আমি দিনে দিনে গিয়ে ওদের ট্যাক্সি করে নিয়ে আসি—তা দিলেনা, এখন বোঝো ঠেলা, পাত্রপক্ষ আসতে আসতে, সেই রাত্তিরই হল।

প্রাণধন ॥ (স্বগতঃ) ব্যাটাচ্ছেলে তোমায় আমি চিনিনা—খালি মারবার ফন্দি! (প্রকাশ্যে) রাত হোল তো কি হোল?

কৃষ্ণধন ॥ (স্বগতঃ) বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো। (প্রকাশ্যে) মেয়ে যে তোমার রাতকানা সে খেয়াল আছে? কানা কড়ি দিয়ে কেমন করে কানা মেয়ে পার করো আমি দেখব! ঐ ওরা আসছে—

প্রাণধন ॥ (স্বগতঃ) বেটা তো নয়, ঘর শত্রু বিভীষণ! (প্রকাশ্যে) শোন বাবা, মেয়ে আমার, কিন্তু তোরও তো বোন। তার ওপর মেয়েটার মা

নেই। যেমন করে হোক পার করতেই হবে বাবা। ঐ ওদের পায়ের শব্দ পাচ্ছি। তুই খুকীকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে আয়। আর বুঝলি, চা-জলখাবারটা অল্পের মধ্যেই একটু জাঁকিয়ে মানে—মাসের শেষ কিনা!

কৃষ্ণধন॥ (স্বগতঃ) মাস পয়লাতেও তুমি বলে থাকো মাসের শেষ। জীবনটা তোমার কবে শেষ হবে বাবা। (প্রকাশ্যে) নিশ্চয়—নিশ্চয়—যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি। ঐ ওঁরা এলেন, তুমি দ্যাখো!

[কৃষ্ণধনের অন্দরে প্রস্থান। পাত্রপক্ষীয় তিনজনের প্রবেশ। পাত্র স্বয়ং চন্দ্রবদন চৌধুরী—তাহার মাতুল রাখোহরি—এবং পাত্রের বন্ধু পদ্মলোচন।]

প্রাণধন॥ (স্বগতঃ) ওরে বাবা এ যে একেবারে ত্রিশূল! (প্রকাশ্যে) আসুন, আসুন। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য রাখোহরিবাবু।

রাখোহরি॥ (স্বগতঃ) অতি ভক্তি চোবের লক্ষণ। (প্রকাশ্যে) আমাদেরই কি কম সৌভাগ্য প্রাণধনবাবু! কুটুম্বিতা হওয়া না হওয়া সে হল গিয়ে হরির ইচ্ছা! কিন্তু আপনার মতন মহাজনের সঙ্গে পরিচয় হল, একি কম কথা।

প্রাণধন॥ (স্বগতঃ) উক্তির বহরটা বড্ড বেশি—যেন চোরের ওপর বাটপারি! (প্রকাশ্যে) আমারও সেই কথা রাখোহরিবাবু। আলাপ-পরিচয়টাই কি কম সৌভাগ্য! কিন্তু এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না তো!

রাখোহরি॥ (স্বগতঃ) শালা সব বুঝেও ন্যাকা সাজছে। (প্রকাশ্যে) এই যা! তাই তো! এ হল গিয়ে পদ্মলোচন—আর এ হল গিয়ে চন্দ্রবদন—মাসতুতো ভাই দুটি—দু-জনেই আমার ভাগ্নে।

প্রাণধন॥ (স্বগতঃ) শালারা জানে নামের ওপর কোন ট্যাক্স নেই! (প্রকাশ্যে) বেশ, বেশ! কিন্তু মূলধন কোনটি?

রাখোহরি॥ (স্বগতঃ) মূলধন সঙ্গেই এনেছি। কিন্তু সুদের হার চড়া হলে চক্ষু চড়ক গাছ যেন না হয় বাবা প্রাণধন! (প্রকাশ্যে) এই তো চন্দ্রবদন—(চন্দ্রবদনকে) প্রণাম করোনি? সে কি বাবা! প্রণাম করো। বুঝলেন প্রাণধনবাবু—বাবাজী বড্ড লাজুক। তা' আমি বলি, ফাজিল ফক্কড়ের যুগে বিনয়ী, নম্র, মুখচোরা ছেলেই ভালো! কি বলেন মশাই?

প্রাণধন॥ (স্বগতঃ) ব্যাটাচ্ছেলে তবে বোবা কি! তবেই সেরেছে! (প্রকাশ্যে) তা' তো বটেই! তা' তো বটেই! তবে কি না চাঁদমুখে দুচারটি কথা না শুনলে প্রাণ তো জুড়োবে না ভায়া। চন্দ্রবদন! শরীর গতিক ভালো তো বাবা?

[চন্দ্রবদন বিনীতভাবে ঘাড় নাড়িয়া ভালো আছে জানাইল]

প্রাণধন ॥ (স্বগতঃ) ব্যাটাচ্ছেলে নির্ঘাত বোবা। (প্রকাশ্যে) এ্যা, শরীর ভালো নেই ?

পদ্মলোচন ॥ (স্বগতঃ) মতলব ভালো নয় দেখছি! (প্রাণধনকে) দেখুন—জীবনধনবাবু—

প্রাণধন ॥ (স্বগতঃ) ভুল নামে আমাকে ডেকে, আমাকে ডিরেল করতে চাইছে, তা' ভবী ভুলবে না। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, বলুন—

পদ্মলোচন ॥ (স্বগতঃ) ওরে বাবা! এ-শালা দেখ্‌ছি আমাদের চেয়েও সেয়ানা। (প্রকাশ্যে) আপনি জীবনধন, না প্রাণধন ?

প্রাণধন ॥ (স্বগতঃ) পুচকে ছোঁড়া, আমার সঙ্গে লাগ্‌তে এসেছো। (প্রকাশ্যে) ও বাবা, যে প্রাণধন সে-ই জীবনধন। (চন্দ্রবদনকে) আচ্ছা বাবা বংশীবদন, এমন সুন্দর নামটি তোমার কে রেখেছে! বাবা ? না, না, লজ্জা কি ? বলো না বাবা।

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগতঃ) এ-শালা শ্বশুর হ'লে বিপদ দেখছি। (প্রকাশ্যে) আ···প···নি মশা···ই জী··বনধন হ'লে আ···মিও মশাই বং··বং···শীবদন।

প্রাণধন ॥ (স্বগতঃ) এই রে। ব্যাটাচ্ছেলে তোত্‌লা। যাক, তবু মন্দের ভালো—বোবা তো নয়। (প্রকাশ্যে) তা' খুব জ্ঞানের কথা বলেছো বাবাজী—বেশ বলেছো—বেশ বলেছো। এসো—এসো বাবা কৃষ্ণধন, নিয়ে এসো—বিদুরের খুঁদ কুঁড়ো নিয়ে এসো।

[রাখোহরি এবং পদ্মলোচন পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া খুশির ভাবই দেখাইল। কৃষ্ণধন ও পরিচারিকা জলখাবার ও চা লইয়া প্রবেশ করিল।]

রাখোহরি ॥ (স্বগতঃ) ওরে শালা, চার পয়সার তেলেভাজা ফুলুরি হ'লো গিয়ে তোমার বিদুরের খুঁদ কুঁড়ো। (প্রকাশ্যে) ওরে বাবা। এ যে একেবারে নারায়ণ সেবার আয়োজন করেছেন। কিন্তু জানেন না তো—আমার আবার কলিক্—মা নাম রেখেছিলেন রাখোহরি—সেই হরি-ই কোনোমতে ধ'রে রেখেছেন—তাই এখনো আছি। আমি ঐ একটু চা-ই খাবো—আর কিছু আমার চলবে না।

পদ্মলোচন ॥ (স্বগতঃ) শালা দেখছি একেবারে হাড় কেপ্পণ। যা দিয়েছে—তা'ও যদি না খাই—দোকানে ফেরত দেবে। (খেতে খেতে প্রকাশ্যে) চমৎকার। চমৎকার। এমন ফুলুরি জীবনে খাই নি—রসগোল্লা লাগে কোথায়।

প্রাণধন ॥ (স্বগতঃ) ওরে বাবা। গো-গ্রাসে গিলছে যে। আবার চেয়ে না বসে। (প্রকাশ্যে) কৃষ্ণধন হাঁ করে দেখ্‌ছিস কি ? শীগ্‌গির খুকীকে নিয়ে আয়—অমৃত যোগটা চ'লে যাচ্ছে যে।

[কৃষ্ণধনের অন্দরে প্রস্থান]

ফুলুরির সব ভালা—খারাপটা শুধু এই—সব পেটে সয় না।

পদ্মলোচন ॥ (স্বগতঃ) ওরে শালা, বাগ্‌ড়া দিচ্ছে ! (প্রকাশ্যে) আমার খুব সয় । বরং আর কিছু তেমন সয় না । আমার ভাইটিরও অনেকটা তা-ই । হ্যাঁ, প্লেট্‌ও তো খালি হ'য়ে এলো । তা' মামা, আজকালকার দিনে এমন ক'রে তুমি একপ্লেট খাবার নষ্ট ক'রছো—খাদ্যমন্ত্রী অপ্রফুল্ল হবেন, চাই কি চাকরি নিয়ে টানাটানি হ'তে পারে—দরকার নেই বাবা—(মামার প্লেট্‌ টানিয়া লইয়া) নে ভাই, দুজনে সাবাড় ক'রে দিই । স্বাধীনতার পর খাদ্য অপচয় করা আর চলে না ।

প্রাণধন ॥ (স্বগতঃ) বেটারা রাক্ষস দেখ্‌ছি ! এ ঘরে মেয়ে দেবো ! (প্রকাশ্যে) তোমরা বাবা সাক্ষাৎ নারায়ণ—তাই বাবা এই গরীব বিদুরের খুঁদ কুঁড়ো চেটেপুটে খেলে !

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগতঃ) শালা এ-দিকে হাড় কেপ্পণ,কিন্তু কথায় দাতাকর্ণ ! (প্রকাশ্যে) মামা এতো খেয়ে পেট গরম হ'য়ে, আমার মাথাটা গ···গরম হয়ে উঠেছে—আ···র কতক্ষণ ব'···সৃবে···ব···লো ?

রাখোহরি ॥ (স্বগতঃ) এই সেরেছে--রেগে গেছে । তোৎলামি বাড়লে বরপণটা কমে যাবে এ কথাটা বাবাজীকে আমি কেমন ক'রে বোঝাই ! (প্রকাশ্যে) বুঝলে বাবাজী, সবুরে মেওয়া ফলে—জানো তো ?···ঐ তো এসে গেছে '

[কৃষ্ণধন সুনয়নীকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিল]

প্রাণধন ॥ (স্বগতঃ) রাতকানা মেয়ে, শালারা এলো রাতে—এখন শেষ রক্ষা হ'লে হয়- (প্রকাশ্যে) নমস্কার কর খুকী—বোস ।

[সুনয়নী তাহা করিল]

রাখোহরি ॥ (স্বগতঃ) বিশ বছরের ধাড়ি হ'লো কিনা খুকী ! (প্রকাশ্যে) খুকীমা, এদিকে তাকাও । তোমার নাম ?

সুনয়নী ॥ (স্বগতঃ) বেটারা টের পেল নাকি ? (প্রকাশ্যে) আমার নাম শ্রীমতী সুনয়নী দেবী ।

পদ্মলোচন ॥ (স্বগতঃ) আমি একটু টেরা ব'লে বাপ-মা নাম রেখেছিলেন পদ্মলোচন ! বেড়াল চোখা মেয়ে—ইনি হ'লেন গিয়ে সুনয়নী ! (প্রকাশ্যে) নাম সার্থক হ'য়েছে । কি সুন্দর চোখ দুটি !

রাখোহরি ॥ (স্বগতঃ) কেমন ডাব্‌ ড্যাব্‌ ক'রে তাকাচ্ছে—রাতকানা নয় তো ! মরুক গে । আসল কথা হ'লো গিয়ে বরপণের অঙ্কটা—সে-টা মোটা হ'লে এক্সট্রা লাইট ফিট ক'রে ভোঁতা চোখও চোখা ক'রে দেওয়া যাবে । (প্রকাশ্যে) না, না—বেশ মেয়ে ! কেমন দুগ্যো পতিমা—দুগ্যো পতিমা ভাব । তা' প্রাণধনবাবু, এবার ও-ঘরটায় চলুন—আমাদের সব লরই প্রাণের কথাবার্তাটা একটু হ'ক ।

প্রাণধন ॥ (স্বগতঃ) এইরে ! শালারা এবার আমাকে টাইট্‌ দিতে

নিয়ে চ'ললো! সুবিধে হবে না। মেয়ে যে রাতকানা তা এখনো ধরা পড়েনি—ছেলে যে তোতলা আমি ধ'রে ফেলেছি। (প্রকাশ্যে) বটেই তো—বটেই তো। চলো বাবা কৃষ্ণধন—এ'দের নিয়ে ও-ঘরে চলো।

[পাত্র ও পাত্রীকে এই ঘরে রাখিয়া অন্য সকলের পার্শ্ববর্তী ঘরে প্রস্থান]

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগতঃ) ও বাবা! আমার দিকে না তাকিয়ে এ-দিক ওদিক তাকাচ্ছে যে। (প্রকাশ্যে) ও-দিকে কী দেখছো সুনয়নী?

সুনয়নী ॥ (স্বগতঃ) এই রে। ধরে ফেল্‌লে বুঝি। (প্রকাশ্যে) কি আবার দেখছি! কিছুই দেখছি না।

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগতঃ) তবে কি চোখের মাথাটি খেয়েছো! (প্রকাশ্যে) আ হা—তুমি তো রাতকানা নও।

সুনয়নী ॥ (স্বগতঃ) জানি ধ'রে ফেলবে! বাবাকে এতো ক'রে বলি, আমার বিয়ের চেষ্টা ক'রো না—তা শুনবে না। কিন্তু এ অপমান আর আমি সইতে পারবো না। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ মশাই, আমি একটু রাতকানা।

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগতঃ) এই রাতকানা মেয়ে নিয়ে আমাকে ঘর ক'রতে হবে সারা জীবন! (প্রকাশ্যে) তুমি রাত...কানা তো···তো···মার বা·· বা আ...গে ব...লেননি কেন?

সুনয়নী ॥ (স্বগতঃ) নাম তো শুনেছিলাম চন্দ্রবদন—সে বদনের বুলি তো দেখছি, তাতো—তাতো, (প্রকাশ্যে) আপনি তোতলা এ-কথা আপনার মামা আগে বলেন নি কেন?

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগতঃ) এই সেরেছে! ধ'রে ফেলেছে। (প্রকাশ্যে) যাক, যাক। তা'তে ক্ষতি কি হ'য়েছে? তুমিও ধ'রোনা—আমিও ধ'রবো না। শুধু একটি কথা। বিয়ের আসরে আমার গলায় মালা দিতে ...গি...গিয়ে, দেখো যেন আর কারুর গ...গলায় মালা দিও না। কি বলো সু...সু···নয়নী?

সুনয়নী ॥ (স্বগতঃ) পথে এসো। (প্রকাশ্যে) নিশ্চয়ই। তবে আপনি একটু ম্যানেজ ক'রে নেবেন।

চন্দ্রবদন ॥ (স্বগতঃ) পথে এসো। (প্রকাশ্যে) তা' ম্যানেজ একটু ক'রে নি...নিতে হবে বৈকি। নইলে, সা...সা···রাজীবন কি আমরা আইবুড়ো আইবুড়ী থাকবো? পরীক্ষা তু..মিও কম দাওনি—আমিও কম দিইনি। আর কেন। এই যে আমি এ...খানে—একটু কাছে এসো। জানলে, রেগে গেলেই আমি তোতো করি! দোহাই লক্ষ্মীটি, আমার মাথাটা ঠাণ্ডা রেখো। রাতের ভাবনা?—ও আমি ম্যা···ম্যা...নেজ ক'রে নেবো।

———

শারদীয়, গল্প ভারতী, ১৩৭৪

ফকিরের পাথর

একাংক নাট্যগুচ্ছ

ফকিরের পাথর

একাংক নাট্যগুচ্ছ

শ্রীমতী কল্যাণী রায়

শ্রীমান চন্দন রায়কে

স্নেহাশিস্

আশীর্বাদক

মন্মথ রায়

১লা জুন ১৯৫৯

ফকিরের পাথর

চৈত্র-সংক্রান্তি। অন্ধচাষী সদাশিব তাহার কুটীর প্রাঙ্গণের এক কোণে যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান। গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা বসিয়াছে। গাজনের বাদ্য ভাসিয়া আসিতেছে। সদাশিব উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতেছে। সদাশিবের স্ত্রী গঙ্গা ঘর হইতে কুলার উপর রক্ষিত একটি বিশালকায় মসৃণ নুড়ি আনিয়া উঠানের ঠিক কেন্দ্রস্থলে রাখিল এবং পুনরায় ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। প্রাঙ্গণস্থিত তুলসী-মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া সদাশিবের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ কলাবতী শঙ্খধ্বনি করিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। শঙ্খধ্বনি শোনা মাত্র সদাশিব যষ্টির সাহায্যে ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া দুর্ভাগ্যবশত পাথরটিতে হোঁচট খাইয়া ভূপতিত হইল।

কলাবতী ॥ শীগগীর এসো মা, শীগগির এসো।

গঙ্গা ॥ (ঘর হইতে) কি হল ?

কলাবতী ॥ ফকিরের পাথরে হোঁচট খেয়ে বাবা পড়ে গেছেন !

গঙ্গা ॥ সে কি !

[গঙ্গা স্বামী সদাশিবের নিকট ছুটিয়া আসিল এবং কলাবতীর সংযোগে সদাশিবকে তুলিয়া আনিয়া বারান্দায় বসাইল।]

গঙ্গা ॥ ধন্যি লোক, ভাঙবে তবু মচকাবেনা। চোখে দেখেনা তবু বলবে দেখি

কলাবতী। চোট পেলেও মুখ বুজে থাকবেন।

সদাশিব। যতটা চোটপাট তোমরা করছ ততোটা চোট আমার লাগেনি।

কলাবতী। বাবার নাম সদাশিব। শিবের মতোই হজম করেন সব বিষ।

সদাশিব ॥ তোমার শাশুড়ীর নাম গঙ্গা—পরশ পেলেই জুড়িয়ে যায় সব জ্বালা---বুঝলে মা কলাবতী।

গঙ্গা ॥ চোখে দেখেনা—তবু বলে দেখি। এ হয়েছে আমার এক জ্বালা।

সদাশিব ॥ যাদের চোখ আছে তারাও কিছু কম হোচট খাচ্ছেনা গঙ্গামণি।

গঙ্গা ॥ নাও থামো। কানা না হয়ে বোবা হলে আমি বাঁচতাম। চৈত সংক্রান্তির পয়মন্ত দিনে ফকিরের পাথর খেল তোমার লাথি। সর্বনাশ না হলে বাঁচি।

কলাবতী ॥ তুমি কি বলছ মা ?

গঙ্গা ॥ বলবো না। কত বড় একটা ঘাট হলো বল দেখি ? ফকিরের পাথরটা তুলে নিয়ে যা দেখি পুণ্যি পুকুরে—চুবিয়ে আন। দেখ তো তাতে যদি শোধন হয়, অশুদ্ধটা শুদ্ধ হয়।

[কুলাসমেত পাথরটি লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল কলাবতী]

সদাশিব ॥ গঙ্গা কিনা---রাজ্যের যত পাপ জমা হচ্ছে বুকে। পরকে শোধন করেন, কিন্তু নিজে অমন অশুচি।

গঙ্গা। আমায় বলছ।

সদাশিব।। তোমায় না তো কাকে? নিজে অশুচি বলে সবাইকে মনে কর অশুচি। তাই হাতে নিয়েছো ঝাঁট,—আর গোবর জলের ঘটি। এই নিয়েই আছো।

গঙ্গা। আমি অশুচি!

সদাশিব। হ্যাঁ, যখন চোখ ছিল, তখন দেখিনি। এখন চোখ নেই বলে দেখতে পাচ্ছি।

গঙ্গা।। কি দেখছ? বল, কি দেখছ, নইলে আজ তোমার রক্ষে নেই।

সদাশিব।। মুখে বলতে বাধে। চোখ বুজে ভাব।

গঙ্গা।। (হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল) তবে কি আজও তুমি আমায় ক্ষমা করোনি!

সদাশিব।। আমি ক্ষমা করেছি। ভাগাড়ের সেই পাঁক থেকে তোমায় তুলে এনেছি ঘরে। কিন্তু, তুমি কেন তোমায় ক্ষমা করতে পারছ না গঙ্গামণি? যখন আমি তোমায় মাথায় নিয়েছি—ছেলেরা তোমায় মাথায় রেখেছে। ভুলে যাও, যা কোন কালে হয়ে গেছে—এগিয়ে চল শুদ্ধ মনে। সামনে—

গঙ্গা। শুদ্ধ হতেই তো চাই—কিন্তু পারছি কই? পারছি কই?

[কুলোতে ফকিরের পাথর লইয়া কলাবতী আসিয়া দাঁড়াইল।]

কলাবতী।। এই যে মা, পুন্যিপুকুরে চুবিয়ে আনলাম ফকিরের পাথর।

গঙ্গা।। জায়গায় রাখ। আমি পঞ্চগব্য তৈরী করে আনছি।

[গঙ্গা ভিতরে চলিয়া গেল। কলাবতী পাথরটি প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া শ্বশুর সদাশিবের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

কলাবতী।। পাথর নিয়েই আজ দিনটা গেল বাবা। চোত সংক্রান্তির এতবড় একটা মেলা হচ্ছে গাঁয়ে। কেউ নিয়ে গেল না আমায়! আজ দিনটাই কেমন পাথর হয়ে গেল বাবা। কোথা কেমন করে এ পাথর এলো ঘরে জানিও না ছাই।

সদাশিব। তোর মা তোকে বলেনি কলাবতী?

কলাবতী।। না বাবা!

সদাশিব।। আমার বড় ব্যাটা তো গোবর গণেশ। তাই নিজেরই মনে আছে কিনা কে জানে। কিন্তু ছোট ব্যাটা? তোমার পেয়ারের দেওর কার্তিক ঠাকুর? চুপি চুপি এত কথা তোকে বলে। এটা গেল চেপে?

কলাবতী।। হ্যাঁ বাবা, চেপেই গেছে। আজ আমি তাকে দেখে নেব! জেনেও নেব সেই সঙ্গে। তুমি ঘরে যাবেনা এখন? শোবার সময় হয়েছে তো বাবা।

সদাশিব।। কার্তিক ঠাকুর এলো বুঝি?

[দেখা গেল সত্যিই কার্তিক প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার চোখে ইশারা।]

চল, আমাকে বিছানায় নিয়ে চল।

[ভিতরে যাইবার অব্যবহিত পূর্বে হঠাৎ দাড়াইয়া গেল এবং কলাবতীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল।]

পায়ের শব্দ আমি চিনি। (চীৎকার করিয়া উঠিল) এই ব্যাটা কার্তিক, চোরের মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সামনে আয়।

[কার্তিক ভীতপদে সামনে আসিয়া দাড়াইল]

চোত সংক্রান্তির মেলায় গিয়েছিলি?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

সদাশিব ॥ ভেঁপু কিনেছিস?

[কার্তিক ভেঁপু বাজাইল। সদাশিব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

আমি দেখেছি—আমি দেখেছি। নাগরদোলা ঘুরছে—মেঠাই মণ্ডা খাচ্ছে লোকেরা—শাঁখা-সিঁদুর শাড়ী কিনছে মেয়েরা। তোরা দু'ভাই ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে ঘুরে তাই দেখছিলি—আর আমি দেখছিলাম ট্যাঁক তোদের ফাঁকা। ঠিক নয়?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ বাবা।

সদাশিব ॥ শেষে চুরি করতে ইচ্ছা হলো তোর? হলো তো?

কার্তিক ॥ (চীৎকার করিয়া) বাবা!

সদাশিব ॥ না-না চুরি তুই করিসনি আমি জানি। কিন্তু চুরির ইচ্ছাটাতেই পাপ হয়েছে তোর। আজ রাতে চাঁদ উঠতেই ফকিরের পাথর ঘিরে তোরা সব বসবি! মনে মনে যে বর চাইবি—সকলের চাওয়া যদি এক হয়—বরটা মিলবে। কিন্তু তার আগে ঐ পুন্যিপুকুরে ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে আয় তুই।

[সদাশিব ঘরে ঢুকিবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইল। কলাবতী তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। কার্তিক কিন্তু ডুব দিতে গেল না—দাওয়ায় বসিয়া তাল পাতার বাঁশই বাজাইতে লাগিল। এমন সময় আসিল গণেশ। তাহার হাতে মেলা হইতে সংগৃহীত একটি কাস্তে। গণেশ আসিয়াই সোজা চলিয়া গেল ফণিমনসার গাছটির কাছে।

গণেশ ॥ এই কার্তিক, দেখছিস? (কাস্তেটি দেখাইল)

কার্তিক ॥ কাস্তে? তুই কিনেছিস দাদা?

গণেশ ॥ কেনবার পয়সা যদি থাকত ভাই—তবে কাস্তে কিনতাম না কিনতাম এক লহোর পুঁতির মালা।

কার্তিক ॥ কেন, চেয়েছে বুঝি?

গণেশ ॥ সেটা তোমাকে আমার বলবার কথা নয়। যেটা তোমার শোনাবার কথা—শোনো। জমির মালিক আমার মনিব খুশি আমার কাজে। কিনে দিল এই কাস্তে। কিন্তু শোনো মালিকের ফসল কাটবার আগে আমি কাটব তোমার এই ফণিমনসার কাঁটাগাছ।

কার্তিক ॥ (চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গেল) দাদা !

গণেশ ॥ কেন কাটব না রে কার্তিক। পাঁচকাঠা জমিতে বাড়ী আমার। মাটির শোকে মরি। নিজের এক রত্তি জমি পেলে প্রাণভরে চাষ করি। এই জঙ্গাল কেটে কেন লাগাবনা এখানে দুটো ধনে পাতার গাছ—লঙ্কার চারা ?

কার্তিক ॥ জঙ্গাল এটাকে তুমি কি বলো দাদা, কেমন একটা শোভা ? কেমন ফুল ফুটবে এই ফণি মনসা গাছে ?

গণেশ ॥ ফুটুক ফুল, তবু আমি কাটব।

কার্তিক ॥ ফুল যদি কাটবে তবে তোমার বৌটাকে আগে কাটো।

গণেশ ॥ 'এটা তুই বড় জবর কথা বলেছিসরে ভাই কার্তিক। যা: তোর ফণিমনসা গেল বেঁচে। (কাস্তেটা তার সামনে ফেলিয়া দিয়া) চালায় গুঁজে রাখ। আমি চললাম পুন্যিপুকুরে ডুব দিতে। আজ চোত্ সংক্রান্তির রাতে চাঁদ উঠতেই ফকিরের পাথর ঘিরে বসবে আমাদের আসর। চাইবো আমরা বর। খেয়াল আছে তোর ?

কার্তিক ॥ খেয়াল আছে। কেন থাকবেনা দাদা ? কিন্তু হাজার মুণির হাজার মত। তাই সাতমণ তেলও পুড়বেনা—রাধাও নাচবেনা।

গণেশ ॥ কেন কেন ! এটা তুই কি বলছিস কার্তিক ?

কার্তিক ॥ কেন বলব না। এমনি আরো দু'টো বছর তো দেখলাম। বাড়িটাতে ছিলাম আমরা চারটা লোক। বুড়োটা বুড়িটা তুই আর আমি। পাথরে হাত দিয়ে একটা মন একটা প্রাণ হয়ে চাইতে হবে একটা জিনিষ। গেল দু'বার তা হলো না। এবার তো আমরা পাঁচটা লোক। বোঝার উপর শাকের আঁটি ঐ বউটা।

গণেশ ॥ তা' বটে। কারো মনের সঙ্গে কারো মনের মিল নাইরে কার্তিক। হাড়ে হাড়ে সেটা বুঝছি। (হঠাৎ চিৎকার করিয়া) কিন্তু মনের মিল হতেই হবে। আমি পুকুরে ডুব দিয়ে আসি। তারপর দেখবি এখন। চাওয়াটা এক না হলে আজ আমি কাউকে রেহাই দেব না—ঠেঙাব।

[গণেশ ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

কার্তিক ॥ (ভেঁপুবাস্কের ফাঁকে ফাঁকে)

ফণীমনসা—ফণীমনসা।
মনে আমার কত আশা।
তোমার পাতায় কাঁটা আছে,
বুকে আমার বিঁধে গেছে।
এই আমার ভালবাসা।
ফণীমনসা ! ফণীমনসা !

[কলাবতী অন্তরালেই দাঁড়াইয়া দুই ভাইয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল। এবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

কলাবতী ॥ এই! ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন? জান না বাবা ঘুমোচ্ছেন?

কার্তিক ॥ আরে সে তো দিনরাতই ঘুমোচ্ছেন। চোখ না থাকার সুবিধাই ঐ।

কলাবতী। না, না, চেঁচিওনা। চোখ নেই বলে এখন আবার কানে শোনেন বেশী ফিস্ ফিস্ করেও কিছু বললে—জানবে উনি সব শুনছেন। বিপদ দেখ! কব্‌রেজ দেখাও না কেন?

কার্তিক ॥ কব্‌রেজ বলে এ রোগের ওষুধ নেই।

কলাবতী ॥ তবেই বিপদটা বোঝ! কিছু লুকোন থাকেনা ওর কাছে।

কার্তিক ॥ তেত্রিশ কোটি দেবতা আর একটি বেড়েছেন। তাতে কি হয়েছে! এই নাও তোমার পুঁতির মালা।

[মালা পরাইয়া দিল।]

কলাবতী ॥ (উজ্জ্বল হইয়া) এ্যাঁ! এনেছো! মেলা থেকে?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ। আমার জন্য এই ভেঁপু আর তোমার জন্য এই মালা।

কলাবতী ॥ দাম জুটলো কোত্থেকে?

কার্তিক ॥ না, না, চুরি করিনি। মহাজনের বাড়িতে মজুরী খাটার দরুন আগাম নিয়ে, আনলাম কিনে।

কলাবতী ॥ তোমার দাদাও কি এনেছে?

কার্তিক ॥ সে এনেছে কাস্তে। তোমাকে কাটতে।

কলাবতী ॥ আমাকে নয়—তোমাকে।

কার্তিক ॥ না, না, তোমাকে। তুমি ঐ ফণীমনসা যে!

কলাবতী ॥ হুঁ?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ। গাছটা না পায় জল—না পায় সার। কিন্তু তবু কেমন লক্ লক্ করে বেড়ে উঠছে। কত রূপ, কত রস ওর পাতায় পাতায়!

কলাবতী ॥ আর কাঁটা? ছুঁতে যেওনা হাতে বিঁধবে। দূর থেকেই দেখো।

[গঙ্গার প্রবেশ।]

গঙ্গা ॥ কার্তিক এসে গেছিস? গণেশ কই?

কার্তিক ॥ সে ডুবতে গেছে।

গঙ্গা ॥ তুই যাবিনা? বৌমা—তুমি তো বিকেলেই নেয়েছ। তুই যা কার্তিক। নোংরা থেকে ফকিরের পাথর ছোঁয়া চলবেনা!

[পাথরের সামনে যাইয়া করজোড়ে।]

শুদ্ধ থেকো বাবা শুদ্ধ থেকো। ফকিরের পাথর আমাদেরও শুদ্ধ রেখো তুই যা কার্তিক। ডুবটা দিয়ে আয়।

কার্তিক ।। তুমি আমাদের মা গঙ্গা। (তাঁহাকে ছুঁইয়া) তোমাকে ছুঁলেই তো সব শুদ্ধ। এখন কি খেতে দেবে দাও। শিবের গাজনে নেচে এলাম। ভারী ক্ষিদে পেয়েছে মা!

গঙ্গা। না, না, রাতে উপোস থেকে পাথর ছুঁতে হবে যে। কচি বৌটা সারাদিন উপোস করছে—আর তুই ক্ষিদেতে নেতিয়ে পড়ছিস কার্তিক!

কার্তিক ।। পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ আমার নেই মা। সে রয়েছে তোমার ঐ কচি বৌএর।

গঙ্গা ।। লাজই হোক আর অলাজই হোক, উপোস থাকতেই হবে আজ যতক্ষণ না চাঁদ উঠছে।

[গঙ্গা ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল।]

কলাবতী ।। আমার পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ একথাটা তুমি কি বললে?

কার্তিক ।। আমি ঠিকই বলেছি বৌ। পুঁতির মালাটা পরতে শখ তবু ঢেকে রেখেছ যে।

[গণেশের প্রবেশ]

গণেশ ।। এই কার্তিক যানা, একটা ডুব দিয়ে আয়।

কার্তিক ।। বুঝলে দাদা, লোকে তোমাকে গোবর গণেশ বলে—মিথ্যা বলে না। বাড়ীতে আমাদের মা গঙ্গা। তাকে ছুঁলেই সব শুদ্ধ। যাও, যাও, ভিজে কাপড়ে থেকো না। কাপড় ছেড়ে এসো।

গণেশ ।। তা যাচ্ছি। কিন্তু তুইও কোনখান থেকে একটু ঘুরে টুরে আয় দেখি। (কলাবতীকে) তার মানে তুমি একটু একলা থেকো বুঝলে। আমি আসছি।

[গণেশ ঘরের ভিতর চলিয়া গেল

কলাবতী ।। লোকটাকে আমার এত ভাল লাগে। সারাদিন অসুরের মত খাটছে—হয়রাণ হয় না একটু। আমাকে বলে—তোমার জন্য না পারি এমন কাজ নেই কলাবতী!

কার্তিক ।। তাইতো ভাবছি—আজ চোত সংক্রান্তির রাতে চাঁদ উঠতেই পাথর ছুঁয়ে ও হয়তো চেয়ে বসবে তোমার জন্যে এক লহর পুঁথির মালা। বিপদ হলো দেখছি। তুমি বৌ, ওটা লুকিয়ে রেখোনা, দেখিয়ে দিয়ো। ঐ যে আসছে··· চাঁদ উঠতে কত বাকি আমি দেখে আসছি।

[কার্তিক বাহিরে চলিয়া গেল। গণেশ ঘর হইতে আসিয়া দাড়াইল।]

গণেশ ।। এই বৌ শোন। পুঁতির মালাটা আমি আনতে পারিনি। তা তুই ভাবিসনে। আজ আমি চেয়ে নেব তোর জন্য।

কলাবতী ।। না, না, পুঁতির মালা পেয়ে গেছি। এই দেখ।

গনেশ ।। ও, কার্তিকটা দিয়েছে বুঝি?

কলাবতী ।। (উজ্জ্বল হইয়া) হ্যাঁ।

গণেশ ॥ বটে ?

কলাবতী ॥ হ্যাঁ।

গণেশ । হ্যাঁ! যাক। আমাকে বাঁচিয়েছে। আজ ফকিরের পাথরের কাছে তবে মামলাটা নয়—কিন্তু কী যে চাইব, তাওতো ভেবে পাইনা ছাই।

[ছুটিয়া আসিল কার্তিক।]

কার্তিক । আকাশে আলো ফুটছে, চাঁদ উঠি উঠি করছে। মা, বাবা তোমরা এসো। দাদা, বৌদি তোমরা তৈরী হও---

[ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল গঙ্গা।]

গঙ্গা ॥ বৌমা, সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকোনা। পাথরের সামনে ধূপ-ধুনো দাও। গোবরজলের ছিটে দাও। আমার ঝ্যাঁটা কোথায়? উঠোনটা ঝাঁট দিতে হয়।

[কলাবতী ছুটিয়া গিয়া একগাছা ঝাঁটা গঙ্গার হাতে দিল এবং ধূপধুনো আনিতে ঘরে চলিয়া গেল।]

গঙ্গা ॥ ঝাঁটার ছিরি দেখ। একেবারে ক্ষয়ে গেছে। কত বলি তোদের---আমাকে একটা রাম ঝাঁটা কিনে এনে দে। দিলি না কেউ। গেলবার চোত সংক্রান্তির রাতে এই পাথর ছুঁয়ে বসে---আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে শুধু এই ঝাঁটার কথাই মনে হলো। কপালেও জুটেছে ঝাঁটা।

সদাশিব ॥ বসো---বসো তোমরা সব গোল হয়ে বসো। চাঁদ উঠতে এখনো বাকি আছে। বৌমা, এবছর তুমি আমাদের মধ্যে নতুন। তাই আজ নতুন করে ফকিরের এই পাথরের কথা বলব। তিন বছর আগে পাথরটা দিয়ে যায় আমাকে এক ফকির। বলে যায়---চোত সংক্রান্তির রাতে চাঁদ উঠতেই এই পাথর ছুঁয়ে যে কোন একটি বর মনে মনে চাইলে তা' মিলবে। কিন্তু সকলের চাওয়াটা হওয়া চাই এক।

গণেশ ॥ ঐখানেই তো যত গোল বেঁধেছে বাবা।

সদাশিব ॥ তা বেঁধেছে। গেলো দু'বছর মেলেনি তাই কিছু। এবার আগে ভাগেই ঠিক করে নাও সকলে মিলে কি বরটি চাইবে।

গণেশ । হ্যাঁ, তুমি মা আবার, রাম-ঝাঁটা চেয়ে না বসো। তুমি কি চাইবে বাবা ?

সদাশিব ॥ আমি কিছুই চাইব না এবার। পাথরে আমি হাতই দেবনা।

সকলে ॥ কেন ? কেন ?

সদাশিব ॥ আমার কিছুই চাইবার নেই। আমার মনে হয় সবই আমি না চাইতেই পেয়ে গেছি।

গঙ্গা ॥ লোকটার মাথা খারাপ হলো নাকি ? চোখ দুটো চাইবার নেই ?

সদাশিব ॥ না। চোখ আমি ফিরে চাই না। এ আমি বেশ আছি—খাসা আছি।

গঙ্গা ॥ খাসা আছ। বেশ, তবে আমি ঝাঁটাই চাইব। ঝাঁটাই বড়

দরকার। নোংরা জঞ্জাল জমে রয়েছে বলেই লক্ষ্মী ঠাকরুণ ঘরে আসবার পথ পান না।

গণেশ॥ এ তুই কি বলছিস মা? নাঃ তোর মাথাও খারাপ হয়েছে দেখছি। ঘরে লক্ষ্মী নেই কেন শোন। আজ আমাদের চাষের জমি নেই। পরের জমিতে মজুর খেটে মরি দুই ভাই। মাটির বুক চিরে পাতাল থেকে টেনে তুলি লক্ষ্মী। কিন্তু সে লক্ষ্মী চলে যান—যার জমি তার ঘরে। না, না, এবার আমরা জমি চাইব—নিজেদের জমি। সোনা ফলাব মাঠে। সেই সোনার শেকলে বাঁধব লক্ষ্মী। জমি চাই, আমি জমি চাই।

কার্তিক॥ জমি। জমি! কি হবে জমি দিয়ে? গাঁয়ে কত জমিই তো পতিত পড়ে আছে। চাষ হচ্ছে কই? ঐ সব জমি আমি একদিনে চাষ করতে পারি, যদি একটা কলের লাঙল পাই। মহেশপুরে এনেছে—কী তার ভট্ ভট্ শব্দ—যেন একটা দৈত্য। দশ বিশটা হালের কাজ একা করেছে ঐ কলের লাঙলটা।

গণেশ॥ আরে—হাঁদারাম, আগে জমি, তবে না লাঙল।

কার্তিক॥ গোবর-গণেশ তোমাকে সাধে বলে দাদা! পেলি না হয় গোটা গাঁয়ের জমিটাই। সে তো এখনো পড়ে রয়েছে। মালিকও রয়েছে কিন্তু চাষ হচ্ছে কি? কলের লাঙলটা যদি পাই—ছুটে আসবে সব লোক আমাদের কাছে। ওদের জমি-আমাদের হাল। উঃ কী চাষটাই হবে—মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ দাদা—

গঙ্গা॥ থাম—তোরা থাম। এবার রথের মেলায় দেখলি না তোরা একটা কল। শহরের বাবুরা আনলো। তারও মুখে ভট্ ভট্ আওয়াজ—বিজলী বাতি জ্বললো—আবার এমন হাওয়া ছাড়লো এক নিমিষে উঠল ঝড়।

কার্তিক। ওটাকে একটা এঞ্জিন বলে ডিজেল ইঞ্জিন মা।

গঙ্গা॥ চাবি তো চাই ঐ কলটা। উঠুক একটা ঝড়। নোংরা জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে করুক বিদায়।

কলাবতী॥ ঝড়টা উঠলে আমাদের কুঁড়ে ঘরটা উড়ে যাবেন। মা?

গণেশ॥ আরে, বৌটা তো খুব খাঁটি কথা বলেছে মা।

কার্তিক॥ না, না, মার কথাই ঠিক। দুনিয়াটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। একটা দিক হয়েছে আকাশ সমান উঁচু আর একটা দিক হয়েছে পাতালের মত নীচু।

গঙ্গা॥ তুই ঠিক বলেছিস কার্তিক। দুনিয়াটা রয়েছে মা বাসুকীর মাথায়। ভার সামলাতে পারছেন না মা বাসুকী। ঘাড়টা করছে টলমল। আমিও তো মা। চোখের উপর দেখছি, তোরা দু'দুটো জোয়ান ছেলে আমার—রাতদিন অসুরের মতো খাটছিস। তবু তোদের ভাত জুটছে না। আর দিন দিন ফেঁপে উঠছে ঐ মালিক আর মহাজন।

কার্তিক ॥ নাঃ, উঠুক ঝড়। ভেঙেচুরে সব সমান হয়ে যাক। সকলের সুখ-সুবিধা সমান হোক। আয় দাদা, আজ আমরা ঐ কথটাই চাই।

গণেশ ॥ রাখো তোমার বড় বড় কথা। এসব কথা শহরের বাবুদের মুখে ছোট থাকতে শুনে আসছি, খালি কথা আর কথা। আসল কথা টাকা। ওসব মতলব ছাড়ো। আজ চাওয়া যাক টাকা—লাখ টাকা। গরু-বাছুর বেঁচে শ' টাকা জোগাড় করে ঘরে আনলাম বৌ। তা' কিনা তাকে—না দিতে পারি পেট ভরে খেতে—না দিতে পারি পরণের একটা ভাল শাড়ী—হাতে দু'গাছা চুড়ি। বৌ হয়ে আছে আমার, একটা মড়া কাঠ। না, না, এসো আমরা আজ চাই টাকা—লাখ টাকা।

সদাশিব ॥ শোন বেটা শোন। গোবর গণেশ শোন। আমি কি দেখছি—জানিস? লাখ টাকা তোরা পেয়েছিস। দুনিয়ায় যে দিকটা আকাশ সমান উচু, সেখানে গিয়ে বাঁধলি বাসা। লাখ টাকাতেও ভরছে না তোদের মন, লোভ যাচ্ছে আরও বেড়ে। এল হিংসা, এল দ্বেষ। ভাইয়ে ভাইয়ে বেঁধে গেল ঝগড়া। ছিলি তোরা মানুষ—হয়ে গেলি অমানুষ।

গণেশ ॥ নাঃ, তোমার চোখ না থেকেই আমাদের হয়েছে যত বিপদ এত বেশি দেখলে—আমরা চলি কি করে?

কলাবতী ॥ আপদ না দেখতে পেলে মাড়িয়ে চলে যাওয়া যায়, দেখলেই ডিঙিয়ে উঠতে পারি না বাবা।

গঙ্গা ॥ সাচ্চা কথা বলেছ। মানুষটার যখন চোখ ছিল—তখন ওকে বোঝা যেত এখন চোখ নেই—বুঝতে পারিনা ওঁকে। এযেন শিব ঠাকুরের তৃতীয় নয়ন খুলে গেছে। দু'চোখে যে নোংরা আর জঞ্জাল দেখি—তাই সইতে পারি না। উনি দেখেছেন তিন চোখে।

কার্তিক ॥ নাঃ, এবারও দেখছি নানা মুনির নানা মত। কি চাইবে সকলে মিলে—চটপট ঠিক করো আমি দেখে আসছি চাঁদ উঠল কি!

সদাশিব ॥ (চীৎকার করিয়া উঠিল) না, না, দাঁড়া, ঐ দেখ চাঁদ উঠে গেছে। পাথর ছুঁয়ে সব গোল হয়ে বসে পড়। চোখ বুজে মনে কর সকলে—আঁধার আলো করে আকাশে উঠছে চাঁদ। একটা বছর আসছে। নতুন বছরে বর দেবে আজ এই ফকিরের পাথর যা চাইতে হবে—মনে মনে চাইতে হবে। আর চারজনের চাওয়াই যদি এক হয় তবেই মিলবে বর। চেয়েছিস্। তোরা চেয়েছিস্?

অন্য চারজন ॥ (এক যোগে) হ্যাঁ—চেয়েছি।

সদাশিব ॥ জয় বাবা সিধু ফকির—তোমার বাক্য সত্য হোক বাবা। পাথরে মাথা ছুঁয়ে প্রণাম করে চোখ মেলে এবার সব উঠে দাঁড়াও।

গণেশ ॥ তুমি কি চেয়েছো মা? ঝাঁটা চেয়ে বসোনি তো?

গঙ্গা ॥ কি জানি বাবা—কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল।

গণেশ ॥ তুই কি চেয়েছিস্ বৌ ?

কলাবতী ॥ ভয়ে ভয়ে কি যেন চেয়েছি।

গণেশ ॥ কার্তিক তুই ?

কার্তিক ॥ অন্ধকারটা যাতে কেটে যায়, আমি চেয়েছি তাই।

সদাশিব ॥ একি! আমি যেন সব দেখতে পাচ্ছি। চোখের আলো আমি ফিরে পাচ্ছি। (সার্তনাদে) একি হলো—একি হলো আমার! (রুদ্রমূর্তিতে) তোরা তবে সবাই আমার চোখ ফিরে চেয়েছিস ? অন্ধ হয়ে আমার তৃতীয় নয়ন খুলে গিয়েছিল। সেটা তোরা কেড়ে নিলি! তোরা আমার একি সর্বনাশ করলি!

গঙ্গা ॥ না, না, এ তুমি কি বলছো ? তুমি যেন আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলে অনেক দূরে। আবার তোমায় ফিরিয়ে আনলাম ঘরে।

গণেশ ॥ তোমার দিকে তাকাতে পারতাম না বাবা। এবার পারছি। সহজ হয়েছ আজ তুমি।

কার্তিক ॥ চোখ ছিল না, তাই আমাদের এগিয়ে যাবার পথে, তুমি দেখতে পদে পদে বাধা। এবার তোমার কাছে আর পাবনা বাধা।

কলাবতী ॥ তোমাকে লুকিয়ে কিছু করবার জো ছিলনা বাবা। সে ভয়টা আজ গেল। এবার তোমার কলাগাছ থেকে কলা চুরি করে খাবে এই কলাবতী। তুমি জানাতও পারবে না বাবা!

সদাশিব ॥ আমার চোখ নেই বলে তোদের যে এত দুঃখ ছিল—এতো আমি জানতাম না! চোখ না থাকতে যে জ্ঞানটা আমি পেয়েছিলাম—সেটা আজ হারালাম। কিন্তু এই চোখ ফিরে পাওয়ায় আর একটা জ্ঞান আমার হলো। এক জোট হয়ে কিছু চাইলে—তা পাওয়া যায়—পাওয়া যায়।

গণেশ ॥ আমরা তা পাব। কি বলিস কার্তিক ?

কার্তিক ॥ ধরে নে দাদা, ও আমরা পেয়েই গেছি। পাওয়াটা যে এতো সোজা তা' কে জানতো।

সদাশিব ॥ ফকিরের পাথরটা এবার পুষ্করিপুকুরে ফেলে দিয়ে আয়।

গণেশ ॥ কেন ?

কার্তিক ॥ কেন বাবা ?

গঙ্গা ॥ তাইতো! কথাটা ভুলেই গেছিলাম।

কলাবতী ॥ কি কথা মা ?

সদাশিব ॥ ফকিরের বাক্য পাথরটা বর দেবে শুধু একবার। এক জোট হয়ে তোরা তা আদায় করে নিয়েছিস। ফকিরের বাক্য—কাজ ফুরালে, ফেলে দিয়ো ওকে পুকুরের জলে। ফকিরের বাক্য রাখ।

কার্তিক ॥ দাদা!

গণেশ ॥ বুঝতে আর বাকি নেই কার্তিক। হয়ে গেল।

কলাবতী ॥ কি হল ?

গণেশ ॥ কপাল পুড়ল।

সদাশিব ॥ কেন ?

কার্তিক ॥ আমিও তাই বলি বাবা, কপাল পুড়বে কেন ? পাথর না হয় নাই থাকল। একজোট হওয়া নিয়ে কথা। একজোট হলেই সব মিলবে। হও দেখি একজোট।

সদাশিব ॥ সাবাস ব্যাটা সাবাস। পাথরটা যাক্, কিন্তু বিনা পাথরেও পাওয়ার মন্ত্রটা তোরা পেয়ে গেছিস। একজোট হয়ে ঠিক করেনে তোদের চাওয়াটা---আজই ঠিক করেনে---কিন্তু তার আগে জলে ফেলে দিয়ে আয় ফকিরের পাথর। ফকিরের বাক্য রাখ।

গণেশ ॥ রাখছি। কিন্তু আমি বলে রাখছি এবার চাই লাখ টাকা।

কার্তিক ॥ শুনলে বাবা, আবার সেই লাখ টাকা। যেন লাখ টাকা কেউ কখনো পায়নি।

সদাশিব ॥ লাখ লাখ লাখপতি আবার পথেও বসেছে।

গঙ্গা ॥ টাকা এলেই পাপ। পাপের টাকা থাকে না, পাপের সংসার টেকেনা। আমি দেখেছি। আমাদের নটবর মণ্ডল—

সদাশিব। থামো তুমি। পুরানো কাসন্দি ঘাটতে নেই।

কলাবতী ॥ নটবর মণ্ডল তো আমার বাপ। সে আবার কি করল ?

সদাশিব ॥ থাম বেটি থাম।

কলাবতী ॥ থামব কেন ? আমার বাপ না হয় এমন পাপীই হয়েছে, তাই বলে আমায় বাপ ভুলবে কেন ?

গঙ্গা ॥ তুই সেই পাপের ঝাড়। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব তোকে। আমি একটা ঝ্যাটা চাই, রাম-ঝ্যাটা।

গণেশ ॥ তুমি কি কথা বলছ মা, আমার ঘরের বৌ—তোমরাই এনে দিয়েছো।

গঙ্গা ॥ (হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া) আমি—হ্যাঁ আমিই এনেছি। কেন এনেছি, আমি জানিনা।

সদাশিব ॥ আমি ওকে বুঝিয়ে বলছি। তোরা তিনজনে পাথরটা ফেলে দিয়ে আয় জলে। ফকিরের বাক্যি রাখ, যা-যা--

[কার্তিক, গণেশ ও কলাবতী পাথর পুকুরে ফেলিতে গেলো]

সদাশিব ॥ নটবর মণ্ডলের কথা কি কিছুতেই ভুলতে পারনা তুমি ? কিছুতেই না গঙ্গা ?

গঙ্গা ॥ আমার তখন কচি বয়স। ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার সর্বনাশ করল লোকটা। বাবুগঞ্জের মেলা দেখাবার নাম করে বেচে দিয়ে এলে বৌ বাজারে।

সদাশিব ॥ মালা বদল করে মাথায় তুলে নিয়ে এলাম আমি—মনের মত

বৌ পেলাম, মনের মতো ঘর বাঁধলাম। গণেশ এল, কার্তিক এল---সোনার সংসার গড়ে উঠল। দুঃখ-কষ্ট ছিল, কিন্তু মনে ছিল সোনা।

গঙ্গা ॥ সোনা লুটতে এলো আবার সেই লোকটা---এবার ছিলনা তার টাকার জোর, ছিলনা লাঠির জোর। পরনে ছেঁড়া কাপড়, পিঠে ভিক্ষের ঝুলি, একটা কচি মেয়ে তার হাতের লাঠি, কিন্তু তবু সে কি জোর! বলে, আমায় ভিক্ষা দাও গঙ্গা।

সদাশিব ॥ এতো আমি সব জানি। তুমি লোকটাকে দিলে তাড়িয়ে, কলাবতীকে রাখলে কেড়ে। তোমার দয়ার ধরণ দেখে আমি হেসে মরি। যে করল তোমার সর্বনাশ, তারই মেয়েকে বুকে টেনে নিলে, ছেলের বৌ করে!

গঙ্গা ॥ তুমি তখন কিছু বোঝনি, না?

সদাশিব ॥ না। বুঝলাম পরে, যখন অন্ধ হলাম। যখন আর একটা নতুন চোখ পেলাম আমি।

গঙ্গা ॥ কি বুঝলে?

সদাশিব ॥ নটবরকেই বুকে তুলে নিলে তুমি--ঐ কলাবতীরূপে।

গঙ্গা ॥ (আর্তনাদ করিয়া উঠিল)।

সদাশিব ॥ কিন্তু, আজ আর নটবরকে তুমি সইতে পারছো না। তাই ঝেটিয়ে বিদায় করতে চাইছ যত অশুচি। কিন্তু গঙ্গা, একটা ভুল করছ তুমি। পাঁক থেকেই জন্মে পদ্ম—পূজার ফুল। আর গঙ্গা! আমার গঙ্গামণি! পাপকে হজমই যদিনা করতে পারবে তবে নাম নিয়েছিলে কেন—গঙ্গা?

[বুকে টানিয়া নিতে গেল]

গঙ্গা ॥ ছাড়ো!

[কার্তিক, গণেশ ও কলাবতী কলরব করিতে করিতে আসিয়া দাঁড়াইল

গণেশ ॥ লাখ টাকা—

কার্তিক ॥ এ না হলে লোকে বলে গোবর গণেশ! ওসব চলবেনা, এবার চাই—ঐ কলের লাঙ্গল।

কলাবতী ॥ না, না, ডিজিল ইঞ্জিন ...ভট্ ভট্ করবে, জ্বলবে বিজলী বাতি, উঠবে ঝড়।

গণেশ ॥ সে ঝড়ে তুই উড়ে যাবি বৌ।

গঙ্গা ॥ না। আমি ওকে বুক দিয়ে ধরে রাখব।

[কলাবতীকে বুকে টানিয়া জড়াইয়া ধরিল]

সদাশিব ॥ উঃ আমার চোখ দুটো। আমার চোখদুটো।

[আর্তনাদ করিয়া চোখ দুটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। গঙ্গা বাদে অন্য সকলেই সার্তনাদে ছুটিয়া গিয়া সদাশিবকে ধরিল]

গঙ্গা ॥ অন্ধ হলেন। আবার। মুখে বলা যায় অনেক কিছু—কিন্তু

চোখে যায় না সওয়া। ......[কলাবতীকে] দূর হ তুই আমার কাছ থেকে দূর হ।

সদাশিব ॥ না-না, কলাবতী, কাছে আয় মা। অন্ধ হয়ে আমি বেঁচে গেলাম। এবার সব মন ঠিক কর। চাইতেই যদি কিছু হয়, চাইবি শান্তি, মনের শান্তি। গঙ্গা, কাছে এস। কলাবতী, আমার তামাক দে। কার্তিক গণেশ উপোস রয়েছে, ওদের খেতে দে। ...গঙ্গা, চল আমায় ঘরে নিয়ে চল। আঃ বাঁচলাম। অন্ধকার, অন্ধকারতো নয়, আমার সামনে শান্তির পারাবার।

[সকলে সদাশিবকে লইয়া ঘরে চলিল]

যবনিকা

> ১৯৫৮ সালের ১৬ই অক্টোবর 'ফকিরের পাথর' নাটিকাটি আকাশবাণী কর্তৃক ন্যাশনাল প্রোগ্রামে সারা ভারতে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হয়েছে।

অসীমন্তিনী

বর্ষীয়সী ধনী ব্রাহ্মণ বিধবা। চিন্ময়ী দেবীর বালীগঞ্জস্থিত সুরম্য বাসভবন "নারায়ণী"। রাত্রি প্রায় দশটা। চিন্ময়ী দেবী এবং তাঁহার গৃহতত্ত্বাবধায়ক রূপলাল মুখোমুখি উপবিষ্ট।

রূপলাল ॥ এইবার তবে, কর্তার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রের খসড়াটা আপনি শুনুন মা। কালই এটা প্রেসে ছাপতে দিতে হবে, আর সময় নেই।

চিন্ময়ী ॥ শোনাও বাবা।

রূপলাল ॥ (পাঠ) "বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—আগামী ১০ই আশ্বিন রবিবার আমার স্বর্গীয় দেবতা ৺নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ আমাদের বালীগঞ্জস্থিত বাসভবন 'নারায়ণী'তে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে সারাদিন গীতাপাঠ এবং সংকীর্তন হইবে। অপরাহ্ন হইতে দরিদ্র-নারায়ণ সেবার আয়োজন থাকিবে। আপনি সবান্ধবে শ্রাদ্ধবাসরে যোগদান করিলে বাধিত হইব। নিবেদন ইতি,

বিনীতা

শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী

চিন্ময়ী ॥ ঠিক আছে বাবা রূপলাল। তবে ঐ বাধিত হইব না লিখে ধন্য হইব লেখ। কর্তা তাই লিখতেন।

রূপলাল ॥ যে আজ্ঞে মা। (তথাকরণ) আর সব ঠিকই আছে কেমন মা?

চিন্ময়ী ॥ হ্যাঁ বাবা। মোটামুটি ঠিকই আছে। খাওয়াদাওয়ার ফর্দ-টর্দগুলো আমি সাবিত্রীকে ডেকে করিয়ে নিচ্ছি।

রূপলাল। তাহলে আমিও মা বসি ?

চিন্ময়ী ॥ না, বাবা, তোমার আর বসতে হবেনা। সাবিত্রী ওসব একাই পারবে। দেখছি তো, খুব কাজের মেয়ে আমার সাবিত্রী।

রূপলাল ॥ তা যা' বলেছেন। দোষের মধ্যে একটু 'বাঙাল'।

চিন্ময়ী ॥ তা' হোক। এই ক'মাসেই কথায় বাঙাল টানটা গেছে। কাজকর্মে আমাদের সবাইকে খুব খুশী করেছে। আমার আনন্দ যে একজন দুঃখী-বিধবা উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিতে পেরেছি। তুমি বলেছিলে বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভালো লোক পাওয়া যায় না। গেছেতো ?

রূপলাল ॥ 'একটি বৃহৎ সংসারের রন্ধনাগারের তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলা চাই' শুধু এইটুকু বিজ্ঞাপন দিলে সাবিত্রীকে আপনি পেতেন না মা। ঐ বিজ্ঞাপনে 'কর্মঠা সুরুচিসম্পন্না যুবতী হওয়া চাই' এই কথাগুলো আমি জুড়ে দিয়েছিলাম বলে আপনি অমন করিৎকর্মা মেয়েটি পেয়েছেন, আর তা ছাড়া মোটা বেতন আর নিখরচায় খাওয়া পরার ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে সেখানে ভালো লোক কেন পাবেন না মা।

চিন্ময়ী ॥ এই কে আছিস সাবিত্রীকে ডেকে দে । আচ্ছা তুমি তবে এস বাবা।

রূপলাল ॥ আর তো আমার কোনো কাজ-টাজ নেই মা ? মনে করে দেখুন।

চিন্ময়ী ॥ কিছু তো মনে পড়ছে না এখন। তা' তুমি আফিস ঘরে আরো তো কিছুক্ষণ থাকছ—যদি দরকার হয় ডাকবো।

রূপলাল ॥ (হাতঘড়ি দেখিয়া) রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেল। রাত দশটা পর্যন্ত তো আছিই, তারপরেও হয়ত আমাকে থাকতে হবে আজ।

[সুদর্শনা সাবিত্রীর প্রবেশ। রূপলাল প্রস্থানকালে তাহাকে একবার আড়চোখে দেখিয়া গেল

সাবিত্রী ॥ আমাকে ডেকেছেন মা।

চিন্ময়ী ॥ হ্যাঁ মা সাবিত্রী, ডেকেছি। আসছে রবিবার এ বাড়ির সবচেয়ে পবিত্র অনুষ্ঠানটি হবে।

সাবিত্রী ॥ জানি মা, কর্তার বার্ষিক শ্রাদ্ধ।

চিন্ময়ী ॥ না মা, এতে সব কথা বলা হল না। লোকে বলে শ্রাদ্ধ, কিন্তু আমি বলি পূজা। মেয়েদের সবচেয়ে বড় দেবতা স্বামী। তার উপর, আমার স্বামীর নামও ছিল নারায়ণ।

সাবিত্রী ॥ জানি মা।

চিন্ময়ী ॥ আমার কাছে সাক্ষাৎ নারায়ণই তিনি ছিলেন মা। যেমন ছিল রূপ, তেমনি ছিল গুণ। আমি আমার সেই নারায়ণ হারিয়ে কি করে যে বেঁচে আছি, ভেবে পাইনা মা। ছেলেপুলে নেই, সে দুঃখ করিনা সাবিত্রী—

সাবিত্রী ॥ কিন্তু আমাদের দুঃখ হয়। এত বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবে কে মা!

চিন্ময়ী ॥ কারা ভোগ করবে তার নির্দেশ অন্তিম কালে তিনিই দিয়ে গেছেন সাবিত্রী। তাঁর সেই কথাগুলো এখনও কানে বাজছে।

[চোখ বুঁজিয়া কথাগুলো যেন শুনিতে লাগিলেন।]

সাবিত্রী ॥ কি বলেছিলেন মা?

চিন্ময়ী ॥ (যেন তাঁহার ধ্যান ভাঙিল) বললেন, সবই নারায়ণের ইচ্ছা চিন্ময়ী। তুমি যে আজ বিধবা হ'চ্ছ এও তাঁরই ইচ্ছা। বিধবাই বিধবার দুঃখ বুঝবে। অনাথ বিধবাদের দুঃখ তুমি দূর করো চিন্ময়ী। আর ছেলে-মেয়ে নেই—এ কোনো দুঃখ নয়। দেশে অনাথ আতুরের অভাব নেই—তারাই তোমার ছেলে মেয়ে।

সাবিত্রী ॥ আপনার জীবনে কথাটা খুবই সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মা।

চিন্ময়ী ॥ তা' হয়েছে কিনা জানিনা। তবে এটা ঠিক আমার এত বড় সংসারের ভার নেবার জন্যে আমি কোন সধবা মেয়ে চাইনি—চেয়েছিলাম একটি বিধবা। তুমি বিধবা বলেই মা, বিধবার দুঃখ এত বোঝ। বোঝ আমারও দুঃখ। জীবনে দুঃখ না পেলে দুঃখীর ব্যথা কেউ বোঝে না—এ আমি দেখেছি।

সাবিত্রী ॥ আমাকে আপনি কেন ডেকেছেন মা?

চিন্ময়ী। ও, হ্যাঁ রবিবারের খাওয়া দাওয়ার ফর্দটা তুমি সেরে ফেল মা।

সাবিত্রী ॥ কিন্তু তার আগে আপনার কাছে আমার কিছু নিবেদন করবার আছে। আপনি না ডাকলেও আমাকে এই জন্যেই আসতে হ'ত আজ।

চিন্ময়ী ॥ কি কথা! বল মা বল!

সাবিত্রী ॥ আমি আপনার কাছে বিদায় চাইছি মা।

চিন্ময়ী ॥ সেকি! সেকি সাবিত্রী!

সাবিত্রী ॥ হ্যাঁ মা এখান থেকে বিদায় নিলে বড় বেশী দুঃখে পড়তে হবে আমি জানি, তবু আমি বিদায় না চেয়ে পারছি না।

চিন্ময়ী ॥ আশ্চর্য! কি হয়েছে সাবিত্রী! আমাকে খুলে বল মা!

সাবিত্রী ॥ সে কথা বলতে মুখে বাধে।

চিন্ময়ী ॥ কেউ কি তোমাকে অপমান করেছে সাবিত্রী? না-না চুপ করে থেকোনা, উত্তর দাও মা!

সাবিত্রী ॥ উত্তর দিলে আপনি মনে বড় আঘাত পাবেন মা।

চিন্ময়ী ॥ কিন্তু তুমি চলে গেলে যে আঘাত আমি পাব, কোন আঘাতই তার চেয়ে বেশী হতে পারেনা সাবিত্রী। বল, কে তোমায় অপমান করেছে—কি অপমান?

সাবিত্রী ॥ ঐ রূপলাল বাবু—

চিন্ময়ী ॥ ও মোক্ষদা আমাকে একটা আভাস দিয়েছিল বটে একদিন। কথাটা বিশ্বাস করিনি। উল্টে মোক্ষদাকেই দিয়েছিলাম ধমক। এখন বুঝছি, মোক্ষদা তবে মিথ্যে বলেনি। কে আছিস?—রূপলালকে ডেকে দে। স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে বিধবা। তার সেই ধ্যান, পুজোয় বাধা দেয় যে দুশ্চরিত্র লোক, তাকে আমি কখনও ক্ষমা করতে পারিনা—কখন না। সে হয়তো এসে বলবে তোমার কথা মিথ্যা; কিন্তু আমি জানি, মেয়েদের অসম্মানের কথা মেয়েরা যখন নিজমুখে বলে তখন তাদের মাথা কাটা যায়—তাই সত্য না হ'লে মেয়েরা কখনো অসম্মানের কথা নিজ মুখে বলে না।

[সাবিত্রী চোখে আঁচল দিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল। রূপলাল আসিয়া দাঁড়াইল।]

রূপলাল ॥ আমাকে স্মরণ করেছেন মা?

চিন্ময়ী ॥ তোমাকে আমি বিদায় দিচ্ছি রূপলাল—আজই। এখনই তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। তোমার যা পাওনা, আমি হিসেব করে কালই তোমাকে পাঠিয়ে দেব তোমার বাড়িতে।

রূপলাল ॥ আপনি আমার ওপর এত নির্দয় হচ্ছেন কেন, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না মা!

চিন্ময়ী ॥ ঐ সাবিত্রীর চোখের জল দেখেও কি তুমি কিছু বুঝতে পারছ না রূপলাল?

রূপলাল ॥ বুঝলাম। সাবিত্রী তবে আমার নামে আপনার কাছে নালিশ করেছে। হয়ত বলেছে, আমি তাকে অপমান করেছি।

চিন্ময়ী ॥ তুমি সাবিত্রীর আঁচল ধরে টেনেছ—গায়ে হাত দিতে গেছ—মোক্ষদা নিজে দেখে আমাকে বলেছে। সেদিন আমি বিশ্বাস করিনি। বলেছিলাম, একথা কখনই সত্য নয়, এ সব সইবার মেয়ে সাবিত্রী নয়—এ যদি এতটুকু সত্য হ'ত, ঐ সাবিত্রী এসে নিজের মুখে আমাকে তা বলতো। আজ সে তা বলেছে।

রূপলাল ॥ হ্যাঁ, আজ বলবারই কথা। আপনি যাকে মনে করছেন সতী সাধ্বী সাবিত্রী, আমি তাকে বলি কুলটা।

চিন্ময়ী ॥ (রাগে চিৎকার করিয়া) রূপলাল, মুখ সামলে কথা বলবে আমার সামনে।

রূপলাল ॥ কুলটা বলেই তাকে আমি মাঝে মাঝে শাসন করতাম। ফল হ'ল তার আজ এই! কিন্তু সত্য চাপা থাকে না মা। সত্যকে ঢাকবার সাধ্য নেই ঐ কুলটার।

চিন্ময়ী ॥ (ভীষণ উত্তেজনায়) বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখনি এখান থেকে—

রূপলাল ॥ যাচ্ছি মা, যাচ্ছি। কিন্তু ঐ সতী সাধ্বীর কীর্তিটা জানিয়ে

যাচ্ছি। (পকেট হইতে একখানি খোলা খাম বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া) আমাকে দেখতেই ভয় পেয়ে আঁচলে বাঁধতে দেখি নামধামহীন এই পত্রটা কেড়েনি আমি, আর সে পত্রটা হচ্ছে এই :

'আসছে বৃহস্পতিবার ঠিক রাত সাড়ে দশটায় আমি তোমাদের বাগানে খিড়কির দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি এসো।' আজ সেই বৃহস্পতিবার। সাড়ে দশটাও বেজেছে এই মুহূর্তটির অপেক্ষাতেই আমি বসেছিলাম আপিসে। আপনার এখানে ইনি আটক বলে যেতে পারেননি অভিসারে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। (সাবিত্রীকে) আপনার লোকটিকে এখানে ধরে আনবার জন্য দারোয়ানকে হুকুম দিয়ে তবেই আমি এখানে এসেছি সাবিত্রী দেবী। (বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া) হ্যাঁ, ঐ বোধ হয় তিনি এসেও গেলেন!

নেপথ্যে দারোয়ান ॥ হুজুর, ও আদমি আয়া।

রূপলাল ॥ ভেজ দেও।

[একটি রুগ্ন লোক, ততোধিক একটি রুগ্ন শিশু সন্তান সহ কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। ভীত, সন্ত্রস্ত তাহাদের দৃষ্টি।]

চিন্ময়ী ॥ এটা তোমার সাজানো ব্যাপার রূপলাল। এ চক্রান্তে আমি ভুলব না। (সাবিত্রীকে) এ লোকটিকে তুমি চেনো সাবিত্রী? (কঠোর কণ্ঠে) না না, চুপ করে থেকোনা—উত্তর দাও।

[এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সাবিত্রী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে রুগ্ন শিশুটি 'মা মা' বলিয়া সাবিত্রীকে আসিয়া জড়াইয়া ধরিল। সাবিত্রী তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।]

চিন্ময়ী ॥ বুঝলাম। ও তোমার ছেলে—কিন্তু ও লোকটি?

[সাবিত্রী নীরবে কাঁদিতেই লাগিল—কোন উত্তর দিতে পারিল না।]

শিশু ॥ (লোকটিকে) বাবা, মা কাঁদছে কেন?

চিন্ময়ী ॥ (বিস্ময়ে) সাবিত্রী! তবে তুমি…কি—

সাবিত্রী ॥ না মা। আমি বিধবা নই। যাতে বিধবা না হই, রুগ্ন বেকার স্বামীকে দু বেলা দু'মুঠো খেতে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি, কোলের এই শিশুটিকে চিকিৎসা করে আরও কিছুদিন যাতে ধরে রাখতে পারি, তাই—তাই আমার এই সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে বিধবা-সাজে আপনার পায়ে এসে পড়েছিলাম মা।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা।]

চিন্ময়ী ॥ যত মিথ্যাই তুমি বলো, তোমার সাবিত্রী নাম মিথ্যা হয়নি মা! আজ থেকে তোমরা সবাই আমার কাছে থাকছো—(রূপলালকে) কিন্তু তোমাকে যেতে হবে রূপলাল।

[রূপলাল মাথা নীচু করিল।]

রূপলাল ॥ এর পর আমার আর থাকা চলেনা জানি। যাচ্ছি। (সাবিত্রীকে) বড়ই অপরাধী মনে হচ্ছে তোমার কাছে। আমাকে পারতো ক্ষমা কর সাবিত্রী।

চিন্ময়ী ॥ ক্ষমা যখন নিজ থেকেই চেয়েছে, পাপমুক্ত হয়েছো তুমি। যাও, ঘরে যাও—কাজগুলো সেরে ফেল।

[কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চিন্ময়ী ও সাবিত্রীকে তাকাইয়া দেখিয়া চলিয়া গেল।]

চিন্ময়ী ॥ কিন্তু সাবিত্রী, তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারছিনা—যতক্ষণ না সিঁথিতে সিঁদুর পরছ তুমি—

[সাবিত্রী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। চিন্ময়ীকে প্রণাম করিয়া ছেলেটিকে বুকে নিয়া চলিয়া গেল।]

চিন্ময়ী ॥ (লোকটিকে) তুমি বসো বাবা।

লোকটি ॥ আমি সবটা বুঝতে না পারলেও এটা বুঝেছি আপনার দয়ার শরীর। আপনি মা-জননী।

[চিন্ময়ীকে প্রণাম করিতে গেল]

চিন্ময়ী ॥ আহা-থাক বাবা থাক।

মন্দিরা, পূজা সংখ্যা, ১৩৬৪

সাবধান

বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান প্রৌঢ় ধনী ব্যবসায়ী পুণ্যবান চৌধুরী সদ্য বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণী পূর্ণিমা দেবীকে। পূর্ণিমা দেবী একটি মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে—রূপের জোরেই বিনাপণে ও বিনা যৌতুকে এই ধনী গৃহের গৃহিণী হওবার সৌভাগ্য হইয়াছে। পিত্রালয় হইতে পূর্ণিমার সঙ্গে পোষা একটি ময়না ছাড়া আর কিছুই আসে নাই। সেই ময়নাটি এই সুখের সংসারে যে বিপত্তির সৃষ্টি করিল এই একাঙ্কিকাটি তাহারই কাহিনী। সন্ধ্যারাত্রি। পুণ্যবান চৌধুরীর উপবেশন কক্ষ। পুণ্যবানের দুই বন্ধু, তারেশ তলাপাত্র এবং সাধুচরণ সমাদ্দার পুণ্যবানের সহিত চা পানে রত। পূর্ণিমা চা ঢালিয়া দিতেছেন।

তলাপাত্র ॥ (পূর্ণিমাকে) বন্ধু পুণ্যবানের অনেক পুণ্য। সেই পুণ্যে এই সংসারে উদয় হয়েছেন আপনি—পূর্ণিমার চাঁদের মতো।

পূর্ণিমা ॥ বড় বেশী বলছেন আপনি শ্রীযুক্ত তলাপাত্র।

সমাদ্দার ॥ না, না, পূর্ণিমা দেবী। তলাপাত্র এতটুকু বাড়িয়ে বলে নি। পুণ্যবানের স্ত্রী মারা যেতে এ সংসারটা একেবারে আঁধার হয়ে গিয়েছিল কিনা, তুমিই বলোনা পুণ্যবান?

পুণ্যবান ॥ সেই অমাবস্যা দূর করিতেই তো খুঁজে খুঁজে ধরে এনেছি তোমাদের পূর্ণিমা দেবীকে। ওকে পেলাম বলেই বেঁচে গেলাম মনে হচ্ছে। সংসারে যদি মনের মত স্ত্রী না থাকে, না থাকে দু'একটা সন্তান—কেন খাটব, কেন করব রোজগার। গেরুয়া পরে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব কিনা—এসব কথাও মনে আসছিল।

তলাপাত্র ॥ আর আজ ?

[সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।]

পূর্ণিমা ॥ নাঃ দেখছি আমাকে পালাতে হবে।

পুণ্যবান ॥ তা'তে আপত্তি নেই। এদের সঙ্গে একটু জরুরী কথা সেরেই সিনেমায় যাবো। তুমি গিয়ে তৈরি হও।

পূর্ণিমা ॥ (বন্ধুদের প্রতি) আচ্ছা আসি। নমস্কার।

বন্ধুদ্বয় ॥ নমস্কার ! নমস্কার !

তলাপাত্র ॥ চায়ের জন্য ধন্যবাদ।

সমাদ্দার ॥ ধন্যবাদ শুধু শুরু হল, পূর্ণিমা দেবী। এমন চায়ের লোভে রোজ যদি আসি, সেটা কি খুব দোষের হবে ?

পূর্ণিমা ॥ (হাসিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া) পুণ্যবান লোকেরা হয়তো বলবেন, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। (বন্ধুদের প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে) আমি অবশ্য তা' বলব না। আসবেন।

[নমস্কারান্তে পূর্ণিমার প্রস্থান।]

সমাদ্দার ॥ ওরে বাবা, কথায় দেখছি বেশ ধার আছে।

পুণ্যবান ॥ বি.এ পাশ মেয়ে।

তলাপাত্র ॥ (পুণ্যবানকে) তোমার তো বড় বিপদ। ইংরেজীতে কথা বলা তোমার এখন ছেড়ে দিতে না হয় !

পুণ্যবান ॥ বাংলার ভুলও ধরা পড়ছে। সেদিন একটা চিঠি লিখেছিলাম কম করে দশটি, বানান ভুল ধরে দিল হে। তা' আমার ভালোই লাগছে। আমি যেন ওর ছাত্র—এমনি ওর শাসন। বেশ মজা লাগে আমার।

তলাপাত্র ॥ নাঃ, তোমার পছন্দের তারিফ করি।

সমাদ্দার ॥ বিনা পণে, বিনা যৌতুকে গরীবের ঘরের মেয়ে বিয়ে করে বাজারে যে সুনামটা কিনেছ, সেটা দেখছি সার্থকও হয়েছে।

পুণ্যবান ॥ নাও ভাই, এখন কাজের কথা হোক। এদিকে সিনেমা যাবার সময় হয়ে আসছে।

তলাপাত্র ॥ ঐ টিম্বার সাপ্লাইটা। বড়বাবুর সঙ্গে কথা-বার্তা পাকা করে এসেছি। দশ আনা কাঠ দেব, ষোল আনা বিল করব। এ লাভের চার আনা আমাদের, দু'আনা বড়বাবুর।

সমাদ্দার ॥ মাল ডেলিভারির তারিখ ঠিক হয়েছে এই মাসের বিশ তারিখ।

পুণ্যবান ॥ তবে তো মেরে দিয়েছ হে ! Good, very good. ঐ চার আনাতেই আমাদের হাজার চল্লিশেক টাকা ঘরে আসবে, কি বল হে ?

বন্ধুদ্বয় ॥ নিশ্চয় ! নিশ্চয় !

তলাপাত্র ॥ (টেণ্ডারের কাগজ পুণ্যবানের সম্মুখে ধরিয়া) টেণ্ডারটা আমি

লিখে-পড়ে এনেছি। তাহলে এসো, এবার আমরা দুর্গা দুর্গা বলে তিন পার্টনার সই করে দি !

[পুণ্যবান সইয়ের জন্য কাগজটি টানিয়া লইলেন। সই করিবেন—এমন সময় কক্ষের বারান্দায় খাঁচায় রক্ষিত, একটি পোষা ময়না পাখী ডাকিয়া উঠিল—'এই চোর সাবধান'। তিন বন্ধুই ইহাতে চমকাইয়া উঠিলেন।]

তলাপাত্র ॥ একি !

সমাদ্দার ॥ কে ?

পুণ্যবান ॥ নুইসেন্স ! ও কিছু না আমি সই করছি।

[সই করিতে যাইবেন এমন সময় আবার পাখীটি চিৎকার করিয়া উঠিল—'এই চোর সাবধান'। অন্য দুই বন্ধু পুনরায় চমকিয়া উঠিলেন।]

পুণ্যবান ॥ আঃ !

[বিরক্ত হইলেন বটে, তথাপি সই করিলেন।]

তলাপাত্র ॥ 'এই চোর সাবধান'! মানে ?

সমাদ্দার ॥ কে বলছে ?

পুণ্যবান ॥ একটা পোষা ময়না। একটা নুইসেন্স ! নাও, নাও—আমি সই করেছি, তোমরা সই কর।

তলাপাত্র ।। দাঁড়াও, দাঁড়াও। বাধা পড়ল।

সমাদ্দার ।। হ্যাঁ ব্যাপারটা কি, ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা চুরি করতেই যাচ্ছি। যদি কোন মানুষ বলতো, সাবধান, ধরতাম না। কিন্তু একটা পাখী ঠিক সই করবার সময় সাবধান হতে বলছে। আমার ভাই, মনটা কেন যেন সরছে না হাতে দড়ি পড়বে না তো ?

তলাপাত্র ॥ পাখীটা কার ? কোত্থেকে এলো—'এই চোর সাবধান', মুখে এই বুলিটি নিয়ে তোমার মত পুণ্যবানের ঘরে ?

পুণ্যবান ।। আর বলো কেন। আমার বিয়েতে এই একটি মাত্র যৌতুকই এসেছে। পাখীটা ছিল পূর্ণিমার বাবার। পুষেছিল পূর্ণিমা।

সমাদ্দার ॥ আরে, পাখী তো কত লোকেই পোষে, সে সব পাখী পড়ে রাধা-কৃষ্ণের নাম—ধর্মের কথা—ভালো ভালো কথা।

তলাপাত্র ॥ কিন্তু এ পাখীর একি সর্বনেশে বুলি ! কেনবা এই বুলিটাই শেখানো হল ঐ পাখীটাকে ?

পুণ্যবান ॥ পূর্ণিমাকে আমিও ঠিক এই কথাটাই জিজ্ঞেস করেছি।

সমাদ্দার ॥ কি উত্তর পেলে ?

পুণ্যবান ॥ ওদের পাড়ায় এক সময় খুব চুরি হতে থাকে। ওদের বাড়িতেও হয়। বুদ্ধিমান বাপ বুদ্ধি করে ময়নাটা কেনেন। পূর্ণিমার ওপর ভার দেন ময়নাটাকে এই বুলি শেখাবার।

তলাপাত্র ॥ তা' দেখছি পূর্ণিমা দেবী ভাল মাষ্টারণী।

সমাদ্দার ॥ হ্যাঁ। আমাদের পিলে চমকে গেছে।

তলাপাত্র ॥ তারপর আর বোধ হয় তোমার শ্বশুর-বাড়িতে চুরি হয়নি?

পুণ্যবান ॥ না। পূর্ণিমার এইটাই হয়েছে মস্ত এক গর্ব। পাখীটা সারারাত জেগে থেকে চোরদের সাবধান করে।

সমাদ্দার ॥ হ্যাঁ, তা' করে বটে। অন্ততঃ আমি এ টেণ্ডারে সই করব না। কুসংস্কার বলতে হয় বল, কিন্তু এটা কি ঠিক নয়, এমনি সব শুভ কাজে আমরা যখন যাই, তখন হাঁচি-টিকৃটিকিও মেনে থাকি, আর এ তো শুনলাম যেন একটা দৈববাণী।

তলাপাত্র ॥ আমারও তাই মনে হচ্ছে ভাই।

পুণ্যবান ॥ এত বড় একটা দাও—সামান্য একটা কারণে ছেড়ে দেবে? না-না, ছেলে-মানুষি করোনা।

সমাদ্দার ॥ না ভাই, পারবো না। এসব আমি বড মানি।

তলাপাত্র ॥ আমিও। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে, তার ওপর আমার এখন আবার শনির দশা চলছে। আচ্ছা, আজ উঠি।

সমাদ্দার ॥ হ্যাঁ। আজ উঠি। আমার গুরুদেব বলেছেন, কোন কাজের আগে মনটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখবি। যদি আলো দেখতে পাস এগিয়ে যাবি—আঁধার দেখলে কেটে পডবি।

তলাপাত্র ॥ হ্যাঁ। কেটেই পড়ছি আমরা আজ। ব্যবসা যদি চালাতে চাও, আগে ময়নাটি উড়িয়ে দাও।

সমাদ্দার ॥ তুমি বলছো উড়িয়ে দাও, আমি বলি ওর ঘাড মটকে ভবলীলা সাঙ্গ করে দাও। ওসব অযাত্রা নিজের বাড়িতে রাখতে নেই, পরের বাড়িতেও দিতে নেই।

পুণ্যবান ॥ পরের কথা ভাবছিনে নিজের কথাই ভাবছি। (হঠাৎ) আমি ভাই পাখীটাকে এখনি উড়িয়ে দিচ্ছি, পূর্ণিমা আসবার আগে।

তলাপাত্র ॥ তারপর?

পুণ্যবান ॥ চাকর-বাকরদের ওপর একচোট রাগা-রাগি করব আমি— "খাঁচার দরজাটা নিশ্চয় আলগা রেখেছিল, তাই পাখীটা উডে গেল" সে আমি ম্যানেজ করব'খন, তোমরা ভেব না। তোমরা বস। পাখীটা তাড়িয়ে দিয়ে আমিও এসে বসছি। সইটা ভাই আজই করা দরকার।

সমাদ্দার ॥ সে ভাই যা' করতে হয় কর, কিন্তু সই আজ হবে না।

তলাপাত্র ॥ কিন্তু টেণ্ডারটা কাল সকাল দশটায় দাখিল করতে হবে। (ভাবিয়া) সইগুলো আজ হওয়াই উচিত। আচ্ছা ভাই আমরা আসছি, যাত্রা বদল করে আসছি।

সমাদ্দার ॥ হ্যাঁ, সে বরং মন্দের ভালো। ইতিমধ্যে পাখীটাকে কিন্তু ভাই সাবাড় কর।

[তলাপাত্র ও সমাদ্দারের প্রস্থান। পুণ্যবান ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তারপর হঠাৎ বারান্দায় পাখীর খাঁচার দিকে চলিয়া গেলেন। অন্য দ্বার-পথে সিনেমা যাওয়ার সাজে সজ্জিতা পূর্ণিমা দেবীর প্রবেশ।]

পূর্ণিমা ॥ (কাহাকেও না দেখিয়া) কই! কোথায়!

[পুণ্যবানের প্রবেশ।]

পুণ্যবান ॥ এই যে পূর্ণিমা!··· ব্যাপার কি বলতো? তোমার ময়নাটা খাঁচাতে নেই!

পূর্ণিমা ॥ নেই! সেকি!!

[ছুটিয়া বারান্দায় গিয়া শূন্য খাঁচা দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন।]

পূর্ণিমা ॥ সত্যি তো, নেই। রামু নিশ্চয়ই খাবার দিতে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলো—

পুণ্যবান ॥ রামুকে এখনি আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।

পূর্ণিমা ॥ না না, সে কি! অতদিনের পুরোনো চাকর, সামান্য একটা ভুলের জন্য—না না, থাক।

পুণ্যবান ॥ থাকবে কি! তোমার অত আদরের পোষা পাখী—

পূর্ণিমা ॥ রামু চাকরটিও তোমার কম আদরের নয়। বরং ময়নাটা গেছে ভালোই হয়েছে। কষ্ট যে না হচ্ছে তা নয়, তবে এ সংসারে ওর ঐ বুলিটা বড় বেমানান মনে হচ্ছিল। এখানে চোর কোথায় যে সাবধান করবে!··কি ভাবছো? সিনেমায় যাবে না?

পুণ্যবান ॥ ভাবছিলাম, তুমি কি নির্মম। এই ক'দিনেই পাখীটার ওপর আমারই কেমন মায়া পড়ে গিয়েছিল। শোন, আজ সিনেমা থাক্। ঐ তলাপাত্র আর সমাদ্দার খুব বড় একটা বিজ্‌নেসের খবর নিয়ে এখনি আবার আসবে বলে গেল।

পূর্ণিমা ॥ বেশ তো, আমি তবে মামার বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি।

পুণ্যবান ॥ চট্ করে এসো কিন্তু। ব্যবসার কথাবার্তা সেরে এই রাতেই তোমাকে নিয়ে যেতে চাই হগ্ মার্কেটে। ময়না আমার একটা কিনতেই হবে তোমার জন্য। তার বুলিটা কিন্তু বেশ ভালো হওয়া চাই। কি বুলি পড়াবে তুমি এবার?

পূর্ণিমা ॥ (আনন্দোজ্জ্বল চোখে) 'তুমি আমার কাছে এস।'

পুণ্যবান ॥ **You naughty girl!** [গালটি টিপিল।]

পূর্ণিমা ॥ আচ্ছা আসি—

[হঠাৎ দরজায় শোনা গেল 'দুর্গা, দুর্গা।' সঙ্গে সঙ্গে আর একজন কে বলিয়া উঠিল—'আসবো?']

পুণ্যবান ॥ বন্ধুরা ফিরে এসেছেন। (তাঁহাদের উদ্দেশ্যে) এসো ভাই, এসো।

[সঙ্গে সঙ্গে তলাপাত্র ও সমাদ্দারের পুন প্রবেশ।]

তলাপাত্র ॥ এই যে বৌদি, নমস্কার।

সমাদ্দার ॥ নমস্কার।

পূর্ণিমা ॥ নমস্কার। আপনারা বসে আপনাদের বিজ্‌নেস করুন। আমি মামা-বাড়ি থেকে এখনি ঘুরে আসছি। আচ্ছা চলি।

[পূর্ণিমা বাহিরে চলিয়া গেলেন।]

তলাপাত্র ॥ (পুণ্যবানকে) পাখীটা ?

পুণ্যবান ॥ উড়িয়ে দিয়েছি।

সমাদ্দার ॥ যাক, বাঁচা গেল। পথ দিয়ে এখনি একটা মড়া নিয়ে যেতে দেখলাম। এবারকার যাত্রাটা মনে হচ্ছে শুভ।

তলাপাত্র ॥ হ্যাঁ। চটপট আগে সইগুলো সেরে ফেলা যাক।

[পুণ্যবান সঙ্গে সঙ্গে দেড়খানির কাগজগুলি তাহাদের সামনে রাখিলেন।]

তলাপাত্র ॥ ব্রহ্মময়ী তারা। বাঁচা, কর বাবা।

[সই করিতে গেলেন।]

সমাদ্দার ॥ খুব কম করেও চল্লিশ হাজার টাকার দাও—জয়মা কালী। পাঁঠা দেব মা।

[এমন সময় ময়না পাখীটি ডাকিয়া উঠিল—[illegible] সকলে চমকিয়া উঠিলেন। তলাপাত্র সই না করিয়া পরম বিরক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সমাদ্দারও। পুণ্যবান [illegible] গেলেন। দেরাজ [illegible] বাহির [illegible]]

তলাপাত্র। (পুণ্যবানকে) তুমি না পাখীটা উড়িয়ে দিয়েছিলে ?

সমাদ্দার ॥ ছিঃ ছিঃ! শুভ কাজে এ কি অযাত্রা!

[ইতিমধ্যে পুণ্যবান [illegible] এমন সময় পূর্ণিমা দেবীর পুনঃপ্রবেশ।]

পূর্ণিমা। বাইরে গিয়েই দেখলাম, ময়নাটা উড়তে উড়তে আবার ফিরে এলো।

[তিনি ছুটিয়া [illegible] আওয়াজ [illegible] গেল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিমা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

পূর্ণিমা ॥ য্যাঁ! এ কি!

[দ্বিতীয় বার [illegible] পুণ্যবানের প্রবেশ।]

পূর্ণিমা ॥ [পুণ্যবানকে] এ কি, তুমি! কাকে গুলি করলে ?

[দেখিবার জন্য ছুটিয়া [illegible] মুখে আর কোন কথা সরিল না। পূর্ণিমা পুনরায় ঘরে [illegible]]

পূর্ণিমা ॥ আমার ময়নাটা ফিরে এসেছিল তুমি তাকে গুলি করে মারলে ?

[পুণ্যবানের মুখে কোনো কথা সরিল না। অন্য দুই বন্ধুও নীরব রহিলেন।]

পূর্ণিমা ॥ আমার বাপের বাড়িতে ওটা যখন ছিল, তখন একটা চোর চুরি করতে এসে ওর বুলিতে চমকে ওঠে। পালাবার সময় চোরটা ওকে ঘাড় মটকে

মারবার চেষ্টা করেছিল। ততক্ষণে আমরা জেগে উঠে ছুটে আসায় বেঁচে গিয়েছিল। সে ছিল চোর। কিন্তু তুমি? তুমি কেন পাখীটাকে গুলি করে মারলে?

পুণ্যবান॥ আজ আমার কাছে এর কোন উত্তর তুমি পাবেনা পূর্ণিমা।

সমাদ্দার॥ পাবেন। উত্তর একদিন পাবেন।

তলাপাত্র॥ সেদিন বুঝবেন, ব্যাপারটা বড়ই মর্মান্তিক।

সমাদ্দার॥ আজ শুধু এইটুকু বলা যায় পূর্ণিমা দেবী, পুণ্যবানও চুরি করেছে—মন চুরি।

তলাপাত্র॥ [হাসিয়া] হেঃ হেঃ হেঃ—আপনার।

[সঙ্গে সঙ্গে টেণ্ডারের কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন]

পূর্ণিমা॥ আপনারা যে কি—আমি বুঝলাম না।

[বলিয়াই গম্ভীর ভাবে অন্দরে চলিয়া গেলেন। তিনবন্ধু পরস্পরের দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট করিবেন।]

যবনিকা

ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৬৫

যমালয়ে এক বেলা

[যমপুরী॥ বিচার-ভবন। সিংহাসনে যমরাজ অধিষ্ঠিত। তাহার দক্ষিণে নিম্ন আসনে যমরাজের খাস মুন্সী চিত্রগুপ্ত। দপ্তরে কতিপয় কর্মচারী খাতাপত্র পরীক্ষারত। যমালয়ে সদ্য আগত মনুষ্যবৃন্দের বিচার হইতেছে। কাঠগড়ায় আসামী দণ্ডায়মান। দণ্ডধারিগণ যথাস্থানে কর্তব্যরত।]

চিত্রগুপ্ত॥ তোমার নাম সাধুচরণ দাস?

আসামী॥ হ্যাঁ হুজুর।

চিত্রগুপ্ত॥ ধর্মাবতার! বিবেচনা করুন, নাম ছিল সাধুচরণ, কিন্তু এমন অসাধু কাজ ছিলনা, যা জীবদ্দশায় এ আসামী করেনি।

সাধুচরণ॥ দোহাই যমরাজ দোহাই ধর্মাবতার। যা করেছি, পেটের দায়ে [হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল

যমরাজ॥ থামো। সাধুচরণ অথচ অসাধু! পিতৃদত্ত নামের এমন অমর্যাদা! চিত্রগুপ্ত, আসামীর খতিয়ান—

[জনৈক কর্মচারী আসামীর খতিয়ান খাতা আগাইয়া দিল।

চিত্রগুপ্ত॥ [খাতা পরীক্ষা করিয়া] অন্নপ্রাশনে পিতৃদত্ত নাম দেখা যাচ্ছে, হাবুলচন্দ্র। স্কুলে হাবুল হয় হরিবল্লভ। স্কুলে একটিমাত্র বিদ্যাই শেখে। তা হলে—চুরি-বিদ্যা। প্রথম অপরাধ পাচ্ছি,—পণ্ডিতের টিকি-কাটা।

সাধুচরণ॥ না। পড়িয়ে খালি ঘুমোতেন হুজুর।

ছিলে—অন্ততঃ নিজেদের মধ্যে। আজকাল এ-ও খুব বিরল। খুসী হলাম চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্ত ॥ হুজুর—ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ আমি এর দণ্ডের কথা ভাবছি।

সাধুচরণ ॥ (হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) দয়া করুন হুজুর।

যমরাজ ॥ না, না, নরকভোগ তোমাকে করতেই হবে। তবে ঐ সাধুতাটুকু তোমার ছিল বলে, নিকৃষ্ট তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্তে তোমাকে উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হবে।

সাধুচরণ ॥ জয় ধর্মরাজ—জয় ধর্মরাজ!

যমরাজ ॥ (দণ্ডধারিগণের প্রতি) নিয়ে যাও। পরের আসামী।

[জনৈক দণ্ডধারী সাধুচরণকে লইয়া গেল। অন্য একজন দণ্ডধারী জনৈকা মহিলা আসামীকে আনিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিল।]

চিত্রগুপ্ত ॥ (খাতা দেখিয়া) তোমার নাম—কামিনী দেবী।

মহিলা ॥ কামিনী নয়,—সে নাম ছিল শিশুকালে। পরে আমার নাম হয়—কামনা দেবী।

চিত্রগুপ্ত ॥ (খাতা পরীক্ষা করিয়া) হ্যাঁ, এই যে—তাও রয়েছে। (যমরাজকে) ধর্মাবতার, কামনা নামটা এর মিথ্যা হয়নি। কামনার আগুনে নিজে সারা জীবন পুড়েছে, অপরকে পুড়িয়েছে। শেষটায় আত্মহত্যা করেছে। আশা ছিল, সব জ্বালা তাতে জুড়োবে।

কামনা ॥ কই জুড়োলো? আরো বেড়ে গেছে। দোহাই ধর্মরাজ! তোমার পায়ে পড়ি। আমার স্মৃতিশক্তিটা তুমি ধ্বংস কর।

যমরাজ ॥ (চিত্রগুপ্তকে) অভিনেত্রী ছিল বোধ হয়?

চিত্রগুপ্ত ॥ ধর্মরাজের অনুমান মিথ্যা নয়। শুধু রঙ্গমঞ্চে নয়, সংসার রঙ্গমঞ্চেও এর পেশাই ছিল অভিনয়। অভিনয় ক'রে বহুলোককে কামনার আগুনে করেছে দগ্ধ।

যমরাজ ॥ সংখ্যা?

চিত্রগুপ্ত ॥ [খাতা দেখিয়া] রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগারে লালসা-দগ্ধ লক্ষ লক্ষ দর্শকের হিসাব দিয়ে আমি ধর্মাবতারের ধৈর্যচ্যুতি করতে চাই না। এক সংসার-রঙ্গমঞ্চেই এই নারীর কামনার আগুনে দগ্ধ হয়েছে—সতেরো হাজার নয় শত সাড়ে তিরাশি জন।

যমরাজ ॥ সাড়ে তিরাশি জন মানে?

চিত্রগুপ্ত ॥ আজ্ঞে, স্কুল-কলেজের তরুণদের অর্ধেক বলেই গণনা করা হয়।

যমরাজ ॥ ও, হ্যাঁ, কিন্তু আত্মহত্যা করলো কেন?

চিত্রগুপ্ত ॥ প্রেমার্তা হয়ে ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ কিরূপ?

কামনা ॥ আমাকে বলতে দিন ধর্মাবতার—আমাকে বলতে দিন। বলতে পারলে—আমার এই দুঃসহ জ্বালা হয়তো কিছুটা জুড়োবে।

যমরাজ ॥ বেশ! বেশ।

কামনা ॥ আমার যখন বারো বৎসর বয়স—জীবনের অথবা যৌবনের যখন কোন খবরই আমার কাছে পৌঁছেনি, তখন আমার পিতামাতা ধনলোভে অন্ধ হ'য়ে আমার বিবাহ দেন—এক ধনকুবের বৃদ্ধের সঙ্গে।

যমরাজ ॥ সত্য চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ॥ সত্য ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ (চিত্রগুপ্তের প্রতি) অসত্য বললেই তুমি তা' ঘোষণা করবে। (কামনাকে) বল।

কামনা ॥ যৌবনে পদার্পণ করার আগেই হলাম বিধবা। আমার জাগ্রত যৌবনে প্রেমের পরশ আমি পেলাম না ধর্মরাজ। নিষেধ আর নিষেধের গণ্ডিতে দেখলাম আমিই শুধু বন্দিনী। কিন্তু চারিদিকেই আমার কামনার সমারোহ। অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়ে মুক্তির সন্ধানে এক সাধুর শরণাপন্ন হলাম। সংসার-আশ্রম থেকে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন তিনি তাঁর সন্ন্যাস আশ্রমে। ধর্মের নামে কি ব্যভিচার চলে—তা দেখলাম আমি সেখানে। দেখলাম, সন্ন্যাসী নয়—পশু।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্ত ॥ মিথ্যা নয় প্রভু।

কামনা ॥ সন্ন্যাসীর আবরণে পশু। পুরুষ জাতটার ওপরেই দাঁড়িয়ে গেল আমার ঘৃণা। পুরুষ কাউকে দেখলেই মনে হতো মিথ্যার ছলনা। আমিও ক্ষেপে উঠলাম—'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। সেদিন থেকেই শুরু হলো আমারও ছলনার অভিযান।

যমরাজ ॥ তার অর্থ?

চিত্রগুপ্ত ॥ তার অর্থ বেশ্যাবৃত্তি ধর্মরাজ। প্রেমের অভিনয়ে এমন দক্ষ হলো যে, রঙ্গমঞ্চে সাড়া পড়ে গেল।

কামনা ॥ হ্যাঁ ধর্মরাজ। রঙ্গমঞ্চেরও সেরা অভিনেত্রীর সম্মান আমি পেলাম। কিন্তু এই অভিনয়ই হলো আমার কাল। জীবনে কোনো পুরুষকেই ভালবাসতে পারিনি—ভালবাসিনি। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিলো। হঠাৎ একদিন আমি আবিষ্কার করলাম, আমি ভালবেসে ফেলেছি—যে নাটকে আমি নায়িকার অভিনয় তখন করছিলাম, সেই নাটকেরই নায়ককে। প্রেমার্তা আমি—নিবেদন করলাম তাকে আমার প্রেম। সে তা' বিশ্বাস করলো না। স্পষ্ট বললো,—সেও নাকি আমার অভিনয়। আমারই চোখের সামনে সে ভালবাসলো থিয়েটারের নগণ্যা এক সখীকে। সইতে পারলাম না ধর্মরাজ,—এ পরাজয় আমি সইতে পারলাম না। নাটকে আমার ভূমিকাতে ছিল বিষপানে

মৃত্যু-বরণ। একদিন সেই অভিনয়কেই আমি সত্য করলাম—সত্যিকার বিষপানে।

যমরাজ॥ বল কী? মরতে গিয়েও তুমি দর্শকদের ছলনা করেছো? নরক-বাস তোমার অনিবার্য। (দণ্ডধারীদের প্রতি) যাও নিয়ে যাও।

কামনা॥ (উন্মত্তবৎ চিৎকার করিয়া) তাতে আমার দুঃখ নেই—আমি যাচ্ছি, কিন্তু দোহাই ধর্মরাজ, আমার স্মৃতিশক্তিটা ধ্বংস করে দাও—আমার স্মৃতিশক্তিটা ধ্বংস করে দাও।

[জনৈক দণ্ডধারী তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।]

যমরাজ॥ চিত্রগুপ্ত!

চিত্রগুপ্ত। প্রভু!

যমরাজ॥ পৃথিবীটার কি হ'ল!

চিত্রগুপ্ত॥ সভ্যতা আর সংস্কৃতির পথে নাকি দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। আর একটি নমুনা দেখুন।

[ইঙ্গিত মাত্র জনৈক দণ্ডধারী এক আসামীকে আনিয়া কাঠগড়ায় খাড়া করিল।]

চিত্রগুপ্ত॥ তুমি রামহরি গড়গড়ি?

রামহরি॥ হ্যাঁ, হুজুর। দণ্ডবৎ হই হুজুর।

[আভূমি নত হইয়া প্রণামের চেষ্টা]

চিত্রগুপ্ত॥ থাক্—থাক।...তেল-ঘির ব্যবসা!

রামহরি॥ ব্যবসাও বটে, আবার ব্যবসা নাও বটে। মানে, ডান হাতে আনা—বাঁ হাতে ছাড়া—এই যা। কোনো রকমে পেটের ভাত হচ্ছিল হুজুর। তা' এরই মধ্যে সমনজারী হলো। কিছুই গুছিয়ে রেখে আসতে পারিনি হুজুর।

চিত্রগুপ্ত॥ (যমরাজকে) তেল-ঘি গুদামজাত করে—তাতে ভেজাল মিশিয়ে ঠাকুর-দেবতার নামে মার্কা করে—বাজারে ছাড়া ছিল এর ব্যবসা। আর এই ব্যবসা করে লোকটা হয়েছিল কোটিপতি। আবার বলছে কিনা —কোন রকমে পেটের ভাত হচ্ছিল।

রামহরি॥ টাকার কথা বলবেন না হুজুর,—এক হাতে এসেছে, আর একহাতে গেছে। খবরের কাগজগুলো সঙ্গে আনতে পারিনি হুজুর, নৈলে দেখিয়ে দিতাম—এমন দিন খুব কমই গেছে, যেদিন প্রথম পাতায় আমার দান ধ্যানের খবর—আমার ছবি ছাপা হয়নি।

যমরাজ॥ একথা সত্য চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত॥ তা সত্য ধর্মরাজ। কিন্তু এটা আরো মারাত্মক এইজন্য যে, এই সব দান-ধ্যানের ঢাক পিটিয়ে—ধর্মের মুখোস পরে—এমনভাবে অধর্মের কাজ করে যায় যে, কেউ সন্দেহ করে না। এদের ব্যবসার এটা একটা ফিকির। ভেজাল খাইয়ে গোটা দেশটাকেই এরা উচ্ছন্নে দিচ্ছে ধর্মরাজ।

যমরাজ॥ কী হে?

রামহরি ॥ আজ্ঞে, আপনারা স্বর্গের দেবতা—মাটির মানুষকে চেনেন না হুজুর। লোক বুঝেই খায়। দেশে আজ খাঁটি লোক কোথায় যে খাঁটি খাবার রুচবে? এতোকাল ভেজাল খেয়ে খেয়ে খাঁটি জিনিস লোকের আর হজমও হয়না। ভেজালটাই আজ সয়ে গেছে—খাঁটি আর সইছে না।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্ত ॥ প্রভু।

যমরাজ ॥ কথাটা খাঁটি কিনা, তদন্ত করে দেখবে।

চিত্রগুপ্ত ॥ তা, না হয় দেখবো ধর্মাবতার। কিন্তু তাই বলে এর দোষ-স্খালন হচ্ছেনা। খাঁটির দাম আদায় করে ভেজাল চালানো—এ একটা সাংঘাতিক পাপ। সারাজীবন লোককে ঠকিয়েছে—দান-ধ্যান করে আরো বেশী ঠকিয়েছে—আর, চরম ঠকিয়েছে মরতে বসে।

যমরাজ ॥ বলো কী হে চিত্রগুপ্ত? মরতে বসেও লোককে ঠকিয়েছে?

রামহরি ॥ না হুজুর। বরং আমি বলবো, আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে—তবেই হুজুরের কাছে এসেছি। ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে যখন সরেই এসেছি, মন খুলেই বলছি হুজুর। যখন বুঝলাম, আর বাঁচবো না—একশো আট টাকা ফিয়ের ডাক্তারও যখন মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল, তখন হুজুর, কেন যেন মনে একটু অনুতাপই এলো। ভেবে দেখলাম, সারাজীবন লোককে ঠকালাম,—শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করে যাই,—নইলে কোন্ মুখে আপনার সামনে এসে দাঁড়াবো। আর কৈফিয়ৎই বা দেবো।

যমরাজ ॥ বটে।

রামহরি। হ্যাঁ ধর্মাবতার। তারপর [illegible] বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সব শেষ দেখা করতে এলো। [illegible] বললাম—আর কী দেখছো [illegible]—চললাম। সারাজীবন মানুষকে [illegible]। [illegible] করেছি—এমন করে ঠকিয়েছি, তা হয়তো তোমরা [illegible] কল্পনাও করোনি, আমি ঠকিয়েছি। এখন বুঝছি, নিজেই ঠকেছি। যদি তোমরা আমার আপনজন হও—যদি তোমরা আমার সদগতি চাও, আমার শেষ অনুরোধটি রাখো।"

যমরাজ ॥ বটে? কী অনুরোধ?

রামহরি ॥ জীবের কল্যাণে আমার এই দেহ-দানের অনুরোধ ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ সে আবার কী হ-য-ব-র-ল?

রামহরি ॥ আজ্ঞে ধর্মাবতার। মরে গেলে ওরা আমাকে চন্দন কাঠে গব্য ঘৃতে পোড়াতো। কিন্তু এই পাপ দেহের ভস্ম কারোর কোন কাজেই লাগতো না ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ বটে।

রামহরি ॥ হ্যাঁ ধর্মাবতার। তাই আমি তাদের কাছে আমার শেষ প্রার্থনা জানালাম,—"এ পাপ দেহ তোমরা পুড়িও না গো, পুড়িও না।"

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত ?

চিত্রগুপ্ত ॥ মিথ্যা নয় প্রভু।

যমরাজ ॥ মৃতদেহ পোড়াবে না ? কেন ?

রামহরি ॥ জীবের কল্যাণে ধর্মাবতার। বেঁচে থেকে কারুর কোন উপকার করিনি—মৃতদেহটায় জীবের উপকার হোক—মানুষের না হোক, পশুপক্ষীর হোক। সেইভেবেই সকলের হাতে ধরে এই অনুরোধই জানিয়ে আমি শেষ বিদায় নিলাম—"আমি মলে এ অঙ্গ না পুড়িয়ে ভাগাড়ে দিও ফেলে—পশু পক্ষীকে নিবেদন করে। শকুনেও যদি আমায় ছিঁড়ে খায়—একটা কাজ হবে—দেহটা তবু কিছু সার্থক হবে—খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে আমার জীবনব্যাপী পাপের।" হয়নি কি তা ধর্মরাজ ?

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত ?

চিত্রগুপ্ত ॥ আমিতো বলেছি ধর্মরাজ, মরতে বসেও সবাইকে এ লোকটা ঠকিয়ে এসেছে।

যমরাজ ॥ (বিরক্ত হইয়া) তুমি বলছো কী চিত্রগুপ্ত? যতো পাপই লোকটা করে থাক না কেন, এই চরম অনুতাপে—জীবকল্যাণে এই পরম দানে তার কী প্রায়শ্চিত্ত হয়নি বলতে চাও চিত্রগুপ্ত ?

চিত্রগুপ্ত ॥ তবে শুনুন ধর্মরাজ। (খাতা দেখিয়া) লোকটার মৃত্যু হলো। অন্তিম-মিনতি অনুযায়ী এর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এর মৃতদেহ না পুড়িয়ে ভাগাড়েই দেয় ফেলে। পুলিশ খবর পেয়ে—সম্পত্তির লোভে হত্যাকাণ্ড সন্দেহ করে। সঙ্গে সঙ্গে এর সেই শ্মশান—মানে, ভাগাড়-বন্ধুদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তারা সবাই হাজতে পচছে।

যমরাজ ॥ বলো কী হে ?

চিত্রগুপ্ত ॥ হ্যাঁ প্রভু। অতগুলো লোক যাতে ধনে-প্রাণে মারা যায়, ও ব্যবস্থা করে—তবে এ লোকটা মরেছে।

যমরাজ ॥ কী হে ?

রামহরি ॥ আমি মারা যাওয়ার এ খবরটা আমি জানতাম না হুজুর। এই খবরটাই আমি জানবার জন্যে ছটফট করছিলাম ধর্মাবতার। ছোট হুজুরের দয়ায় খবরটা পেয়ে প্রাণটা আমার ঠাণ্ডা হলো ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ বলো কী হে ? কেন বলতো ?

রামহরি ॥ হুজুর। ভেজাল ব্যবসা করতে গিয়ে ঝড়ঝাপটা সবই গেছে আমারই ওপর দিয়ে। ঘুষঘাষ, জরিমানা—যা কিছু দিতে হয়েছে—দিতে হয়েছে আমাকেই। আর ও শালারা সব আমার টাকাতে শুধু মজাই লুটে গেছে—গায়ে কারো এতোটুকু আঁচড় লাগেনি। পাপের ফলভোগ আমি একাই করবো,—এতো আর হয়না হুজুর। তাই, আসবার সময় আমি ওদের ঐ ব্যবস্থাই করে এসেছি। আর সে ব্যবস্থাটা যে এমন সুফল প্রসব করেছে তা' জেনে আর আমার কোনো দুঃখ নেই। হুজুর যে শাস্তি দিতে হয় দিন—আমি প্রস্তুত।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত! লোকটি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। একে কী দণ্ড দেবো, অথবা দণ্ড দেবো কিনা—খুব সূক্ষ্মভাবে আমাকে বিচার করে দেখতে হবে। এই বিচার মুলতুবি রইলো। পরবর্তী আসামী!

রামহরি ॥ জয় ধর্মরাজ—জয় ধর্মরাজ।

(দণ্ডধারী কর্তৃক অপসারিত হইল।)

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্ত ॥ ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ ক্রমাগত অধার্মিক আসামীদের বিচার করে করে কেমন একটা অবসাদ বোধ করছি। আজকের মৃত্যুর তালিকাটা আমায় দেখতে দাও।

চিত্রগুপ্ত ॥ এই যে প্রভু—(তালিকাটি যমরাজের হস্তে দিলেন)।

যমরাজ ॥ (তালিকা পরীক্ষা করিয়া দণ্ডধারীদের প্রতি) শ্রীশ্রীস্বামী পরমানন্দ অবধূত মহারাজ—আনো।

[আদেশমাত্র জনেক দণ্ডধারী তৎক্ষণাৎ মহারাজকে আনিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিল।]

চিত্রগুপ্ত ॥ নাম—শ্রীশ্রীস্বামী পরমানন্দ অবধূত মহারাজ?

পরমানন্দ ॥ লক্ষ লক্ষ ভক্তের দ্বারা আমি ঐ নামেই অভিহিত ধর্মাবতার।

ভক্তদের কাছে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান বলে নিজেকে প্রচার করেছিলে?

পরমানন্দ ॥ আমাকে কিছুই করতে হয়নি ধর্মাবতার ভক্তরাই ঐরূপ বিশ্বাসে আমাকে পুজো করতো।

যমরাজ ॥ তুমি তার প্রতিবাদ করেছিলে কখনো?

পরমানন্দ ॥ না ধর্মরাজ এ বিশ্বাসের কথা। আর, এরূপ বিশ্বাসে বাধা দিলে তাদের মনে ব্যথা দেওয়াই হতো। ভক্তের মনে ব্যথা দিতে আমার মন সরেনি ধর্মরাজ

যমরাজ ॥ বটে। তুমি তবে ভগবান?

পরমানন্দ ॥ আমি তো বলেছি ধর্মরাজ, আমি ভগবান কিনা,—এটা ভক্তদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। কেউ যদি আমাকে ভগবান বিশ্বাসে পুজো করে, অন্ততঃ তার কাছে আমি ভগবানই। বিশ্বাসের এই সোজা পথে ভগবান লাভ করা—অতি সহজ।

যমরাজ ॥ এই মহাপ্রভুর ভক্তদের কী গতি হয়েছে, চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ॥ তা অনেকের পরমাগতি লাভ হয়েছে ধর্মরাজ।

পরমানন্দ ॥ হতেই হবে। জানেন তো ধর্মরাজ,—"বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর!" সোজা কথা—সোজা পথ।

চিত্রগুপ্ত ॥ ধর্মরাজ। ইনি ভগবান—এই অন্ধবিশ্বাসে এর পুজোপকরণ যোগাতেই বহু ভক্ত সর্বস্বান্ত হয়েছে—বহু ধনী দেউলিয়া হয়ে গেছে—অনেকের স্ত্রীপুত্র পথে বসেছে।

পরমানন্দ ॥ ঈশ্বরকে যাঁরাই লাভ করতে চেয়েছেন, এমনি সব দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে দিয়েই তাঁরা তা লাভ করেছেন।

চিত্রগুপ্ত ॥ কিন্তু তাদের এই দুঃখ-দৈন্য তোমার সুখ-ঐশ্বর্যের কারণ হয়েছে। তাদের রিক্ত করে তুমি হয়েছো বিত্তশালী।

পরমানন্দ ॥ ভক্তের দান আমাকে নিতেই হবে ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত। মহাপ্রভুর আয়ের পরিমাণ?

চিত্রগুপ্ত ॥ (খাতা পরীক্ষান্তে) আমাদের খাতায় দেখতে পাচ্ছি ধর্মাবতার দশ লক্ষ সাতাশ হাজার তিন শত পাঁচ টাকা আট আনা সতেরো গণ্ডা তিন কড়া এক ক্রান্তি। কিন্তু ওঁর আয়করের খাতায় উনি দেখিয়ে এসেছেন—তিন হাজার ছয় শত নয় টাকা মাত্র।

যমরাজ ॥ (পরমানন্দকে) সত্য?

পরমানন্দ ॥ সম্পূর্ণ সত্য ধর্মরাজ। মহামান্য চিত্রগুপ্ত বর্ণিত টাকার সংখ্যাও সত্য, আমার উল্লিখিত আয়ের পরিমাণও সত্য। প্রথমটা হলো গিয়ে অপ্রকাশ্য দান, আর পরেরটা হলো গিয়ে প্রকাশ্য আয়। আয়করটা আয়ের উপরই দেওয়া বিধি। আমি তাই-ই দিয়ে এসেছি।

যমরাজ ॥ যা বলছো, তা কি আয়কর বিভাগ মেনেছে?

পরমানন্দ ॥ না মেনে উপায় ছিলনা ধর্মাবতার। দানের হিসাব রাখতে আমাদের কোন খাতাপত্র থাকেনা।

যমরাজ ॥ বল কি হে? এতো টাকা, আর তার কোনো হিসাব থাকে না?

পরমানন্দ ॥ আজ্ঞে, কেন থাকবে না ধর্মরাজ। সে হিসাব থাকে আমাদের মনের খাতায়—প্রাণের পাতায়।

যমরাজ ॥ হুঁ! আয়করের নাগালের বাইরে তোমার হিসাব মতো ঐ অল্প-স্বল্প আয়টা হয়েছে কোত্থেকে?

পরমানন্দ ॥ আজ্ঞে দেখুন ভক্তরা ছাড়ে না। আধি-ব্যাধি কার নেই বলুন? এমন আকুল হয়ে সবাই কাঁদবে যে, হয় তাবিজ-কবচ, না হয় ওষুধপত্র—একটা কিছু দিতেই হয়। নইলে ভিড় ঠ্যাকানো যায় না ধর্মরাজ। তা এসবের আবার একটা খরচ আছে। তাই, দক্ষিণাই বলুন, আর প্রণামীই বলুন,—ভক্তরাই দিয়ে থাকে। যতো বলি নোবো না, শুনছে কে? অবোধদের ধারণা—এসব যদি না নিই, ব্যাধির প্রায়শ্চিত্ত হবেনা—ফলও কিছু হবে না।

যমরাজ ॥ তা ফল কিছু হতো?

পরমানন্দ ॥ একটা কিছু দিলে—হয় ফল হবে, আর না হয় হবে না। যাদের ফল হলো—হলো। যাদের হ'লনা—তারা দেখলো, অপরের যখন ফল হয়েছে সুফল ফলেছে, তখন তাদের নিশ্চয়ই ভক্তির অভাব ছিল—বিশ্বাসের অভাব ছিল। দোষটা তাদেরই।

যমরাজ ॥ মানে; এ নিয়ে মাথাটা তারাই ঘামাতো,—তোমার ঘামাতে হতো না—কেমন?

পরমানন্দ ॥ আপনি সর্বজ্ঞ। আপনাকে বুঝিয়ে বলবার মতো আমার কিছুই নেই ধর্মরাজ।

চিত্রগুপ্ত ॥ তা বটে! কিন্তু একটা জিনিস তো ভাল বোঝা যাচ্ছেনা অবধূত। উপাধিতে বোঝা যাচ্ছে তুমি সন্ন্যাসী, কিন্তু আচরণে দেখা যাচ্ছে, তুমি বিষয়ী, গৃহী। তোমার আশ্রমে যে কামিনীকাঞ্চনের সমারোহ ছিল, রাজ-সংসারেও তা বিরল।

পরমানন্দ ॥ আপনারা সর্বদ্রষ্টা। আপনার কথা যথার্থ মহামান্য চিত্রগুপ্ত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী স্মরণ করুন,—

"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।"

আমার নীতিও ছিল তাই।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ॥ স্বামীজি মিথ্যা বলেননি। কাঞ্চনের অঙ্ক পূর্বেই পেশ করেছি। এবার কামিনীর সংখ্যাটা শুনুন। স্বামী পরমানন্দ মহারাজ ষোল শত একজন নারীর স্বামী, তন্মধ্যে বৈধের সংখ্যা তিনশ কুড়ি।

যমরাজ ॥ ওরে বাবা! বলো কী চিত্রগুপ্ত! সমাজে এ নিয়ে আন্দোলন হয়নি?

চিত্রগুপ্ত ॥ হবে কী করে ধর্মাবতার? সবই যে হয়েছে ধর্মের নামে—ধর্মের আবরণে।

যমরাজ ॥ তা ঠিক। ধর্মের নামেই সব চেয়ে বেশী অধর্ম হয়ে থাকে দেখছি। খৃষ্ট, বুদ্ধ,—জগতের প্রায় সব ধর্মপ্রচারকেরাই শান্তি ও অহিংসাই পরম ধর্ম বলে ঘোষণা করে গেছেন। কিন্তু সেই সব ধর্মাবলম্বী লোকেরাই শান্তির নামে, ন্যায়ের নামে কী হানাহানি—কী রক্তারক্তিই না করছে। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না চিত্রগুপ্ত। ধর্মের নামে অধর্ম হচ্ছে—বাইরের লোক না দেখুক, কিন্তু এদের ভেতরের লোকেরা তো এ সব অনাচার—এ সব ব্যভিচার স্বচক্ষে দেখছে। তারা কেন এর প্রতিবাদ করে না—এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় না? মানুষ কি আজ এতো নীচে নেমে গেছে?

চিত্রগুপ্ত ॥ ভেতরের লোকেরা হয় এর সম্মোহনী শক্তিতে আচ্ছন্ন—অন্ধ, নতুবা কামিনী-কাঞ্চনের প্রসাদ-লুব্ধ।

যমরাজ ॥ (পরমানন্দের প্রতি) তুমি কী গুরুতর পাপ করেছো—বুঝতে পারছো অবধূত?

পরমানন্দ ॥ কেন বুঝবো না প্রভু? আমি ইচ্ছা করেই পাপ করেছি ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ কী সর্বনাশ! তুমি কী বলছো অবধূত? আর তা বলছো আমার সামনে? তোমার শেষ বিচারে?

পরমানন্দ ॥ হ্যাঁ প্রভু। ইচ্ছা করে পাপ করেছি। কারণ আমি জানি, —ঈশ্বর করুণাময়—ঈশ্বর দয়াময়। সে করুণা—সে দয়া কার জন্য? পাপীর জন্য—তাপীর জন্য। পাপ করলে তবেই না ক্ষমা—তবেই না করুণা! আমি জানি আমার মতো পাপীও কেউ নেই,—ঈশ্বরের মতো পাপঘ্নীও কেউ নেই।

"মৎসম পাতকী নাস্তি।
পাপঘ্নী ত্বৎসম নহি।"

আমি যত পাপই করে থাকি না কেন, তাঁর কৃপা পারাবারের তুলনায় তা অতি তুচ্ছ—অতি নগণ্য। নয়কি ধর্মরাজ?

চিত্রগুপ্ত ॥ প্রভু!

যমরাজ ॥ লোকটি খুব চালাক।

চিত্রগুপ্ত ॥ মর্ত্য থেকে আজকাল যে সব চালান আসছে, বেশীর ভাগই এ-ই।

যমরাজ ॥ তাই দেখছি। লোকটি সত্যিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। একে কী দণ্ড দেবো, অথবা দণ্ড দেবো কিনা—সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে হবে।

পরমানন্দ ॥ জানি মহারাজ,—"ধর্মস্য সূক্ষ্ম গতি।" আমার আশা-ভরসা ঐখানেই।

যমরাজ ॥ এর বিচার আজ মুলতুবী থাক্।

চিত্রগুপ্ত ॥ আমাদের প্রচলিত দণ্ডবিধি বড় সেকেলে—বড় পুরোনো হয়ে গেছে ধর্মরাজ। এটাও কিন্তু ভেবে দেখবার বিষয়।

যমরাজ ॥ তা ভাববো, কিন্তু আজ আমি ক্লান্ত। আর একটি মাত্র বিচার আজ আমি করবো। আজকের তালিকা—

চিত্রগুপ্ত ॥ এই যে ধর্মাবতার।

[চিত্রগুপ্ত তালিকাটি যমরাজের নিকট পেশ করিল]

যমরাজ ॥ (তালিকাটি পরীক্ষা করিয়া) দেশনেতা স্বদেশ চৌধুরী। দেশনেতা যখন,—ভালো লোকই হবেন বোধহয়। ডাকো—স্বদেশ চৌধুরী।

চিত্রগুপ্ত ॥ কিন্তু ধর্মাবতার—

যমরাজ ॥ না, না, চিত্রগুপ্ত, আজ আমি বড় ক্লান্ত—বেশী ঝামেলায় যেতে চাই না।

[চিত্রগুপ্ত নীরব হইলেন। দণ্ডধারী বাহিরে গিয়া স্বদেশ চৌধুরীকে লইয়া আসিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিল।]

চিত্রগুপ্ত ॥ তোমার নাম স্বদেশ চৌধুরী?

স্বদেশ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আমার বন্ধুরা আমাকে "দেশপ্রদীপ" আখ্যাও দিতে চেয়েছিলেন এক সময়, কিন্তু আমি রাজী হইনি।

যমরাজ ॥ তাই নাকি! পেশা নেতাগিরি?

স্বদেশ ॥ আজ্ঞে,—দেশ-সেবা।

চিত্রগুপ্ত ॥ আমার খাতায় দেখতে পাচ্ছি ধর্মাবতার, দেশ-সেবা নয়—পেশা ছিল নেতাগিরি।

স্বদেশ ॥ তাও বলতে পারেন। দেশের লোক আমাকে ভালবেসেই তাদের নেতা করেছিল। আজ এই চরম বিচারের দিনে এ কথা বলতে আমার কুণ্ঠা নেই সে নেতৃত্বের মর্যাদাও আমি রেখেছি। দেশকে পরাধীনতার অশুচি থেকে মুক্ত করতে যে মুষ্টিমেয় নেতা জীবন পণ করেছিলেন—বহু ত্যাগ স্বীকার করে জাতিকে অবশেষে জয়-গৌরবে বিভূষিত করেছিলেন—দেশ-মাতৃকাকে পরাধীনতার নাগ-পাশ থেকে মুক্ত করেছিলেন—আমিও তাঁদেরই একজন। এ কথা আমি নিজমুখে ঘোষণা করতে লজ্জা অনুভব করছি। তবু এই শেষ বিচারে তা না বলেও উপায় নেই, কারণ খবরের কাগজগুলো সঙ্গে আনতে পারিনি। একটা আত্মজীবনী লেখা শুরু করেছিলাম—শেষ হবার আগেই ডাক এলো, খালি হাতেই চলে আসতে হলো।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত!

চিত্রগুপ্ত ॥ আসামীর দলীয় কাগজগুলো এই সব কথাই চিরদিন ফলাও করে বলেছে। বিরুদ্ধ দলের কাগজগুলো উল্টো গান গেয়েছে। কিন্তু ধর্মাবতার, খবরের কাগজের প্রমাণ এ বিচারালয়ে অপ্রাসঙ্গিক—অচল।

যমরাজ ॥ তাওতো বটে। তোমার খতিয়ানে কী দেখছো, চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ॥ আমার খতিয়ানে যা দেখছি, তাতে আমিই বিপন্ন বোধ করছি ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ কেন? কেন চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ॥ আমাদের দণ্ডবিধি দস্তুরমত সংশোধন করতে হবে এই দেশ-প্রদীপের নাগাল পেতে।

যমরাজ ॥ কেন—কেন চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ॥ আমি জেরা করছি,—আপনি দেখুন ধর্মাবতার। (আসামীর প্রতি) চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলা—এই যে একটা চালাকি মতে চালু আছে, সেই নীতিটাই কলাবিদ্যা হিসাবে তুমি প্রয়োগ করেছিলে—তোমার দেশ-সেবার সর্ব আন্দোলনে। এ কথা কি তুমি অস্বীকার করবে?

স্বদেশ ॥ কখনও না। সারা জীবনেই আমি এই নীতি প্রয়োগ করেছি আমার আন্দোলনে। করেছি ইচ্ছা করে। আমি বুঝেছিলাম, দেশকে মুক্ত করতে হ'লে তার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে,—দিতে হবে রক্ত—দিতে হবে জীবন। বিদেশী রাজশক্তিকে গোপনে সাবধান করে দিতাম বলেই তারা পূর্বাহ্নেই থাকতেন প্রস্তুত। তাঁদের কাবু করা হতো না সহজ। লড়াইটা হতো ধোরালো, আমাদের যুবশক্তিকে তাই বরণ করতে হতো অসীম দুঃখ—অবর্ণনীয় কষ্ট—অপরিসীম আত্মত্যাগ। জানেন তো ধর্মরাজ, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ

সম্পন্ন হয়না। স্বাধীনতা-অর্জনের মতো একটা মহৎ কাজ যাতে চালাকিতে না হয়, সেই ব্যবস্থাই আমি করেছিলাম, ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত! এটা দোষ না গুণ?

চিত্রগুপ্ত ॥ আমার দণ্ডবিধি ভাবগ্রাহী। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছলের আশ্রয় গ্রহণ করা ক্ষমার্হ বিবেচিত হ'তে পাবে রাজনীতিতে। প্রচলিত রাজনীতিতে এ ব্যক্তি ক্ষমার্হ। কিন্তু আমি নিবেদন করবো ধর্মরাজ, এ লোকটির এই ছলের পশ্চাতে স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধি ভিন্ন কোন মহৎ উদ্দেশ্যই ছিল না। দেশের যাঁরা স্বাধীনতা সত্যিই চেয়েছিল, এ লোকটি সেই কোটি কোটি লোকের কেউ নয়! এ লোকটি মুষ্টিমেয় সেই কতিপয় লোকের অন্যতম—যারা অন্যের স্বাধীনতা স্পৃহাকে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছিল।

যমরাজ ॥ সাংঘাতিক!

চিত্রগুপ্ত ॥ আরো সাংঘাতিক এই জন্য যে, দেশের লোক এর মৃত্যুকে মহাপ্রয়াণ বলছে—শহরে শহরে শোক-সভা করছে।

স্বদেশ ॥ আপনি আমাকে ভুল বুঝতে পারেন মহামান্য চিত্রগুপ্ত। কিন্তু আমি জানি, দেশের লোক আমাকে ভুল বুঝবে না। এ বিষয়ে আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাও দূর করলেন আপনি। দেশের লোক আমার শোকে সত্য সত্যই কাঁদে কিনা, মারা যাওয়ায় সেটা জানতে পারছিলাম না। যমপুরীতে এসে সবচেয়ে যে জিনিসটার অভাব বড় বেশী অনুভব করছিলাম, সেটা হলো একখানা খবরের কাগজ। তা' যাক, খবরটা আমি আপনার কাছেই পেলাম—দেশের লোক শহরে শহরে আমার মৃত্যুতে শোকসভা করছে।

চিত্রগুপ্ত ॥ তা করছে। কিন্তু এটা শুনে আপনি অবাক হয়ে যাবেন ধর্মরাজ,– এই সব শোকসভা অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের এই দেশপ্রদীপ স্বদেশ চৌধুরী তাঁর দলের হাতে প্রচুর টাকা রেখে এসেছেন।

স্বদেশ ॥ আমি প্রতিবাদ করছি ধর্মরাজ। এ টাকা আমি দিইনি, দিয়েছে দেশের লোক—তুলেছি আমি। মহাপ্রাণ নেতাদের মৃত্যুতে শোকসভা অনুষ্ঠানের জন্য একটা ফাণ্ড থাকাই উচিত। কর্তব্য বুদ্ধিতে এ রকম একটা ফাণ্ড আমি স্থাপন করে এসেছি। আমার জীবদ্দশাতেও মহাপুরুষদের এমনি স্মৃতি-পূজা আমিও বহুবার করেছি এই ফাণ্ডেরই সাহায্যে। আমার মৃত্যুতে, আমার বন্ধুরাও আজ সেই কর্তব্য পালনই করছে, এতে অন্যায়ের কি আছে ধর্মরাজ?

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্ত ॥ অন্যায়টা ফাণ্ড খোলাতে নয় ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ তবে?

চিত্রগুপ্ত ॥ ভাল কাজের নামে ফাণ্ড খুলে ফাণ্ডের সেই টাকা ডান হাত বাঁ হাত করাতে।

যমরাজ ॥ এ লোকটি কি তাই করেছে?

চিত্রগুপ্ত ॥ করেছে কিনা আসামীর নিজমুখেই শোনা যাক, ধর্মাবতার। শুধু স্মৃতি-পূজার স্মৃতি-রক্ষার ফাণ্ড কেন? ওঁর সুদীর্ঘ নেতৃত্বকালে অমন বহু ফাণ্ড

উনি স্থাপন করেছেন, এই ধরুন,—যেমন দুর্ভিক্ষবোধ ফাণ্ড—বন্যা-ত্রাণ ফাণ্ড—সমাজ-সেবা ফাণ্ড—এক কথায় যখনই দেশে কোনো আপদ বিপদ দেখা দিয়েছে, ও প্রাণই কেঁদেছে সকলের আগে—সবচেয়ে বেশী।

স্বদেশ ॥ দুঃখীর দুঃখ দূর করতে এগিয়ে যাওয়াটা কি অধর্ম হয়েছে ধর্মরাজ? তবে হয়তো মহামান্য চিত্রগুপ্ত তাঁর খতিয়ান দেখে একথা বলবেন, দুঃখীর দুঃখ দূর করতে গিয়ে নিজের ভাত-কাপড়ের দুঃখও আমি খানিকটা লাঘব করেছি। আমি বলবো, আমি তা করেছি। সারা জীবন আমার এই মূলমন্ত্র ছিল,—"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্ত ॥ ধর্মরাজ! লোকটি মিথ্যা বলেনি। দুঃখীর দুঃখ-ত্রাণে কাজও যে কিছু না হয়েছে, তাও নয়—তবে, দশ আনা ছ'আনা—কোন কোন ক্ষেত্রে আধা-আধি—এই হারে। মানে—দশ আনা বা আট আনা এই সব কর্ম-কর্তাদের পকেটেই গেছে।

স্বদেশ ॥ যেতে পারে—তা যেতে পারে ধর্মাবতার। আর্তত্রাণের কাজেও একটা খরচা আছে। কোন্ কাজে খরচা নেই? এমন কি মড়া পোড়ানো—তাও তো বিনি পয়সায় হয় না। মহামান্য চিত্রগুপ্ত এই সব অনিবার্য খরচা সম্পর্কেই বোধহয় কটাক্ষ করছেন, ধর্মরাজ। কিন্তু সব খরচারই হিসাব আছে। যাঁরা চাঁদা-টাঁদা দেন, তাঁদের নামও আমরা খবরের কাগজে ছেপে দিই। সব কিছুই অডিট্ হয়। ফাণ্ডের কার্য-নির্বাহক সমিতিতে এ সব হিসাব আমি পাশ করিয়েও এসেছি। দোষটা আমার কোথায়,—এখনো বুঝলাম না ধর্মরাজ।

চিত্রগুপ্ত ॥ বেশ, বেশ, এসবও আমরা বুঝেছি। কিন্তু শুধু বক্তৃতা আর নেতাগিরি করে বাড়ি আর গাড়ীর মালিক হলে কি করে—এটা আমাদের বুঝিয়ে দাও দেখি, দেশ-প্রদীপ স্বদেশ চৌধুরী?

স্বদেশ ॥ হুজুর ধর্মাবতার! এসব হচ্ছে গিয়ে—আমার প্রিয় দেশবাসীর অজ্ঞাত দান—গোপন দান। হুজুররা অন্তর্যামী—সবই তো জানেন। তবে হ্যাঁ, একটা বিষয় আমার বলার আছে—আমি বলবোও। নেতাগিরি করা মানে পুষ্পশয্যায় থাকা নয়। ঝড়-ঝাপ্টা অনেক কিছুই সইতে হয়। আর তার জন্য শক্তি চাই—স্বাস্থ্য চাই—অদম্য উৎসাহ চাই। তাই এ সবের খোরাকও চাই। আর এ খোরাক—নেতাগিরির প্রাপ্যও বটে। বলতে আজ আমার আনন্দই হচ্ছে,—দেশবাসী আমার এ খোরাক ইচ্ছায় হোক—অনিচ্ছায় হোক বরাবর জুগিয়ে এসেছে। আর তা জুগিয়ে এসেছে বলেই—আমি আমরণ নেতৃত্বের শক্তি পেয়েছি—যে সে শক্তি নয়, বিপ্লবের শক্তি—যে-শক্তি স্বাধীনতা-অর্জনের পরও আপোষহীন সংগ্রামে মত্ত ছিল।

যমরাজ ॥ আপোষহীন সংগ্রাম! সেটা আবার কি?

স্বদেশ ॥ আজ্ঞে, বিশ্বশান্তির জন্য বিরামহীন সংগ্রাম!

যমরাজ ॥ ওরে বাবা ! চিত্রগুপ্ত—!

চিত্রগুপ্ত ॥ প্রভু !

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত ! এই পরমাত্মাটিকে আমি কোথায় রাখবো চিত্রগুপ্ত ?

চিত্রগুপ্ত ॥ ইনি আমাদের প্রচলিত আইনের বাইরে—আমিতো বলেছি ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ হ্যাঁ, তুমি বলেছো। আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি। নরকে এর স্থান হবে বলে মনে হচ্ছে না।

স্বদেশ ॥ আমি জানি—আমি জানি। আমার দেশের লোক—স্বর্গেই আমার সদ্গতি হোক—প্রতিটি শোকসভায় কামনা করছে। এখন ধর্মরাজের দয়া।

যমরাজ ॥ আমি ভেবে দেখছি—আমি ভেবে দেখছি। ওরা এত এগিয়ে গেছে, আর আমরা এত পিছিয়ে আছি। যাক আজকের মতো বিচার শেষ।

স্বদেশ ॥ ধর্মরাজ জিন্দাবাদ—ধর্মরাজ জিন্দাবাদ—ধর্মরাজ জিন্দাবাদ।

যবনিকা

সংহতি, আশ্বিন, ১৩৬১

বিবসনা

রাত তখন অনেক। দিব্যেন্দু সবে ঘুমিয়েছে। ঘরে জ্বলছে নীল রঙের বাল্ব। বিনতা এবার শুতে যাবে। একবার আড়মোড়া ভেঙে নেয় বিনতা। এগিয়ে যায় জানালার কাছে। বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে। আবার দু'হাতের চেটোয় চোখ মুছে তাকায় ভাল করে, তারপর ছুটে এসে দিব্যেন্দুকে ডাকে।

বিনতা ॥ এই শোনো, ওঠো—

দিব্যেন্দু ॥ আঃ।

বিনতা ॥ ওঠো বলছি।

দিব্যেন্দু ॥ নাঃ কাঁচা ঘুমটা ভেঙে দিলে।—কেন বলতো ?

[ধড়মড় করে দিব্যেন্দু উঠে বসে]

বিনতা ॥ বাগানে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দিব্যেন্দু ॥ এত রাতে !

বিনতা ॥ হ্যাঁ···একটা সোমত্ত মেয়ে···

দিব্যেন্দু ॥ বলকি। কই ?

বিনতা ॥ এখন অবশ্য দেখছিনা। কিন্তু দেখেছি। এমন কিছু দেখেছি যা বলতে বাধে।

দিব্যেন্দু ॥ বলকি রানী !

বিনতা ॥ হ্যাঁ। তুমি তো দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলে, আমার ঘুম

গেল না। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চমৎকার জ্যোৎস্না—সারা পৃথিবী ঘুমাচ্ছে—শুধু চাঁদ জেগে আছে আর আমি।…হঠাৎ—

দিব্যেন্দু ॥ বল!

বিনতা ॥ হঠাৎ দেখলাম হাসনুহানার ঝোপের ধারে—

দিব্যেন্দু ॥ একটা সোমত্ত মেয়ে। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে রানী!

[দিব্যেন্দু হেসে ওঠে]

বিনতা ॥ আমি স্পষ্ট দেখলাম…তবু বলবে মাথা খারাপ হয়েছে?

দিব্যেন্দু ॥ পাঁচিল ঘেরা বাড়ি—রাত দুপুর—আর তুমি দেখলে একটা মেয়ে হাসনুহানার ঝোপে—

বিনতা ॥ শুধু কি তাই? বলতে বাধছে…

দিব্যেন্দু ॥ কি?

বিনতা ॥ কাপড় নেই।

দিব্যেন্দু ॥ মানে ন্যাংটো।

বিনতা ॥ হ্যাঁ।

[illegible]

দিব্যেন্দু ॥ তুমি দেখেছো?

বিনতা ॥ আমি দেখেছি।

দিব্যেন্দু ॥ মনে হয় কেউ এখানে রয়েছে?

বিনতা ॥ কি করে বলব। এদিক ওদিক তাকালো। একবার। দুবার। এগুলো চারদিক চেয়ে দেখলো, তারপর যেন হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে সরে গেল!

দিব্যেন্দু ॥ কোথায়?

বিনতা ॥ ঝোপের আড়ালে

দিব্যেন্দু ॥ ন্যাংটো?

বিনতা ॥ হ্যাঁ। কিন্তু তুমি বল…আমি এসব কি দেখলাম। লোকজন ডাকো—দেখাতে হবে।

দিব্যেন্দু ॥ তুমি স্পষ্ট দেখেছ ন্যাংটো?

বিনতা ॥ হ্যাঁ গো হ্যাঁ…

দিব্যেন্দু ॥ মনে করে দেখ—পরনে সাদা কাপড় ছিল না তো!

বিনতা ॥ না। আমি স্পষ্ট দেখেছি। অমন জ্যোৎস্না। না, ভুল আমি করিনি। সাদা থান কাপড় কেন?

দিব্যেন্দু ॥ না, একটা কথা মনে পড়ল তাই।

বিনতা ॥ কি কথা?

দিব্যেন্দু ॥ আমার এক জ্যাঠাইমা, অনেক কাল আগে অপঘাতে—

বিনতা ॥ মানে…মানে তুমি বলতে চাও—

দিব্যেন্দু ॥ হঁ্যা, অনেকে দেখেছে—

বিনতা ॥ দেখেছে ?

[বিনতার চোখ বিস্ময়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়]

দিব্যেন্দু ॥ বলে তো তাই।

বিনতা ॥ না, এ সে হবে কেন। এ ভরা যুবতী মেয়ে। আর কই, সে সব কথা তো আমি শুনিনি। এও তো হতে পারে যে, আমি যে এখানে এসেছি বা আছি ও মেয়েটি শোনেনি।

দিব্যেন্দু ॥ মানে ?

বিনতা ॥ হয়তো এমন-ও অনেক এসেছে !

[বিনতার গলায় যেন একটা বাঁকা সুর বেজে ওঠে]

দিব্যেন্দু ॥ মানে, তুমি বলতে চাও—

বিনতা ॥ আমি কিছুই বলতে চাইনা। কিন্তু বলবই না বা কেন—

দিব্যেন্দু ॥ বল।

বিনতা ॥ রাত দুপুরে, তোমার শোবার ঘরের লাগাও বাগানে এসব দেখবে এ যদি জানতাম—

এবার ধ্বনিত হয় অভিমান

দিব্যেন্দু ॥ বানী।

বিনতা ॥ লোকজন ডাকো বলছি। ডাকো চল আমি নিজে যাব

দিব্যেন্দু ॥ চল—কিন্তু—কিন্তু শোন বানী—

বিনতা ॥ যাবে না ?

দিব্যেন্দু ॥ যাব না কেন। কিন্তু লোকজন নিয়ে গিয়ে কিছুই দেখবো না। তুমি জানো না—এমন অনেকবার হয়েছে।

বিনতা ॥ ভূতের ভয় বলতে চাও ?

দিব্যেন্দু ॥ জানিনা কি। জ্যাঠাইমা এসেছিলেন বিধবা হয়ে বাবার কাছে আশ্রয় চাইতে। বাবা রাজী হননি। জ্যাঠাইমা বললেন মোকদ্দমা করবো—এ বাড়িতে আমার অধিকার আছে—ভাত কাপড় দিতে তুমি বাধ্য। বাবা রেগে করলেন অপমান। পরদিন ভোর বেলায় দেখা গেল ঐ আমগাছটায় তার পরনের কাপড়খানি ফাঁস দিয়ে তিনি—

বিনতা ॥ ঐ· ঐ। দেখেছ ?

জানালা দিয়ে তাকিয়ে বিনতা আবার আঁৎকে ওঠে

দিব্যেন্দু ॥ কিন্তু এতো···সত্যিই তো।

বিনতা ॥ একি তোমার জ্যাঠাইমা ?

দিব্যেন্দু ॥ না··কিন্তু···তবু

বিনতা ॥ তবু বলবে জ্যাঠাইমা! বলো স্বর্গে কাপড় নেই, কনট্রোল, তাই—

দিব্যেন্দু ॥ কিন্তু ও মানুষ নয়—মানুষ নয় বানী। কোন যুবতী মেয়ে অমন ন্যাংটো হয়ে! দাঁড়াও—

বিনতা ॥ আমি জানতে চাই এসব কি?

দিব্যেন্দু ॥ না না শোন। এটা বিজ্ঞানের যুগ। গুলি ছুঁড়ে দেখবো ওটা কি।

[দিব্যেন্দু লাফিয়ে উঠে দোনালা বন্দুকটা টেনে নেয়—জানলা দিয়ে নিশানা করে বাইরে। তারপরই বন্দুকটা গর্জন করে ওঠে আর বাইরে একটা আর্তনাদ ওঠে। কালক্ষেপ সূচক অন্ধকার। একটু পরেই আলো জ্বলে উঠলে দেখা যায় ঘরের আলোটা জ্বালানো আর দিব্যেন্দুর বিছানায় শোয়ানো একটা নারীমূর্তি আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা। দিব্যেন্দু বন্দুক হাতে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে—আর বিনতাও দাঁড়িয়ে অ[illegible] খাটের বাজুতে হাত রেখে।

নারীমূর্তি ॥ আমায় মেরেছ…ভালই করেছ…ভালই করেছ। আঃ-ওঃ-

দিব্যেন্দু ॥ কে তুমি? তুমি কে?

নারীমূর্তি ॥ কৈবর্তদের মেয়ে ফুলি। একখানা কাপড়। একখানা কাপড়। মাত্র একখানা কাপড় সাত জায়গায় জোড়া তালি দিয়ে… কোন রকমে…আঃ…

দিব্যেন্দু ॥ কোথায় সে কাপড়?

নারীমূর্তি ॥ সন্ধ্যেবেলা তালপুকুরে গা ধুতে গিয়ে… ভাবলাম কাপড়খানা ভিজলে আর তো নেই, তাই খুলে রেখে…ডুব দিয়েছি, উঠে আর পেলাম না…কে চুরি করে পালিয়েছে।

বাড়ির বুড়ো চাকর গোবিন্দ ঢোকে]

দিব্যেন্দু ॥ ডাক্তার এসেছে?

গোবিন্দ ॥ আসছেন

দিব্যেন্দু ॥ হাঁ, তারপর?

নারীমূর্তি ॥ হঠাৎ দেখলাম কারা আসছে। তোমাদের খিড়কির দোর খোলা ছিল। ঢুকে পড়লাম, ঝোপের ভেতর থেকে দেখলাম তোমাদের দারোয়ান সব দরজায় তালা দিয়ে গেল। আর পালাতে পারলাম না। আঃ-ওঃ, তা বাবু গুলি করে মেরে ভালোই করলে। আমি বেঁচে গেলাম।

যবনিকা

'ন্যাংটো মেয়ে' নামে প্রথম প্রকাশ
শারদ সংখ্যা অগ্রদূত, ১৩৫২

বোমা

অধ্যাপক সদাশিব ভট্টাচার্যের বাসভবনে উপবেশন কক্ষ। ডাক্তার জগবন্ধু বোস সদাশিবের স্ত্রী শ্রীমতী দিগম্বরী দেবীকে পরীক্ষা করিতেছেন। দিগম্বরী বাল্যকালে টাইফয়েড রোগাক্রান্তা হইয়া বাক শক্তি হারাইয়াছিলেন। স্বামী বহু চিকিৎসা করাইয়াও তাঁহার লুপ্ত বাকশক্তি আজ পর্যন্ত ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। ডাক্তার বোস এইরূপ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ। তিনি কিন্তু হতাশ হন নাই।

জগবন্ধু ॥ (দিগম্বরীকে) আর একবার চেষ্টা করে দেখুন তো দিগম্বরী দেবী। বলতে চেষ্টা করুন 'আ-মি ক-থা ব-ল-বো।'

[প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু মুখ হইতে গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া আর কোনো কথা বাহির হইল না। কথা বলিবার প্রাণপণ প্রযাসে দিগম্বরী অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অবশেষে হতাশ ভাবে সোফায় বসিয়া পড়িয়া মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—'পারলাম না।']

সদাশিব ॥ (ডাক্তারকে) থাক থাক, ওকে আর কষ্ট দিয়ে দরকার নেই। দেখছো ডাক্তার, সামান্য ঐ ক'টা কথা বলতে গিয়ে কি রকম অবসন্ন হয়ে পড়েছে!

জগবন্ধু ॥ আচ্ছা দিগম্বরী দেবী, আপনি যান। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

[দিগম্বরী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

জগবন্ধু ॥ তবে এও জেনে যান দিগম্বরী দেবী, আমি এখনো হাল ছাড়িনি। এ আশা আমি এখনো রাখি, কথা আপনার মুখে ফুটবেই। আর যখন ফুটবে তখন একেবারে খৈ ফুটবে।

[দিগম্বরী ডাক্তারকে ইঙ্গিতে বলিলেন 'আপনি যাবেন না' আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি]

(সদাশিবকে) কি যেন বলতে চাইলেন।

সদাশিব ॥ ওর না-বলা বাণী আমি বুঝি। বলছে, 'আপনি যাবেন না, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

[ডাক্তার আনন্দে সম্মতি জানাইলেন]

জগবন্ধু ॥ আচ্ছা সদাশিব, তুমি ঠিক জানো, দিগম্বরী দেবীর বাল্যকালে যে ব্যারামে বাকশক্তি লোপ হয়েছিল, সে ব্যারামটা টাইফয়েডই কি?

সদাশিব ॥ হ্যাঁ টাইফয়েডেই।

জগবন্ধু ॥ এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই?

সদাশিব ॥ না। আমি তখন ওদের বাড়িতে থেকে পড়তাম। দিগম্বরীর বাবা ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। বাবা তখন রাজপুতানার জয়পুরে চাকরী

করতেন। বন্ধুর কাছে আমায় কলকাতায় রেখে পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। দিগম্বরী আর আমি প্রায় এক সঙ্গেই মানুষ হয়েছি। ওর টাইফয়েড হলে ওর সেবা-শুশ্রূষাও করেছি আমি। তাই ঘটনাটা আমি ঠিকই জানি।

জগবন্ধু।। রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি!

সদাশিব।। বলতে হয় বল, কিন্তু ব্যাপারটা খুব ট্র্যাজিক। টাইফয়েডের পরেই দিগম্বরী হয়ে গেল বোবা। কিন্তু বোবা হলেও শশীকলার মত সে দিন দিন বাড়তে লাগলো। বিয়ের বয়স হলো। একে বোবা তায় লেখাপড়া শিখতে পারেনি। বাপেরও এমন কিছু পয়সা ছিলনা—শুধু রূপ দেখে বিয়ে করতে কোন ছেলেই রাজি হলোনা। ওর বাবা তখন চেষ্টা করতে লাগলেন দোজবরে বিয়ে দিতে—বুড়ো বরেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু দিগম্বরী তাতে ক্ষেপে গেল—মরীয়া হয়ে দাঁড়ালো, বিয়ের কথা কেউ তুললেই তাকে কামড়াতে যেত।

জগবন্ধু।। ওরে বাবা, আর শেষে কিনা তাঁকে বিয়ে করলে তুমি?

সদাশিব।। হ্যাঁ আমি। আমি তখন এম.এ. পাশ করেছি। বাবা জয়পুর কলেজেই আমার জন্য ভালো একটা চাকরী জোগাড় করেছেন। আমি যাবো শুনে দিগম্বরী এমন ছেলেমানুষি শুরু করলো, সে কি বলবো! প্রথমে আমার ওপর হলো একচোট মারধোর, শুরু হলো আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়িয়ে গেল যে, সেটা যেমন লজ্জাকর তেমনি মর্মান্তিক।

জগবন্ধু।। পরের ঘটনাটা আমি বেশ অনুধাবন করতে পারছি সদাশিব। এদ্দিন এক সঙ্গে এক ছাতের তলে থাকা—মায়া মমতা না এসে পারেনা। তা ছাড়া যৌবনেরও একটা মোহ আছে তার ওপর দিগম্বরী দেবীর ছিল যাকে বলে লোভনীয় স্বাস্থ্য। কিন্তু তোমার বাবা এ বিয়েতে সম্মত হলেন?

সদাশিব।। সেটাই খুব আশ্চর্য। বন্ধুকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে বাবার কৃতজ্ঞতার অভাব হলো না। কলকাতায় এসে তিনি শুধু বিয়ে দিলেন না, আমাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে আনন্দ করে বললেন, খুব বেঁচে গেলে বাবা। বোবা বৌ হলে সংসারে অনেক সুখ, অনেক শান্তি।

জগবন্ধু।। (হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে) তা তোমার বাবা মিথ্যা বলেননি। প্রবীণ লোক। অনেক কিছু দেখেছেন, অনেক কিছু ঠেকে শিখেছেন।

সদাশিব।। (হাসিয়া) তুমি ধরেছ ঠিক। আমার মা-বাবার মধ্যে বনিবনাটা একটু কম। অবশ্য সংসার অচল হবার মত কিছু নয়। ঐ শুনছো।

[নেপথ্য হইতে দিগম্বরীর গোঁ গোঁ শব্দ ভাসিয়া আসিল। স্পষ্ট বোঝা গেল তিনি কথা বলিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন।

জগবন্ধু।। হ্যাঁ, কথা বলতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এবং এ-ও তোমাকে বলে রাখছি প্রফেসর, কথা ওঁর মুখে খৈ ফুটবেই—আজই হোক বা কালই হোক। আমি চিকিৎসার ত্রুটি রাখিনি। Latest treatment-ই আমি করেছি।

সদাশিব ॥ তোমাকে ভাই আমি ধন্বন্তরী বলেই জানি।

জগবন্ধু ॥ সেটা তোমার বাড়াবাড়ি। আবার কাল খবর নেব।

[এমন সময় ভৃত্য কৈলাস চায়ের ট্রে রাখিয়া গেল।]

সদাশিব ॥ না না বসো। চা এসে গেল যে!

জগবন্ধু ॥ না না, Excuse me please! (ঘড়ি দেখিয়া) আমার আর একটা ভারী জরুরী কল্ আছে। কথায় কথায় আমার বড্ড দেরী হয়ে গেছে। কাল এসে চা খাবো।

[প্রস্থান করিতে উদ্যত এমন সময় একটি সুদর্শনা তরুণী বাহির হইতে প্রবেশ করিলেন।]

জগবন্ধু ॥ (তরুণীকে) নমস্কার! আপনি ঠিক সময় এসে গেছেন কেকা দেবী। আপনার চা রেডি। চা খেতে খেতে আপনার নোতুন কবিতা প্রফেসরকে পড়ে শোনান, দেখবেন রস আরো জমে উঠবে।

[ডাক্তার বোস ঝড়ের বেগে কথাগুলি বলিয়া ঝড়ের বেগেই চলিয়া গেলেন]

সদাশিব ॥ এস কেকা, এস। চাটা ঢালো—তারপর কবিতার খাতা খোলো।

কেকা ॥ (চা ঢালিতে ঢালিতে সস্মিত মুখে) খুব উল্লাস দেখছি আজ তোমার শিবুদা। ব্যাপার কি?

সদাশিব ॥ মনে হচ্ছে দিগম্বরীর মুখে আবার কথা ফুটবে। তোমার কবিতার খাতা খোল কেকা। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' জাতীয় কোন একটা লেখা শোনাও।

কেকা ॥ দিগম্বরী দেবীর মুখে কথা ফুটলে আমার কথাটি ফুরোবে, নটে গাছটি মুড়োবে, বুঝলে, শিবুদা।

সদাশিব ॥ কেন, একথা বলছো কেন কেকা?

কেকা ॥ বৌদির মুখে ভাষা ছিলনা বলেই আমার ভাষা তোমার কানে উঠেছে। বৌদি চোখ পাকিয়ে তা শুধু দেখেছেন, নিতান্ত বোবা বলেই বাধা দেন নাই।

সদাসিব ॥ না-না। মুখে কথা ফুটুক, দেখো উনিও আমাদের কাব্যালোচনায় যোগ দেবেন সানন্দে—গরম চা আর মুখরোচক শিঙাড়া হাতে।

কেকা ॥ তোমরা মেয়েদের মনটা আজও বুঝলে না শিবুদা। কেন ভুলছ আমি তোমার বন্ধু নই, বান্ধবী। তোমার বন্ধুকে তিনি ভালবাসবেন, মানে, বিশ্বাস করবেন, বান্ধবীকে নয়।

[দেখা গেল, দিগম্বরী উঁকি দিয়া ইঁহাদের দেখিয়া গেলেন।]

সদাশিব ॥ দিগম্বরীর ওপর তুমি অবিচার করছ কেকা।

কেকা ॥ তোমার এ কথার খানিকটা দাম আমি হয়তো দিতাম, যদি না তিনি এইমাত্র আমাদের উঁকি দিয়ে দেখে না যেতেন।

সদাশিব ॥ তাই নাকি? দেখে গেলেন?

কেকা ॥ আমার চোখে পড়তেই সরে গেলেন। এইটেই স্বাভাবিক।

সদাশিব ॥ হবে। কিন্তু, আমি তো কারণ ভেবে পাইনা। দিগম্বরী তেমন শিক্ষিতা নয়—সত্য, কিন্তু, তাই বলে এতটা অনুদার হবে কেন?

কেকা ॥ ওটা মেয়েদের ধর্ম। শিক্ষিতাই হোক আর অশিক্ষিতাই হোক—মেয়েরা স্বামীকে চায় পুরোপুরি, ষোল আনা।

সদাশিব ॥ কি বিপদ! তোমার সঙ্গে বসে কাব্যালোচনা করব, এতে স্বামীকে পুরোপুরি পাওয়া না পাওয়ার সঙ্গে কি সম্পর্ক?

কেকা ॥ ওটা তুমি বুঝবে না, আমি বুঝি।

সদাশিব ॥ তুমি আবার কি বুঝবে! তুমি তো বিয়েই করনি।

কেকা ॥ বিয়ে করিনি সত্যি, কিন্তু তাই বলে কাউকে ভালোবাসিনি, তাই বা তুমি কি করে মনে করছো শিবুদা?

সদাশিব ॥ বটে! বটে!

কেকা ॥ থাক এসব কথা। একটা কথা আজ জেনে রাখো শিবুদা। দিগম্বরী দেবীর মুখে কথা ফুটলে, আমার মুখে আর কথা সরবে না। আমার কবিতা তার ছন্দ হারাবে, হয়ে যাবে নীরস গদ্য। কেন হবে—সে তুমি বুঝবে না শিবুদা।

[ইতিমধ্যে পাশের ঘরে দিগম্বরীর কণ্ঠ শোনা গেল। সদাশিব ও কেকা চমকাইয়া উঠিলেন। আনন্দে চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া আসিলেন দিগম্বরী।]

দিগম্বরী ॥ আমি কথা বলবো। আমি কথা বলছি।

[কিন্তু তাঁহার এত উদ্যম ও উচ্ছ্বাস [illegible] দেখিলেন [illegible] স্বামীর পাশে বসিয়া রহিয়াছেন [illegible] বেকাবে [illegible]]

তুমি এখানে কেন? সোমত্ত মেয়ে তুমি পরপুরুষের গা ঘেঁসে বসে কেন? লজ্জা করে না? এদ্দিন কথা বলতে পারিনি—তাই এ সব বেহায়াপনা চুপ করে সহ্য করেছি, কিন্তু আজ আর সইবো না। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

সদাশিব ॥ (চরম বিব্রত হইয়া) ছিঃ। দিগম্বরী, শোন, শোন—

দিগম্বরী ॥ ছিঃ? তার মানে মচ্ছে? আমার ঝাঁটাগাছটা কোথায়? রসো, তোমাদের দু'জনকেই আমি দেখছি।

[ঝাঁটা আনিতে অন্দরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাসন পত্র ছুঁড়ে মারবার শব্দ এল]

কেকা ॥ এইবার বোঝো, আমার কথা সত্য কিনা এইবার বোঝো শিবুদা। একি! এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার। বাসনপত্র ছুঁড়ে মারছে!

সদাশিব ॥ ছিঃ! ছিঃ! (ঊর্ধ্বে তাকিয়ে) হে ঈশ্বর, আমার দিগম্বরী আবার বোবা হোক, তা' না হলে দেখছি রক্ষে নেই—

কেকা ॥ তুমি ভুল করছো শিবুদা। বছরের পর বছর ঈশ্বরকে ডেকে দিগম্বরী দেবীর জন্যে আজ তুমি যে বর লাভ করেছ, তোমার এক দিনের প্রার্থনায় তিনি সে বর ফিরিয়ে নেবেন বলে মনে হচ্ছেনা।

দিগম্বরী ॥ (অন্যঘরে), কই, পাচ্ছি না তো! কোথায় গেল ঝাঁটা-গাছটা? আজ ঝেঁটিয়ে সব পাপ বিদেয় করব।

সদাশিব ॥ পালাও কেকা, এখনি পালাও। বাসনপত্র ছুঁড়ে মারছে। টেবিল চেয়ার ভাঙছে। রণচণ্ডী মূর্তি দেখছি।

কেকা ॥ তোমারো পালানো উচিত শিবুদা। ঐ পায়ের শব্দ পাচ্ছি—ঐ ঝাঁটার শব্দ। এদিকেই আসছে শিবুদা, এদিকেই আসছে।

সদাশিব ॥ ওরে বাবা! তাই তো! আমার বাবা যে বড় জ্ঞানী ছিলেন আজ বুঝছি।

[উভয়ের পলায়ন। অন্যদিক হইতে ঝাটা হস্তে দিগম্বরীর প্রবেশ।]

দিগম্বরী ॥ পালিয়েছে। একেবারে জোড়ে। (স্বামীর উদ্দেশ্যে) কিন্তু তুমি? তুমি পালিয়ে যাবে কোথায়? পিণ্ডি গিলতে বাড়ি আসতে হবে না? আজ আমার মুখ খুলেছে—বান ডেকেছে আমার মুখে। কে রুখবে, এস, আজ কথার বোম মেরে উড়িয়ে দেব সব। আজ এ পাড়ার কোনো চালে কাক চিলটি বসতে দেব না। হাঃ—হাঃ—হাঃ (ঝাঁটা হস্তে উন্মত্তবৎ নৃত্য।)

[কালক্ষেপক অন্ধকারান্তে]

কয়েকদিন পরের ঘটনা। অধ্যাপক সদাশিব ভট্টাচার্যের সেই উপবেশন কক্ষ। সদাশিব ক্লান্ত দেহে একটি আরাম কেদারায় অধশয়ান রহিয়া একটি সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ভৃত্য কৈলাসের প্রবেশ। তাহার হাতে একটি ধুমায়িত ধুপদানি]

সদাশিব ॥ কর্ত্রী কোথায়?

কৈলাস ॥ শানওয়ালা ডেকে আঁষ বঁটিতে ধার দেওয়াচ্ছেন।

সদাশিব ॥ ওরে বাবা! কেন রে?

কৈলাস ॥ দরকার পড়েছে, দিচ্ছেন।

[বাইরের কলিং বেল বাজিয়া উঠিল]

সদাশিব ॥ ঐ বুঝি জগবন্ধু-ডাক্তার এলেন। দেখ কৈলাস, ধুপ-ধুনাতেও আমার গায়ের গন্ধ যাচ্ছেনা। ডাক্তারকে ঘরে এনে সেণ্টের শিশিটা দিয়ে যাস।

কৈলাস ॥ আজ্ঞে কর্তা। (চলিয়া যাইতেছিল)

সদাশিব ॥ শোন কৈলাস। কর্ত্রীর মেজাজটা এখন কেমন বুঝছিস?

কৈলাস ॥ ও হ'লো গিয়ে শালগ্রামের শোয়া-বসা, —বোঝা দায়।

[কৈলাস বাহিরের দরজায় গিয়া ডাক্তারকে লইয়া আসিল]

সদাশিব ॥ আরে এসো, এসো ডাক্তার। গিন্নী তোমাকে পরশুদিন কল্ দিয়েছিলেন। এলে আজ। সাহস খুব! তবে আজ ভালই হয়েছে। আমাকেও দেখতে হবে।

জগবন্ধু ॥ কেন তোমার আবার কি হল প্রফেসর?

[ইতিমধ্যে কৈলাস সেণ্টের শিশি আনিয়া দিল]

সদাশিব ॥ আমার গায়ে দুর্গন্ধ পাচ্ছো না একটা? (কৈলাসকে) ও দু'এক ফোঁটা সেণ্টে কিছু হবে না, শিশিটা গায়ে ঢেলে দে।

জগবন্ধু ॥ আরে রাখো রাখো, ব্যাপার কি?

সদাশিব ॥ (সেণ্টের শিশিটা হাতে লইয়া কৈলাসকে) আচ্ছা তুই যা। পাঁচ মিনিট পর তোর কর্ত্রীমাকে বলবি ডাক্তার সাহেব এসেছেন।

কৈলাস ॥ খবর দেব পাঁচ মিনিট পর, সে কি কর্তা, তবে কি আমার রক্ষে আছে!

সদাশিব ॥ আরে বাপু তা না হলে আমার রক্ষে নেই। যা।

[কৈলাসের প্রস্থান]

জগবন্ধু ॥ ব্যাপার কি প্রফেসর, ব্যাপার কি? একটা ভীষণ কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে।

সদাশিব ॥ আমার গায়ে কোনো গন্ধ পাচ্ছো?

[ডাক্তার সদাশিবের গা শুঁকিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বমির উদ্রেক হইল।]

জগবন্ধু ॥ ওয়াক! কিসের গন্ধ?

সদাশিব ॥ গোবরজল।

[বলিয়াই শিশি হইতে কিছুটা সেণ্ট নিজের গায়ে ঢালিলেন এবং ডাক্তারের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন।)

জগবন্ধু ॥ গোবর জল তোমার গায়ে? সে কি?

সদাশিব ॥ আমার মাথায় ঢালা হয়েছে।

জগবন্ধু ॥ কে ঢাললো?

সদাশিব ॥ নাম বলতে যখন সাহস পাচ্ছিনা, তখন তোমার বোঝা উচিত ডাক্তার। ঘুমন্ত দৈত্যকে তুমি জাগিয়েছ।

জগবন্ধু ॥ বুঝলাম। কখন ঢাললেন? আর কেনই বা ঢাললেন?

সদাশিব ॥ কাল রাতে খেতে বসেছি। আমার দোষের মধ্যে কেবল বলেছি, ডালটা পুড়ে গেছে—কেমন একটা পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। ব্যস। ঘর নেকানো গোবর, জলে গুলে এক গামলা মাথায় ঢেলে জিজ্ঞেস করলেন, পোড়া গন্ধটা কি এর চেয়েও বেশী। সারারাত কতবার গায়ে সাবান ঘষেছি, নেয়েছি—গন্ধটা তাও গেছে বলে মনে হচ্ছেনা। অধিকন্তু লেগেছে সর্দি, বুকে হয়েছে ব্যথা।

জগবন্ধু ॥ তুমি দেখছি সক্রেটিস হয়ে গেছো প্রফেসর।

সদাশিব ॥ সক্রেটিস! কেন?

জগবন্ধু ॥ বাঃ তুমি প্রফেসর মানুষ, জানো না? সক্রেটিসের স্ত্রী জ্যানথিপি ছিলেন—স্বামীর ওপর তর্জনগর্জনে অদ্বিতীয়।

সদাশিব ॥ অদ্বিতীয়? তা হতে পারেন কারণ তখন আমার দিগম্বরী দেবী জন্মান নি।

জগবন্ধু ॥ তা' বটে—তা' বটে। কিন্তু অত তর্জনগর্জনেও সক্রেটিস

উত্তেজিত হতেন না দেখে, একদিন জ্যানথিপি স্বামীর মাথায় ঢেলে দিলেন এক গামলা নোংরা জল। তাতেও সক্রেটিস ধৈর্যচ্যুতি হলেন না। হাসি মুখে বললেন, মেঘ গর্জনের পর বারি বর্ষণই স্বাভাবিক।

সদাশিব ॥ ঠিক এ কথাটা আমি বলতে পারিনি ভাই, তবে তখনকার তাঁর মূর্তিটি দেখে আমি বলেছিলাম এ যেন গোবরে পদ্ম ফুল ফুটেছে দেখছি। প্রতিবাদ করিনি বলেই রক্ষে। নইলে আর এক গামলা—হ্যাঁ, তার মাল-মসলা তৈরী ছিল। তা ঐ এক গামলাতেই—

জগবন্ধু ॥ দেখি তোমার বুকটা (বুকে স্টেথিসকোপ লাগাইয়া) সর্দি পাচ্ছি। ক'বার চান করেছিলে বললে ?

সদাশিব ॥ তা' বার দশেক।

জগবন্ধু ॥ (হাসিয়া) 'ক্লিনলিনেস ইজ নেক্সট টু গডলিনেস'। আচ্ছা আমি ওষুধ দেব। কিন্তু উনি আমাকে ডেকেছিলেন কেন ?

সদাশিব ॥ পরশুদিন আমাকে বকাবকি করেছেন পুরো দু' ঘণ্টা। মুদির দোকান থেকে পাওনা টাকা নিতে লোক এসেছিলো, ঘণ্টাখানেক তার সঙ্গে ঝগড়া করে, শেষে আঁষ-বটি নিয়ে তাড়া করেছিলেন! তারপর থেকেই ওঁর গলাটা একটু জখম মনে হলো।

জগবন্ধু ॥ মানে স্বরভঙ্গ ?

সদাশিব ॥ হ্যাঁ, স্বরভঙ্গ। (হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া পরম অনুনয়ে) আচ্ছা ভাই, ওর গলার স্বরটা ওষুধ দিয়ে কোনো মতে আবার বন্ধ করে দেওয়া যায়না ? মানে যাকে বলে স্বর-লোপ—কমপ্লীট লস্ অফ ভয়েস।

জগবন্ধু ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে য়্যাফানিয়া হচ্ছে স্বরভঙ্গ ; আর য়্যাফাসিয়া হচ্ছে স্বরলোপ। কিন্তু ভাই তোমার দুঃখে যত দুঃখিতই হইনা কেন, ডাক্তার হয়ে স্বরনাশের মত সর্বনাশটি করতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, তোমাকে খানিকটা রিলিফ দিতে পারি কিনা দেখছি।

সদাশিব ॥ চুপ।

জগবন্ধু ॥ কেন ?

সদাশিব ॥ আসছে।

জগবন্ধু ॥ কি করে বুঝলে ?

সদাশিব ॥ দুপদাপ শব্দ। শুনছো না ?

(আঁষ-বঁটি হাতে দিগম্বরীর প্রবেশ।)

দিগম্বরী ॥ (বঁটির ধার পরীক্ষা করিতে করিতে) নাঃ, ধারটি বেশ মনের মতই দিয়েছে। (ডাক্তারকে দেখিয়া) খুব মশাই, ডাকলাম পরশু, এলেন আজ।

জগবন্ধু ॥ অসুখ করেছিল কিনা, তাই।

দিগম্বরী ॥ অসুখ। আপনি ডাক্তার,—আপনার অসুখ! আপনি তবে কেমন ডাক্তার ? এই জন্যেইতো আমার ব্যারাম সারাতে আপনার একটি

বছর লাগলো। আপনারই যদি অসুখ হবে তবে আপনার কাছে কী চিকিৎসা আমরা আশা করতে পারি? লোক ঠকিয়ে এমনি ক'রে পয়সা লুঠছেন ডাক্তারবাবু! (বঁটিটি হাতের কাছেই নামাইয়া রাখিলেন)।

জগবন্ধু॥ (ঘাবড়াইয়া গেলেও চট করিয়া সামলাইয়া লইয়া) আপনি ডাক্তারদের জানেন না দিগম্বরী দেবী। ইচ্ছা ক'রে আমরা আমাদের দেহে অসুখ সৃষ্টি করি—রোগীর জ্বালা-যন্ত্রণাটা যতে সঠিক বুঝতে পারি। হ্যাঁ, তারপরেই সুচিকিৎসা করে আবার ব্যাধিটা সারিয়ে ফেলি। এ যে আপনি জানেন না, এ তো আমি জানতাম না।

দিগম্বরী॥ জানিনা মানে? সিভিল সার্জনের পাশের বাড়ির মেয়ে আমি। কথাটা তুলে আপনাকে বাজিয়ে নিলাম। (স্বামীর প্রতি) খুব সেন্টের গন্ধ পাচ্ছি যে।

সদাশিব॥ তুমি এসেছ তাই।

দিগম্বরী॥ ঠাট্টা হচ্ছে—ঠাট্টা?

জগবন্ধু॥ (হাত ঘড়িট দেখিয়া) আমার একটা জরুরী য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে দিগম্বরী দেবী। আপনার কি অসুখ বলুন।

দিগম্বরী॥ গলাটা একটু ভেঙেছিল। না ভেঙে উপায় আছে? কি করে যে আমার দিন যায়, জানেন শুধু মা গঙ্গা। কি সব লোক নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়, জানেন না তো!

জগবন্ধু॥ বটেই তো। সংসার মানেই আজকাল একটা যুদ্ধ। রাত দিন চেঁচাতে হবেই। আপনি তবু পারেন, এতকাল বোবা ছিলেন, গলার জোরটা খরচ হতে পারেনি, তাই। কিন্তু, আমাদের বৌ-ঝিরা তো হাল ছেড়ে দিয়েছে।

দিগম্বরী॥ কিন্তু আমার সেই গলা—তাও ভাঙবার মত হয়েছিল— তবেই বুঝুন, ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে! ভয় পেয়ে আপনাকে কল দিয়েছিলাম।

সদাশিব। কলটা আমিই দিতে বলেছিলাম, কারণ মানুষের গলাই যদি গেল, তবে কি রইলো।

দিগম্বরী॥ (স্বামীকে) ঠাট্টা হচ্ছে!—ঠাট্টা হচ্ছে!—ঠাট্টা? (ডাক্তারকে) দু'টি ঘণ্টা সমানে আমাকে বকিয়ে যখন দেখলেন আমার গলা দিয়ে আর কথা বেরোচ্ছে না, তখন বললেন ডাক্তার ডাকো—যাকে বলে জুতো মেরে গরু দান—বুঝলেন ডাক্তারবাবু?

জগবন্ধু। বুঝেছি, বুঝেছি। তা' এখন গলাটা তো দেখছি বেশ—

দিগম্বরী॥ বেশ! বেশ মানে কি?

জগবন্ধু॥ না, আগেকার মত বাজখাই গলা যদিও নেই—

দিগম্বরী॥ বাজখাই! বাজখাই মানে?

জগবন্ধু ॥ (কোণঠাসা না হইয়া) মানে, গলার যে জোরটা ছিল, এখন সেটা একটু—

সদাশিব ॥ তবু এখনো যা রয়েছে—

দিগম্বরী ॥ ঠাট্টা হচ্ছে—ঠাট্টা? (সখেদে) দেখুন ডাক্তারবাবু, এখনও আমার গলায় যা ব্যথা—

জগবন্ধু ॥ বটেই তো—বটেই তো! একটু হাঁ করুন, আপনার গলাটা একটু দেখি। (ব্যাগ খুলিয়া গলা দেখিবার যন্ত্র বাহির করিতে করিতে) গলার ব্যারাম উপেক্ষা করতে নেই। বিশেষ, আপনার। আবার বোবা না হন।

সদাশিব ॥ দেখ ডাক্তার দেখ, সেরকম যদি কিছু হয়—

জগবন্ধু ॥ (দিগম্বরীকে) না, না, আর একটু হাঁ করুন।

[দিগম্বরী বড় হাঁ করিল, ডাক্তার যন্ত্রপাতি দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।]

সদাশিব ॥ কি বুঝছ ডাক্তার? আশাপ্রদ মনে হচ্ছে কি?

জগবন্ধু ॥ দাঁড়ান মশাই, দেখতে দিন……হ্যাঁ—তাইতো!

[পরীক্ষা শেষ হইল।]

দিগম্বরী ॥ কি বুঝছেন ডাক্তারবাবু! হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যে?

জগবন্ধু ॥ ব্যাপারটা আমি বাংলা করেই বলছি, আপনার কেসটা য়্যাফানিয়া থেকে য়্যাফাসিয়া'য় যাবার পথে। আচ্ছা, আপনার গলা কুটকুট করে?

দিগম্বরী ॥ করে, এখনও করছে।

ডাক্তার ॥ গলা শুকিয়ে যায়?

দিগম্বরী ॥ হ্যাঁ, তা' যায়—

ডাক্তার ॥ শুষ্ক খুসখুসে কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলা সাঁই সাঁই বা হাঁস পাস করা—

সদাশিব ॥ মানে, তুমি বলতে চাইছো ডাক্তার, স্বরযন্ত্র অত্যধিক চালনা করার সব উপসর্গ—

দিগম্বরী ॥ তুমি থামো না চেঁচিয়ে এ সংসার চালাবার উপায় আছে? শ্বাসকষ্ট কি, নাভিশ্বাস উঠে যায়।

জগবন্ধু ॥ বটেই তো—বটেই তো। তাতেই বোধ হয় ঐসব উপসর্গ এসে গেছে। কিন্তু এখন যা বুঝছি সেটা ভাল নয়।

দিগম্বরী ॥ কি বুঝছেন আপনি?

জগবন্ধু ॥ স্বরযন্ত্রে পক্ষাঘাত আসন্ন। দেখলাম কিনা, স্বরতন্ত্রে আঘাতিতবৎ স্পর্শ-দ্বেষ, খঞ্জতা ও ঘৃষ্টতা অনুভব। মানে পেশীর অভিঘাতিক পীড়া দেখা দিয়েছে। বাংলায় বলছি এইজন্তে যাতে, বুঝতে পারেন।

দিগম্বরী ॥ কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝলাম না ডাক্তারবাবু।

সদাশিব ॥ কেন, এতো পরিষ্কার বাংলা কথা। স্বরযন্ত্রের অত্যধিক সংঘর্ষণে ও নিষ্পেষণে গণ্ডদেশে ঘৃষ্টবৎ স্পর্শ-দ্বেষ।

দিগম্বরী ॥ তুমি থামো। (ডাক্তারকে) ভয়ের কিছু কি দেখছেন ডাক্তারবাবু?

জগবন্ধু ॥ এই তো বললাম। ব্যাপারটা সত্যিই একটু জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। য়্যাফানিয়া থেকে য়্যাফাসিয়ায় এসে যাচ্ছে। এক্ষুনি সাবধান না হলে একেবারে স্বরলোপ, যাকে বলে বাকরোধ।

সদাশিব ॥ মানে বোবা হতে হবে। হায় হায়! উনি যদি বোবা হন, আমার কি করে চলবে ডাক্তার? সংসার যে একেবারে অচল হয়ে যাবে।

দিগম্বরী ॥ (স্বামীকে) ভেবেছ তুমি রেহাই পাবে? না ডাক্তার, বোবা আমি হতে পারবো না, কিছুতেই পারবো না, বোবা হওয়া আমার চলবে না। আপনি আমার চিকিৎসা করুন। যে ওষুধ দেবেন, আমি খাবো, যা বলবেন আমি শুনবো।

জগবন্ধু ॥ না না, এত উতলা হবেন না আপনি। ঠিক সময়মত রোগটা যখন ধরা পড়েছে, ওষুধ খেলে—আমার কথা মত চললে—

দিগম্বরী ॥ (চীৎকার করিয়া) সে তো আমি বলছি।

জগবন্ধু ॥ চুপ! আপনি আর একটিও কথা কইবেন না। আমার চিকিৎসার এইটিই হলো গোড়ার কথা। অন্ততঃ তিন মাস কথা বলা আপনার একেবারে বন্ধ।

সদাশিব ॥ তিন—মাস!

দিগম্বরী ॥ তি-ন মাস!

জগবন্ধু ॥ চুপ! আবার! আবার কথা বলছেন আপনি! এক একটি কথা বলছেন আর আপনার স্বরতন্ত্রে ঘা লাগছে। স্বরতন্ত্র জখম হচ্ছে। স্বরতন্ত্রের পেশী পক্ষাঘাতের দিকে এগুচ্ছে।

দিগম্বরী ॥ (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমি চুপ করছি ডাক্তারবাবু।

জগবন্ধু ॥ একথাটা বলাও আপনার উচিত হলো না।

সদাশিব ॥ বটেই তো!

[দিগম্বরী স্বামীর পানে অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।]

কথা বলা বন্ধ, একথাটা এখন মনে থাকলে হয়।

জগবন্ধু ॥ মনে রাখতেই হবে। এই নির্দেশটা কাগজে বড় বড় করে লিখে উনি যেখানে চলা ফেরা করেন, সেখানে সেখানে ঝুলিয়ে রাখা উচিত। আচ্ছা আমি ওষুধের প্রেসক্রিপশানটা লিখছি। (তথাকরণ)

সদাশিব ॥ কৈলাস! কৈলাস! শিগগীর আয়।

[একটু আড়ালে অবস্থিত হৃষ্ট কৈলাস ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।]

কৈলাস ॥ আজ্ঞে কর্তা!

সদাশিব ॥ খানকত বড় কাগজ আর লাল পেন্সিলটা নিয়ে আয়।

[কৈলাসের তথাকরণ। সদাশিব বড় কাগজে লাল পেন্সিল দিয়া কথা না বলার নির্দেশটি বড় বড় করিয়া লিখিলেন।]

জগবন্ধু ॥ এই রইলো একটা মিক্সচার। আর রইলো একটা গলায় পেণ্ট। যাকে বলে একেবারে কমপ্লিট রেষ্ট—আপনার এখন তাই আবশ্যক। অন্ততঃ তিনটি মাস। খুব লঘু পথ্য খাবেন।

সদাশিব ॥ এই রে! আচ্ছা, আচার টাচার?

জগবন্ধু ॥ না না।

সদাশিব ॥ সর্বনাশ। ভাঁড়ারে এত আচার···একা আমি পারব কি!

দিগম্বরী ॥ কেন, তোমার সেই কেকা দেবীকে ডেকে এনো।

জগবন্ধু ॥ সর্বনাশ! আবার কথা! স্বরযন্ত্রে পুঁজ হোক এইটাই কি আপনি চান?

দিগম্বরী ॥ (রাগিয়া গিয়া) চায় চায়, ও লোকটা তাই চায়।

[জগবন্ধু ঠোঁটে আঙুল দিয়া দিগম্বরীকে কথা না বলিবার নির্দেশ দান।]

দিগম্বরী ॥ ও! (থামিয়া গেলেন)

সদাশিব ॥ যাতে মনে থাকে—এই জন্মে টাঙিয়ে দিচ্ছি। কৈলাস! এটা টাঙিয়ে দে।

[কৈলাস লেখাটি সকলের সামনে ধরিল।]

জগবন্ধু ॥ (পাঠ) 'কথা বলিলেই কথা বন্ধ।' হ্যাঁ, লেখাটা ঠিকই হয়েছে। (কৈলাসকে) ঘরে ঘরে এখনি টাঙিয়ে দাও। (দিগম্বরীকে) আপনি ভাববেন না, তিনটি মাস এসব নিয়ম মেনে চলুন, তখন দেখবেন মুখে আবার খৈ ফুটবে। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

[ডাক্তারের প্রস্থান। কৈলাস ইতিমধ্যে কাগজটি দেওয়ালে টাঙাইয়া দিয়াছে, এবং সদাশিব কর্তৃক লিখিত ঐরূপ আর একটি কাগজ ঘরের অন্যত্র লাগাইতে ব্যাপৃত হইল। বলা বাহুল্য—সে মহা খুসি।]

সদাশিব ॥ বাড়িতে কাক চিল বসতে পেত না—এখন বসবে। পথ থেকে লোক সব ছুটে এসে জিজ্ঞেস করতো, মশাই আপনার বাড়িতে ব্যাপার কি? আমাকে বলতে হতো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে। যাক, তিন মাস আর বোধ হয় তা' বলতে হবেনা।

দিগম্বরী ॥ হাতি গর্তে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে। এ দেখছি তাই।

[সদাশিব নির্দেশনামার তৃতীয় কাগজখানি চট করিয়া দিগম্বরীর সম্মুখে ধরিল।]

দিগম্বরী ॥ আমি ওসব মানবো না।

সদাশিব ॥ সেই সুমতিই তোমার হোক দিগম্বরী। কথা বল—বল কথা গলায় হোক পুঁজ। স্বরতন্ত্রে পক্ষাঘাত হোক। চিরতরে বোবা হও। তবেই যদি বাঁচি।

[দিগম্বরী সত্য সত্যই ভয় পাইলেন। ভাগ্যচক্রে যেন একেবারে বেকুব বনিয়া গেলেন। ফ্যাল ফ্যাল চোখে সদাশিবের মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সদাশিব সস্নেহে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন!]

না-না, কেঁদনা লক্ষ্মীটি, ওতেও স্বর যন্ত্রটা জখম হতে পারে। ভাবছো

কেন, তিনটে মাস তো! এতকাল তুমিই বলেছ, আমি শুনে গেছি। এবার আমি বলবো, তুমি শুনে যাও। কোন অসুবিধা হবে না। তোমার না বলা বাণী আমি শুনবো—বুঝবো। ছিঃ! কেঁদো না।

[ক্রন্দনরতা দিগম্বরীর মাথায় সস্মিত মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইতে কেকার প্রবেশ।]

কেকা॥ একি!

[সদাশিব ইঙ্গিতে তাহাকে থামাইলেন, চলিয়া যাইতেও ইঙ্গিত করিলেন। দিগম্বরী চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সদাশিব বিপদ বুঝিয়া নোটিশটি তাহার সামনে ধরিলেন। দিগম্বরী সংযত হইতে চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন।]

দিগম্বরী॥ বোবা হতে হয়, হ'বো, তবু ঝেঁটিয়ে আমি পাপ বিদেয় করব। কোথায় আমার ঝাঁটা (ছুটিয়া কক্ষান্তরে গেলেন। নেপথ্যে বাসনপত্র টেবিল চেয়ার সশব্দ হইয়া উঠিল।)

সদাশিব॥ সর্বনাশ করেছ কেকা। রণচণ্ডী জেগেছেন। এসে পড়বার আগেই এসো পালাই—নইলে আজ আর রক্ষে নেই।

[কিন্তু পালাইবার সময়টুকুও আর নাই দেখিয়া কক্ষের ইজিচেয়ারের নীচে একজন এবং টেবিলের তলে আর একজন আত্মগোপন করিলেন। রণচণ্ডীর মতো দিগম্বরীর পুনঃপ্রবেশ।]

দিগম্বরী॥ পালিয়েছে! জোড়ে! কিন্তু আমারটি যাবে কোথায়। পিণ্ডি গিলতে আসতে হবেনা? তখন দেখে নেব। চুপটি মেরে ঘুপটি মেরে পালিয়ে থাকছি দোরের আড়ালে। একবার এলেই হয়।

[দোরের আড়ালে আত্মগোপন। লুক্কায়িত তিনজনই নীরব নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে ধীরে ধীরে যবনিকা নামিল।]

যবনিকা

॥ ১৩৬৫ শারদীয়া সংখ্যা 'দীপালী'তে প্রকাশিত 'বোমা' এবং 'যষ্টিমধু'তে প্রকাশিত বাঘাওলে বুনোতেঁতুল' নাটিকাদ্বয়ের সংযোজিত রূপান্তর ॥

হারিকেন

তালপুকুরের পারে গৃহস্থবাড়ির একখানি ঘরে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত তের বছরের বালক কমল। কমলের মাথার কাছে ব'সে তার বিধবা মা ষোড়শী। মৃদু দীপালোক।

কমল॥ মা!

ষোড়শী॥ কি বাবা।

কমল॥ এখন কত রাত্তির হবে? বারোটা বেজে গেছে…না?

ষোড়শী॥ হ্যাঁ বাবা!

কমল॥ আজ আমি কেমন আছি?

ষোড়শী॥ কালকের চেয়ে আজ ভালই আছ। এখন একটু ঘুমোও… আমি হাওয়া করি।

কমল॥ খালি খালি ঘুমোতে আর আমার ভাল লাগেনা। রাত বারোটার পর আর আমি ঘুমোতে পারি না। আমাকে ঘুমোতে দেয় না।

ষোড়শী॥ আবার?

কমল॥ হ্যাঁ মা। তুমি বিশ্বাস কর না কিন্তু যদি তুমি দেখতে—

ষোড়শী॥ ও কিছু নয়। পেটে পথ্যি পড়েনি, তাই দুর্বল হয়ে পড়েছ, তার ওপর জ্বর তো লেগেই রয়েছে। ওসব চোখের ধাঁধা।

কমল॥ না মা আমি ত সেরে উঠেছি! ডাক্তারই বলুক উঠেছি কিনা। কিন্তু শোন না কানে কানে!

ষোড়শী॥ বল বাবা!

কমল॥ আমি সেরে উঠছি……ডাক্তারের ওষুধে নয় কিন্তু। কিসে জানো?

ষোড়শী॥ কিসে বাবা?

কমল॥ ওদের ডাকে। ওরা আমায় ভালবাসে। ওরা আমায় ডাকে! বলে 'আয়! আয়! কোলে আয়! বুকে আয়!'……মা!

ষোড়শী॥ কি বাবা!

কমল॥ ওদের তুমি সব সময় দেখছ…কিন্তু ওদের তুমি দেখেও দেখ না। কথা বল না…কেন? কেন মা?

ষোড়শী॥ ওরা যে কে, তাই তো বুঝলাম না বাবা!

কমল॥ সে কি মা! তোমার কি চোখ নেই? কান নেই?

ষোড়শী॥ তুই ঘুমো কমল!

কমল॥ কেমন করে ঘুমোই! ঐ যে…মা…ঐ যে…

ষোড়শী॥ কই?

কমল॥ …ঐ…শুনছ না?

ষোড়শী॥ ও দুপুর রাতের ঝিঁঝির ডাক।

কমল ॥ তবে তুমি কেন বলো শুনতে পাওনা!

ষোড়শী ॥ লক্ষ্মী আমার! ঘুমোও।

কমল ॥ মা! দেখেছ? দেখেছ?

ষোড়শী ॥ আবার কি বাবা!

কমল ॥ ঐ আকাশের দিকে চেয়ে দেখ।

ষোড়শী ॥ কি?

কমল ॥ চোখ বুজে রয়েছো বুঝি! মুঠো মুঠো তারা··চোখে পড়ে না? মিটি মিটি চাইছে...ভারী দুষ্টু ওরা···আমায় শুধু ইসারা করে!··মা!··· তালপুকুরের জলে নেমে ওরা খেলা করে। কালো জলে ওদের ঝিকিমিকি ভারি ভাল লাগে! আমার কি ইচ্ছে হয় জানো মা?

ষোড়শী ॥ কি বাবা?

কমল ॥ ওদের সঙ্গে ঐ কালো জলে সাঁতার কাটি···খেলা করি!··· তালপুকুরের মাছগুলোও কম নয় রাত দিন ছুটোছুটি! চোখে একটুও ঘুম নেই! কি নিয়ে ওদের এত মাতামাতি মা?

ষোড়শী ॥ জানিনে বাবা।

কমল ॥ কিছুই জানো না তুমি। চারিদিকে এত খেলা, এত ইসারা, এত হাত ছানি—সেদিকে লক্ষ্য নেই। শুধু জানো ঐ ডাক্তারকে। হয়তো ঐ ডাক্তার কিছু কিছু জানে মা! আমি দেখেছি, ডাক্তার তোমাকে মাঝে মাঝে ইসারা করে, হাতছানি দিয়ে ডাকে। ও ডাকের মানে কি ও জানে! আমি জানিনে মা..! কথা ব'লছ না যে!

ষোড়শী ॥ তুমি যদি না ঘুমোও কমল, তবে আমি ভারি রাগ করব কিন্তু!

কমল ॥ আমি ঘুমোব না। কিছুতেই না। ডাক্তার এলে আজ তাকে জিজ্ঞেস করে জানব, ঐ ইসারা, ঐ হাতছানির মানে কি?

ষোড়শী ॥ এতরাত্রে ডাক্তার আসবে না। আর তুমি তো আজ ভালই রয়েছ বাবা!

কমল ॥ আমার ভালো লাগছে না মা, বড় কষ্ট হচ্ছে। যাও মা, ডাক্তারকে ডাকো।

ষোড়শী ॥ তাঁকে কি ব'লবি?

কমল ॥ শুধু একটা কথা।

ষোড়শী ॥ কি?

কমল ॥ ওর মানে কি?

ষোড়শী ॥ কিসের মানে?

কমল ॥ ঐ ইসারার, ঐ হাতছানির। যেই জানব, অমনি ও বাড়ির বীণাকে ডেকে পাঠাব। ওকে চমকে দেব। অমনি ইসারা ক'রব। অমনি হাতছানি দিয়ে ডাকব।

ষোড়শী ॥ এসব ভালো কথা নয় বাবা। বলতে নেই। তুমি ঘুমোও।

কমল॥ বাঃ, ডাক্তার যদি পারে, আমি পারব না কেন? তারারা পারে, জোনাকীরা পারে, তালপুকুর পারে, ঘরের ঐ মাটির দীপটা পারে, আমি পারবনা কেন?···মা দেখেছ? মাটির দীপ হাসছে! কাঁপছে!

ষোড়শী॥ তোকে নিয়ে যে আমি বিপদে প'ড়লাম দেখছি।

কমল॥ ডাকো ডাক্তারকে!

ষোড়শী॥ না. কোন দরকার নেই। তুমি ঘুমোও।

কমল॥ মা! তবে সর্বনাশ হবে ব'লছি।

ষোড়শী॥ সে আবার কি?

কমল॥ হ্যাঁ, সর্বনাশ। যে আমার কথা শোনে না—সে আমায় ভালোবাসে না। আমায় ভালো না বাসলেই সর্বনাশ।

ষোড়শী॥ কি সবনাশ?

কমল॥ হ্যাঁ, তুমি আমার কথা শুনছ না, তুমি আমায় ভালোবাস না।

ষোড়শী॥ সে কি বাবা?

কমল॥ শোন মা, ওরা ব'লেছে····· ওরা ব'লেছে······। মা.. . এক গ্লাস জল দাও।····· গলা শুকিয়ে আসছে।

ষোড়শী॥ তুমি ঘুমোও কমল।

কমল॥ তুমি জল দাও মা!

ষোড়শী॥ রাত দুপুরে ঠাণ্ডা জল খাওয়া ঠিক হবে না বাবা. দুধ দেবো?

কমল॥ জল! জল! এক গ্লাস জল!

ষোড়শী॥ নাও বাবা।

কমল॥ আঃ. . বুক জুড়িয়ে গেল। এইবার শোন মা—

ষোড়শী॥ এবার ঘুমোও বাবা।

কমল॥ ওরা আমায় বলে.. ..তোকে আমরা ভালোবাসি.. ...খুব ভালোবাসি। এত ভালবাসি যে ইচ্ছে হয় তোকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খাই। যখন বলে, আমার মনে হয় ওরা আমায় বুঝি গিলে খাবে।

ষোড়শী॥ তবেই বুঝছো ওরা লোক ভালো নয়।

কমল॥ কিন্তু ওরা আমার কাছে আসতে পারেনা। সাহস পায়না, কেন পায়না জিজ্ঞেস করলেই বলে, আমাদের এগোবার জো নেই, কেন জানো?

ষোড়শী॥ কেন বাবা?

কমল॥ ব'ললো, 'তোর মা তোকে আমাদের চাইতেও বেশী ভালোবাসে। তোর মা'র ভালোবাসা যতই কমবে, আমরা ততই এগিয়ে আসব।'

ষোড়শী॥ শোন বাবা, ওরাই ভূত। রাম রাম বল! রাম রাম বল!

কমল॥ ভূত! ভূতের বুঝি অমন সুন্দর সুন্দর চেহারা হয়?

ষোড়শী॥ ওরে কমল! তোর অসুখ কি তবে বেড়েছে? আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না!

কমল॥ ডাক্তারকে ডাকো, ডাক্তারকে ডাকো!

ষোড়শী ॥ এই আঁধার রাতে তিনি আসবেন কেমন ক'রে ?

কমল ॥ ডাক্তার কেমন করে আসবে সে জানো তুমি।

ষোড়শী ॥ সেদিন এলেন, আঁধার রাতেই চলে এলেন, সঙ্গে একটা লণ্ঠনও আনেন নি! আঁধার রাতে সাপের ভয়। সেদিকেও লক্ষ্য নেই। আমার লজ্জা করে বাবা তাঁকে রাত্রে ডাকতে।

কমল ॥ এলে কিন্তু যেতে চায় না! যাক্ তবে ডেকো না মা।

ষোড়শী ॥ কাল ভোরে ডাকলে হয় না বাবা ?

কমল ॥ ভোর অবধি কি আমায় ধ'রে রাখতে পারবে মা!

ষোড়শী ॥ কি যে অলুক্ষণে কথা বলিস কমল! [পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে] ভুলু! ভুলু! ওরে ভুলু! [দরজা খুলে ভুলু সামনে এসে দাঁড়ালো] ডাক্তারকে গিয়ে বল কমল ডাকছে। এখনি যেন একবার আসেন। সঙ্গে যেন আলো আনেন।

ভুলু ॥ তিনি সঙ্গে আলো আনেন না। বলেন, তিনি তো এখনো চোখের মাথা খান নি।

ষোড়শী ॥ তবে না হয় তুই-ই আমাদের হারিকেনটা নিয়ে যা।

ভুলু ॥ ঐ একটাই তো হারিকেন মা, যদি এখানে হারিকেনের দরকার হয় ?

ষোড়শী ॥ ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। তুই হারিকেন নিয়ে যা। নিয়ে যাস বুঝলি ? কখন সাপের মাথায় পা দেবেন ভয়ে মরি।

ভুলু ॥ হারিকেন নিয়েই যাচ্ছি মা। [দরজা বন্ধ করে চলে গেল]

ষোড়শী ॥ কমল! তুমি না হয় একটু ঘুমোও। ডাক্তার এলে আবার ডেকে তুলব।

কমল ॥ না মা ঘুমোব না। ডাক্তার এলেই তার পানে চেয়ে থাকব। দেখব, আজ দেখব, ভালো ক'রে দেখব। তার চোখের কথা, চোখের ইসারা, হাতছানি!

ষোড়শী ॥ ......তোকে বুঝি ইসারা করে ?

কমল ॥ আমাকে নয়, তোমাকে!···মা, একটা গান গাও না!

ষোড়শী ॥ তুমি বড় দুরন্ত হ'য়ে উঠেছো কমল!

কমল ॥ তুমি আমায় বকছ মা ?

ষোড়শী ॥ দুষ্টুমি ক'রলে বকব না তো কি ক'রব ?

কমল ॥ তুমি আমায় ভালোবাসা না মা ?

ষোড়শী ॥ ভালোবাসি কমল, আমার মানিক! আমার মণি! আমার সোনা! আমার লক্ষ্মী! আমার......আমার...

[কমলকে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করলেন।]

কমল ॥ তাই অত আদর ক'রে আমায় ভোলাচ্ছ মা! বাইরে কি ঝড় উঠল ? ঐ যে······ঐ যে মা······উঃ

ষোড়শী ॥ তাই তো বাবা! ব'সো আমি জানলা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

কমল ॥ [চীৎকার ক'রে] না মা! না—

ষোড়শী ॥ ও-ঘরে জানালার ধারে টেবিলের ওপর ডাক্তারের দামী ওষুধগুলো রয়েছে, ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যাবে বাবা।

কমল ॥ যাও। কিন্তু আমার ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করতে পারবে না।

[ষোড়শী চলে গেল।]

আঃ কি সুন্দর! ঐ ঝড় উঠছে! গাছপালা নাচছে! কাঁপছে! দুলছে! তারারা নাচছে! কেন নাচে? বাঃ বাঃ, প্রদীপের আলো নাচছে! কেন নাচে? কি চমৎকার নাচে! দেখি [উঠে প্রদীপ হাতে নিল। প্রদীপ মুখের কাছে ধরে দেখতে লাগল……হঠাৎ প্রদীপের আলো তার জামায় ধরে গেল] মা! মা! আলো আমায় ধরেছে! আগুন! আগুন! কী সুন্দর! কিন্তু পুড়ে গেলাম, জ্বলে মলাম!

[হাত থেকে প্রদীপ পড়ে নিভে গেল। ষোড়শী ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকেই করে উঠলেন, 'সর্বনাশ' এবং সঙ্গে সঙ্গেই জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলে আগুন নিভিয়ে ফেললেন]

ষোড়শী ॥ কমল! কমল! বাবা আমার।

কমল ॥ মা, ভা—রি সু—ন্দ—র! কিন্তু পুড়ে গেলাম, জ্ব—লে গে—লা—ম! আমায়ই—সা—রা করেছিলো ..হাতছানি দিয়ে.. ডে—কে-ছিলো···আলো জা—লো! আবার দে-খি।

ষোড়শী ॥ ভুলু! ভুলু·· সর্বনাশ! দেশলাইটা পর্যন্ত তার কাছে!

কমল ॥ হারিকেন? [ষোড়শী নীরব]

কমল ॥ মা! হা—রি—কে—ন কই?

ষোড়শী ॥ ভুলু নিয়ে গেছে।

কমল ॥ কেন? [ষোড়শী নীরব]

কমল ॥ আলো আনো মা, আলো আনো। আমার গায় জল ঢালো, আমার স্নান করিয়ে দাও—

ষোড়শী ॥ না বাবা জল নয়। আমি ভুলুর ঘরে আলোর খোঁজে যাই।

[ভুলুর ঘরে প্রস্থান]

কমল ॥ জল! জ্বলে গেল!—ঐ তালপুকুরের কালো জল [জানালার কাছে গিয়ে] নাচে? নাচে! কালো জল নাচে! কালো জলের বুকে তারারা নাচে, খেলা করে···জল! জল! জ্বলে গেল [অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে দরজা খুলল] মা! তুমি সরে গেছ, আর ঐ ওরা আমার কাছে এসেছে। (চীৎকার করে) ডাকছে মা, আমায় ডাকছে! ঐ ইসারা—ঐ হাতছানি! মা! মা! ওরা আমার হাত ধরল! আমায় নিয়ে গেল। আমায় জড়িয়ে নিয়ে গেল!

[বাইরে চলে গেল। অন্য দরজা দিয়ে লণ্ঠন হাতে ভুলু ও ডাক্তারের প্রবেশ।]

ভুলু ॥ মা! মা!

ডাক্তার ॥ [ছুটতে ছুটতে ষোড়শীর প্রবেশ] কমল কই ভুলু ?

ষোড়শী ॥ লণ্ঠন এনেছ ?

ডাক্তার ॥ কমল কই ষোড়শী ?

[ষোড়শী শয্যার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কমল সেখানে নেই। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন কমল নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তেই নজরে পড়ল তালপুকুরের দরজা খোলা। তখনই, 'সর্বনাশ।' ব'লে সেই দিকে ছুটে যেতেই ডাক্তার তাঁর হাত ধ'রে ফেললেন।]

ডাক্তার ॥ কমল কোথায় ?

ষোড়শী ॥ হাত ছাড়ো......হাত ছাড়ো......তুমি এসেছ·· তাই সে চলে গেছে।

[কপালে করাঘাত করতে করতে লুটিয়ে পড়ল।]

বিচিত্রা, কার্তিক, ১৩৩৪

একটা পাপ

[সহরতলীর রেলের গার্ড কৃপাণ বসুর বাসগৃহের কদ্ধদ্বার শয়ন কক্ষ। রাত্রি। গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। সদ্য বিবাহিত কৃপাণের তরুণী স্ত্রী ইলা শয়ন কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়াছিল। শিয়ালের ডাক এবং ঝিঁঝির কলরব। শয়ন কক্ষের সম্মুখে তাহার স্বামী কৃপাণের কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। ইলা ইহাতে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িল।]

কৃপাণ ॥ রাত দুটো বাজতে না বাজতেই কি ঘুমরে বাবা !

[সজোরে কড়া নাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে ডাকিতে লাগিল।]

কৃপাণ ॥ ইলা ! ইলারানী ! বলি শুনছো ? ওগো—।

[কৃপাণের বিধবা মা কৃপাণের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

মা ॥ কি হ'লরে বাবা—বাড়িতে ডাকাত পড়লো নাকি ?

কৃপাণ ॥ দেখতো মা, তোমার বৌমার কি কুম্ভকর্ণী ঘুম !

মা ॥ তোর কড়া নাড়ায় পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে গেল—ঘরের বৌ'র ঘুম ভাঙছে না। কি জানি বাপু, নতুন বৌ—তার এত ঘুম কেনরে বাবা, [চেঁচাইয়া] বলি ও বৌমা—বৌমা ! [কৃপাণকে] না বাবা, নতুন বৌর চাল চলন আমি ভালো বুঝছি না। জেগে ঘুমাচ্ছে।

কৃপাণ ॥ [চেঁচাইয়া] বলি খুলবে না দরজা ভাঙবো ?

[ইলা দরজা খুলিল, এবং ঘোমটা টানিয়া দিয়া একটু আড়ালে গেল। কৃপাণ ও মা ঘরে ঢুকিলেন।]

মা ॥ তোমার যা চাল-চলন দেখছি বৌমা, লোকের কাছে এখন মুখ দেখানো দায়। বাছার আমার রেল গার্ডের চাকরি, সারা দিন খেটে খুটে এসে বাড়িতে যদি এই কুরুক্ষেত্র হয়, তবে বল মা তারা দাঁড়াই কোথায় !

[মা চলিয়া গেলেন। কৃপাণ শয়ন কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া দিল]

কৃপাণ ॥ কি কেলেংকারী বলো তো! গার্ডের চাকরী—রাতে ডিউটি থাকলে বাড়ি ফিরতে এমনি রাত হয়েই থাকে, তবু এই আশা নিয়ে ঘর পানে ছুটি—নতুন বৌ, রাত জেগে পথ চেয়ে বসে আছে। তা কিনা—

[ঘরের ভিতর সিগারেটের গন্ধ পাইল এবং বার কতক নাক টানিয়া নিঃসন্দেহ হইল।]

কৃপাণ ॥ ঘরে সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি।

ইলা ॥ সিগারেট! কই, না তো!

কৃপাণ ॥ হ্যাঁ। আমি কৃপাণ বোস। জীবনে কখনো সিগারেট ছুঁইনি। কাজেই তার গন্ধটা আমার নাকেই লাগবে বেশী। ইলা, বল ঘরে কে এসেছিলো

ইলা ॥ তুমি বলছো কি?

কৃপাণ ॥ [পুনরায় নাক শুঁকিয়া] হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিক বলছি। এখনি এঘরে সিগারেট খেয়ে গেছে কেউ। এখনো তার কড়া গন্ধ পাচ্ছি। কে খেয়েছে সিগারেট? কে এসেছিল ঘরে? [বাতায়নটি উন্মুক্ত দেখিয়া] জানালটা খোলা—[ছুটিয়া জানালায় গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া চারিদিকে দেখিয়া] কে ওখানে? [কোনো সাড়া না পাইয়া ইলার সামনে ফিরিয়া আসিয়া] ভেবেছিলে আমি রেলের গার্ড। রাতে নাও বা ফিরতে পারি। ভাগ্যিস ফিরেছিলাম তাই আজ ধরতে পারলাম—কেমন বৌ আমি ঘরে এনেছি।

ইলা ॥ শোনো—শোনো—

কৃপাণ ॥ কি আবার শুনবো? হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়েও আবার কথা বলছো? (রাগের চোটে ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া চেঁচাইয়া ডাকিতে লাগিল) মা, মা,! শিগগীর শুনে যাও।

[ইলা কাঠের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।]

আমি তখনি মাকে বলেছিলাম—শহরের মেয়ে ঘরে এনো না। মা তোমার রূপ দেখে মজে গেলেন।

[মায়ের প্রবেশ]

মা ॥ কি বাবা, ব্যাপার কি?

কৃপাণ ॥ অত কড়া নাড়াতেও দরজা খুলছিলো না তোমার বৌ। কেন জানো?

মা ॥ কেন বাবা?

কৃপাণ ॥ ঘরে তখন লোক ছিল।

মা ॥ সে কি!

কৃপাণ ॥ হ্যাঁ মা। জানালা দিয়ে তাকে পাচার করে তবে দরজা খোলা হয়েছে।

মা ॥ না, না, এ তুই কি বলছিস বাবা!

কৃপাণ ॥ ঘরের ভেতর এসো মা। সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছো? হ্যাঁ—এখনো তো রয়েছে।

মা ॥ (নাক শুঁকিয়া) তাই তো! সিগারেটের গন্ধ তো! বৌমা, তোমার চাল-চলন ভালো বুঝিনি এটা সত্যি—কিন্তু তুমি যে এতদূর অধঃপাতে গেছ—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

কৃপাণ ॥ এই বৌ নিয়ে আমাকে ঘর করতে হবে মা?

মা ॥ আগেকার দিন হলে মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে লাথি মেরে বের করে দিতেন এমন বৌকে কর্তারা। ছিঃ! ছিঃ! ঘেন্নায় মরছি। এখন কর্তা তুমি, যা করতে হয় করো।

কৃপাণ ॥ এতক্ষণ আমি ওকে খুন করিনি কেন তাই ভাবছি!

মা ॥ না—না—বাবা, ওসব খুন খারাপি থাক। হাতে দড়ি পড়বে—শত্রু হাসবে। রাত ভোর হোক, মানে মানে এ পাপ বিদেয় হোক বাপের বাড়ি। হ্যাঁ বাবা, কাল ভোরে ঐ কুলটার মুখ দেখতে হয় না যেন আমাকে।

ইলা ॥ শুনুন মা, আপনার পায়ে পড়ছি, শুনুন।

মা ॥ কি আবার শুনবো? চাঁদপানা মুখের দু'ফোঁটা চোখের জল দেখে কচি ছেলে তোমার কথায় ভুলতে পারে, আমি ভুলবো না। এক কাপড়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে কাল সকালে।

[মা চলিয়া গেলেন। কৃপাণ দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল।]

কৃপাণ ॥ কুলটা! মা ঠিকই বলেছেন।

ইলা ॥ আমি কুলটা—এ কথা শোনার পর আর কিছু বলতে আমারও ঘেন্না হচ্ছে।

কৃপাণ ॥ 'চোরের মা'র বড় গলা' আমাদের দেশে একটা কথা চালু আছে। কথাটা দেখছি মিথ্যে নয়। কিন্তু আমি ভাবছি এ-ই যদি তোমার মনে ছিল, এ বিয়েতে তুমি রাজি হলে কেন? যে বাবুটি, থুড়ি, যে দাদাটি আজ ঘরে এসেছিল, তাকে বিয়ে করতে বাধাটা ছিল কি? ও, বুঝেছি, দাদাটি হয়তো বেকার, তাই বাপ মা'র হয়তো অমত হলো। আর তুমিও বুঝলে, আমার যখন রেল গার্ডের চাকরি—মাসের মধ্যে অনেকগুলো রাত তোমার ঘরটা খালিই থাকবে—রথ দেখা হবে, কলা বেচাও চলবে।

ইলা ॥ অভদ্র তুমি—ইতর তুমি। এক নিমিষে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম, তুমি আমাকে কতটা ভুল বুঝেছ। কিন্তু তোমার ইতরোমিতে সে প্রবৃত্তি আর আমার নেই। রাত ভোর হবার অপেক্ষাও আমি আর করতে চাইনা। আমি চলে যাচ্ছি এখনি।

কৃপাণ ॥ অত সহজে আমি তোমাকে ছাড়তে পারিনা ইলা দেবী। তোমার গুপ্ত প্রেমের কাহিনীটা আমি সবিস্তারে শুনে রাখতে চাই। কারণ তোমার নাগরটিকেও আমার জানা আবশ্যক। অতীতটা উদ্ঘাটন কর দেবী।

ইলা ॥ (চট করিয়া তাহার বালিশের তল হইতে এক তাড়া চিঠি বাহির করিয়া সেই চিঠির তাড়া কৃপাণের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া) আমার অতীতটা যাই

হোক, তোমার অতীতের চেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক নয়। তোমার ভালোবাসার মিসেস ডলি পলের ঐ হৃদয় বিদারক চিঠিগুলো পড়েই তবে আমি একথা বলতে পারছি।

কৃপাণ॥ (চিঠির তাড়াটি তুলিয়া তাহা পকেটে পুরিল) হুঁ, চিঠিগুলো তবে পড়েছ—তার মানে, আমার বাক্সটাক্স সব ঘাটা হয়েছে।

ইলা॥ হ্যাঁ, তা হয়েছে। তবে নিশ্চিন্ত থাকো—কিছু হারায়নি। ডলি পলের সঙ্গে নানা পোজে তোলা তোমার মনোরম ফটোগুলোও যথাস্থানেই আছে। আচ্ছা, আমি তবে আসি।

[যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।]

কৃপাণ॥ দাঁড়াও। শোন।

ইলা॥ বল।

কৃপাণ॥ আমি বলছিলাম কি, তুমি এভাবে চলে গেলেও কেলেংকারীটা কিছু কম হবে না।

ইলা॥ হোক। উপায় কি ?

কৃপাণ॥ উপায় হয়তো এখনো আছে।

ইলা॥ আমি কুলটা—একথা শোনার পর আর কিছু আমি শুনতে চাই না।

কৃপাণ॥ অতীত সবারই থাকে। আমারও আছে, তোমারও আছে। অস্বীকার করছিনা, মিসেস্ ডলি পল, আমার জীবনে সত্যি সত্যিই একদিন এসেছিল ঝড়ের মতো। বিশ্বাস কর ইলা, আমার জীবনের সে ঝড়টা কেটে গেছে। আর কেটে গেছে বলেই আমি বিয়ে করতে পেরেছিলাম তোমাকে। এমনি একটা ঝড় হয়তো তোমার জীবনেও উঠেছিল। কিন্তু আজ যখন তুমি আমার সঙ্গে ঘর বেঁধেছ, তোমার মনের দোর-জানালাগুলো বন্ধ রেখে সে ঝড়টাকে ঠেকানোই কি উচিত ছিলনা ইলা ?

ইলা॥ তোমার এ কথাগুলো আমার শুনতে কেন যেন বেশ ভাল লাগলো। মনে হচ্ছে বেশ প্রাণ খুলেই তুমি কথা কইলে।

কৃপাণ॥ তুমিও বলো। তুমিও প্রাণ খুলেই আমায় সব বলো। এ যুগের যা ধারা তাতে আপোষ করে না চললে উপায় নেই। ভুল ভ্রান্তি মানুষের হয়—মানুষ যখন তা বোঝে, তাকে এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করে। চেষ্টাটা যদি আন্তরিক হয় জীবনের অনেক গরমিল দূর হয়ে যায়। প্রাণ খুলে যদি তোমার কাহিনীটা বল, হয়তো আবার আমরা একটা পথ খুঁজে পেতে পারি ইলা! (ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর) তোমাকে হারাতে আমার কষ্ট হচ্ছে ইলা।

[মনে হইল কৃপাণের কথাগুলি ইলার মনে দাগ কাটিল। সে ক্ষণকাল কি ভাবিল। তারপর হঠাৎ স্বামীর মুখোমুখি ঘুরিয়া দাঁড়াইল।]

ইলা॥ তুমি বসো, আমি বলছি, কিন্তু আমার একটু সময় লাগবে।

[ইলা চট করিয়া ক্যাশ বাক্সটির কাছে গিয়া চাবি দিয়া বাক্সটি খুলিল—খুলিয়া একটি সিগারেট

কেস হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া উহা মুখে লইয়া দিয়াশলাই জ্বালাইয়া ধরাইল, এবং সিগারেট টানিতে টানিতে স্বামীর সম্মুখে আসিল।]

কৃপাণ ॥ (সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল) ইলা!

ইলা ॥ বলো—

কৃপাণ ॥ তুমি—তুমি সিগ্রেট খাও।

[ইলা মাথা নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।]

আমি আসবার আগে তবে তুমিই সিগ্রেট খাচ্ছিলে?

ইলা ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল—হুঁ) আমার দাদা ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানীর সেলসম্যান। নেশাটা ধরেছিলাম লুকিয়ে। বিয়ের পরও বদ অভ্যাসটা—

কৃপাণ ॥ এত কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ এ কথাটা একবার বললে না?

ইলা ॥ বলবার সময় দিলে কৈ? আর শাশুড়ির সামনে এ কথাটা বলবারও নয়। বাঙালী ঘরের মেয়েদের এটা এখনো একটা পাপ।

কৃপাণ ॥ কিন্তু আমার কাছেও তো চুপি চুপি বলতে পারতে?

ইলা ॥ সারা জীবনে তুমি সিগ্রেট ছোঁওনি। আমি সাহস পাইনি।

কৃপাণ ॥ ইলা! আমার ইলা! (স্ত্রীকে বুকে চাপিয়া ধরিল।)

যবনিকা

॥ বনফুল অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ ॥

ওলট-পালট

[কলিকাতার উপকণ্ঠে ফালগুনী চৌধুরীর বাসস্থান। ফাল্গুনী চৌধুরীর বয়স পঁচিশ কিন্তু ফিল্মের গল্প লিখিয়া কিছু নাম ও অর্থ দুই-ই উপার্জন করিয়াছে। অষ্টাদশী তরুণী চিত্রাঙ্গদা গুপ্তা ফালগুনীর গুণমুগ্ধা বান্ধবী ছিল: এক্ষণে ফালগুনীর স্ত্রী এবং সগ্য বি-এ পাশ করিয়া সহরতলীর "আদর্শ শিক্ষা সদন"-এ শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্তা। ফালগুনী ও চিত্রাঙ্গদার সংসারটিতে তৃতীয় ব্যক্তি হইতেছে একটি কিশোরী দাসী—নাম আগুন। সন্ধ্যাকাল। উপবেশন কক্ষে গল্প লেখায় রত ফালগুনী।]

ফাল্গুনী ॥ (হঠাৎ হাত ঘড়িটি দেখিয়া) এই যাঃ! ছটা বাজে যে! উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল) চিতু—চিতু! (কোন সাড়া মিলিল না। ফাল্গুনী আবার কলম ধরিল এবং লিখিতে চেষ্টা করিল) দূর ছাই! এমন হলে কি কেউ লিখতে পারে? ছ'টা বেজে গেল—না পেলাম এক পেয়ালা চা—না দেখছি সিনেমায় যাওয়ার কোন আশা। (পুনরায় চিৎকার করি. ডাকিতে লাগিল) চিতু চিতু! কোন সাড়া নেই। নতুন ঝি-টাও হয়েছে এমন—। আমার কোন কাজ করবে না। (চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল) আগুন—আগুন

[রাস্তা হইতে এক পথিক যুবক ছুটিয়া আসিল]

যুবক ॥ আগুন ! কোথায় লাগলো মশাই ?

ফাল্গুনী ॥ আঃ কী বিপদ ! কোথায় আবার আগুন লাগবে ?

যুবক ॥ আগুন আগুন বলে চ্যাঁচাচ্ছিলেন যে !

ফাল্গুনী ॥ আরে মশাই আগুন আমাদের ঝি'র নাম । ঝিকে ডাকছিলাম

যুবক ॥ বলিহারী নাম ! আগুনের মত চেহারা বুঝি ?

ফাল্গুনী ॥ বেরিয়ে যান মশাই ।

যুবক ॥ আমি বেরিয়ে যাচ্ছি স্যার। কিন্তু যেদিন সত্যি সত্যি আগুনে পুড়ে মরবেন সে দিন হাজার চিৎকার - করলেও কেউ আসবে না। পাড়ায় আমি সবাইকে বলে রাখছি। আমার নামটা জেনে রাখুন—অশনি হালদার। ছেলেরা শনিদা বলে ডেকে থাকে। পাড়ায় নতুন এসেছেন তাই জানেন না। একখানা ফিল্মের বই লিখে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। ফিল্মের জগতে বাস করেন কিনা তাই নিজের নাম নিয়েছেন ফাল্গুনী, বৌ'র নাম চিত্রাঙ্গদা আর ঝি'র নামও রেখেছেন আগুন। এই আগুনেই একদিন পুড়তে হবে. সেদিন জল ঢালার লোক মিলবে না। হ্যাঁ—বলে যাচ্ছে শনিদা। [পথে নামিয়া চলিয়া গেল]

ফাল্গুনী ॥ এই সেরেছে ! কী হতে কী হয়ে গেল। [উঠিয়া বাহিরে যাইবার দরজাটি খিল দিয়া পুনরায় টেবিলের কাছে আসিয়া অধীরভাবে চিৎকার করিতে লাগিল] আচ্ছা এর কী কোন মানে হয়। চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙ্গে গেল তবু তোমাদের কোন সাড়া নেই ?

[ভেতর হইতে রুদ্ধ দরজা খুলিয়া আগুন ঝি প্রবেশ। মেয়েটির নাম নেহাত বেমানান হয় নাই। কোনদিন হয়তো নীচের মহলেই ছিল কিন্তু এখন সাজসজ্জায় অনেকটা উঁচু হইয়াছে। আগুনের কোন লক্ষণ দেহে থাকুক না থাকুক চোখে আছে আর আছে কথায়।]

আগুন ॥ বলুন কর্তা।

ফাল্গুনী ॥ কোথায় সব থাক ?

আগুন ॥ দিদিমণির সাজ পোশাক করে দিচ্ছিলাম।

ফাল্গুনী ॥ সাজপোশাক করতে ক'ঘণ্টা লাগে ? আর ঘরে, খিল এঁটে সাজ পোশাকই বা কেন ? ডাকতে ডাকতে আমায় গলা ভেঙে যায়। পাড়ার লোক জড়ো হয়—ভাবে ঘরে বুঝি আগুন লেগেছে ! তোমার ঐ আগুন নাম আর চলবে না। ঝি বলেই তোমাকে এখন থেকে ডাকা হবে।

আগুন ॥ ডাকতে পারেন। কিন্তু কোন সাড়া পাবেন না। আমাদের মিটিঙে পাশ হয়ে গেছে, ঝি চাকর বলে ডাকা চলবে না।

ফাল্গুনী ॥ তা না হয় না ডাকলাম. কিন্তু অমন একটা অলুক্ষণে নাম—ওটা তোমাকে বদলাতে হবে।

ফাগুন ॥ আম-ই বরং মনিব বদলাব। বাপ-মা'র দেওয়া নাম বদলাতে যাবো কেন আমি ?

[চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ। অষ্টাদশী, সুন্দরী। কোমল কঠোরের সমাবেশ—যেন শ্রীদুর্গা।]

[সঙ্গে সঙ্গে রুখিয়া] আমি আর এখানে চাকরী করবো না দিদিমণি।

চিত্রাঙ্গদা ॥ কেন, কি হয়েছে ?

আগুন ॥ কর্তা বলছেন যে আমার বাপ-মা'র দেওয়া নামটা পালটাতে হবে।

চিত্রাঙ্গদা ॥ [ফাল্গুনীকে] কেন নামটাতে কী দোষ হল ?

ফাল্গুনী ॥ ঘরে খিল এঁটে দুজনে বসে থাকবে। এক পেয়ালা চা চাইতে গিয়ে 'আগুন আগুন' ব'লে চেঁচিয়ে ডেকেছি। পথ থেকে লোক ছুটে এল ঘরে। বলে কি না, ঘরে আগুন লেগেছে ?

চিত্রাঙ্গদা ॥ চেচামেচি করাটাই অভদ্রতা। চায়ের সময় হয়নি এখনও। পাঁচ মিনিট বাকী। ভদ্রঘরে সব-কিছু টাইম মাফিক হয়। কোন কিছুর জন্যে চেঁচামেচি করতে হয়না। আগুন। চা।

[আগুন চা আনিতে চলিয়া গেল।]

ফাল্গুনী ॥ ঝি'র সম্মানটাই তোমার কাছে বড হল। খুব ওকে মাথায় তুলেছ দেখছি !

চিত্রাঙ্গদা ॥ কাজের লোক আমি ভালবাসি। আশা করি এটা তোমার ওপর কোন কটাক্ষ বলে তুমি মনে করবে না। তুমি স্বামী। [হাসিয়া] সবার উপরে তুমিই সত্য তোমার উপরে নাই !

[পাশের চেয়ারে বসিল।]

ফাল্গুনী ॥ বাঁচলাম ! ভারী ঈর্ষা হচ্ছিল কিন্তু আমার চিতু।

চিত্রাঙ্গদা ॥ আবার চিতু !

ফাল্গুনী ॥ ও-হ্যাঁ। হুকুম হয়েছে 'চিতু' বলে ডাকা চলবে না।

চিত্রাঙ্গদা ॥ [আবদারে] তুমি আদর করে আগে যখন আমায় 'চিতু' বলে ডাকতে মন্দ লাগতো না। কিন্তু কেন যেন এখন আমার মনে হয়—এ নামটা অতি সাধারণ। নামটা যেন আমাকে মানায় না। চিত্রাঙ্গদা বলতে না চাও, কেন তুমি আমায় চিত্রা বলে ডাকো না।

ফাল্গুনী ॥ ডাকতে তাই-তো চাই, কিন্তু একটু আবেগ হলেই কেন যেন ঐ কাটখোট্টা নামটা ভুলে যাই। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে 'চিতু'।

চিত্রাঙ্গদা ॥ এখন থেকে আমিও তোমাকে 'ফাগুন' বলে ডাকবো। ফাল্গুনী বলবো না—বলবো না।

ফাল্গুনী ॥ বাঃ বাঃ—কী সুন্দর নামটি তুমি আমায় দিলে। ফাগুন ! একবার ডাকো না আমায় তুমি ঐ নামে।

চিত্রাঙ্গদা ॥ তাই নাকি ! ওর চেয়েও মিষ্টি নাম তোমায় আমি দিতে পারি। দেবো ?

ফাল্গুনী ॥ কই দাও তো !

চিত্রাঙ্গদা ॥ বেগুন !

[চায়ের ট্রে লইয়া আগুনের প্রবেশ ।]

আগুন ॥ না না—ও বেগুন নাম আমি নেবো না। আমি যে আগুন—সেই আগুন।

[ফাল্গুনী ও চিত্রাঙ্গদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—আগুন ট্রে টেবিলের উপর রাখিয়া রাগতভাবে চলিয়া গেল। ইহাতে স্বামী-স্ত্রী আরও হাসির খোরাক পাইল। চিত্রাঙ্গদা চা ঢালিয়া দিল।]

চিত্রাঙ্গদা ॥ কি—বেগুন নামটা পছন্দ হল ?

ফাল্গুনী ॥ তোমার পছন্দ হলেই আমার পছন্দ চিতু !

[চিতু নামে চটিয়া গিয়া চিত্রাঙ্গদা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ।]

কেন—কী হল ?

চিত্রাঙ্গদা ॥ আবার চিতু ?

ফাল্গুনী ॥ এই দেখ ! একটু আবেগ এলেই আমার কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। আমায় মাপ কর চিতু—মানে—চিত্রা—মানে চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা ॥ [না হাসিয়া পারিল না] আচ্ছা এই শেষবার মাপ করলাম।

ফাল্গুনী ॥ বাঁচলাম। না না—এ ভুল আর আমি করবো না। যদিও ভুল করবো না বললেও মানুষেরই ভুল হয়। যেমন তোমার।

চিত্রাঙ্গদা ॥ আমি আবার কী ভুল করলাম ?

ফাল্গুনী ॥ আজকে সিনেমায় যাওয়ার কথাটা একেবারেই ভুলে গেছ।

চিত্রাঙ্গদা ॥ সিনেমায় আজকে তোমার লেখা বই হচ্ছে।

ফাল্গুনী ॥ না। আমার বই তো কাল বেস্পতিবার উঠে গেছে।

চিত্রাঙ্গদা ॥ বলেছিলাম তোমার বইটা আর একবার দেখবো। আজ তবে ভুলটা আমার কোথায় হলো ?

ফাল্গুনী ॥ আজ একটা ইংরেজী বই দেখবো. তোমায় কতবার বলেছি। প্লটটা ভারী সুন্দর। একটু ওলোট-পালোট করে বাংলায় চালানো যায় কি না দেখবার ছিল মতলব।

চিত্রাঙ্গদা ॥ দু'বছর চেষ্টা করে চার জোড়া জুতোর তলা খুইয়ে একটা ফিল্মের গল্প তোমার বিক্রী হয়েছে। যে দামে বিক্রী করেছো তা মুখে আনতেও লজ্জা হয়। ভাগ্যিস আমি বি-এ পাশ করার পরই ইস্কুলের কাজটা পেয়েছিলাম তাই এখনও কপোত-কপোতী হয়ে একটা বাসা বেঁধে বাস করতে পারছি। নইলে ফুটপাতে বাঁধতে হত ঘর। এ কথাটা তুমি বার বার ভুলে যাও।

ফাল্গুনী ॥ না না—অবশ্য ভুলি না।

চিত্রাঙ্গদা ॥ হ্যাঁ তুমি ভোল। ঐ তো আবার ফিল্মের গল্প লিখতে বসেছো। কী হবে এ সব ছাইপাঁশ লিখে ?

ফাল্গুনী ॥ চিতু,—মানে—চিত্রাঙ্গদা, আজ তুমি একে ছাইপাঁশ বলছো, কিন্তু একদিন ছিল—যেদিন গল্প লিখতে তুমিই দিয়েছিলে আমাকে উৎসাহ, প্রেরণা।

চিত্রাঙ্গদা ॥ তখন আমরা কেউ সংসারে ঢুকিনি। জগৎটা ছিল তখন আমাদের আলাদা। জীবনটা ছিল তখন স্বপ্নের। আজ বুঝছি সে জীবন, সে জগৎ কী মিথ্যা। স্পষ্ট বুঝছি জীবনটা আমার পালটে যাচ্ছে। জগৎটা আমার বদলে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বদলে যাচ্ছি। [হঠাৎ আত্মস্থ হইয়া কঠোর ভাবে] বি-এ'র পাঠ্য বইগুলো ধুলো ঝেড়ে আমি সাজিয়ে রেখেছি তোমার ঐ শেল্‌ফে। গল্প লেখা ছেড়ে দিয়ে বইগুলি ধরো—আবার পড়াশুনা করো। পড়াতে আমার বেশ লাগে। আমার কাছে পড়বে।

ফাল্গুনী ॥ তোমার কাছে!

চিত্রাঙ্গদা ॥ না না—আমি বুঝি তোমার কাছে সেটা অপমানের হবে। [একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায়] আমার কেন এমন হয় আমি জানিনা। বুঝিনা কেন এসব আমার মাথায় আসে! মনে হয় আমার কোন ব্যারাম আছে!

ফাল্গুনী ॥ কী হয়েছে চিতু? বল—বল। কাঁধ আর শিরদাঁড়ায় আবার কি সেই ব্যাথাটা?

চিত্রাঙ্গদা ॥ না-না তার চেয়েও বেশী। স্কুলে আমি পডাই একেবারে নির্মম হয়ে। কচি কচি মেয়েরা আমাকে দেখে ভয় করে। শুধু ধমকাইনা, মাঝে মাঝে আমি ওদের মারি। মুখে ডাকে অবশ্য দিদিমণি, কিন্তু আড়ালে গিয়ে বলে "বাঘা দিদি"। এমন তো আমি ছিলাম না ফাল্গুনী!

ফাল্গুনী ॥ একটা মাস্টারী মাস্টারী ভাব তোমার আগেও ছিল চিতু। কলেজে ছেলেরা তোমার কাছে ঘেঁসতে ভয় পেত। আমি বাদে। স্কুলে চাকরী নেবার পর তোমার সেই মাস্টারী মনোবৃত্তিটা যেন আরও বাড়ছে। হ্যাঁ, সেটা আমি আজ কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি। যদি এটা ব্যারাম বলো, ওষুধ হচ্ছে স্কুলের কাজটা ছেড়ে দেওয়া।

চিত্রাঙ্গদা ॥ [রুখিয়া উঠিয়া] ছেড়ে দেবো! স্কুলের কাজ আমি ছেড়ে দেবো! বেকার বসে থেকে তুমি আমাকে এ কথা বলতে পারছো?

ফাল্গুনী ॥ হ্যাঁ, বলতে পারছি। আমি বেকার হতে পারি কিন্তু বিত্তহীন নই। গ্রাম দেশে এখনও আমার ভিটে মাটি যা আছে কিছু কম নেই। যাবে সেখানে আমার সঙ্গে? চাষ-বাস করে খাবো। মোটা ভাত কাপড়ের কোন দুঃখ হবেনা। আমরা আনন্দে থাকবো। শান্তিতে থাকতে পারবো চিতু।

চিত্রাঙ্গদা ॥ আবার চিতু?

ফাল্গুনী ॥ মানে, চিত্রা। চিত্রাঙ্গদা, [একটু থামিয়া] আমার প্রস্তাবটা রাখবে?

[সম্মতির আশায় আগ্রহের সহিত চিত্রাঙ্গদার দিকে তাকায়।]

চিত্রাঙ্গদা ॥ তুমি আমার স্বামী। কিন্তু আমি তোমায় সে স্ত্রী নই—যে স্ত্রী স্বামীর গলগ্রহ। আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে জানি। কারুর অনুগ্রহ

আমি নেবো না। না, তোমারও না। আমার কাছে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ একটা 'পার্টনারশিপ'। হ্যাঁ জীবনের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার আমরা।

ফাল্গুনী॥ শুধু অংশীদার! জীবনটা কি তবে বাণিজ্য? শুধু হিসাব? সে ভালবাসা কি তাতে নেই যে ভালবাসায় ক্ষতিকেও মনে হয় লাভ— লোকসানে হয় আনন্দ। তুমি কি তবে আর আমাকে ভালবাসো না চিত্রা?

চিত্রাঙ্গদা॥ বাসতাম। একদিন তোমায় মনের প্রতিটি অনুভূতি দিয়ে, প্রাণের প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে তোমাকে ভালবাসতাম। ছিলাম তোমার প্রিয়া, হলাম তোমার জায়া। স্বপ্ন দেখতাম জননীও হবো একদিন তোমার সন্তানের।

[একটি মনোরম শাড়ি পড়িয়া আগুনের প্রবেশ।]

আগুন॥ দিদিমণি চলো—আমি 'রেডি'।

ফাল্গুনী॥ (বিরক্ত হইয়া) কোথায় যাবে?

আগুন॥ আমি কী জানি! জানেন দিদিমণি।

চিত্রাঙ্গদা॥ ও, হ্যাঁ, কিছু কেনা-কাটা আছে।

ফাল্গুনী॥ আমি যেতে পারিনা সঙ্গে?

চিত্রাঙ্গদা॥ না, আমার সঙ্গে না। তুমি গেলে আমি পছন্দ মত জিনিষ কিনতে পারিনা। তোমার মেয়েলী রুচি আমি সইতে পারি না।

ফাল্গুনী॥ ও। কিন্তু আগুন গেলে কি করে চলে? কেউ যদি আসে এক পেয়ালা চা-ও কি সে পাবেনা?

[বাইরের দরজায় করাঘাত। সকলে চমকাইয়া উঠিল। ফাল্গুনী উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভিতরে প্রবেশ করিল ডাঃ সুবন্ধু গুপ্ত।]

ফাল্গুনী॥ আরে এসো এসো সুবন্ধুদা।

চিত্রাঙ্গদা॥ ছোড়দা!

ফাল্গুনী॥ পথ ভুলে নাকি ভাই?

সুবন্ধু॥ আর বোলো না ভাই। পসার যখন ছিলোনা তখন দুঃখ করতাম টাকা নেই। পসার হয়ে এখন দুঃখ, সময় নেই বলে। তোমাদের পাড়াতেই এই ভূ-কৈলাস রোডে এক রোগী দেখতে এসেছিলাম। তোমাদের সঙ্গে দেখা করার এই সুযোগটা ছাড়তে পারলাম না। কিন্তু খুকী তুই যেন কোথায় বেরুচ্ছিস মনে হচ্ছে!

চিত্রাঙ্গদা॥ একটু কেনা-কাটা করতে যাচ্ছি। তুমি যখন এসেছো যাবো আর আসবো। কতদিন বাদে দেখা। কেন যেন তোমার কথা এ ক'দিন বড্ড মনে হচ্ছিল ছোড়দা! আমার শরীর-মন কিছুই ভালো যাচ্ছেনা। তোমাকে বসতে হবে। আমার অনেক কিছু তোমাকে আজ শুনতে হবে। তুমি বস আমি তোমার জন্য কেক্ আর কাজু বাদাম নিয়ে আসছি।

সুবন্ধু॥ শুধু কেক্ আর কাজু বাদামে আমার পেট ভরবে না। আমার খিদে পেয়েছে। তোর হাতের সেই বাদশাহী হালুয়া ফিরে এসে করে দে। আমি বসি।

ফাল্গুনী ॥ এখনি তোমার একটু চা চাই সুবন্ধুদা ?

চিত্রাঙ্গদা ॥ ছোড়দা চা খান না। আয় আগুন।

[আগুনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বিজয়িনীর মত বাহিরে চলিয়া গেল চিত্রাঙ্গদা—সুবন্ধু এবং ফাল্গুনী উভয়ে মুখোমুখি বসিল]

সুবন্ধু ॥ তারপর কেমন আছো ফাল্গুনী ? সংসার ধর্ম কেমন চলছে বল।

ফাল্গুনী ॥ আর বলে কী হবে ? তুমি তো আমাদের ভুলেই গেছ সুবন্ধুদা !

সুবন্ধু ॥ না হে না, তোমাদের সব খবর আমি রাখি। আমার ঐ মামাতো বোনটা ছোটবেলা থেকেই আমার বড় আদরের ছিল। জানো তো মামার বাড়িতেই আমি ছোটবেলায় মানুষ হই। আর খুকী মানে তোমার চিত্রাঙ্গদাও ছিল আমার চুরি-ডাকাতির সাকরেদ।

ফাল্গুনী ॥ বটে !

সুবন্ধু ॥ বলেনি খুকী ? বারে ! একসঙ্গে নদী সাঁতরে পার হয়েছি। মাছ ধরেছি। চুরি করে এর গাছের আম, ওর গাছের জাম পেড়ে খেয়েছি। ঐ দস্যি মেয়েটা আমার চেয়েও ভালো গাছে উঠতে পারতো হে। গাঁয়ে স্পোর্টস হতো। তা, দৌড়ে আমরা বড়রা ওর কাছে হেরে যেতাম। ছোটবেলার সে সব স্মৃতি আজও মধুর হয়ে মনে মনে ভাসছে। বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। ঐ দস্যি মেয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে যে স্বামীর ঘরকন্না করতে পারে তা দেখে অবাকই হয়েছিলাম আমি ! আসতে না আসতেই বাদশাহী হালুয়া খাইয়েছিল, তা যেন আজও আমার মুখে লেগে আছে। আমার একটি খুব ইনটারেষ্টিং পেসেণ্ট তোমাদের এই পাড়ায় উঠে এসেছে জেনে ভাবলাম কেসটাও দেখে আসি, তোমাদের সঙ্গেও দেখা হবে। আমার যে পেসেণ্টটি দেখতে এসেছিলাম সেটি ভারী ইনটারেষ্টিং কেস হে। যুগান্তরে কেসটি বেরিয়েছে। পেসেণ্টের ছবিও ছাপা হয়েছে।

ফাল্গুনী ॥ বল কি ? আমার চোখে পড়েনি তো ! কী কেস ?

সুবন্ধু ॥ বল কি হে— গোটা দেশ তোলপাড় হয়ে গেছে এ খবরে। যদিও ডাক্তারী শাস্ত্রে এটা এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। 'কাটিং'টা আমার পকেটেই আছে। এই দেখ। (পাঠ)

॥ যুগান্তর ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৮ ॥

নুরজাহান বিবি এখন নুরুল হুদা

একদিন যিনি ছিলেন নূরজাহান বিবি, আজ সে নুরুল হুদা হইয়াছে। তাহার বয়স এখন ১৮ বৎসর ; ভূকৈলাস রোডে এক বাড়িতে সে আমিনুল সর্দারের সঙ্গে বসবাস করিতেছে।

ডায়মণ্ডহারবার জেলায় ...রা থানার শীর্ষা নামে ছোট এক গ্রামের ছোট মেয়ে

ছিল নূরজাহান। ৪ বৎসর পূর্বে যখন তাহার বয়স প্রায় ১৪, তখন তাহার সাদি হয়; বিবাহিত জীবন তিন বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার পর ছয়মাস পূর্ব হইতে সে বুঝিতে আরম্ভ করে যে, তাহার যৌন রূপান্তর আরম্ভ হইতেছে। এখন সে ১৮ বৎসর বয়স্ক কিশোর। এই রূপান্তরের পূর্বে সে প্রায় ৫ দিন ধরিয়া কাঁধ এবং শিরদাঁড়ায় ব্যথা অনুভব করিতে থাকে এবং একদিন সকালে উঠিয়া যখন সে দেখিল যে, একমাত্র মেয়েলী গলার স্বর ও ভাবভঙ্গী ছাড়া তাহার শরীরের মধ্যে স্ত্রীজনোচিত কোন চিহ্নমাত্র নাই, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি থাকে না।"

ফাল্গুনী॥ দাঁড়াও-দাঁড়াও। কোথায় ব্যথা বললে?

সুবন্ধু॥ "কাঁধ এবং শিরদাঁড়ায় ব্যথা অনুভব করিতে থাকে এবং একদিন সকালে"—

ফাল্গুনী॥ মেয়েটি দেখল সে আর স্ত্রী নয়! আশ্চর্য!

সুবন্ধু॥ শোন শোন, তারপর শোন—"এই সংবাদ রটিয়া যাওয়ার পর স্থানীয় একজন ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করেন এবং নূরজাহানের স্বামী যখন এই খবর জানিলেন, তাহার পর তাঁহার কোন পাত্তা নাই।

নূরজাহান শৈশবেই পিতৃহীনা। সংসারে তাহার দুই ভাই, এক বোন। গত ১৬ই এপ্রিল সে কলিকাতায় আসে। উদ্দেশ্য দুইটি, চাকরীর চেষ্টা এবং একদা ছিলেন যিনি তাঁহার স্বামী, তাহার সঙ্গে দেখা করা।

এখন নূরুল হুদা কিশোর জীবনের সঙ্গে নিজেকে বেশ অনেকখানি মানাইয়া লইয়াছে; এখন সে কাজ চায়; ভাইবোনদের প্রতিপালন করিতে চায়; নিজে পড়াশুনা শুরু করতে চায়; আর সবার উপর একটি মেয়েকে সাদি করার জন্য সে উন্মুখ!"

ফাল্গুনী॥ সুবন্ধুদা—আমার দারুণ ভয় হচ্ছে।

সুবন্ধু॥ ভয় হচ্ছে! কেন কিসের?

ফাল্গুনী॥ আজ কয়েকদিন থেকেই তোমার বোনের কাঁধ আর শিরদাঁড়ায় ব্যথা। অবশ্য তেমন প্রবল নয়, তবু—[বাইরে পদশব্দ পাওয়া যায়] ঐ ওরা এসে পড়েছে।

[বাহির হইতে চিত্রাঙ্গদা ও আগুন প্রবেশ করিল। সঙ্গে কিছু প্যাকেট]

সুবন্ধু॥ এই যে—এরই মধ্যে ফিরে এলি!

চিত্রাঙ্গদা॥ তোমাকে বসিয়ে রেখে দূরে যেতে মন সরলো না। হাতের কাছে যা পেলাম নিয়ে এলাম। আগুন! রান্নাঘরে জিনিষগুলো নিয়ে যা—উনুনে আঁচ দে।

[আগুন আদেশ পালন করিল।]

সুবন্ধু॥ হ্যাঁরে খুকী! তোর নাকি কাঁধে আর শিরদাঁড়ায় ব্যথা? ফাল্গুনীর ধারণা এ ব্যথা হলেই মেয়েরা হবে পুরুষ আর পুরুষরা হবে মেয়ে!

(প্রবল হাস্য)

চিত্রাঙ্গদা ॥ আমারই সব গল্প হচ্ছিল বুঝি ?

(হঠাৎ যেন চটিয়া গেল)

কি গল্প হচ্ছিল তোমাদের ?

সুবন্ধু ॥ এ পাড়ায় যে কেসটি দেখতে এসেছিলাম সে কেস্‌টা যুগান্তরে বেরিয়েছে—মায় ছবিশুদ্ধ। এরই গল্প হচ্ছিল—রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে পড়ে দেখ। মানে, হালুয়াটা করতে দেরী না হয়। আমার ক্ষিদে বেশী, সময় কম।

['কাটিং'টি তার হা'তে দিল। চিত্রাঙ্গদা তাহা দেখিতে দেখিতে অন্দরে চলিয়া গেল।]

ফাল্গুনী ॥ আমার ভয় হচ্ছে—সত্যি আমার বড় ভয় হচ্ছে।

[অন্দরে একটি আর্তনাদ শোনা গেল। কেহ পড়িয়া গেল এইরূপ শব্দ পাওয়া গেল।]

ফাল্গুনী ॥ ও কী!

সুবন্ধু ॥ একটা আর্তনাদ শুনলাম, কেউ পড়ে গেল না কি ?

[অন্দর হইতে ছুটিয়া আসিল আগুন]

আগুন ॥ আপনারা শীগগির আসুন। দিদিমণি একটা কাগজ পড়তে পড়তে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

সুবন্ধু ॥ কোথায় ?

[আগুনের পিছে পিছে সুবন্ধু, অন্দরে ছুটিয়া গেল। ফাল্গুনী হাতে মুখ ঢাকিয়া হতাশ ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।]

উল্টোরথ : কার্তিক : ১৩৬৫

। সাহিত্যের অনন্য সমালোচক

বাংলা সাহিত্যের অমর 'বীরবল'

সবুজপত্র-সম্পাদক

প্রমথ নাথ চৌধুরীর স্বহস্ত লিখিত চিঠির ব্লক।

বিচিত্র একাঙ্ক

বিচিত্র একাঙ্ক

শ্রীমতী কুমকুম দাশগুপ্তা
শ্রীমান বিশ্বরঞ্জন দাশগুপ্তকে

স্নেহাশিস্

আশীর্বাদক

মন্মথ রায়

১লা আষাঢ়

বঙ্গাব্দ ১৩৬৮

আটত্রিশ বছর আগে আমার দেড় ঘণ্টার একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' বড় বেশী ছোট বলে একক চলেনি। তখন ছিল পাঁচ ঘণ্টার নাটকের রেওয়াজ।

যুগের গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনের কর্মব্যস্ততা বেড়ে গেল, অবসর গেল ক'মে। নাটকের দৈর্ঘ্য নেমে এল আড়াই ঘণ্টায়। আড়াই ঘণ্টা থেকে নামলো এক ঘণ্টার একাঙ্ক নাটকে। আজ এই 'স্পুটনিক'-যুগের গোড়াতে আধঘণ্টার একাঙ্ক নাটকও চলছে। এমন দিনও আসছে যখন দশ পনর মিনিটের নাটকেরও হবে চাহিদা। সেদিন আসছে মনে করে পাঁচ সাত দশ মিনিটের কিছু একাঙ্ক নাটকও রেখে গেলাম আমি। এই সংকলনেও।

আজকের একাঙ্ক নাটকই ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ নাটক। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের সে যুগ আসন্ন। নাটকের মান তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না, বরং বাড়বে। 'এটম্'-বিন্দু শক্তির সিন্ধু'।

মন্মথ রায়

১লা আষাঢ়
১৩৬৮, বঙ্গাব্দ

জন্মদিন

—আজ তোমার জন্মদিন।

—ও, তুমি এসে গেছ?

—প্রত্যেক জন্মদিনেই আসি।

—ভাগ্যিস তোমাকে কেউ দেখতে পায় না। শুনতে পায় না কেউ তোমার কথা। তাই রক্ষে। নইলে জন্মদিনে মৃত্যুর দেবতা তুমি আমার পাশে বসে আছ। সবাই আঁতকে উঠত।

—এ দিনটিতে তোমাকে যারা ভালবাসে, তারাই আসে তোমার কাছে। আমিও তাই এসেছি! তারা তোমাকে চায়। আমিও তোমাকে চাই।

—হ্যাঁ. ঠিক। তারা আমাকে চায়। তারা আমাকে দিতে চায়। তুমি আমাকে চাও। তুমি আমাকে নিতে চাও।

—বটেই তো। তাদের দেওয়া যখন ফুরোবে, তখনই আমি তোমাকে নেব। জান তো, নিঃস্ব আব কাঙালের উপরেই আমার লোভ। হ্যাঁ, একজনের যখন কিছুই থাকে না, কিছুই রইল না, তখনই আমি তাকে বুকে টেনে নিতে পারি। তার আগে নয়। তাই প্রতি জন্মদিনে আমি ছুটে আসি দেখতে, তোমার এখনও কি আছে!

—কিন্তু এখনও তো আমার সবই আছে।

—হ্যাঁ আছে। স্ত্রী আছে। পুত্র কন্যা আছে। বন্ধু আছে। প্রচুর আত্মীয়স্বজন রয়েছে। কিন্তু তাদের নিয়ে গর্ব করবার মত এখনও তোমার কিছু আছে কি? তা যদি না থাকে তবে তো তারা থেকেও নেই।

—চুপ। আমার স্ত্রী আসছেন।…এস গো। দেরি কেন?

—স্নান সেরে পুজো করে এলাম। কই, পা দুখানি কই? প্রণাম করি।

—এতকাল ঘুম থেকে উঠেই এই দিনটিতে সবার আগে আমাকেই করতে প্রণাম।

—এতকাল তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানতাম না। তুমিই ছিলে আমার একমাত্র ইষ্ট। দীক্ষা নেবার পর থেকে জেনেছি, ওটা মায়া। জগৎটা, সংসারটা সচ্চিদানন্দের। তুমি আমার সেই সচ্চিদানন্দের দান, তোমাকে প্রণাম করে তাঁকেই প্রণাম করছি আজ।

—নতুন কথা শুনছি গো।

—গুরু বলেছেন, এইটাই একমাত্র সত্য। আজ এই দিনটিতে তাঁকে আসতে বলেছিলাম, তিনি এসেছেন। যাই, তাঁর ভোগের আয়োজন করতে দেরি হয়ে গেছে।

কিন্তু আমাকে সকালের ওষুধটা দিতেও দেরি করে ফেলছো সুরমা।

এই যাঃ! ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে। আনাই হয়নি। আচ্ছা আমি আনাচ্ছি।

*   *   *

—কি বুঝছ ?

—হ্যাঁ, বুঝছি।

—সুরমা দেবী তো চলে গেলেন। এবার প্রাণ খুলে আমাকে বল না, তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানেন না তোমার স্ত্রী—এ গর্বটা কি তোমার এখনও আছে ?

—হ্যাঁ, সেটা এখন ভেবে দেখার বিষয় বটে।

—মানুষের দোষই ওই। ভাঙে তো মচকায় না।

—চুপ রমেন আসছে। আমার ছেলে।

*   *   *

—বাবা, কী বিপদ দেখেছ ?

—বিপদ ? কি বিপদ রমেন ?

—তোমার পা দুখানি বের কর। আগে প্রণাম করি। তারপর বলছি।

—দীর্ঘজীবী—হও বাবা। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। কিন্তু বিপদটা কি ?

—বিপদটা ঘটিয়েছেন বিধাতা। তোমার জন্মদিনেই হচ্ছে সুনন্দার জন্মদিন।

—কে সুনন্দা ?

—বাঃ, সুনন্দাকে তুমি ভুলে গেলে ? তোমার বন্ধু অশোক সেনের সেই ধিঙ্গি মেয়েটা। যাকে তুমি আনন্দময়ী বলে ডাক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আনন্দময়ী!

—সেই আনন্দময়ীর জন্মদিনও আজ। আমি লিখেছিলাম:বাবার জন্মদিনও আজ। কি করে বর্ধমান যাই বল। তা এখন ট্রাঙ্ককল এসে উপস্থিত। আমি না গেলে উৎসবই নাকি হবেনা।

—না না, তুমি যাবে বইকি বাবা। অশোক আমার বাল্যবন্ধু। আব ওই আনন্দময়ী সুনন্দা—একদিন আমার ঘরের লক্ষ্মী হয়ে আসবে, এ আশাও আমি রাখি। তা বেশ, এ বাড়ির নেমন্তন্নের ভোজপর্বটা তো দুপুরে। ওটা মিটিয়ে দিয়েই তুমি বেরিয়ে পড়। বেলাবেলিই পৌছে যাবে বর্ধমানে।

—টেলিফোনে আমিও তাই বললাম বাবা। কিন্তু শুনছে না। বলছে এবেলাই এস। তুমি যাই বল বাবা, মেয়েটা বড় অবুঝ।

—তা বেশ, এখুনি রওনা হও। এদিককার ব্যাপার—আচ্ছা সে হবে এখন।

—সে তুমি ভেবো না বাবা। আমাদের ওই নতুন চাকরটা যেমন চালাক তেমনি চটপটে। ম্যানেজ করে দেবে। আচ্ছা বাবা, তা হলে আমি এই আটটা তেইশের গাড়িতেই—

—এসো।

*　　　　　*　　　　　*

—কি বুঝলে ?

—হ্যাঁ, বুঝছি।

—ছেলে তো চলল আটটা তেইশের গাড়িতে।

—যাক না। মমতা, আমার মেয়ে—ট্রেনটা বোধ হয় লেট আছে—নইলে এতক্ষণ এসে পড়বার কথা। বাঁকুড়া গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। সে এসে পড়লে একাই একশো। ওই বুঝি এসে গেছে।···কিন্তু—কিন্তু তোমাকে তো চিনলাম না মা।

—আমার প্রণাম নিন। আর চন্দনকাঠের এই খড়ম-জোড়া নিন। মমতাদি আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁরই সহকারী শিক্ষয়িত্রী। আমার নাম রমা মিত্র।

—বেশ মা, বেশ। আশীর্বাদ করি সুখী হও। সার্থক হও। কিন্তু মমতা সে এল না কেন? ভাল আছে তো?

—ও, সে জানেন না বুঝি? স্কুলে এবার রেলের কনসেশান পাওয়া গেছে ভারতের সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখার জন্য। স্কুলের শিক্ষিকারা সব দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছেন কাল। আজ আপনার জন্মদিন বলে প্রথমটায় মমতাদি যেতে চাইছিলেন না। কিন্তু সেক্রেটারী চঞ্চলবাবুর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। জানেন, ভারি মজার লোক এই চঞ্চলবাবু। বলছিলেন অজন্তা ইলোরায় গিয়ে নিজেদের খুঁজে পাবে তোমরা।

—ত, তুমি গেলে না যে মা? নিজেকে হারাও নি বুঝি?

—আমিও যেতাম। কিন্তু কিছুদিন থেকে মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বিদেশে চাকরি করি। এই ছুটিছাটাতেই যা একটু সুযোগ পাই বাপ-মায়ের সেবাশুশ্রূষার। ট্রেন থেকে সোজা আপনার এখানেই চলে এসেছি। হ্যাঁ, মমতাদি ওই খড়মজোড়া আজই সকালে দেবার জন্য বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন যে। আচ্ছা, আমি তবে আসি।

—এসো মা, এসো। তোমার মা হয়তো তোমার পথ চেয়েই আছেন। না, আর দেরি করো না।

*　　　　　*　　　　　*

—কি, বুঝলে ?

—হ্যাঁ, এটা বুঝেছি, অনেকের কাছ থেকেই ধীরে ধীরে আমি দূরে চলে আসছি।

—আর তত কাছে আসছ আমার। ওই যে আবার কে আসছে।

*　　　　　*　　　　　*

—আরে, এসো এসো—তাপস এসো। তোমার এত কাজের মধ্যে মনে করে যে আজ এসেছ—

—আসব না? তুমি কি বলছ সর্বদা? যত কাজই থাক্‌, তোমার জন্মদিনে আমাকে আসতেই হবে। আমার মাসিকপত্র 'মশালে'র নামকরণ করছিলে তুমি। তোমার লেখার আগুনে তখন বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার কতটা কেটে গিয়েছিল তা জানে দেশের লোক। তোমারই আশীর্বাদে দাদা, এবার আমার 'মশালে'র পূজাসংখ্যায় বেরুচ্ছে তিন তিনটে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। এক ডজন বড় গল্প। কবিতা আমি গুণি না। জানই তো এই পূজা সংখ্যাটাই হল আমাদের নববর্ষ-সংখ্যা। দু লাইন আশীর্বাদ লিখে দাও দাদা।

—লিখে আর কি আশীর্বাদ করব। 'মশালে'র এই বার্ষিক সংখ্যার জন্যে একটা ছোট গল্প লিখে রেখেছি। ওটা নিয়ে যাও। ওই আমার আশীর্বাদ।

—দাদা, তুমি হলে গিয়ে বাংলাদেশের প্রবীণতম সাহিত্যিক; তোমাকে এই ছেলে—ছোকরার দলে মিশিয়ে মুড়ি-মিছরির একদর করতে পারব না। তা সে যে যাই বলুক। তুমি বরঞ্চ একটা আশীর্বচন লিখে দিলে এদের যাত্রাপথ সুগম হয়ে উঠত। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি বরঞ্চ সম্পাদকীয়তে লিখে দেব, তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই আমাদের নববর্ষের জয়যাত্রা শুরু হল। চলি। আমার আবার একগাদা প্রুফ। এমন হয়েছে—মরবার সময় নেই।

*　　　*　　　*

—কি বুঝলে?

—হ্যাঁ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

—আমার ঘর অস্তাচলের ওপারে। কিন্তু তাই বলে খুব দূরে নয়। এক নিমেষেই পাওয়া যায়।

—কিন্তু আমাকে নেবার জন্যে তোমারই বা এত আগ্রহ কেন?

—সেটা তুমি ভুলে গেছ। এবং আশ্চর্য, যদি আজ আমি তা তোমাকে মনে করিয়ে দিই, বুঝেও তুমি না বোঝার ভান করবে। তোমার প্রতি জন্মদিনেই তো তোমাকে তা বলি? তুমি শুধু অবিশ্বাসের হাসি হাসো।

—রাগ করছ কেন? বল না, শুনি। আমার প্রতি তোমার এ প্রেম কেন?

—কারণ তুমি ছিলে আমার। পৃথিবীর হাতছানিতে চুপিচুপি পালিয়ে এসেছ আমার বুক থেকে। ফিরে পেতে চাই আমি তোমাকে।

—কি যে তুমি বল, আমি বুঝিনা। পালিয়ে যদি এসে থাকি, ভুল করিনি কিছু। শুনেছি তুমি আলোহীন প্রাণহীন পাষাণ। তাই তোমাকে আমার এত ভয়। যেতে চাই না আমি এ পৃথিবী ছেড়ে। জীবনে যত দুঃখই আসুক, যত নৈরাশ্যই জমা হোক, সবাইকে ছাপিয়ে তবু থাকে এমন কোনও সম্পদ, যার জন্যে মনে হয়, যত কাঙালই আমি হইনা কেন, তবুও আমি সম্রাট।

—হ্যাঁ, এ গর্ব মানুষ করে থাকে বটে। কিন্তু এটাও কি সত্য নয় যে

মানুষের কোনও সাম্রাজ্যই শেষ পর্যন্ত টেকেনি। ধ্বংস হয়ে গেছে। চুরমার হয়ে গেছে। আমি শুধু বলতে চাই, তোমার সাম্রাজ্যও যাবে। ভাঙন ধরেছে। প্রতি জন্মদিনে দেখতে আসি আর কত বাকী!

—বড় নিষ্ঠুর তুমি। শুধু নিষ্ঠুর নও, পৈশাচিক আনন্দ দেখছি তোমার চোখে। কিন্তু তুমি জেনো, তোমার আশা পূর্ণ হতে, আমাকে পেতে, তোমার এখনও ঢের ঢের বাকি।

—অহংকারে এ কথা তুমি বলছ। চোখের উপর দেখছ নাকি একে একে তোমার সকল অহংকার চূর্ণ হচ্ছে?

—দেখছি। কিন্তু জানবে, এই পৃথিবী অনেক বড়। এত রূপ, এত রস, এত গান, এত গন্ধ আছে মানুষের জীবনে—ফুরোবে না তা কোনদিন। একদিকে হবে ক্ষয়, আর একদিকে জয়। শোন মৃত্যু—

—বল।

—আমার বাড়ির দুয়ারে রাজপথের ধারে পড়ে আছে এক কুষ্ঠরোগী। কুৎসিৎ, কদাকার, বীভৎস। দেহের মাংস খসে পড়েছে। কিলবিল করছে পোকা। দেখছ?

—হ্যাঁ, আমি সবই দেখি।

—লোকটাকে মৃত্যুকামনা করতে শুনেছ কখনও?

—মুখে করেছে। কিন্তু মনের ইচ্ছা বাঁচতে। কিন্তু কেন? কেন বাঁচতে চায় বলতে পার?

—তবে শোন, কেন বাঁচতে চায়। দীনদুঃখী একটা ভিখারিণী রাতে এসে ওর কাছে বসে। ঘাগুলো ধুয়ে দেয়। ভিক্ষে করে যা পায় তা থেকে ওকেও খাওয়ায়। হয়তো প্রেম। হয়তো দয়া। কিন্তু এইটুকু পাবার জন্যে ওর যেমন লোভ; ওইটুকু পেয়ে তেমনিই গর্ব। কেউ যদি ভিক্ষে না দেয়, লোকটা তাকে শুনিয়ে দেয়, নাইবা দিলে তুমি ভিক্ষে, ভিক্ষে দেবার লোক আমার আছে। ওর কাছে তবে তুমি হার মেনেছ মৃত্যু।

—আপাততঃ।

—অবশ্য আমি এত মূর্খ নই যে বলব আমরা অমর। মরব আমরা একদিন নিশ্চয়, কিন্তু তোমার সঙ্গে লড়াই করে মরব বন্ধু। সগৌরবে লড়াই করব। আর তারই নাম হচ্ছে জীবন। ওই, কে আসছে! ক্রমাগত হারছি। তুমি এগিয়ে আসছ। ভাবছি, আজ কি তোমাকে রুখতে পারব না আমি!

—দেখ!

* * *

—আরে, এস এস বিপদভঞ্জন। তোমার কথা আজ যেন কেন বারবার মনে হচ্ছিল। না না, কোনও মামলা টামলায় পড়িনি। ভাবছিলাম, তুমি আর আমি একবয়সী। জন্মদিনে তাই তোমার কথা মনে হচ্ছিল।

—আরে, আমারও তো মন ছটফট করছিল তোমার কাছে ছুটে আসতে। কিন্তু তার কি জো আছে? আসব বলে বেরিয়েছি এমন সময় মক্কেল এসে উপস্থিত। পুলিশ-কেসের আসামী। তুমি বলেছিলে সকাল সকাল আসতে, কিন্তু পড়ে-পাওয়া টাকা ফেলে আসতে পারি নে। কাজেই বসতেই হল।

—না না, টাকার চেয়ে বড় কিছু নেই। আমার জন্মদিনে নেমন্তন্ন রাখতে তোমার ক্ষতি হলে আমারই কি ভাল লাগত?

—তুমি ভাই আমার জন্যে যেসব ক্ষতি সহ্য করেছ, আমার কোনও ক্ষতি দিয়েই তাকে মাপা যাবে না সূর্যদা। ছিলাম বিপ্লবী। জেল খেটেছি, নতুবা এ-গর্তে সে-গর্তে পালিয়ে থেকেছি, পুরো সাতটি বছর। এই সাত-সাতটি বছর তুমি আমায় স্ত্রী পুত্রের মুখে ভাত জুটিয়েছ।

—থাক, থাক, ওসব কথা থাক। কেসটা বেশ কিছুদিন চলবে? মানে, কেসটায় টাকা আছে তো?

...হ্যাঁ, বেশ টু-পাইস পাবার কেসই এটা। আসামী দুজন। একজন তো খুবই বড়লোক। আর একজন অবশ্য খুবই গরীব। তা মামলার খরচ অবশ্য বড়লোকের ছেলেটিই চালাবে। কিন্তু যা চার্জ, শুনে আমার গা ঘিনঘিন করছে।

—বল কি! কি কেস হে?

—জঘন্য। গরীব লোকটি হচ্ছে একটি বুড়ো বাপ। আর বড়লোকের ছেলেটি হচ্ছে একটি নরপশু। বুড়ো তার ষোড়শী মেয়েটিকে নিজে নিয়ে গেছে এক পার্কের ঝোপে। ওই পশুর হাতে তুলে দিয়ে, দূরে পাহারা দিয়েছে নিজে, যাতে কেউ ওদিকে না যায়।

—আশ্চর্য! বুঝছি, পেটের দায়ে বুড়ো এই কিন্তু ঘেন্নায় মরতে ইচ্ছে হচ্ছে!...কে, ওখানে কে হাসছে?

—কই? হাসছে আবার কে!

—ও। না—হ্যাঁ...তা এরা ধরা পড়ল কি করে?

—ওই মেয়েটারই কোনও 'লাভার' হয়তো ব্যাপারটার গন্ধ পেয়ে অ্যান্টি-করাপ্‌শান্‌ পুলিসকে পূর্বেই খবরটা দিয়ে রেখেছিল—কাজেই এরা একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে।

—কিন্তু মানুষ কি এত নীচে নেমে গেছে! না না, হয়তো ওই 'লাভার'ই পুলিসকে হাত করে কেসটা সাজিয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে। ডিফেন্সও তাই হবে। কিন্তু আসামীরা আমার কাছে কবুল করেছে, ঘটনাটা সত্য। বড়লোকের ছেলেটি পাঁচশো টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, আমায় বাঁচান উকিলবাবু।

—তুমি বিপদভঞ্জন বোস। আশা করি ওদেরও বাঁচাতে পারবে, আর নিজেও বেঁচে যাবে ওদের টাকায়। তোমারও তো সামনে মেয়ের বিয়ে।

—না ভাই, এ কেস আমি নিই নি।

—নাওনি।

—না। আমিও মেয়ের বাপ।…ঘেন্না করল।

—কিন্তু তোমার মেয়ের বিয়েতে টাকার এত দরকার! কেসটা তুমি নিলে না?

—না। কেসটা শোনা অবধি নিজেকে কেমন যেন অশুচি বোধ হচ্ছে। তাই ছুটে এলাম একটা মহৎ লোকের পরশ পেতে।

—আরে আরে, একি! একেবারে যাকে বলে আলিঙ্গন যে। তা ভালই, আমার জন্মদিনে তোমার মত একটা খাঁটি লোকের ছোঁয়া পেলাম। জন্মদিন আমার সার্থক হল বিপদভঞ্জন। একি, চললে যে!

—কাছারির বেলা হয়ে গেছে।

—আরে, মিষ্টি মুখ করে যাবে না?

—টাকার বড় দরকার। আজ একটা জটিল মামলা আছে। সকাল সকাল গিয়ে তদ্বির করতে হবে। মিষ্টি খাব বিকেলে এসে।

* * *

—কি? মরতে ইচ্ছে হয় বলছিলে যে?

—ও, তাই বুঝি তুমি হোহো করে হাসছিলে? ভাগ্যিস আর কেউ শুনতে পায়নি। কিন্তু হোহো করে জয়ের হাসি হাসবার পালা বোধ হয় এবার আমার। মানুষ আজ কত নীচে নেমে গেছে এ কথাও যেমন ঠিক, মানুষ আজ কত উপরে উঠতে পারে তাও তো দেখা গেল বন্ধু। এমন বন্ধু-ভাগ্যে গর্ব করে বাঁচা চলে। চলে নাকি?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে এ-বছরটিতেও তোমাকে আমি পাব না। আচ্ছা আজ তবে চলি। ও, না, আবার কে আসছে। আচ্ছা, তবে একটু বসেই যাই। দেখি, ইনি এসে তোমার পরমায়ু বাড়ান কি কমান।

* * *

—অমল যে! এসো এসো। এবার দেরি যে! বাঃ, কি সুন্দর সব ফুল। আচ্ছা অমল, তোমার শ্যামলী-মা তিনি তো আর শ্যামলী নেই, পাকা বুড়ি হয়েছেন। তা তিনি এখনও কি নিজের হাতে তাঁর বাগানটির পরিচর্যা করেন? না না, এ ফুল আমার পায়ে রাখছ কেন? দাও, আমার হাতে দাও।

—কিন্তু শ্যামলী-মা এ ফুল আপনার পায়ে রেখে আপনাকে প্রণাম করতে বলেছেন আমায়। তাঁর আদেশ অমান্য করার সাহস আমাদের নেই স্যার।

—ও, তোমার শ্যামলী-মা একটি বাঘা বুড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছেন দেখছি। বেশ, তাঁকে বলো, আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ করছি তাঁর জীবন আরও সার্থক হোক। তোমাকে আশীর্বাদ করছি—দীর্ঘজীবী হও। হ্যাঁ, যে কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, শ্যামলী তাঁর বাগানের কাজ

এখনও কি নিজের হাতেই করেন? ফুলের বাহার দেখে তাই কিন্তু মনে হচ্ছে অমল।

—অনাথ আশ্রমের অত বড় বাগান। এ-বয়সে অত বড় বাগানের কাজ তাঁকে আমরা কেন দেব করতে—যেখানে আমরা তাঁর শত শত ছেলেমেয়ে রয়েছি। তবে জানেন স্যার, ওঁর নিজের ঘরের সামনে যে ছোট্ট বাগানটি, সেখানে কারও ঢোকার হুকুম নেই। তার কাজ করেন তিনি নিজেই। আচ্ছা স্যার, শুনেছি, ওই বাগানের ফুলগাছগুলো নাকি আপনার নিজের হাতের?

—শুনলেই হল? ওরে বোকা ছেলে, কি করে তা হয়? তোদের শ্যামলী-মা'র ওই বাড়িতে থেকে আমি যখন এম. এ. পড়ি তখন আমার বয়স ছিল কুড়ি-একুশ। শ্যামলী তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে। সে আজ কতকালের কথা বল্ দেখি। হ্যাঁ তা বছর চল্লিশ হবে। চল্লিশ বছর বুঝি কোনও ফুলগাছ বেঁচে থাকে রে বোকা ছেলে!

—না না, সে আমরা শুনেছি। এখনকার গাছগুলো নাকি আপনার সেই গাছগুলোর কাচ্চা-বাচ্চা।

—এসব কে বলেছে রে অমল? শ্যামলী বুঝি?

—না না, তিনি বলেন নি। তবে এ কথা কিন্তু আর সবাই বলে। আজ যখন এই ফুলের ঝাঁপিটি আমার হাতে তুলে দিলেন তখন আমি খুব সাহস করে শ্যামলী-মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যা শুনি সেটা সত্যি কি? আমার কথায় তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, এ ফুল আমার গুরুদেবের পায়ে রেখে তাঁকেই জিজ্ঞেস করিস অমল।

—বটে, এ কথা বলেছেন শ্যামলী! আর কি বলেছেন শ্যামলী?

—বেশী কথা আজকাল তিনি বলতে পারেন না। তাঁর যে খুব অসুখ।

—অসুখ! জানি নে তো। কী অসুখ?

—সে জানার উপায় নেই। মুখ বুজে সয়ে থাকেন সব যন্ত্রণা। আজকাল কথা বলেন কম, কিন্তু মুখে সেই হাসিটি লেগেই আছে।

—আমাকে যেতে বলেছেন?

—কি করে জানলেন স্যার?

—আমার মন বলছে।

—শ্যামলী-মা বলেছেন, তাঁর আশ্রমে এসব ফুলের চেয়েও আরও শত শত সুন্দর ফুল ফুটেছে। আপনাকে গিয়ে দেখে আসতে বলেছেন। আপনি নাকি সেখানে বহুকাল যাননি। আজ যেতেই হবে আপনাকে। আশ্রমের গাড়ি নিয়ে এসেছি। চলুন স্যার।

—সেই শত শত ফুলের একটি তো দেখছি তুমি। যাব, আমি যাব। তুমি পুজোর ঘরে গিয়ে প্রসাদ নাও। আমি তৈরি হচ্ছি।

* * * *

—এবার কি বুঝছ?

—বুঝছি তোমার পরমায়ু অনেক। কিন্তু এ কি সেই শ্যামলী—যে ছিল একটি ধনী পতিতার মেয়ে, যার গার্জেন-টিউটর ছিলে তুমি?

—হ্যাঁ বন্ধু।

—তা দেখছি, তোমার শিক্ষাতেই পতিতার মেয়ে হয়েছে পতিতপাবনী।

—হ্যাঁ বন্ধু। জীবনে এইটেই আমার সবচেয়ে বড় গর্ব।

—আর গুরুটিকেও সে ভোলেনি।

—হ্যাঁ বন্ধু।

—গুরু আর শিষ্যা তোমাদের দুজনের জন্যেই দেখছি আমাকে অপেক্ষা করতে হবে আরও অনেককাল। তা করব। আনন্দের সঙ্গেই করব। হ্যাঁ, এই আশীর্বাদ করেই মৃত্যু আজ বিদায় নিচ্ছে। চলি আমি আমার অন্ধকার রাজ্যে—যাত্রা কর তুমি তোমার আনন্দলোকে। বিদায়।

—বিদায়।

শনিবারের চিঠি, শারদীয়া সংখ্যা, বঙ্গাব্দ—১৩৬৭

এক-দুই-তিন

বালিগঞ্জে ক্যাপ্টেন সেনের বাসভবন। রাত্রিবেলা। ক্যাপ্টেন সেন তাঁহার সদ্য-পরিণীতা স্ত্রী মেঘনা সেনকে লইয়া ডাইনিং টেবিলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেন॥ এ আমাদের পৈতৃক বাড়ি। পছন্দ হল কি মেঘনা?

মেঘনা॥ তা মন্দ কি, তবে বড় পুরনো। যদি কিছু মনে না কর বলব?

সেন॥ বল মেঘনা, বল।

[বাহিরে হঠাৎ একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল]

মেঘনা॥ [চমকিয়া উঠিয়া] ও কি!

সেন॥ একটা নেড়ী কুত্তা।

মেঘনা॥ কী বিশ্রী ডাক!

সেন॥ ওটাকে আজ সকালে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখছি আবার এসেছে। বোধ হয় অনেক কাল এ বাড়িতে আছে। হ্যাঁ, বাড়িটা সম্বন্ধে তুমি যেন কী বলতে গিয়ে থেমে গেলে?

মেঘনা॥ বলছিলাম কি, বাড়িটাতে কেমন যেন একটা ভুতুড়ে ভাব আছে।

সেন॥ আমরা কেউ থাকি না তো। আমার তো সারাটা জীবন বিদেশেই কেটেছে। বিয়ে করতে কলকাতায় আসতে হল। তাই

কতকাল পর আসা হল এই পৈতৃক ভিটায়। খাবার দিতে বলেছি, এস বসি।

[বাহিরে পুনরায় কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। মেঘনা চেয়ারে বসিল বটে কিন্তু ক্যাপ্টেন সেন ছুটিয়া জানালায় গিয়া কুকুরটির উদ্দেশ্যে বলিলেন—]

সেন ॥ I say, Neri, stop.

মেঘনা ॥ (খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) কুকুরটা খুব বুঝল !

সেন ॥ ও, বেশ, স্পষ্ট বাংলাতেই বলছি—নেড়ী, আমি কারও অপরাধ দু বারের বেশী ক্ষমা করি না। তিনবার অপরাধ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করি। আমি ক্যাপ্টেন সেন।

মেঘনা ॥ My God—তুমি কি বলছ ?

সেন ॥ আমার যা স্বভাব তাই বলছি। নেড়ী, বেশ লক্ষীটির মত চুপ করে থাক। আমি নতুন বিয়ে করে বউ ঘরে এনে তুলেছি আজ। কেলেঙ্কারি করো না এখন। আমাদের একটু আরাম করে খেতে দাও।

[জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া ডাইনিং টেবিলে বসিলেন]

সিমলা গিয়ে দেখবে মেঘনা, সেখানে আমার দু-দুটো অ্যাল্‌সেসিয়ান্ কুকুর আছে। কিন্তু দেখবে তারা কি ভদ্র !

মেঘনা ॥ সিমলা খুব সুন্দর, না ?

সেন ॥ সে তুমি নিজে গিয়ে দেখে বলবে। কিন্তু খাবার দিতে দেরি করছে কেন ? (চীৎকার করিয়া ডাকিলেন) বয় !

মেঘনা ॥ একটা কথা বলব ?

সেন ॥ বল। বল না।

মেঘনা ॥ তুমি বড্ডো চেঁচিয়ে ডাক। আমি চমকে উঠি।

সেন ॥ (হাসিয়া) ও। আচ্ছা।

[বয়ের প্রবেশ]

আমি দু-বারের বেশী কারও কোন অপরাধ ক্ষমা করিনা। তিনবারের বার গুলি করি। পনের মিনিট আগে তোমাকে খানা দিতে বলেছিলাম। এখনও খানা এল না। মনে রাখবে এটা হল এক। আর দশ মিনিটের মধ্যে খানা না এলে সেটা হবে দুই।

বয় ॥ জি।

[ব্যস্তসমস্ত হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল]

মেঘনা ॥ রিভলবারটা তাই সব সময় কাছে রাখ ?

সেন ॥ হ্যাঁ। না না, তুমি ভয় পেয়ো না।...আজ রাতটা বড় বিচিত্র মনে হচ্ছে আমার।

[নেড়ী কুত্তাটি বাহিরে আবার ডাকিয়া উঠিল]

সেন ॥ (চেয়ার হইতে দাঁড়াইয়া নেড়ীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া) নেড়ী, এক—

[সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া মেঘনার সহিত আলাপ শুরু হইল]

সেন ॥ বিচিত্র নয় কি মেঘনা? দু-দিন আগেও তোমাকে চিনতাম না। কিন্তু কাল তোমাকে বিয়ে করার পর থেকে মনে হচ্ছে তোমাকে যেন কতকাল চিনি, কতকাল জানি।

মেঘনা ॥ আমিও তাই ভাবছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে: পাত্রী চাই। আমার ফটো পাঠিয়ে বাবা লিখলেন তোমাকে চিঠি। কিন্তু বাবা স্বপ্নেও হয়তো ভাবেন নি যে তোমার মত একজন জবরদস্ত মিলিটারী অফিসার সেই চিঠি পেয়ে, ফটো দেখে ঝড়ের মত এসে বলবে—

সেন ॥ ওঠো খুকী, আজকেই তোমার বিয়ে। এটা হচ্ছে মিলিটারী ট্রেনিং। বুঝলে খুকী?

মেঘনা ॥ খুকী? (খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল) আমি খুকী?

[বাহিরে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল]

সেন ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) নেড়ী, চুই। (আবার বসিয়া পড়িলেন)

মেঘনা ॥ একটু জল।

সেন ॥ খাবে? বয়! (হাতঘড়ি দেখিয়া) আচ্ছা, আমি দিচ্ছি।

[টেবিলে রক্ষিত জলপাত্র হইতে গ্লাসে জল ঢালিয়া মেঘনাকে দিলেন। মেঘনা জল পান করিল]

তোমার ক্ষিধে পেয়েছে honey. (হাতঘড়ি দেখিয়া) খাবার এল বলে।

মেঘনা ॥ আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

সেন ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমার কথা শুনতেই তো আজ চাই মেঘনা।

মেঘনা ॥ তুমি লড়াইয়ে গেছ?

সেন ॥ নিশ্চয়। এই তো সেদিন—কাশ্মীরে।

মেঘনা ॥ কত লোক মেরেছ তুমি?

সেন ॥ অগুন্তি। অগুন্তি। লেখাজোখা নেই।

মেঘনা ॥ আচ্ছা, তোমার মনে এতে এতটুকু কষ্ট হয় না, না?

সেন ॥ কষ্ট? ফুঃ! I am a military man.

[সঙ্গে সঙ্গে মেঘনা জলপাত্র হইতে জল ঢালিয়া খাইতে উদ্যত হইল]

মেঘনা ॥ বিশ্রী গরম পড়েছে।

সেন ॥ কিন্তু অত জল খাওয়াও বিশ্রী। এটা এক নম্বর দোষ।

মেঘনা ॥ অ্যাঁ!

সেন ॥ হ্যাঁ।

[বাহিরের কুকুরটি আবার ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন সেন রিভলবার লইয়া বাহিরে ছুটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেঘনার হাত হইতে জলের গ্লাস সশব্দে পড়িয়া গেল। সে ভয়চকিতা হইয়া কক্ষান্তরে ছুটিয়া গেল। বাহিরে গুলির শব্দ এবং কুকুরের আর্তনাদ শোনা গেল। পরক্ষণেই ক্যাপ্টেন সেন ডাইনিং টেবিলে ছুটিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বয় খাবারের একটি ট্রে লইয়া ঘরে ঢুকিল]

সেন ॥ এ কি! (ডাকিলেন) মেঘনা!

বয় ॥ মেমসাব চলা গিয়া হুজুর।

সেন ।। কাঁহা চলা গিয়া ?

বয় ।। মালুম নেহি হুজুর ।

সেন ।। মালুম নেহি ? কিঁউ ? ইয়ে তুম্‌হারা দো নম্বর কসুর হুয়া ।

বয় ।। মেমসাব ভাগ গিয়া ।

সেন ।। ভাগ গিয়া ! তব্‌ কিউ নেই পাকড় লিয়া ? ইয়ে তুমহারে তিন ।

[সঙ্গে সঙ্গে রিভলবার দিয়া বয়কে গুলি করিলেন । কিন্তু দেখা গেল বয় যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে । এবং বাহিরে কুকুরটিও পুনরায় ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল]

সেন ।। মেমসাব কো পাকড়াও । বলো, ইয়ে হামারা ব্লাঙ্ক ফায়ার । ফাঁকা আওয়াজ ।

বয় ।। জি সরকার । ইয়ে তো হাম দশ বরষ দেখতা হ্যায় । আপ তো নেহেরুজীকি চেলা হ্যায় ।)

সেন ।। Yes, this is our military tactics We will be firm : we will fire : but blank. মেমসাব কো পাকড়কে লে আও জলদি ।

যবনিকা

শনিবারের চিঠি, শারদীয়া সংখ্যা, বঙ্গাব্দ – ১৩৬৭

পলায়ন

স্থানটি ঠিক চেনা যাইতেছে না । ধূসর কুয়াশায় যেন চারিদিক আচ্ছন্ন রহিয়াছে । কতকগুলি নরনারীকে তাহার মধ্যে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে ।

—ও ড্রাইভার, এ আমরা কোথায় এলাম ?

—ঠিক বুঝতে পারছি না ।

—মোটর বাসটা চলছে কি ?

—ড্রাইভার, তুমি চুপ করে রয়েছো কেন ?

—আমি স্টিয়ারিংটা খুঁজে পাচ্ছিনা ।

—তবে কি গাড়ি চলছে না ?

—হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে । সব যেন কেমন থেমে গেছে ।

—বাসটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সেই যে থেমে গেলো—

—হ্যাঁ; তারপর থেকেই সব যেন কেমন চুপচাপ ।

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন খুব বড় রকমের একটা এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে

—কিন্তু কারো তো খুব চোট লেগেছে বলে মনে হচ্ছে না!

—না না, এখন মনে পড়ছে আমরা সবাই ভীষণ চীৎকার করে উঠেছিলাম।

—আমরা কি মোটর বাসটার ভিতরেই রয়েছি?

—কি জানি, অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

—আমারো যেন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

—আমরা যেন কোথায় যাচ্ছিলাম?

—তাইতো! ঠিক মনে করতে পারছি না তো!

—খুব বড়ো রকমের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা মনে পড়ছে। আমি ডাক্তার বলেই বলতে পারছি এ ধরনের দুর্ঘটনায় অনেক সময় স্মৃতি লোপ পায়।

—সে আর বেশী কথা কি ডাক্তার। অনেকে অন্ধ হয়ে যায়।

—আমার পিসিমা ছাত থেকে পড়ে গিয়ে বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। সারা জীবনে আর মুখ খোলেননি।

—কিন্তু আমার ডাক্তারি অভিজ্ঞতায় বলছি, ঠিকমতো চিকিৎসা হলে এ রকম কেস্ ভালো হয়। আপনার পিসিমার চিকিৎসা করিয়েছিলেন?

—না।

—কেন?

—পিসেমশাই বললেন, এ শাপে বর হয়েছে। হ্যাঁ। সেই থেকে আমার পিসেমশাইয়ের শান্তির সংসার।

—ড্রাইভার, ও ড্রাইভার, স্টিয়ারিং ধরেছো?

—কোথায় স্টিয়ারিং। গাড়িটাই খুঁজে পাচ্ছিনা।

—সে কি!

—বলে কি?

—গাড়ি খুঁজে পাচ্ছেনা!

—য়্যা?

—হ্যাঁ। আমি গাড়ি খুঁজে পাচ্ছিনা।

—সে কি?

—তবে আমরা কোথায়?

—তাইতো? তবে আমরা কোথায়?

—অন্ধকারটা কেটে না গেলে কিছুই বোঝা যাবেনা।

—এখন রাত কটা?

—কি জানি ঘড়ি রয়েছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছিনা।

—আমার হাতে রেডিয়াম ডায়েলের ঘড়ি। তাও তো টাইম দেখতে পাচ্ছিনা।

—এ্যাকসিডেন্টে হয়তো ঘড়িটারও বারোটা বেজেছে।

—এ্যাক্সিডেণ্ট বলছো বটে—কিন্তু কেউ খুব চোট পেয়েছে বলে তো মনে হচ্ছেনা!

—যন্ত্রণায় কেউ কাতরাচ্ছে না তো!

—আমার মনে হচ্ছে, অনেকে বোধহয় মূর্ছিত হয়েই রয়েছে—বিশেষ মেয়েরা, আর বাচ্চারা।

—ওগো শুনছো? তুমি কোথায়?

—এতক্ষণ পরে খোঁজ করছো। তাও ভালো।

—খুব চোট পেয়েছো কি?

—কি জানি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বেশী আঘাত পেলে প্রথমটায় সব অসাড় হয়ে যায়।

—ঠিক ঠিক, আমাদের হয়তো তাই হয়েছে।

—এখন যখন জ্ঞান হয়েছে, ব্যথা বেদনা শুরু হোলো বলে।

—না না তবে জ্ঞান না হওয়াই ভালো।

—তা হলে অজ্ঞান হতে আর একটা দুর্ঘটনা চাই। লাফিয়ে পড়বো নীচে?

—পাগল না মাথা খারাপ?

—ও ড্রাইভার, তুমি কোথায়? সাড়া পাচ্ছিনা যে।

—আমার গাড়ি কোথায় খুঁজে পাচ্ছিনা।

—আমরা পাহাড়ী পথ দিয়ে চলছিলাম মনে পড়ে গেছে।

—গাড়িটা বোধহয় পাহাড় থেকে খাদে পড়ে গেছে।

—সেই সঙ্গে আমরাও কি তবে—

—না না, আমরা বেঁচেই আছি। কিন্তু কি করে বাঁচলাম বুঝছি না।

—যাকে বলে মিরাক্‌ল্।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে, মিরাক্‌ল। দৈব।

—ঠাকুমার কথা মনে পড়ছে। সব সময়ে তিনি বলতেন, রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে?

—এই তো সেদিন কাগজে পড়লাম না পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ নায়াগ্রা ফল্‌স্—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও পড়েছি একটি ছেলে ঐ জল-প্রপাতে ঝাঁপ দিয়েছিলো; কিন্তু পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য, ছেলেটা মরেনি।

—হ্যাঁ বেঁচে গেছে।

—হ্যাঁ, সব কাগজে লিখেছে নায়েগ্রার ইতিহাসে এমনটি আর দেখা যায়নি।

—তবেই বুঝুন, শেক্‌স্‌পিয়ার মিথ্যা লেখেনি

'There are more things in heaven and earth than are dreamt of in our philosophy."

—যাক প্রফেসার এতক্ষণে মুখ খুলেছে। লেক্চার শুরু হয়ে গেছে।

—রাখুন মশাই আপনাদের লেকচার। এখন বলুন দেখি আমরা কোথায় এলাম ?

—এ হোলো পরের কথা। আগের কথাটাই আগে বলুন। আমরা কোত্থেকে আসছি মনে করতে পারছেন কেউ ? আমি তো পারছি না।

—তাই তো কোথায়ই বা যাচ্ছিলাম—কেনই বা যাচ্ছিলাম ?

– দেখুন দেখি, কেউ যদি কিছু মনে করতে পারেন, বলুন তিনি।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

—অন্ধকারটা যেন একটু একটু কাটছে মনে হচ্ছে।

—হঁ্যা, একটু একটু আলো ফুটছে ।

—আমরা যেন পরস্পরকে আবছা আবছা দেখছি।

—গাড়িটাকে কি দেখা যাচ্ছে ?

—ও ড্রাইভার বলো না গাড়িটাকে কি দেখতে পাচ্ছো ?

—কই, না।

—তবে ওটা খাদে পড়ে গেছে।

—যাক। সব চেয়ে বড়ো কথা আমরা বেঁচে আছি।

—আর কেউ যখন কাতরাচ্ছে না তখন বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছি।

—কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হলো ?

—রাখে হরি মারে কে ? মারে হরি রাখে কে ?

—নায়েগ্রা ফল্‌স্ এ ঝাঁপিয়ে পড়েও ছেলেটা বেঁচে গেছে। কাগজে লিখেছে সে এখন মাঠে মাঠে গরু চরাচ্ছে।

—আলো আলো উষার আলো ফুটে উঠছে।

—হঁ্যা, এইবার আমরা সবাই সবাইকে দেখতে পাচ্ছি।

—কিন্তু কেমন সব এলোমেলো হয়ে গেছে। ঝাঁকুনি খেয়ে এদিকে ওদিকে সব ছিটকে পড়েছি। দূর হয়েছে নিকট, আর নিকট হয়েছে দূর।

—আমাদের স্মৃতিও যেন এই আলোর সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে ফিরে আসছে।

—হঁ্যা, হ্যাঁ, আমরা এই ক'জন কেন যেন পালাচ্ছিলাম।

—কোত্থেকে পালাচ্ছিলাম ?

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ১লা জুলাই মাইনে পেয়েছিলাম।

—[হাসিয়া] ১লা জুলাই ! স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে পড়েছে দেখছি।

—না না, আমার ভুল হয়নি। ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই মাইনে পেয়েছিলাম, তার পরেই শুরু হলো উঃ সে কি অরাজকতা! ৭-ই জুলাই এই মোটর বাসে আমরা পালাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আসামের জোড়হাট থেকে।

—[বজ্রকণ্ঠে] চুপ! চুপ!

[নিস্তব্ধতা]

—কুয়াশাটা যেতে যেতেও যাচ্ছে না।

—আলো—আলো—আর একটু আলো পেলে বড়ো ভালো হতো।

—কিন্তু এ আমরা কোথায় এসেছি?

—তাই তো! এটা যে কোন জায়গা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!

—কিন্তু জায়গাটা বেশ উঁচু এটা মনে হচ্ছে।

—এরোপ্লেন থেকে যেমন দেখা যায় এ যেন আমরা তাই দেখছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ব্রহ্মপুত্র নদটা একটা রূপোর তারের মতন দেখা যাচ্ছে।

—লোকজন, গাছপালা—বোধহয় দেখছি, কিন্তু চিনে ওঠা দায়।

—তাই তো? এ আমরা কোথায় আছি!

—আমরা স্বপ্ন দেখছি না তো?

—হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা শুনলাম। আমরা বোধ হয় স্বপ্নই দেখছি।

—[হাসিয়া] স্বপ্ন দেখছি এতগুলো লোক একসঙ্গে।

—স্বপ্ন দেখছি হয়তো একজনই। সবাইকে নিয়ে একটা মস্ত স্বপ্ন দেখছি।

—আশ্চর্য। সবারই তাই মনে হচ্ছে।

—হোক তাতে ক্ষতি নেই। আমরা বেঁচে আছি এই যথেষ্ট।

—হ্যাঁ, আর বেশ ভালোভাবেই বেঁচে আছি মনে হচ্ছে।

—ড্রাইভার, ও ড্রাইভার! তোমার মোটর বাসটি কোথায় খোঁজ পেয়েছো?

—না।

—একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে এটা তোমার মনে পড়ছে ড্রাইভার?

—হ্যাঁ, কি যেন ভাবতে ভাবতে আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম, পথটা গিয়েছিলো বেঁকে। সাংঘাতিক কিছু ভাবছিলাম, তাই বাঁকটা আমার চোখে পড়লো না—পাপের ফল হাতে হাতে পেলাম।

—পাপের ফল? তুমি কি বলছো ড্রাইভার?

—হ্যাঁ, পাপের ফল। কথাটা আর মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারছি না। বলে ফেলতে পারলে মনটা তবেই হয়তো হালকা হবে। আমি বলবো।

—বলো, বলো।

—আমাদেরও এখন অনেক কিছু মনে পড়ছে।

—এখানকার আকাশে বাতাসে কি কোন যাদু আছে? মনের কথা টেনে বের করতে চাইছে।

—ড্রাইভার, তুমি অমন করছো কেন ?

—আমার বমি পাচ্ছে। মনের পাপটা বমি হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি তোমাদের সবাইকে নির্জন পাহাড়ের বুকে টেনে এনে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম।

—সে কি ! তুমি আমাদের বলেছিলে যদি বাঁচতে চাও শিগগীর আমার মোটর বাসে ওঠো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটছিলো আমাদের ঐ অঞ্চলে।

—এই দ্যাখো, দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, পালাচ্ছিলাম, কিন্তু কেন পালাচ্ছিলাম কিছুতেই এখানে মনে করতে পারছিলাম না। তোমার এই কথায় এখন সব কিছু মনে পড়ছে।

—ড্রাইভার, ড্রাইভার, ও তুমি কি করছো ? তোমার গলাটা অমন করে টিপে ধরেছো কেন ?

—আমাদের নেতাদের কথায় আমি ভুলেছিলাম যে গেল বন্যায় যখন আমার বাড়িঘর গিয়েছিলো ভেসে, তখন সপরিবারে আশ্রয় পেয়েছিলাম এক বাঙালীর বাড়িতে। অথচ সেই বাঙালীদের মারবার জন্যই এমন একটা মহত্বের ফাঁদ পাতলাম যে তোমরা সবাই আমার কথায় ভুলে আমার বাসে উঠে ভাবলে পালিয়ে বাঁচছো তোমরা। এ জীবন আমি রাখবো না। আমি মরতেই চাই। শ্বাসরোধ করে মরবার জন্য এত চেষ্টা করছি কিন্তু আমি পারছি না। কী আশ্চর্য ! গলাটা এমন করে টিপে ধরছি কিন্তু কোন ব্যথা লাগছে না আমার। আমার হাতের জোর কি কমে গেলো ? তোমরা কেউ দয়া করে এসে আমাকে মারতে পারো ?

—না, না। তুমি মরবে কেন ? পাপের প্রায়শ্চিত্ত মরে হয় না। মৃত্যুর পর তো সব শান্তি।

—তুমি যে তোমার ভুল বুঝতে পেরেছো এতেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে।

—আমাদের সকলেরই ছিলো সোনার সংসার। হীন স্বার্থের ষড়যন্ত্রে ভেঙেচুরে হয়ে গেছে খানখান। বাকী ছিলো প্রাণটা।

—আমার বাসে তুলে নিয়ে এসেছিলাম—সেই প্রাণটাও নিতে। পাপের ফল হাতে হাতে পেয়েছি। বাসটা আমার গেছে। প্রাণটা গেলে বাঁচতাম।

—যাক, তবু তো আমরা সব বেঁচে গেছি। এই ঢের।

—না। আমরা পালাতে চেয়েছিলাম কারণ বাঁচাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো দুঃখের। এ বাঁচার চেয়ে মরাই ছিল ভাল, অন্ততঃ আমার !

—আমারও অনেকটা তাই, বুঝলে প্রফেসর। আচ্ছা কি দুঃখে তুমি পালাতে চেয়েছিলে বলো তো শুনি ?

—হ্যাঁ, কি আশ্চর্য পরিবেশে এখন এখানে আছি যে মনের সব গুপ্ত কথা আপনা আপনি বেরিয়ে আসতে চাইছে। মনে হচ্ছে তাতেই পাবো শান্তি। নইলে আমার কাহিনী এত লজ্জার যে সভ্য সমাজে তা বলবার মতো নয়।

—না না, বলো প্রফেসর। আমরাও আমাদের কথা বলবো। মনে হচ্ছে বললেই শান্তি।

—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো ডাক্তার। আমারও তাই মনে হচ্ছে। এ যেন গভীর অরণ্য। তোমরা আমার চারিদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছো এক একটি বৃক্ষ। তাই একথা বলতে আজ আমার কোনো লজ্জা হচ্ছে না যে --ঐ যে আমার স্ত্রী ওখানে বসে আছেন---উনি আমারই শয্যা করেছেন কলঙ্কিত---আর তা করেছেন আমারই এক প্রিয় ছাত্রের সঙ্গে।

—কী আশ্চর্য! এ যে কি পরিবেশ! এ পরিবেশে না জানি কি যাদু আছে---আমার স্বামীর এই অভিযোগ আমি অস্বীকার করতে পারছি না—অস্বীকার করছি না।

—হয়তো এই অবৈধ সংসর্গের কারণও ছিলো প্রফেসর। তুমি হয়তো তোমার অধ্যাপনা নিয়ে এমন মশগুল থাকতে যে স্ত্রীর প্রতি তোমার সব কর্তব্য যথাযথ পালন করনি তুমি।

—আপনি মিথ্যা বলেননি। আমার মনের ক্ষুধা উনি না মিটিয়ে ছিলেন তা নয় কিন্তু আমার কোলে সন্তান দিতে অক্ষম ছিলেন উনি।

—অস্বীকার করছি না। আইনে এজন্য বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। আমি তোমাকে বলেছিলাম বিবাহ বিচ্ছেদ হোক। কিন্তু কি আশ্চর্য, তুমি তাতেও স্বীকৃত হওনি।

—না, সে লজ্জাটা আমি বরণ করতে চাইনি। তাছাড়া আরও একটি কারণ ছিল। বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তোমার ছাত্রটিকেও হারাতাম আমি। কারণ তার সামাজিক অবস্থা ছিল না এমন—যাতে স্বামী বলে তাকে গ্রহণ করতে পারি আমি।

—আমি সেটা স্পষ্ট বুঝেছিলাম। তোমাকে খুন করতে ইচ্ছা হচ্ছিল আমার। সুযোগ খুঁজছিলাম। এমন সময় এলো এই 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন। পরিপূর্ণ অরাজকতা। ভাবলাম, এই আমার সুযোগ। বাঁচাবার নাম করে তোমাকে নিয়ে উঠলাম আমি এই মোটর বাসে। তোমাকে মারতে। নির্জন পথে কোনখানে তোমাকে নিয়ে নেমে গিয়ে।···ডাক্তার শুনছ?

—হ্যাঁ, শুনছি। আর ভাবছি আমার নিজের কথা। প্রফেসর—তোমরা জানো আমি ডাক্তার। এবং খুব দয়ালু ডাক্তার। কী অসমিয়া কী বাঙালী সকলের মুখে একটি কথা: আমার মায়া মমতার অন্ত নেই। আমি এক দেবতা।

—এ কথা আপনাকে নিজ মুখে বলতে হবে না স্যার। এখানে আমরা যারা আছি, প্রত্যেকটি লোক এ কথা জানে।

—কিন্তু এ কথা কি তোমরা জানো যে আমি মার্ডারার। আমি একজন অসমিয়াকে হত্যা করেছি।

—সে কি!

—বলেন কি?

—আমি খুব অবাক হচ্ছি না। 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে মানুষ আর মানুষ নেই। শুধু যে বাঙালী মরছে তাও তো নয়। সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতা যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন নির্বিচারে মানুষ মানুষ হত্যা করে।

—আপনি হয়তো এমনিভাবেই কোন অসমিয়াকে হত্যা করেছেন, তাতে আর লজ্জার কি আছে স্যার?

—না। হিংসায় যখন পৃথিবী উন্মত্ত হয় তখন যে হত্যা হয়—যে হত্যা আমি করেছি সেটা তা নয়। আমি হত্যা করেছি টাকার লোভে।

—এ তুমি কি বলছো ডাক্তার?

—হ্যাঁ, প্রফেসর! এক অসমিয়া কোটিপতি, একটিমাত্র তার সন্তান, পুত্র সন্তান। সুদর্শন স্বাস্থ্যবান এক যুবক। হঠাৎ একদিন আকস্মিক এক দুর্ঘটনা হলো তার। সেই মুহূর্তেই অপারেশন প্রয়োজন। অপারেশন করতে বাড়ি থেকে বেরুবো এমন সময় এসে উপস্থিত ছেলেটির কাকা, আমার সামনে সুটকেশ খুলে সাজিয়ে রাখলো দশ হাজার টাকার নোট। বললে নিন। আরও বিশ হাজার দেবো আজ অপারেশন টেবিলেই যদি ছেলেটি মারা যায়।

—আপনি নিলেন?

—এ টাকা আপনি নিলেন?

—না। টাকার যদিও ছিলো যথেষ্ট প্রয়োজন তবু টাকা আমি নিলাম না। টেলিফোনে পুলিশ ডাকবো ভয় দেখালাম। টাকা নিয়ে লোকটি গেলো পালিয়ে।

—আপনার পক্ষে এইটাই স্বাভাবিক স্যার।

—কিন্তু অস্বাভাবিক হয়ে পড়লাম আমি সেই মুহূর্ত থেকে। অপারেশন করতে চললাম, যেতে যেতে কেবলই মনে হতে লাগলো আমাদের হাতে কতো লোকই তো মারা যায়। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তো কত রোগীকে বাঁচাতে পারিনা। চিকিৎসাতেও হয় ভুল। অপারেশনের কাজেও হয় ত্রুটি। সকল সতর্কতা সত্ত্বেও। টাকাটা বড়ো বেশী ছিলো প্রয়োজন। কারণ আমার যত্র আয় তত্র ব্যয়। আজ পর্যন্ত নিজের একটা বাড়ি করতে পারিনি আমি। অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম আমার তখনকার মনের অবস্থা: টাকাটা না নিয়ে আমি জীবনের চরম ভুলটিই করেছি। অপারেশন হলো। অপারেশন টেবিলেই ছেলেটি গেল মারা। কিন্তু সেই রাত্রে একমাত্র ঈশ্বরই

হয়তো দেখেছিলেন যে গলাধাক্কা খেতে খেতে আমি বেরিয়ে এসেছি রোগীর কাকার বাড়ি থেকে। কি, কেউ কোন কথা কইছো না যে?

[নিস্তব্ধতা]

সেইদিন থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল—প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল আমি খুনী। কিন্তু আমার সব চেয়ে বড়ো শাস্তি এই যে আমার শাস্তি হবে না—কারণ আমার অপরাধ কেউ জানলো না। সব চেয়ে অসহ্য হলো কখন জানো?

—বলুন।

—সে রাত্রে আমি আমার স্ত্রীকে সব বললাম। স্ত্রী তাতে কী বললেন জানো?

– কি বললেন?

—বললেন, তুমি একটি মূর্খ! তখন কেন নাওনি টাকাটা? আমি পাগল হবার আগে টাকার শোকে, তিনিই হয়ে গেলেন পাগল। আমাকে দেখলেই তিনি চেঁচিয়ে উঠতে শুরু করলেন—কেন নাওনি টাকাটা? শেষে দশজনের সামনেও চীৎকার করতে লাগলেন: কেন নাওনি টাকাটা? লোকজন প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো ব্যাপার কি? তখন উপায়ান্তর না দেখে আমি ভেবে দেখলাম আমাকে পালাতে হবে। পালাতেই হবে। আর তার সুযোগ পেয়ে গেলাম এই 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে।

—তুমিও তবে প্রাণ ভয়ে পালাওনি ডাক্তার।

[নিস্তব্ধতা]

—কিন্তু আমি যে কি ভয়ে পালিয়েছি বুঝে উঠতে পারছি না।

—আপনি তো স্কুল মাষ্টার।

—হ্যাঁ, আমি স্কুলমাষ্টার। পঁয়ত্রিশ টাকায় ঢুকেছিলাম, দশ বছরে এখন বেতন দাঁড়িয়েছে একশো। যখন চাকরীতে ঢুকি তখনই সংসার সুখের আশায় বিয়ে করেছিলাম একটি অসমিয়া তরুণী। প্রেমের প্রাবল্যে এই দশ বৎসরে আমরা জন্ম দিয়েছিলাম সাতটি সন্তান। একথা জেনেশুনেও যে মাসিক আয় কিন্তু আমার একশো টাকার বেশী নয় কখনো। মাঝে মাঝে মনে হ'তো এসব কি হচ্ছে! স্ত্রী বলতেন জীব দিয়েছেন যিনি—আহার দেবেন তিনি। কিন্তু তা তিনি দিলেন না। ফলে চোখের উপর দেখতে পা'চ্ছলাম ছেলেপুলেগুলো হয়ে দাঁড়াচ্ছে চোর-জোচ্চর। আর বড়ো মেয়েটার মতিগতিও যেন কেমন কেমন মনে হ'চ্ছিল।

—হতেই হবে।

—আমি তো বলি গরীবের বিয়ে করাই উচিত নয়।

—হাঁ৷ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু গরীবেরই ঘোড়া রোগ হয় জানেন

তো? আমার হয়েছিলো তাই। সংসারের অবস্থা দেখে কেবলই মনে হতো এখন মরলে বাঁচি। তা' এমন বরাত! কলেরা থেকেও একবার বেঁচে উঠলাম। তখন ভাবলাম পালিয়ে যাবো। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়ে যাবো বনে কিংবা পাহাড়ে। সুযোগ খুঁজছিলাম। এমন সময় শুরু হলো এই 'বংগাল খেদা আন্দোলন' আর এ আন্দোলনের এমনই প্রকোপ যে আমার অসমিয়া পত্নী গর্ভজাত সন্তান বাহিনী—লাঠি সোটা হাতে নিয়ে তেড়ে এলো আমাকে মারতে। প্রাণটা রক্ষা পেলো অবশ্য ঐ অসমিয়া পত্নীরই উদার করুণায়।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ, আশ্চর্য! বললেন তিনি: 'বংগাল' হলেও পতি বটে।

—বৈধব্যের হাত থেকে রক্ষা পেতেই তিনি আপনাকে রক্ষা করে থাকবেন।

—হয়তো তাই। কিম্বা ঐ এম. এ. পাশ প্রফেসারের যে শক্তি ছিলো না—ম্যাট্রিক ফেল পণ্ডিতটির সে শক্তি পুরোপুরি ছিলো। আর আমার জয়মতীর ছিল মাতৃত্বের অনন্ত ক্ষুধা।

—তবে মশাই আপনি পালালেন কেন?

—পালালাম শুধু এই জন্যে যে ঐ প্রফেসারের আর্থিক শক্তির দশ ভাগের এক ভাগও আমার নেই। ছেলেপুলেগুলোকে ভাতকাপড় দিয়ে পুষতে পারছিলাম না। চোখের উপর দেখতে পাচ্ছিলাম তারা অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। কেবলই মনে হতে লাগলো অপরাধটা ওদের নয়, অপরাধ আমার। পালাবার সুযোগই আমি খুঁজছিলাম। সে সুযোগ পেয়ে গেলাম এই মোটর বাসে।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

—কী এক আশ্চর্য পরিবেশ এখানে সৃষ্টি হয়েছে যে মনে হচ্ছে কেউ যেন সাঁড়াশী দিয়ে মুখ থেকে টেনে বের করছে মনের গোপনতম কথাটি।

—আপনি যখন একজন নেতা এটা খুবই স্বাভাবিক, আপনার মনে এক মুখে এক হবেই। তাতেই না আপনার এই বিপদ।

—কিন্তু মনে এক মুখে এক না হলে নেতাই হতে পারতেন না উনি। কেউ পারে না।

—রাজনীতি মানেই, মনে এক মুখে এক।

—শুধু নেতা কেন যে-কোন সভ্য মানুষেরই সেই কথা। মনের কথা গোপন করবার জন্যেই ভাষার হয়েছে সৃষ্টি।

—যে ভাষার এ ক্ষমতাটা যত বেশী সে ভাষা ততো সমৃদ্ধ! সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের বাংলা ভাষা এখন বেশ চালাক হয়ে গেছে।

—অসমিয়ারা ভাষায় এই মারপ্যাঁচ হয়তো পছন্দ করে না ব' ই বোধ হয় বাংলা ভাষাটাকে আসাম থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে।

—ও সব বাজে কথা রাখুন। 'বংগাল খেদা' আন্দোলনের একমাত্র

উদ্দেশ্য রাজনৈতিক স্বার্থ। হ্যাঁ, আমার পকেটেই তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পত্র রয়েছে।

—এত প্রমাণ থাকতেও তবু আপনি আমাদের সঙ্গে পালাচ্ছিলেন কেন মশাই? বিশেষ আপনি যখন নেতা?

—পালাতে গেলেও নেতার দরকার হয়।

—আমি আমার শেষ মিটিংয়েই স্পষ্টভাবে বলে এসেছি কেন আমি পালাচ্ছি।

—আপনার সেই মিটিংয়ে আমরা ছিলাম না।

—আমি ছিলাম। উনি বলেছিলেন অসমিয়াদের রাজনৈতিক চক্রান্তে অনসমিয়ারা আসামে মাইনরিটিতে পরিণত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আসামে আন্দোলন করে কোন ফল হবেনা। আন্দোলন করতে হবে সেখানে যেখানে বাঙালীরা মেজরিটি। আন্দোলন করতে হবে কলকাতায়। আর আন্দোলন করতে হবে রাজধানী দিল্লীতে।

—কথাটা উনি নেহাৎ মিথ্যে বলেননি!

—হ্যাঁ, সে মিটিংয়েও আমি দেখেছি সকলেই সমর্থন করলেন আমাদের এই নেতাকে। বিপুল জয়ধ্বনির সঙ্গে। ওঁকে এরোপ্লেনে কলকাতা-দিল্লী পাঠাবার খরচও তুলে দেওয়া হয়েছিল ওঁর হাতে সেই মিটিংয়েই। কিন্তু এটা আমি বুঝছি না, এরোপ্লেনে না গিয়ে এই বিপজ্জনক পথে মোটর বাসে কেন উনি এলেন।

—সত্যি কথা গোপন করবার শক্তি আর আমার নেই। শুনুন তবে আপনারা। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম, আসামে বাংলা ভাষার উৎসাদন রোধ করতে হবে বাঙালী সমাজকে একতাবদ্ধ করে—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দ্বারা। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে—জননী এবং জন্মভূমির সম্মান রক্ষা করতে সন্তানকে জীবন দানও করতে হয়। কর্তব্যের এই চেতনাটি আমার ছিল, কিন্তু কার্যকালে জীবন বিপন্ন করার সাহস পেলাম না আমি। অথচ নেতৃত্ব হারাতেও আমি ছিলাম অনিচ্ছুক। তাই সংঘর্ষ যখন হয়ে দাঁড়ালো অবশ্যম্ভাবী কলকাতায় গিয়ে আন্দোলন চালাবার ছলনার শরণ গ্রহণ করতে হলো আমাকে। বাঙালী সমাজ আমার এই প্রচেষ্টা সমর্থন করল। এরোপ্লেনে কলকাতা আর দিল্লী যাবার খরচও পেয়ে গেলাম হাতে হাতে। কিন্তু কেবলই মনে হতে লাগলো, না, আত্মপ্রবঞ্চনা আর নয়। আমি যেন তখন পালাতে পারলেই বাঁচি।

—কিন্তু আমরা বেঁচেছি কি?

—ড্রাইভার? তুমি তোমার গাড়িটার খোঁজ পেয়েছো কি?

—গাড়ি তো দূরের কথা—আমরা কোথায় তাই কি বুঝতে পারছি আমরা!

—ঐ কারা যেন আসছে।

—হ্যাঁ, কারা যেন এদিকে আসছে।

—বাঁচা গেলো। ওরাই বলতে পারবে আমরা কোথায়!

[দু'তিনজন লোকের প্রবেশ]

প্রথম লোক ॥ অতো বড়ো মোটর বাসটা একেবারে চুরমার হয়ে গেছে।

—কোথায় মশাই ? কোথায় ?

দ্বিতীয় লোক ॥ গাড়ীটা যখন খাদে পড়ে গেছে তখন চুরমার হবে না তো কি ?

—বলেন কি মশাই ? আর গাড়ীর ভিতরে যারা ছিলো তারা ?

তৃতীয় লোক ॥ বাসটা চুরমার হয়েছে তো কি হয়েছে! সার্ভিসের গাড়ী ইনসিওর করা ছিলো নিশ্চয়।

—না, না, আমার এ গাড়ী সার্ভিসের নয়। এ আমার নিজের গাড়ী। বলুন না মশাই গাড়ীটা কোথায় ?

প্রথম লোক ॥ সিগ্রেট আছে ?

দ্বিতীয় লোক ॥ সিগ্রেট আছে কিন্তু দেশলাই নেই!

—দেশলাই, আমার কাছে আছে। আমার কাছে আছে।

প্রথম লোক ॥ তোমরাও যেমন, একটা দেশলাই সঙ্গে রাখতে পারো না।

—আপনারা কারা মশাই ? আপনারা কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন না ?

দ্বিতীয় লোক ॥ চারদিকে সব চুপচাপ। কেউ যে কোথাও আছে মনে হচ্ছে না। আর কতো খোঁজাখুজি করবো। যে দৃশ্য দেখলাম তাতে হাত পা আর সরছে না।

—এরা বলছে কি ? আমরা এতো চীৎকার করছি, তাও বলছে চারদিকে সব চুপচাপ ?

তৃতীয় লোক ॥ জায়গাটা বেশ নির্জন। এখানে বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্।

—নির্জন। জায়গাটা নির্জন! আমরা এতগুলো লোক থাকতে ? এরা বলছে কি ?

—ও মশাইরা, আপনারা কি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না ?

প্রথম ॥ এখন সবচেয়ে বড়ো কথা, এতগুলো লোকের সৎকারের কি ব্যবস্থা করা হবে ?

দ্বিতীয় ॥ সে ভাবনা তোমার কেন ? আমরা শহরে গিয়ে রিপোর্ট দিয়েই খালাস।

—সৎকার হবে ? কাদের সৎকার হবে মশাই ?

তৃতীয় ॥ আমি ভাবছি লোকগুলো মোটরের পেট্রোলের আগুনে যেভাবে ঝলসে গেছে সনাক্ত করতে পারবে না কেউ, ওরা কে।

দ্বিতীয় ॥ তা বটে।

—আপনারা বলছেন কি ? ও মশাই, আপনারা বলছেন কি ?

প্রথম ॥ আমরা রিপোর্ট দিয়েই খালাস। "একটি পলায়নপর যাত্রীবাহী বাস পাহাড়ী পথের খাদে পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।"

—আমরা কি তবে বেঁচে নেই?

—ম্যা! আমরা কি তবে বেঁচে নেই?

তৃতীয় ॥ আশ্চর্য! একটি আরোহীও বাঁচেনি। আর এমন শোচনীয় মৃত্যু বড়ো একটা দেখা যায় না।

[মোটরবাহিত লোকগুলি একসঙ্গে আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

দ্বিতীয় ॥ (হাসিয়া) একটা কথা স্পষ্ট হলো আজ—যে পালালেই বাঁচা যায় না। চলো।

[মৃত ব্যক্তিদের অব্যক্ত যন্ত্রণার মধ্যে যবনিকা নামিল]

যবনিকা

উত্তরা, শারদীয়া সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

ভূভারহরণ কর্পোরেশন

শেষ রাত্রে ভূভারহরণ কর্পোরেশনের অফিস ঘরে প্রবেশ করলেন। উক্ত করপোরেশনের সভাপতি শ্রীমৎ হর্ষ্যানন্দ এবং তৎপশ্চাতে অর্ধ-নগ্ন-ফকির-প্রায়-বেশ ক্যাবলা।

হর্ষ্যানন্দ ॥ জয় শ্রীভূভারহরণ শ্রীনন্দ-নন্দন। রাজা কর বাবা! [আফিস ঘরে রক্ষিত ও পূজিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিকে প্রণাম করে, ক্যাবলাকে—] এসো, এসো বাবা, ব'সো। [ক্যাব্‌লা কুণ্ঠিতভাবে উপবেশন করলে—] তাই বলছিলাম কি

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

তোমাকে দেখলাম অন্ধকারে পথ খুঁজে মরছ। কিন্তু পথতো পড়ে রয়েছে। সোজা সরল পথ। ওরে মোহবদ্ধ জীব? কেন বৃথা আঁধারে ঘুরছিস! আঁধারে আঁধারে আর কতকাল কাটাবি!

ক্যাবলা ॥ আজ্ঞে আজ ঠাকুরকে যখন একবার ধরতে পেরেছি, আর তো ভাবছি না কর্তা! সাধে কি আর পিছু নিয়েছি! তরাতে আমাকে হবেই বাবাঠাকুর! জ্বালা .....জ্বালা......এ বুকে বড় জ্বালা। [ক্রন্দনোপক্রম]

হর্ষ্যানন্দ ॥ কাঁদিস নে রে, কাঁদিস নে......সম্মুখে তোর ভূভারহরণ শ্রীনন্দ-নন্দন! তবু কাঁদবি! বল ব্যাটা, তোর কাহিনী বল। তোর সকল শোক—সকল পাপ ঐ সচ্চিদানন্দের পায়ে ব্যক্ত কর। দেখবি কি শান্তি।

বুক ভরে উঠবে রে, শাস্তিতে তোর বুক ভরে উঠবে! বল ব্যাটা, ঐ অন্ধকারে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে, কি করছিলি……কি ভাবছিলি?

ক্যাবলা॥ তোমারি পিছু নিয়েছিলাম ঠাকুর, তোমারি পিছু নিয়েছিলাম। আজ দুদিন পেটে অন্ন নাই, ভাবলাম ঠাকুরের পিছু নি, দুটো প্রসাদ মিলবে।

হর্ষ্যানন্দ॥ হুঁ। তারপর?

ক্যাবলা॥ বড় আশা করে ঐ ঘুরঘুটি অন্ধকারে ঠাকুরের পিছু পিছু চললাম……

হর্ষ্যানন্দ॥ কি করে? ঐ ঘুরঘুটি অন্ধকারে কি করে আমায় দেখছিলি?

ক্যাবলা॥ ঠাকুরের জ্যোতি—সে তো আর এই ক্যাবলার কাছে লুকাতে পারবে না কর্তা! পিছে পিছে কুত্তার মতো চললাম! মনে মনে ভাবতে ভাবতে চললাম রাজভোগ—আজ রাজভোগ প্রসাদ কপালে নাচছে! আজ আমাকে পায় কে! কতবার যে হোঁচট খেলাম তাকি গ্রাহ্যি করলাম! কিন্তু প্রভু, তোমার যে কি ইচ্ছা, ঐ হোঁচট খাওয়াই আমার সার হল!

হর্ষ্যানন্দ॥ কেনরে ব্যাটা, এ কথা বলছিস কেন! জগতে কোনটা যে সার আর কোনটা যে অসার তা বিচার করবার মালিক কি তুই আর আমি! ঐ যে হোঁচট খেয়েছিস, ওরও দাম আছেরে ভাই, দাম আছে। 'হাঁটিতে শেখেনা কেহ না খেলে আছাড়' সাধনমার্গেও ঐ কথারে ব্যাটা ঐ কথা। হুঁ, তারপর?

ক্যাবলা॥ তারপর আর কি! কিছু না! আমার পোড়া কপালে হাতে বুলোতে লাগলাম!

হর্ষ্যানন্দ॥ কতটা দেখলি? বলনা, শুনি। তবে তো বুঝব পূর্বজন্মের সুকৃতি বলে কতটা এগিয়ে গিয়েছিস!

ক্যাবলা॥ আজ্ঞে কর্তা, তারপর যা দেখলাম সেটা স্বচক্ষে দেখলাম কি স্বপ্নে দেখলাম এখনো বুঝে উঠতে পারছি না।

হর্ষ্যানন্দ॥ [মৃদুহাস্যে] দেবো—দেবো, সবই বুঝিয়ে দেব। তোর কি মনে হল বল দেখি।

ক্যাবলা॥ আজ্ঞে প্রভু, এক গ্লাস জল পাই কি?

হর্ষ্যানন্দ॥ ওরে বাবা রাখোহরি! দু কাপ চা-ভোগ দিয়ে যা বাবা।

ক্যাবলা॥ সঙ্গে গোটাকয়েক রাজভোগও দিতে বলো ঠাকুর। আজ দুদিন পেটে অন্ন নাই।

হর্ষ্যানন্দ॥ আরে ব্যাটা, ভাবছিস কেন! একবার যখন শ্রীনন্দনন্দনের পায়ে এসে পড়েছিস, এখনো পেটের ভাবনা ভাবছিস!…ওরে উনি যে ভূভারহরণ করেন! এখনো তুই পেটের ভাবনা ভাবছিস? বল ব্যাটা, তারপর কি দেখলি! বুঝতে দে…কতটা তুই এগিয়ে আছিস!

ক্যাবলা॥ গলির শেষে মস্ত তেতালা বাড়ি। বাড়টা জানতাম, মল্লিকদের। মনে ভাবলাম ঠাকুর এইবার বুঝি দারোয়ানকে ডাকবেন। আমি

একটু আড়ালে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমি অবাক! ঠাকুর তো দারোয়ানকে ডাকলেন না!

হর্ষ্যানন্দ ॥ [মৃদু হেসে] ডাকলাম না তো! ওরে, ডাকলেই কি ও শুনতো! মায়াচ্ছন্ন জীব! ওর যে এখনো সময় হয়নি! এখনো যে ওর—অনেক বাকী। তাই, ওকে ডেকে কোন ফল নেই। তাই ডাকলাম না!

ক্যাবলা ॥ তারপর যা দেখলাম……[থেমে গেল।]

হর্ষ্যানন্দ ॥ [মৃদু হেসে] বল্—বল্। থামলি কেন?

ক্যাবলা ॥ এখনো বুঝছি না ঠাকুর সে আমার কি! স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম!

হর্ষ্যানন্দ ॥ ওরে ব্যাটা, কথাবার্তায় দেখচি অনেকটা এগিয়েছিস! কতটা দেখলি—কি দেখলি—বল্।……জ্ঞানাঞ্জন শলাকা রে, জ্ঞানাঞ্জন শলাকা। তিনি যখন জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে জীবের চক্ষুরুন্মীলন করে দেন, তখন ভৌতিক আধিভৌতিক সব কিছু দেখা যায়—সব কিছুর মানে হয়…… বল ব্যাটা, তারপর কি দেখলি!

ক্যাবলা ॥ কিন্তু গলা আমার শুকিয়ে আসছে। চা-ভোগের আর কত দেরী!

হর্ষ্যানন্দ ॥ আরে ব্যাটা, গাছের ফল। যখন পাকবে—আপনা থেকেই টুপ্ করে পড়ে যাবে। তার আগে তুই পেড়ে খা, রসের ব্যত্যয় হবে। চায়ের জল এখনো ফোটেনি নিশ্চয়। ফুটতে দেরে, ফুট্‌তে দে। বল্ ব্যাটা, তারপর কি দেখলি?

ক্যাবলা ॥ দারোয়ানকে না ডেকে, তুমি ঠাকুর, অবলীলাক্রমে—

হর্ষ্যানন্দ ॥ অবলীলাক্রমে! ব্যাটা দেখছি শব্দের দিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে আছিস, কেবল ব্রহ্মের সঙ্গেই সাক্ষাৎ নেই। তা হবে—হবে—এখানে আসতে একবার যখন পথ পেয়েছিস, ও শব্দও হবে, ব্রহ্মও হবে। হুঁ, অবলীলাক্রমে—?

ক্যাবলা তুমি ঠাকুর দেওয়ালটি টপকালে।……দেখাদেখি, আমিও—

হর্ষ্যানন্দ ॥ অবলীলাক্রমে?

ক্যাবলা ॥ না। তা আর পারলাম কই! তা কি আর পারি! তুমি কে! আমি কে! তবে হ্যাঁ, তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে, নানা কসরৎ করে, অনেক উত্থান-পতনের পর তোমারি পায়ের ধুলোর জোরে, শেষে এই পঙ্গু যখন গিরি লঙ্ঘন করল, তখন ঠাকুর আমার, পাইপ বেয়ে মল্লিকদের দোতলার গাড়ী বারান্দায় উঠে……

হর্ষ্যানন্দ ॥ বা ব্যাটা বা! জয় শ্রীভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দন! [মূর্তির দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে, হঠাৎ ক্যাবলাকে] ঠাকুরের কৃপা পেয়েছিস। অনেক কিছু দেখেছিস। ভূভারহরণ রে, ভূভারহরণ! তারপর—তারপর?

ক্যাবলা ॥ হঠাৎ একট সোরগোল শুনলাম। দোতলার কোন ঘরে।

হর্ষ্যানন্দ ॥ "চোর। চোর!" এমনি কোন শব্দে দিগমণ্ডল ব্যাপ্ত হল, কেমন? [মৃদু মৃদু হাস্য]

ক্যাবলা ॥ আজ্ঞে হঁ্যা। আমার ভারী ভয় হল! গা কাঁপতে লাগল।

হর্ষ্যানন্দ ॥ গা কাঁপতে লাগল! তোর গা কাঁপতে লাগল! "চোর! চোর!" শব্দ শুনে......কে রে তুই? গোকুলে গভীর রাতে ভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দন যখন ঘরে ঘরে দুগ্ধ সর ননী চুরি করতেন অমনি "চোর চোর" রবে দিগমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হত—আর সঙ্গে সঙ্গে—সঙ্গে সঙ্গে গোপিনীদের গা কাঁপতো—সে গা কাঁপার মানেটা কি উদ্দীপন হ'তো। উদ্দীপন......কে রে তুই, তোর গা কাঁপতে লাগল?

ক্যাবলা ॥ আজ্ঞে হঁ্যা। কি করব ভাবছি, এমন সময় দেখলাম প্রভু পাইপ বেয়ে তরতর করে নেমে আসচেন। লোকজন তাড়া করেছে। আমি দেখলাম প্রভুর পথই আমার পথ। আমার আর দেরী করা উচিত নয়। কারণ প্রভু যা অবলীলাক্রমে সারবেন, আমার কপালে সেখানে অনেক উত্থান অনেক পতন লেখা রয়েছে—কাজেই আগেভাগেই আমি ছুটলাম, কিন্তু দেওয়াল টপকাতে গিয়ে—

হর্ষ্যানন্দ ॥ সেও ঠাকুরের ইচ্ছা। দেখলাম উবু হয়ে তুই পড়ে রয়েছিস —বুঝলাম তখন তোর পতন-যোগ। আমার সাধনমার্গে তখন তুইই আমার সোপান হলি।

ক্যাবলা ॥ তখন... ...তখন প্রভু, লোকজন সব চেঁচাচ্ছে "চোর চোর ...সিন্দুক ভেঙেছে, গয়না নিয়েছে...ধর ধর......" আমার পা কাঁপতে লাগল, থরথর করে পা টলছে, মাথা ঘুরছে—

হর্ষ্যানন্দ ॥ উদ্দীপন—তখন তোর জোর উদ্দীপন, বুঝলিরে ব্যাটা? তারপর? তারপর?

ক্যাবলা ॥ তারপর আর কি! দেখলাম প্রভুর শ্রীচরণ ছাড়া গতি নেই। বাঁচবার আর কোন পথ নেই। প্রভুর এক পা তখনো এদিকে ছিল—ধরে ফেললাম—দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম! প্রভুর আকর্ষণ হ'ল, বেঁচে গেলাম!

হর্ষ্যানন্দ ॥ তাহলে বুঝেছিস! ভূভারহরণরহস্য কতকটা বুঝেছিস! হঁ্যা, বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছিস।

ক্যাবলা ॥ অগ্রসর হয়েছি! কোথায় প্রভু?

হর্ষ্যানন্দ ॥ ব্যাটা ক্যাবলা আরকি! সাধনপথে। আলোতে এসে তোর চেহারাটা দেখেই আমি ধরতে পেরেছিলাম। এদ্দিন কোথায় কি প্রক্রিয়ায় সাধনভজন করছিস বল্ দেখি—

ক্যাবলা ॥ দাঁড়ান প্রভু, আগে গলাটা ভিজিয়ে নি। এই যে বাবা রাখোহরি, আনো—আনো—এদিকে আনো! একি! এযে দেখাচ্ছ শ্রীনন্দনন্দনের বাল্যভোগ! দুগ্ধসর ও চাঁছি! [চায়ে চুমুক দিয়া] আ—......আমার গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে ঠাকুর, একটা ভজন গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে.

"হরির কৃপায় দশজনে খায়,
আমরাই কেন খাবো না!"

হর্ষ্যানন্দ॥ ওরে কে তুই! অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিস! এতকাল কোথায় ছিলি রে?

ক্যাবলা॥ এখানে—ওখানে—সেখানে—পথে পথে—অপথে বিপথে—সর্বত্র প্রভু, সর্বত্র!

হর্ষ্যানন্দ॥ লৌকিক পাসটাস কিছু দিয়েছিলি?

ক্যাবলা॥ তা "বি-এল্" নদী পার হয়েছিলাম বই কি প্রভু!—আপনি প্রভু আপনি?

হর্ষ্যানন্দ॥ তা যদি বলিস, তবে সে তো অনেক দূরই এগিয়ে গিয়েছিলাম। ইকনমিক্সে "এম-এ", বুঝেছিস? কিন্তু তাতে ভবার্ণব তো তরতে পারলাম না! নাকানি চুবানি খেতে খেতে, যখন প্রাণ-পাখী খাঁচাছাড়া হয়—হয়—, তখন—তখন মনে হল ভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দনকে ভুলেই না জীবের এই দুর্গতি!

ক্যাবলা॥ তারপরই বুঝি এই ভূভারহরণ করপোরেশন?

হর্ষ্যানন্দ॥ তোমার অনুমান যথার্থ বৎস!

ক্যাবলা এ করপোরেশনের সভ্য সংখ্যা এখন কত প্রভু?

হর্ষ্যানন্দ॥ [মৃদু হাস্যে] সংখ্যাতীত! অব্যক্ত! অব্যয়। কি রকম জানো? রেল কম্পানীর বিজ্ঞাপন দেখনি? Thieves and swindlers are about: beware. মানে, কে যে, জানবার উপায় নাই। কে যে নয় বলা যায় না।

ক্যাবলা॥ লোকপরম্পরায় এসব খবর পেয়েছিলাম প্রভু, কিন্তু ঠিক ধরতে পারিনি। "ভূভারহরণ করপোরেশন!" চমৎকার নাম! মুদ্রিত নিয়মাবলীটলি দেখতে পাই কি?

হর্ষ্যানন্দ॥ না—না। ওসবের বালাই আমাদের নাই। শ্রীনন্দনন্দনের ব্রজলীলা কে না জানো বাবা? সেই পরমলীলাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র শাস্ত্র—একমাত্র গাইড। শ্রীনন্দনন্দন দুগ্ধ সর ননী চুরি করে খেতেন, আহা! গোপিনীর মন চুরি করতেন—

ক্যাবলা॥ আহা!

হর্ষ্যানন্দ॥ রুক্মিণীহরণ তিনিই করেছেন, ভূভারহরণও তিনিই করেছেন! ওরে বৎস, তলিয়ে দেখ—তলিয়ে দেখ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, law of gravitation, balance of power, foreign exchange, socialism socialism কেন, তোমাদের last word, communism পর্যন্ত...সব কিছু সবকিছুর পথ প্রদর্শকই তিনি। জয় শ্রীভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দন!

ক্যাবলা॥ জয় শ্রীভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দন! কিন্তু এক কথায় ঐ "হরি" নামটিই বেশ!

হর্ষ্যানন্দ॥ আরে, "হরিই" তো হচ্ছেন আমাদের creed! ওটা হচ্ছে

বজ্রমন্ত্র, বুঝেছিস? "হরি" বিনা হরণ করি, অপহরণ করি! কথাগুলো শুনতেই খারাপ কিন্তু কত গুরুত্বপূর্ণ সব theory ওতে যে অন্তর্নিহিত রয়েছে, কজনে তা তলিয়ে দেখছে? অসাম্যে পৃথিবী ভরে যাচ্ছে। হরণ কর, সাম্য আসবে। Equilibrium, adjustment, সোসিয়ালিজম তাই বা কেন, আজকের শেষকথা communism, প্রত্যেকটির বীজ রয়েছে "হরি" এই বীজমন্ত্রে! এই যে আজ মল্লিকদের বাড়িতে হরণ হ'ল, এতে সমাজের ভালো হ'ল কি মন্দ হ'ল একবার বিচার করে দেখ।

ক্যাবলা ॥ সমাজের কথা ছেড়ে দিন প্রভু। এ সব তত্ত্বকথা আজকালকার সমাজে অচল। এসব হচ্ছে বিশ্বাসের কথা, কেউ করে, কেউ করে না।

হর্য্যানন্দ ॥ বুঝিয়ে দিলে কেন বিশ্বাস করবে না বৎস!

ক্যাবলা ॥ ধরুন আমি কংসানুচর পুলিসের কথাই বলছি। তারা তো আর এসব বুঝবে না। বিবেচনা করুন তারা যদি আমাদের অনুসরণ করতে থাকে, বিবেচনা করুন তারা যদি এই গুপ্তবৃন্দাবনের সন্ধানও—পেয়ে থাকে, বিবেচনা করুন—

হর্য্যানন্দ ॥ সে সব বিবেচনা করাই আছে। আরে মল্লিকদের মাল কি আর এখানে আছে! সে এতক্ষণ মল্লিকা হয়ে কোন কুঞ্জ আলো করছে, সে শুধু ঐ 'রাখোহরি'ই জানে!

ক্যাবলা ॥ এর মধ্যে পার করেছেন?

হর্য্যানন্দ ॥ আমি কি আর পার করেছি বাবা, সে আমার ঐ 'রাখোহরি' বাবাই পার করেছে!

ক্যাবলা ॥ কখন? কখন প্রভু?

হর্য্যানন্দ ॥ ঐ তো বাবা একপেয়ালা চা আর একটু দুগ্ধ সর চাঁছি দেখে মায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়লে! আমার 'রাখোহরি'কে চিনলে না! আমি তো শুধু এম-এ. উনি হচ্ছেন এম.-এ. বি-এল! তোমায় চাভোগ দিয়ে আমার পাগড়িটি যে ভুলে নিয়ে গেলেন···চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সেটি তো আর দেখলে না!

ক্যাবলা ॥ বলেন কি প্রভু! আমার কপালে কি শুধুই তবে ঐ দুগ্ধসর ও চাঁছি! সন্ত-আহৃত মহাপ্রসাদের কণিকাও কি আমি পাবনা নিঠুর ঠাকুর?

হর্য্যানন্দ ॥ করপোরেশনের মেম্বর তো এখনো হওনি বাবা!

ক্যাবলা ॥ হচ্ছি! এখনি।

হর্য্যানন্দ ॥ না বাবা। এখনো সময় হয় নি। সাধনা এগিয়েছে বটে, কিন্তু শেষ হয় নি। হাঁকুপাঁকু করো না বৎস। ভেতরের আমটাকে পাকতে দাও, নইলে যে রসের ব্যত্যয় হবে বাবা।

ক্যাবলা ॥ বাবা। আমায় ক্ষমা করুন। 'রাখোহরি' বাবার কি আর দর্শন পাবনা প্রভু?

হর্য্যানন্দ ॥ না বৎস। আজ রাত্রে আর না।

ক্যাবলা ॥ কিন্তু তাঁকে আর একটি বার না দেখে আমি তো যেতে

পারবো না প্রভু! অমন রতন পেয়েও আমি চিনলাম না! কোথায় গেলেন তিনি প্রভু?

হর্ষ্যানন্দ॥ তবে তোমায় তত্ত্বকথা বলি শোন। তুমি তো বি.-এ.-পাস দিয়েছ। ইকনমিকস্ যে একেবারে না বুঝবে তা তো নয়—

ক্যাবলা॥ বলুন—বলুন, বি.-এ.তে ইকনমিক্সে আমি অনার্স নিয়েছিলাম।

হর্ষ্যানন্দ॥ ব্যাস, তবে ইকনমিক্সের ভাষাতেই বলি। এই যে মল্লিকদের বাড়িতে হরণ হল, জানো এই মল্লিকদের?

ক্যাবলা॥ আজ্ঞে তা আর জানবো না! ব্যাটারা তো টাকার কুমীর, কলকাতায় কে না জানে!

হর্ষ্যানন্দ॥ বনেদি ঘর। বসে বসে খাচ্ছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। টাকায় শ্যাওলা পড়েছে—এত টাকা এক জায়গায় জমে গেছে! ইকনমিক্সের ভাষায় এতগুলো টাকা এক জায়গায় একেবারে 'জমাট' হয়ে 'অচল' হয়ে পড়ে রয়েছে!

ক্যাবলা॥ অর্থাৎ টাকা আছে কিন্তু তার circulation বন্ধ হয়ে রয়েছে!

হর্ষ্যানন্দ॥ এই তো বুঝছ! সমাজের পক্ষে, দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এ যে কী ক্ষতিকর পরিস্থিতি বোঝ বাবা বোঝ। ভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দনের আসন টলে উঠল। তাঁর ইঙ্গিতে হরণ করলাম মল্লিকের পাঁচ হাজার টাকার গয়না। তখনি চালান দিলাম তা 'রাখোহরি' বাবার হাতে। ছুটলেন 'রাখোহরি' বাবা 'বলহরি' ঠাকুরের আড্ডায়।

ক্যাবলা॥ 'বলহরি' ঠাকুর! সে আবার কে বাবা?

হর্ষ্যানন্দ॥ মহাপুরুষ। অক্রূর, কলিযুগের অক্রূর! যোগাযোগ রক্ষা করেন। 'হরির লুট' সব তাঁর ওখানে গিয়েই জড়ো হয়। তিনি নাম-মূল্যে কিনে নেন! আবার তখনি প্রেমমূল্যে বিক্রি করেন। 'রাখোহরি' বাবা পাঁচ হাজার টাকার গয়না দু'হাজারে 'বলহরি' বাবাকে গছিয়ে ·····যেই এখানে আসবে, ভাগ হয়ে যাবে বাবা ভূভারহরণ করপোরেশনে! টাকা হাতে পেয়েই মেম্বাররা ছুটবে, যার মন যায় যেখানে। এক সূর্য ডুবে আর এক সূর্য উঠতে না উঠতেই দু' হাজার শেষ। মল্লিকদের ধন নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেল না। বনবন করে হাতে হাত ঘুরছে রে ভাই, হাতে হাতে ছুটছে! দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এমনি করেই না তবে জেঁকে উঠবে!

ক্যাবলা॥ বেচারা মল্লিক।

হর্ষ্যানন্দ॥ না না, বেচারা তাঁকে বলো না ক্যাবলা। তাঁর এক পয়সাও ক্ষতি হল না বৎস! ও সব গয়নাই ইনসিওর করা ছিল। ও পাঁচ হাজার টাকাই তাঁর ঘরে ঘুরে আসবে। ইনসিওরেন্স কোম্পানীরও যে ক্ষতি হল, তাই কি বলতে পার? এরকম 'ক্লেম' তাদের মেটাতে হবে ধরে নিয়েই না তারা ব্যবস্থা করছে। 'ক্লেম'টা তারা চট্ করে মিটিয়ে দিয়েছে যেই রটবে, অমনি আরো দশজন ছুটে আসবে, তাদের ধন-সম্পত্তি ইনসিওর করতে!

কার যে কোথায় লোকসান হচ্ছে ভেবেও পাবে না বৎস! এমনি আমার লীলা ভূভারহরণ ঐ শ্রীনন্দনন্দনের!

ক্যাবলা॥ তাই তো দেখছি!

হর্ষ্যানন্দ॥ ইকনমিক্সে কি বলে? টাকা যত চটপট হাত-বেহাত হবে ব্যবসা-বাণিজ্য তত কেঁপে উঠবে। তাই হচ্ছে কি না বল! মল্লিকরা চোর তাড়াবার জন্য দশজন দারোয়ানের যায়গায় বিশজন দারোয়ান রাখবেন। দশজন বেকারের অন্ন সংস্থান হবে। নতুন প্যাটার্ণের গড্‌রেজ সিন্দুক কিনবেন। গড্‌রেজের ব্যবসা চাঙ্গা হয়ে উঠবে। বাজারে মূলধন বেড়ে যাবে। বেশী টাকা খাটবে। কাজ বেড়ে যাবে। আর যদি—

ক্যাবলা॥ আর যদি?

হর্ষ্যানন্দ॥ ভূভারহরণ না হ'ত রে ভাই, ভূভার হরণ না হ'ত? কি হ'ত ঐ পুলিসের? চাকরি থাকতো? কি হ'ত ঐ সব দারোয়ান প্রভুদের? কি হ'ত সিন্দুক কোম্পানীর? কি হ'ত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর? ভেবে দেখ্‌ বাবা ভেবে দেখ! ভার হরণ হচ্ছে বলেই না সমাজেও একস্তর থেকে টাকার ক্রয়কারিণী শক্তি, যাকে তোমরা 'purchasing power' বল, সমাজের আর একস্তরে স্থানান্তরিত হচ্ছে! প্রাচুর্যের ভার কমিয়ে অভাবের বৈষম্য দূর হচ্ছে, সাম্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ইকনমিক্স তো পড়েছ, তুমিই বল 'velocity of circulation' বাড়ছে কি না 'business activity' বাড়ছে কিনা 'marginal utility' যেখানে কম, সেখান থেকে, 'marginal utility' যেখানে বেশী সেখানে টাকা যাচ্ছে কি না? বল ভাই বল, সমাজের পক্ষে এটা মন্দ না ভালো? ক্ষতিটা কার হ'ল বল বাবা, বল—

ক্যাবলা॥ তা ঠিক বলতে পারব না, তবে ভূভারহরণ করপোরেশনের যে লাভ হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই প্রভু।

হর্ষ্যানন্দ॥ হ্যাঁ, হচ্ছে কিন্তু societyর লাভ হচ্ছে নাকি? এই সোসাইটি —যে সোসাইটিতে টাকা ছাড়া এক দণ্ড চলে না, ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া যে সোসাইটি একেবারেই সমৃদ্ধ হয় না, অর্থের সচলতার ওপরই যে সোসাইটির নির্ভর, বল বাবা ক্যাবলা সে সোসাইটিতে এই ভূভারহরণ করপোরেশন কি একেবারেই নিষ্প্রয়োজন? অনাবশ্যক? যদি বল, আমরা কিছু উৎপাদন করি না—আমরা শুধু পরের উৎপাদিত ধন ভোগ করি, হাত-বেহাত করি, তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, উকীলরা কি করে? ডাক্তাররা কি করে? পলিটিসিয়ানরা কি করে? কী ধন তারা উৎপাদন করে? সমাজের মাথায় যদি তাদের স্থান হয়, সমাজের এক কোণে কি আমাদের এতটুকু স্থান হতে পারে না?

ক্যাবলা॥ প্রভু! প্রভু! থামুন! শুনুন। আপনাকে আমার সঙ্গে একবার লালবাজারে যেতেই হবে। যেতেই হবে প্রভু, এখনি। এই কথাগুলো, হ্যাঁ, এই কথাগুলো, আমাকে না শুনিয়ে শোনাতে হবে পুলিস কমিশনারকে।

আসুন। না—না, না গেলে চলবে না। যদি না যান, হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাব। আপনাকে নিয়ে গিয়ে সোজা সাহেবকে গিয়ে বলব, 'স্যার' যাঁকে ধরতে পাঠিয়েছিলেন, ধরে আমি এনেছি, কিন্তু এঁর কথাগুলো শুনে ভেবে দেখুন, গবর্ণমেণ্টকে লিখবেন কি না—পেনালকোড থেকে ৩৭৯ ধারা তুলে দাও!"

হর্ষ্যানন্দ ॥ বুঝলাম বাবা ক্যাবলাকান্ত, কংসানুচর, চিনলাম বাবা তুমি কী চিজ! তা চলো। লালবাজার! সে তো আমার তীর্থ! মহাতীর্থ ওরে, ঐ কংস-কারাতেই যে ভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দনের জন্ম! কতবার গিয়েছি, তবু তো আশা মেটে না! চলো বাবা চলো, আমায় নিয়ে চলো, নইলে তো তোমার চাকুরি থাকবে না বাবা! একি···প্রণাম কর, ভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দনকে প্রণাম কর্ ব্যাটা, ভুলিসনে যে ওঁর অনুগ্রহে আমাদের অন্ন, আমাদের অন্নে তোদের অন্ন।

যবনিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬

ষ্ট্যাচু

[নিশীথ রাতের কলিকাতা। নির্জন পার্ক। পার্কের এক কোণে শ্বেত পাথরের চতুষ্কোণ স্তম্ভ। স্তম্ভের উপরে একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি। এই মমর মূর্তিটি স্বর্গত বিখ্যাত এক দেশনেতার। স্তম্ভগাত্রে একটি ফলক। তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ:

"সত্যাশ্রয়ী ও নির্ভীক, জিতেন্দ্রিয় ও কর্মযোগী পরদুঃখকাতর ও দানবীর স্বনামধন্য দেশনেতা সেবাব্রত চৌধুরীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁহার অগণিত ভক্তের শ্রদ্ধার্ঘ। জন্ম ১৩০৫ সন ১৫-এ আষাঢ়— মৃত্যু ১৩৬০ সন, ১২ই আশ্বিন।',

আশ্রয়হীন একটি বেকার যুবক এই স্মৃতিফলকে লিপিবদ্ধ কথাগুলি উচ্চৈস্বরে পাঠ করিতেছিল।]

যুবক ॥ (পাঠ শেষ হইলে) পরদুঃখকাতর! দানবীর! হায় হায় কি দুর্ভাগ আমি! কলকাতা শহরে আমি চাকরীর খোঁজে এসে পড়েছি কখন? হায় হায় এই মহাপুরুষটির স্বর্গগমনের পর। কয়েক বছর আগে যখন এই মহাপুরুষ বেঁচে ছিলেন, হায় হায় তখন যদি আসতে পারতাম কলকাতায়, এই মহাপুরুষের পায়ে গিয়ে পড়লে একটা কিছু সুরাহা আমার হতোই হতো। হায় হায় কবি ঠিকই বলেছেন! "অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।"

[ঐ অঞ্চলে পাহারারত একটি কনেষ্টবেলের প্রবেশ]

কনেষ্টবল ॥ এখানে এতো রাতে তুমি কি করছো?

যুবক ॥ আমাকে তুমি বলছেন কেন আপনি?

কনষ্টেবল ॥ চোর-জোচ্চোরদের তুমি বলব না তো কি বলবো?

যুবক ॥ আমি চোর-জোচ্চোর ? কোন অধিকারে আপনি আমাকে চোর-জোচ্চোর বলছেন ?

কনষ্টেবল ॥ রাত একটার সময় ভদ্রলোক এই নির্জন পার্কে হাওয়া খেতে আসেন না। আর তাছাড়া, তোমার চেহারা আর পোশাক যা দেখছি, তাতে তোমাকে কোন সাধুপুরুষ বলে মনে করতে পারছি না।

যুবক ॥ সাধুপুরুষের পরিচয় কি চেহারা আর পোশাকে লেখা থাকে ?

কনষ্টেবল ॥ তুমি তো বেশ গোলমেলে লোক দেখছি। চলো, থানায় চলো।

যুবক ॥ বাঁচালেন আমাকে আপনি। কী উপকার যে করলেন তা আর কী বলবো ? চলুন।

কনষ্টেবল ॥ সে কি হে ? তোমাকে থানায় নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরবো, সেটা হোলো গিয়ে তোমার উপকার ?

যুবক । আজ্ঞে হ্যাঁ, উপকার। পরম উপকার। একটা চাকরী-বাকরীর খোঁজে গ্রামে থেকে শহরে এসেছিলাম মাসখানেক আগে। যে ক'টা টাকা সঙ্গে ছিল পাইস্ হোটেলে খেতে খেতে শেষ হয়ে গেছে। মাথা গোঁজবার কোনো আশ্রয় নেই বলেই রাতটা কাটাই রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে, নইলে পার্কে। কিন্তু সেখানেও পুলিশের তাড়া খেতে হয়—যেমন এখন খাচ্ছি। আজ মনে হচ্ছিল এখন আমার একমাত্র আশ্রয় দয়াময় সরকারের জেল। যেখানে যেতে পারলে একেবারে রাজ-আতিথ্য—খাওয়া-পরা আর মাথা গোঁজবার সব সমস্যার অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান।

কনষ্টেবল ॥ তুমি কি বলছো হে ?

যুবক ॥ আজ্ঞে আমি ঠিকই বলছি।

কনষ্টেবল ॥ তবে তো আমি তোমার এই উপকার করবো না। আরো কিছু ভোগো।

যুবক ॥ ও মশাই শুনুন। আমার চেহারাটা দেখছেন ? কাপড়চোপড় ছেঁড়া বটে। কিন্তু হাতের কব্জী আর গায়ের জোর বাপ-মায়ের কৃপায় আপনার চেয়েও অনেক বেশী। আপনি আমাকে হাজতবাসের সুযোগ না দিতে চাইলে সে সুযোগ আমি জোর করে আদায় করবো আপনাকে পিটিয়ে।

কনষ্টেবল ॥ ওরে বাবা, সে কি ?

যুবক ॥ হ্যাঁ, মশাই। না খেতে পেয়ে পেয়ে আমি এখন মরীয়া হয়ে উঠেছি।

[যুবক কনষ্টেবলের হাত চাপিয়া ধরিল।]

কনষ্টেবল ॥ আরে ! শোনো, শোনো ! মারামারি কেন ? না খেয়ে আছো—বোসো, বোসো। কিছু খাবার আমিই তোমাকে দিচ্ছি।

যুবক ॥ সে কি ! আপনি মশাই আমাকে খেতে দেবেন ?

কনষ্টেবল ॥ হ্যাঁ, দেবো, দেবো। আমার পরিবারের দিব্যি আছে যে।

যুবক ॥ পরিবারের দিব্যি! কি দিব্যি ?

কনষ্টেবল ॥ সেটা অত্যন্ত গুপ্ত কথা। এসো বসি। (যুবকটিকে বসাইয়া পকেট হইতে একটি কাগজের মোড়কে রাখা কিছু পুরী ও মিষ্টি বাহির করিয়া যুবকের সামনে রাখিল) তুমি খেতে থাকো। আমি বলছি।

যুবক ॥ (খাইতে খাইতে) আপনি আমাকে অবাক করছেন মশাই। কি ভাগ্য আমার! ঐ মহাপুরুষের মুখ দেখেছি বলেই বোধ হয়। হঁ্যা নিশ্চয়, তাই আপনার মতো মহাপুরুষ কনষ্টেবলের হাত পড়েছি! না না, ভুল হলো। আপনি তো আপনার পরিবারের নির্দেশে আমাকে খাওয়াচ্ছেন—আমার ধন্যবাদটা বোধ হয় তাঁরই বেশী পাওনা! এই খাওয়ানো ছাড়া আরো কিছু নির্দেশ আছে নাকি তার ? বলুন না আপনার পরিবারের কী আদেশ আছে আপনার উপর ?

কনষ্টেবল ॥ তুমি বেশ বলো দেখছি। আমি বললাম নির্দেশ, তুমি বলছো আদেশ! তা আদেশই বটে! (হাস্য) তোমাকে গোপনে বলছি আমার অফিসারের আদেশ—সেও আমি সব সময়ে মানি না, কিন্তু আমার গিন্নীর আদেশ—সে আমি মানবোই। কারণ, দেখেছি—তাতে দিন দিন আমার ভালো হচ্ছে।

যুবক ॥ বুঝছি, সাক্ষাত দেবী তিনি। তা সেই দেবীর আদেশ-টাদেশগুলো বলুন না আমাকে।

কনষ্টেবল ॥ তিনি বলেন, আমি লোকটি খুব সুবিধার নই। মিছে কথাতো বলিই—তা ছাড়াও নীতিবিরুদ্ধ কাজকর্মও কিছু কিছু করি। তাতে আমি বলি—দু-একটা মিছে কথা কি দু একটা অকাজ কুকাজ শুধু আমি কেন —কে না করছে আজ ? আর আজই বা কেন ? চিরদিন চিরকালই মানুষমাত্রেই এ সব করেছে।

যুবক ॥ না না সে কথা বলবেন না, আপনি সকলের কথা ধরবেন না। এই ধরুন এই মহাপুরুষটি—যার বেদীতলে আমরা বসে আছি। ঐ পড়ে দেখুন, লেখা আছে—সত্যাশ্রয়ী, জিতেন্দ্রিয়···বিশেষণগুলো একবার দেখুন। যার মুখখানি দেখেছিলাম বলে আজ আপনার মতো দয়াবান লোকের হাতে আমি এই খাবার পেয়ে বেঁচে গেলাম। সবাই অসাধু নন। তবে আপনি-আমি হয়তো মাঝে মাঝে—

কনষ্টেবল ॥ হঁ্যা, তা তো বটেই। আমরা তো আর মহাপুরুষ নই। অতিসাধারণ মনুষ্য আমরা। আজকাল যা দিন পড়েছে—আমাদের একটু ভুলভ্রান্তি হওয়া—হঁ্যা, তা হয় বৈ কী। তাই আমার পরিবার বলেন, বলেনও বলবো না—একেবারে, আদেশই দিয়েছেন—ডিউটি সেরে যখন বাড়ি আসবো, তার, আগে—কোনো ভিখিরীকে যেন আমি কিছু খেতে দিই। তিনি বলেন, এতে দিনের ছোটখাটো পাপ-টাপগুলো—অবশ্য আমি এগুলোকে পাপ-টাপ না বলে, 'হরির কৃপায় দশ জনে খায় আমরাই কেন খাব না, বলতে চাই—তা

সে যাই হোক—তিনি বলেন, ও সব ধুয়ে মুছে যায়। আর ঐ ভিখিরী যদি খেতে পেয়ে আশীর্বাদ করে তাহলে দেখেছি পরদিন্ উপরি রোজগারটা আমার বেড়ে যায়—। (হাস্য)

যুবক ॥ ভালো ভালো, এ বিশ্বাসটা থাকা ভালো। তাতে একটা হতভাগা লোক, সেও খেয়ে বাঁচছে, অন্ততঃ একটা রাত খেয়ে বাঁচছে—আর আপনিও দুটো পয়সার মুখ দেখছেন। আমার তো মশাই কেন যেন মনে হচ্ছে এই যে মহাপুরুষ—যাঁর বেদীতে আমরা বসে এই সব ধর্মকথা আলোচনা করছি—এই মহাপুরুষের ঐ পাথরের মুখটি—এ মশাই আমি রোজ দেখবো। যেমন আজ দেখেছি। তাতে আর কিছু না হোক, আমার যেন কেমন বিশ্বাস হচ্ছে—অন্ততঃ রোজ রাতে আমার ভরা পেট খাবার জুটবে। যেমন আজ জুটলো।

কনষ্টেবল ॥ না না, তোমাকে আমার আরও কিছু বলবার আছে। তার আগে অবশ্য তোমাকে আমি ওই কল থেকে জল খেয়ে নিতে বলছি।

যুবক ॥ যা বলেছেন। পেট ভরে গেছে। এখন ঐ কল থেকে দু'আঁচলা জল খেলেই দেখবেন আমি বেশ ভালো লোক। কাউকে ঠকানোর মনোবৃত্তি আমার একেবারেই নেই। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আমার পাশে দু'দণ্ড বসে আপনি আপনার পরিবার—পরিবারই বা কেন বলি, বরং বলবো সেই দেবীর আরো দু'চারটি মহান্ আদেশ যা তিনি দিয়েছেন আমাকে বলতে পারেন।

[যুবকটি জল খাইতে গেলো। কনষ্টেবলটি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল। ইতিমধ্যে যুবকটি প্রত্যাগমন করিল]

যুবক ॥ আঃ। কী তৃপ্তি যে হোলো আজ। খাবারগুলো বেশ ভালো ছিলো।

কনষ্টেবল ॥ তা আর হবে না? খাবারগুলি যে "মধুর ভারত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের।"

যুবক ॥ যদি কিছু মনে না করেন—বড়ো কৌতূহল হচ্ছে—জানতে—ক' টাকার খাবার আপনি আমাকে খাওয়ালেন। মানে, এতো ভালো খাবার আমি এর আগে খেয়েছি বলে মনে হচ্ছে না কিনা। আর তাই দামটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কনষ্টেবল ॥ দাম কি আর আমিই জানি বাপু? ও সব—

যুবক ॥ ও—

কনষ্টেবল ॥ হ্যাঁ।

যুবক ॥ ও তো বেশতো বেশতো। আমি ধরে নিচ্ছি—অমূল্য। অথবা যে দামে আপনি কিনেছেন আমাকেও সেই কেনা দামেই দিয়েছেন।

কনষ্টেবল ॥ (হাসিয়া) তুমি বেশ বলো হে। কিন্তু এবার তোমাকে যা দিচ্ছি এটা একেবারে ঘরের। গিন্নীর নিজের হাতের তৈরী। নাও (পকেট হইতে একটি পানের ডিবা বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি পান দিয়া) খাও।

যুবক ॥ পান! বা-বা-বা। আপনি বুঝি খুব পান খান?

কনষ্টেবল ॥ না না, পান-দোষটোষ আমার নেই।

যুবক ॥ কিন্তু আমি তো প্রায়ই দেখি—বেশীর ভাগ কনষ্টেবলই পানের দোকানের সামনে ডিউটি দেয়।

কনষ্টেবল ॥ তা দিক! কিন্তু এই ছাখো আমার দাঁত সাদা।

যুবক ॥ তবে স্যার আপনার পকেটে পানের ডিবো কেন।

কনষ্টেবল ॥ ওটা গিন্নীর আদেশ। তিনিই একডিবে পান সঙ্গে দেন—মানে আমাদের কাছেও তো অনেকে পান খেতে চান যে। গিন্নী বলেন, শুধু সেলাম করতে নেই। বুঝেছো?

যুবক ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। সেলাম আর সেলামী।

কনষ্টেবল ॥ বা:। কী সুন্দর তুমি বলো। তোমাকে একদিন আমার বাড়ি নিয়ে যাবো হে। ও হো-হো, তা তো হবে না। তাঁর আবার দ্বিতীয় নির্দেশটাও রয়েছে কিনা।

যুবক ॥ ও, তবে দ্বিতীয় নির্দেশও আছে? বলুন না, সে আদেশটা কী? আমার তো এখন থেকেই তাঁকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কনষ্টেবল ॥ (চটিয়া গিয়া) প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে? সে যে কী চিজ্ তা জানো না তো—তাই। দ্বিতীয় নির্দেশটা শুনলেই তা বুঝবে।

[সঙ্গে সঙ্গে রুল দিয়া যুবকটিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।]

যুবক ॥ একী! একী, আপনি আমাকে ঠ্যাঙাবেন কেন?

কনষ্টেবল ॥ কী করবো? তাঁর আদেশ। বলেছেন, প্রথমে খাওয়াবে—তারপর ঠ্যাঙাবে।

যুবক ॥ আরে শুনুন—শুনুন—ঠ্যাঙাবেন কেন?

কনষ্টেবল ॥ বলেছেন, খুব ঠেঙিয়ে দেবে যাতে আর কোনোদিন তোমার কাছে কিছু না চায়—তোমার পিছু না নেয়—তোমার বাড়ি ধাওয়া না করে। বলো, এ সব করবে না, তবে আমি তোমাকে রেহাই দিচ্ছি। নইলে—

[আবার মারিতে উদ্যত হইল।]

যুবক ॥ না না, না মশাই, আমি কথা দিচ্ছি আমি আর আপনার মুখই দেখবো না। মুখ দেখবো শুধু একটি লোকের—হ্যাঁ ঐ মহাপুরুষের। আপনি এখন স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারেন, আমি এখন এই মহাপুরুষের পায়ের তলায় পড়ে ঘুমাবো।

কনষ্টেবল ॥ রাত বারোটার পর পার্কে থাকাও বে-আইনি।

যুবক ॥ তবে মশাই আমাকে হাজতে নিয়ে চলুন, আমি তো তাই চাইছি।

কনষ্টেবল ॥ না না—ও-সব হাঙ্গামার মধ্যে আমি যাবো না। এখন ওই পানওয়ালীর দোকানটার উপর নজর রাখতে হবে—

যুবক ॥ আরে মশাই, আপনি তো পান খান না—

কনষ্টেবল ॥ (হাসিয়া) ঐ পানওয়ালীর পান দু' একটা খাই।

যুবক ॥ (ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে) ও।

কনষ্টেবল ॥ হ্যাঁ!

যুবক ॥ বেশ তো, বেশ তো। তা যান না। শুভস্য শীঘ্রং।

কনষ্টেবল ॥ তোমাকে একটা কথা না বলে যেতে মন সরছে না।

যুবক ॥ কী বলুন তো।

কনষ্টেবল ॥ এখানে তোমার না থাকাই উচিত। না না, আইনের কথা আমি ছেড়েই দিচ্ছি। আসল কথা হচ্ছে এই, এই মূর্তিটার আশে পাশে অনেকে অনেক কিছু দেখেছে বেশী রাতে। আমার মনে হয় চোরাকারবারীরা আসে। আর তারাই রটিয়েছে এই ভূতের ভয়।

যুবক ॥ এঁ্যা?

কনষ্টেবল ॥ হ্যাঁ। একজন ভয় পেয়ে মারাও গেছে শুনেছি।

যুবক ॥ তাই নাকি? তবে তো আর এখান থেকে আমি কিছুতেই নড়ছি না।

কনষ্টেবল ॥ তোমার প্রাণের ভয় নেই?

যুবক ॥ খেতে না পেলে ঐ একটা ভয়ই থাকেনা! দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন দেখবেন প্রাণের ভয় আমারই হবে সবচেয়ে বেশী।

কনষ্টেবল ॥ না তোমার সঙ্গে আর আমি কথা বলে সময় নষ্ট করতে পারিনা। আমার ডিউটি আছে।

"লোকে বলে প্রেম করেছি, প্রেম কারে কয় জানিনা,
মনের মানুষ মন নিয়েছে, লোকের কথা মানিনা।"

[গানের সুর ভাঁজিতে ভাঁজতে প্রস্থান করিল। যুবকটিও ঐ গানের কলিটি গুনগুন করিতে করিতে একটি ইঁট সংগ্রহ করিয়া মাথায় দিয়া বেদীর উপরে শয়ন করিল এবং অনতিকালের মধ্যে নিদ্রাচ্ছন্ন হইল। কিছুক্ষণ পরে ঐ স্থানে একটি উন্মাদিনী নারী চুপি চুপি চোরের মতো প্রবেশ করিয়া হাতের যষ্টিটি দিয়া মূর্তিটিকে প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করিতে লাগিল। এই শব্দে যুবকটির ঘুম ভাঙিতেই সে ধড়মড় করিয়া সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিল।]

যুবক ॥ একি! একি! কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এ সব?

নারী ॥ Shut up. Get out.

যুবক ॥ সেকি!

নারী ॥ I say, get out. বেরিয়ে যাও!

যুবক ॥ বেরিয়ে যাবো মানে? তুমি এই মহাপুরুষকে—

নারী ॥ ম-হা-পু-রু-ষ! হাঃ হাঃ হাঃ! তোমরা জানো মহাপুরুষ। কিন্তু আমি জানি উনি কে এবং কি।

যুবক ॥ দেশশুদ্ধ লোক ওঁকে মহাপুরুষ বলে জানে—আর তুমি একটা পাগলি—

নারী ॥ Shut up. I am his wife. বাংলা করে বলছি, আমি ওঁর স্ত্রী। আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না ওঁকে।

যুবক ॥ আপনি ওঁর স্ত্রী? স্ত্রী হয়ে আপনি আপনার স্বামীকে ঠেঙাচ্ছেন?

নারী ॥ হ্যাঁ ঠ্যাঙাচ্ছি। ঐ ষ্ট্যাচু আমি ভাঙবো। ঐ বেদী আমি চুরমার করবো।

[লাঠি দিয়া পুনরায় আঘাত করিতে উদ্যত হইলে যুবকটি উঠিয়া পিঠ দিয়া মূর্তিটিকে আঘাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল।]

নারী ॥ (ইহাতে নিরস্ত হইয়া) ও। তবে তোমাকে সব খুলে বলতে হবে দেখছি। তোমাকে বিশ্বাস করিয়ে দিতে হবে যে এই লোকটা সত্যাশ্রয়ী নয়, জিতেন্দ্রিয় নয়। ঐ ভণ্ড লোকটির মুখোসটা খুলে দিতে হবে। বেশ তবে বোসো।

[বেদীতটে উভয়েই বসিল]

নারী ॥ ঐ স্মৃতী-ফলকে যা যা লেখা আছে ওর একটি কথাও মিথ্যা নয় বলেই ছিলো আমার ধারণা। আর সে জন্য আমার গর্বের ছিলোনা সীমা। গৌরবের ছিলোনা শেষ। আমার মনে হতো জগতে আমার চেয়ে ভাগ্যবতী খুব কমই আছে। বাল্যকাল থেকেই শংকরের মতো স্বামী পেতে গৌরীর মতো তপস্যা করেছিলাম আমি। আমার মনে হ'তো ঈশ্বর আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। (হঠাৎ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল) আমার সেই স্বামী মারা গেলেন কবে জানো? ঐ লেখা আছে ১২ই আশ্বিন, ১৩৬০। আমার মনে হলো আমার চোখের সামনে থেকে সব আলো নিভে গেলো।

যুবক ॥ ওঁকে হারিয়ে বহু লোকই অনাথ হয়েছিলেন মা। ঐ স্মৃতিফলকের লেখা থেকেই তা বুঝছি।

নারী ॥ আমারও তাই মনে হতো। আমিও তাই ভাবতাম! ওঁকে ছেড়ে বাঁচা আমার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠলো বাবা। ওঁর মৃত্যুর পর আমার মৃত্যুর জন্য আমি তপস্যা করেছি বাবা।

যুবক ॥ আমি সেটা বিশ্বাস করছি মা।

নারী ॥ শেষে সেই মৃত্যু আমার এল। মরতে বসে এতো আনন্দ কারো হয় না—যেমন আমার হয়েছিলো বাবা। কেবলই মনে হচ্ছিল আমি যেন চলেছি এক মহাঅভিসারে আমার স্বামীর মহাজীবনের স্বর্গে। হিন্দু নারী, আমরা বিশ্বাস করি, শেষ নিঃশ্বাসে যে কামনা করে মানুষ—জীবনের পরপারে তা হয় পূর্ণ। আমিও তাই আমার শেষ নিঃশ্বাসে এই প্রার্থনাই করেছিলাম আমার যেন স্থান হয় আমারই স্বামীর শ্রীপাদপদ্মে—মহাস্বর্গে।

যুবক ॥ বুঝতে পেরেছি। মৃত্যুর দুয়ারে গিয়েও আপনি বেঁচে উঠেছেন। আর সেই শোকে হয়েছেন পাগল।

নারী ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। তুমি কিছুই বোঝোনি, কিছুই বোঝোনি তুমি।

যুবক ॥ হ্যাঁ, আপনার সব কথাই যে আমি বুঝবো এ স্পর্ধা আমি রাখিনি। যাঁরা প্রকৃতিস্থ, তাঁদেরই অনেক কথা আমরা বুঝিনা। কিন্তু তবু বলুন, আমি শুনবো। বলুন মা, বলুন।

নারী ॥ স্পষ্ট বুঝলাম আমার মৃত্যু হলো। একি তুমি মুখ ফিরালে যে? তুমি হাসছো বুঝি? (রাগে ও ক্ষোভে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তুমি হাসছো? তুমি হাসছো?

যুবক ॥ শুনুন মা শুনুন। হাসা তো দূরের কথা—আপনাকে দেখে আমার কী যে কষ্ট হচ্ছে—আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না। কত বড়ো লোকের স্ত্রী আপনি, আর আপনার কিনা আজ এই দশা।

নারী ॥ আমার দুঃখে আকাশ বাতাসও আজ কাঁদে। সব শুনলে তুমিও এখনি কাঁদবে।

যুবক ॥ আপনি মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। এই আপনার দুঃখ, না?

নারী ॥ (চটিয়া গিয়া) you are all fools. (কাঁদিয়া) কাউকে আমি আমার কথা বোঝাতে পারিনা—মরতে আমি চেয়েছিলাম, ঈশ্বর আমার সে প্রার্থনা শুনেছিলেন। আমার মৃত্যু হলো। যে মৃত্যু আমি কামনা করেছিলাম সে মৃত্যু আমার হলো। কিন্তু মৃত্যুকালে যে কামনা করেছিলাম তা আমার পূরণ হলো না।

যুবক ॥ কেন? কেন মা?

নারী ॥ এই স্মৃতি ফলকটির জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই স্মৃতিফলকটির জন্য।

যুবক ॥ সে কী মা? কেন বলুন তো?

নারী ॥ আমার অন্তিমবাসনা হলো পূর্ণ। স্বামীর সঙ্গে আমার হলো সাক্ষাৎ। কিন্তু সে সাক্ষাৎ কোথায় হলো জানো?

যুবক ॥ বলুন?

নারী ॥ স্বর্গে নয়, স্বর্গে নয়।

যুবক ॥ তবে?

নারী ॥ নরকে।

যুবক ॥ ন-র-কে!

নারী ॥ হ্যাঁ, নরকে।

যুবক ॥ নরকে কেন মা? নরকে কেন?

নারী ॥ ঐ স্মৃতিফলকে লেখা রয়েছে সত্যাশ্রয়ী সে। জিতেন্দ্রিয় সে। আমিও তাঁকে তাই জানতাম। দেশের লোকেও তাই জানতো। কিন্তু সে যে একটা মিথ্যা মুখোস পরে দুনিয়ার সবাইকে ফাঁকি দিয়ে গেছে—তা জানতেন শুধু ঈশ্বর। আর জানতো অবশ্য সে নিজে। জীবনের পরপারে আমার সঙ্গে যেই দেখা, তখন আর সে তাকাতে পারে না আমার দিকে।

যুবক ॥ ওঃ।

নারী ॥ হ্যাঁ। তাঁর মুক্তি হয়নি। তাঁর মুক্তি হয়নি। সদ্গতি হয়নি তাঁর। কেন জানো?

যুবক ॥ আপনিই বলুন।

নারী ॥ তাঁর জীবনের মিথ্যেটাই অক্ষয় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই স্মৃতি-স্তম্ভরূপে—এতে তাঁর পাপ আরো বেড়ে যাচ্ছে—আরো বেড়ে যাচ্ছে।

যুবক ॥ ও।

নারী ॥ হ্যাঁ। যতলোক এই স্মৃতিস্তম্ভে এই লেখাটি পড়ছে তারা সবাই তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

যুবক ॥ আমিও করেছি মা।

নারী ॥ তুমিও করেছো? তবে তুমিও তার পাপ আরো বাড়িয়ে দিয়েছো। এক একটি লোক তাঁর এই স্মৃতিফলকে লেখা প্রশস্তি পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে এক একটি কশাঘাত সে ভোগ করছে নরকে। হ্যাঁ, এই হয়েছে তাঁর শাস্তি! সে যে কী অবর্ণনীয় কষ্ট, জীবিত তোমরা, বুঝবে না, বুঝবে না। আমি তা স্বচক্ষে দেখে, সহ্য করতে না পেরে, রোজ রাতে চলে আসি এখানে—ঐ স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙতে। কিন্তু আমার কি সাধ্য সুদীর্ঘ জীবনে মিথ্যার যে সুদৃঢ় সৌধ সে রচনা করে গেছে আমি তা ধূলিসাৎ করবো!

যুবক ॥ তাইতো! তাইতো মা।

নারী ॥ এই মিথ্যা চূর্ণ-বিচূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মুক্তি নেই বলে আমারও নেই মুক্তি।

যুবক ॥ তাইতো।

নারী ॥ একটা উপকার তুমি আমায় করবে বাবা?

যুবক ॥ বলুন মা।

নারী ॥ একটা ডিনামাইট দিয়ে এটা উড়িয়ে দিতে পারো বাবা?

যুবক ॥ তাও তো বটে। আচ্ছা বলতে পারো বাবা, আমাদের দেশে এটমবোম কবে পড়বে?

যুবক ॥ না মা, এ্যাটমবম আর পড়বে না! যাদের হাতে এ্যাটমবম তারা এটা বুঝে গেছে—এ্যাটমবমের লড়াই সুরু হলে পৃথিবীটাই হবে ধ্বংস, বাঁচবে না কেউ।

নারী ॥ তবে—তবে—এই মিথ্যার জয়-ধ্বজাটাই কি সত্য হয়ে থাকবে?

যুবক ॥ যতদিন মিথ্যা আর মেকী থাকবে আমাদের সভ্যতার ভিত্তি ততদিন ঐ ষ্ট্যাচু অক্ষয় হয়েই থাকবে—কারো সাধ্য নেই ওটা ভাঙে।

নারী ॥ তবে?

যুবক ॥ এই সভ্যতার প্রথম ঘোষণাই ছিল মনের কথা গোপন রাখতেই হয়েছে ভাষার সৃষ্টি। তাতেই সুরু হয়েছে সমাজ জীবনে মিথ্যা ভাষণ, মিথ্যা-চার, প্রবঞ্চনা আর ছলনা।

নারী ॥ তুমি মিথ্যা বলোনি, স্ত্রীর মন রাখতেও স্বামী করেছেন মিথ্যাচার।

যুবক ॥ সমাজ-জীবনের ভিত্তিই হয়ে দাঁড়িয়েছে মিথ্যাচার। পেটে ক্ষুধা নিয়েও মুখে রেখেছি লজ্জা। কপালে করাঘাত করে বলেছি এ দুঃখ এ দারিদ্র্য আমাদের অদৃষ্টের দোষ। হ্যাঁ, জীবনটাই হয়ে এমনি দাঁড়িয়েছে একটা মিথ্যার স্তূপ।

নারী ॥ ভেঙে ফেলো সেই মিথ্যার জঞ্জাল। ভেঙে ফেলো ঐ ষ্ট্যাচু। সুরু হোক সত্যের জয়যাত্রা।

যুবক ॥ সুরু হয়ে গেছে মা। আর আমরা স্বীকার করিনা—মনের ভাব গোপন করতেই ভাষার সৃষ্টি। আজ আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে শিখেছি আমাদের মনের সংকল্প।

নারী ॥ কি সে সংকল্প বাবা ?

যুবক ॥ আবার আমরা বাঁচবো। বাঁচবার জন্য আবার আমরা লড়াই করবো।

নারী ॥ হ্যাঁ বাবা, এটা খুব সাহসের কথা।

যুবক ॥ পেটের ক্ষুধাই জুগিয়েছে এই সাহস। আর এই সাহসেই নিহিত রয়েছে সত্যের জয়—মিথ্যার ক্ষয়।

নারী ॥ একদিন তবে ঐ ষ্ট্যাচু ধ্বংস হবে তো বাবা ?

যুবক ॥ নিশ্চয়।

নারী ॥ যাক্—আশার কথাই শুনে যাচ্ছি তোমার মুখে। মিথ্যা আর মেকি ধ্বংস হোক। মিথ্যাপাশবদ্ধ মানব আত্মার মুক্তি হোক। মুক্তি হোক।

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান]

যুবক। হোক না কেন পাগল, কিন্তু কথার দাম আছে। এর পর আর কি ঘুম আসবে ? দেখি।

[ইঁটটিকে আবার বালিশ করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু তখনই অদূরে গীতরত কনষ্টেবলটির আবির্ভাব হইল। যুবকটি উঠিয়া বসিল।]

কনষ্টেবল ॥ "লোকে বলে প্রেম করেছি,
প্রেম কারে কয় জানিনা,
মনের মানুষ মন নিয়েছে,
লোকের কথা মানিনা।"

কি গো, ঘুমোও নি যে ?

যুবক ॥ ঘুমোবার কি আর জো আছে ? আপনি মশাই যাবার পরই এসেছিলো একটা পাগলী। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। বলে, সে নাকি এই মহাপুরুষের স্ত্রী।

কনষ্টেবল। সে কি হে ? এ মহাপুরুষের স্ত্রী তো বছর দুই হলো মারা গেছেন।

যুবক ॥ আপনি কি বলছেন মশাই ? মারা গেছেন ? এই পাগলীটাও তাই বলছিলো বটে—

কনষ্টেবল ॥ ঠিকই বলেছে। হরসুন্দরী পার্কে এঁর স্ত্রীরও ষ্ট্যাচু রয়েছে। দেখনি বুঝি ?

যুবক ॥ আপনি বলছেন কী মশাই ?

কনষ্টেবল ॥ দেখতে চাও ?

যুবক ॥ তবে কি—তবে কি—

[থামিয়া গিয়া অন্যদিকে তাকাইল]

কনষ্টেবল ॥ মনে হচ্ছে হঠাৎ ভয় পেলে যেন ?

যুবক ॥ পাগলীটা বলছিলো, এঁরই স্ত্রী সে। পরপার থেকে চলে এসেছে। মিথ্যার এই জয়স্তম্ভটা ভেঙে ফেলতে।

কনষ্টেবল ॥ (হো হো করিয়া হাসিয়া) আরে কথায় বলে—'কিনা বলে পাগলে, আর কিনা খায় ছাগলে।' হাঃ হাঃ হাঃ।

[গীতকণ্ঠে প্রস্থান। যুবকটি ক্ষণকাল ষ্ট্যাচুটিকে এক দৃষ্টে দেখিল। ক্রমশঃ সে উত্তেজিত হইয়া ষ্ট্যাচুকে প্রাণপণ শক্তিতে লাথি মারিতে লাগিল—ক্লান্ত হইয়া শেষে উহা ভূপাতিত করিতে চেষ্টা করিল। পশ্চাতে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল সেই নারীটি—আগ্রহ এবং আনন্দ উদ্ভাসিত আননে। অভিভূত মনে কম্পিত হাতে আশীর্বাদ করিল যুবককে।]

যবনিকা

ভারতবর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

শেষ সংবাদ

[ধনপতি বসু নগরের বিখ্যাত ধনী এবং দেশের প্রখ্যাত নেতা। এই ধনপতি বসু আজ মৃত্যু-শয্যায়। শহরের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ চৌধুরী তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। ধনপতি চিরকুমার। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিশ এবং ভাগিনেয় রমেশ উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে এই কক্ষে উপস্থিত। ধনপতির অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাহার উকিল-বন্ধু, শিবদাস মিত্রও উপস্থিত রহিয়াছেন। শয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষারত নার্স তরলা রায়। ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হইল। ধনপতির তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা।)

হরিশ ॥ কাকাবাবুর আর জ্ঞান আছে ব'লে মনে হচ্ছেনা।

রমেশ ॥ কি বুঝছেন ডাঃ চৌধুরী ?

ডাক্তার ॥ আপনারা ধনপতিবাবুর কে হন ?

হরিশ ॥ আমি ওঁর একমাত্র ভাইপো—হরিশ বসু।

রমেশ ॥ আমিও ওঁর একমাত্র ভাগনে—স্নেহের রমেশ ঘোষ।

ডাক্তার ॥ ধনপতিবাবু চিরকুমার ছিলেন জানি। তবু ভালো, আপনারা আছেন। এবার প্রস্তুত হন।

শিবদাস ॥ তার মানে ডাঃ চৌধুরী, আর বুঝি সময় নেই ?

ডাক্তার ॥ আপনি কে ?

শিবদাস ॥ আমি ওঁর এ্যাটর্নিবন্ধু শিবদাস মিত্র। একটা উইল করবেন বলে আমায় খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন।

ডাক্তার ॥ Perhaps too late, আমার তো মনে হচ্ছে সে সময় আর নেই। তবু অপেক্ষা করুন, যদি জ্ঞান ফিরে আসে।

শিবদাস ॥ কিন্তু আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি ডাক্তার চৌধুরী?

ডাক্তার ॥ না। আমিও আছি। তবে আমাকে বসবার ঘরে গিয়ে এখনি ওঁর 'হেলথ্-বুলেটিন'টা লিখে সই করতে হবে। একপাল প্রেস-রিপোর্টার অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে। আর তাছাড়া, দেখেছেন বোধ হয়—বাড়ির সামনে কি বিশাল জনতা ওঁর খবরের জন্যে জড়ো হয়েছে।

হরিশ ॥ সে এক নুইসেন্স হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রমেশ ॥ পুলিশও ভীড় সরাতে পারছে না।

ডাক্তার ॥ এটা আপনাদের সৌভাগ্যের কথা। ধনপতি বসু শুধু লক্ষপতি নন, দেশের একটা মাথা। আমার দুর্ভাগ্য যে, প্রতীক্ষারত ঐ বিশাল জনতার জন্যে আমি কোনো ভালো খবর নিয়ে যেতে পারছি না।

[ডাক্তার বাহিরে চলিয়া গেলেন]

শিবদাস ॥ তাইতো! এর আগেও ধনপতিবাবু আমাকে দু'একবার বলেছিলেন, উইল করবেন। আমি তখন গা' করিনি। আজ বুঝছি অন্যায় হয়েছে।

হরিশ ॥ কাকাবাবু আমাকে এত ভালবাসতেন যে, যখন যা মনে হতো আমাকে বলতেন; উইলের কথা কিন্তু আমাকে কোনোদিন বলেননি।

রমেশ ॥ মামাবাবু কাউকে যা বলতেন না, আমাকে তা বলতেন। আমাকে কিছুদিন আগে একবার ডেকে বলেছিলেন, স্নেহের রমেশ আমার কাছে কি চা'স বাবা, তোকে আমি কি দিতে পারি বল!

শিবদাস ॥ আমাকে কিন্তু বলেছিলেন, 'আমার এতবড় বিষয়-সম্পত্তি বারোভূতে লুটে-পুটে না খায়—যাতে দেশের কাজে লাগে এমনি একটা উইলের কথা ভেবে দেখ হে শিবদাস।' কিন্তু দেখছি আমারই গড়িমসিতে

তরলা ॥ মনে হচ্ছে জ্ঞান ফিরে আসছে। (থার্মোমিটারটি বগলের তলা হইতে বাহির করিয়া দেখিয়া) কিন্তু জ্বর এখনো (হাতের চারিটি অঙ্গুলি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল একশ' চার)।

ধনপতি ॥ (বিকারের ঝোঁকে) আগুন—আগুন—দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আমার চারদিকে। (উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই, নার্স তাঁহাকে শোওয়াইতে চেষ্টা করিল) ছাড়ো—ছাড়ো আমাকে পালাতে দাও—

তরলা ॥ আপনারা কেউ ডাক্তার চৌধুরীকে খবর দিন।

শিবদাস ॥ ধনপতি! ধনপতি! এই যে ভাই আমি শিবদাস—চিনতে পারছো না? আমাকে তুমি ডেকে পাঠিয়েছিলে—উইল করতে—

[ধনপতি শিবদাসের কথা শুনিয়া তাঁহার দিকে বড় বড় চোখে তাকাইয়া রহিয়া খানিকটা শান্ত হইলেন।]

ধনপতি ॥ উইল! হ্যাঁ—আমি উইল করবো।

হরিশ॥ কাকাবাবু এই যে আমি আপনার শিবরাত্রির সলতে হরিশ। এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে তো ?

রমেশ॥ মামাবাবু, আমি আপনার স্নেহের রমেশ—আমায় চিনতে পারছেন তো ?

শিবদাস॥ আহা, তোমরা থামো। প্রত্যেকটা মিনিট, প্রত্যেকটা সেকেণ্ড এখন মূল্যবান। বরং গিয়ে ডাক্তার চৌধুরীকে ডেকে আনো।

[কিন্তু ঐ কথাতে কেহই নড়িল না। শিবদাস কাগজ কলম লইয়া উইল লিখিবার জন্য উদ্যত হইয়া]

বলো ভাই ধনপতি, বলো—কি উইল করবে বলো—দেশের কাজে তুমি অনেক টাকা দেবে বলেছিলে—কি দেবে বলো !

ধনপতি॥ ছাই—ছাই—(অর্থশূন্য দৃষ্টিতে সকলের দিকে একটিবার তাকাইয়া) আগুনে পুড়ে আমি ছাই হয়ে যাচ্ছি। ওঃ! ওঃ (ভয়ে দুহাতে চোখ ঢাকিয়া) উঃ! কি পাপ আমি করেছি—কত পাপ আমি করেছি—(শিহরিয়া উঠিয়া ভয়ে চোখ বুজিয়া রহিলেন।)

শিবদাস॥ ধনপতি! ধনপতি!

ধনপতি॥ কে! কে তুমি! শিবদাস! এসেছ ভাই ? আমি উইল করবো। লেখ ভাই, শিগগির লিখে দাও—আমি সই করবো।

শিবদাস॥ যাক। তুমি তবে সজ্ঞানেই রয়েছ ধনপতি। কি লিখবো বলো—

হরিশ॥ আপনি এ সব কি করছেন শিবদাসবাবু ? ওঁর এখন মানসিক বিশ্রাম দরকার। আপনি কি ওঁকে মেরে ফেলতে চান নাকি ? উইল-টুইল লেখা এখন হবে না।

রমেশ॥ না-না। মামাবাবুর যখন ইচ্ছে—(মামাবাবুকে) আমি—আপনার স্নেহের রমেশ। আপনি যদি উইল করে আপনার স্নেহের রমেশকে সব দিতে চান কার সাধ্য আপনাকে বাধা দেয় ?

শিবদাস॥ আঃ! এসব কি হচ্ছে ? জেনো তোমরা, গোটা দেশের লোক ওঁর মুখ চেয়ে রয়েছে—তুমি বল ভাই ধনপতি—দেশের মঙ্গলের জন্যে কাকে কি দেবে ?

ধনপতি॥ হ্যাঁ—বলছি—বলছি—এখন বলছি। এরপর আর আমি সময় পাব না। তুমি কলম ধর। ভেজাল সরষের তেলের ব্যবসা করে—জাল ওষুধের ব্যবসা করে আমি লাখ টাকা কামিয়েছি—

শিবদাস॥ তুমি ভুল বকছ ভাই ধনপতি।

ধনপতি॥ না, না, এই সব ব্যবসা চালিয়ে দেশের কত লোক যে আমি অকালে খুন করেছি, তার লেখা-জোখা নেই। ঐ—তারা সব আমার দিকে রুখে আসছে আমাকে পুড়িয়ে মারতে। চারদিকে আগুন জেলে দিয়েছে আমার—আর সময় আমি পাব না—আমার শেষ কথাটি উইলে লিখে নাও—আমার সব সম্পত্তি আমি দিচ্ছি আমার প্রাণের হরিদাসীকে—ঠিকানা

ঠিকানাটা—আঃ! সেটা এত গোপন রেখেছিলাম যে আমি নিজেই ভুলে গেছি—উঃ! কি আগুন—কি পাপ—ঐ হরিদাসীর স্বামী ঐ তার ছেলে—ওদের আমি সাবাড় করেছিলাম—এবার ওরা আমাকে—ও হো হো—

[ভয়ে ও আতঙ্কে মূর্চ্ছা। ডাক্তার চৌধুরীর প্রবেশ।]

ডাক্তার ॥ চেঁচাচ্ছিলেন কে? একি! (সঙ্গে সঙ্গে রোগীর নাড়ী দেখিয়া) হয়ে গেছে।

হরিশ, রমেশ ও শিবদাস ॥ (প্রায় এক সঙ্গে) বাঁচা গেছে।

যবনিকা

লোক সেবক : পূজা সংখ্যা : বঙ্গাব্দ ১৩৬৫

দুর্বোধ্য

একটি পার্কের জনবিরল কোণে একটি বেঞ্চে সূর্য ও সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা ॥ এতদিন পর হঠাৎ আবার আমাকে স্মরণ করেছো যে?

সূর্য ॥ সে তুমি যা-ই বলো, আমি ভাবিনি যে তুমি আসবে।

সন্ধ্যা ॥ তুমি এমনি ক'রে আমাকে আসতে বলায় সত্যিই আমি অবাক হয়েছি কিন্তু।

সূর্য ॥ আমার দুঃসাহস বলতে পারো। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিলো আমি ডাকলে, তুমি না এসে পারবে না সন্ধ্যা। বিশেষ এই পার্কে—আমাদের জীবনের অনেক স্মৃতিমাখা এই পার্কে।

সন্ধ্যা ॥ কি বলবে বলো! তোমার সঙ্গে আমাকে এখানে এভাবে দেখলে লোকে হাসবে। সেটা দুঃসহ।

সূর্য ॥ তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, একথা সত্য; কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের আইনে এমন কোন বিধান আছে কি যে ভূতপূর্ব স্বামী এবং ভূতপূর্ব স্ত্রী এদের পরস্পরের মুখ দেখা নিষেধ, এমনকি কথা বলাও নিষেধ?

সন্ধ্যা ॥ না, তা' নেই বটে; কিন্তু এমন একটা দৃশ্য দেখলে লোকে হাসতেও পারবে না—এবিধানও নেই। কি জন্যে আমাকে ডেকেছো বলো!

সূর্য ॥ নিউইয়র্ক থেকে চন্দ্রা তোমার কলিক পেনের একটা ওষুধ পাঠিয়েছে। ওষুধটা নাকি অব্যর্থ। লিখেছে, তার এক বান্ধবী কথায় কথায় তাকে বলেছিলো, এই ওষুধটায় তার কলিক পেন একেবারে সেরে

গেছে। তখন তার মনে পড়েছে তোমার কথা। বেচারি এখনো জানে না, তার বৌদি তার দাদাকে ছেড়ে চলে গেছে।

সন্ধ্যা ॥ জানে না, জানিয়ে দাও। সেই সঙ্গে ওষুধটাও ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।

সূর্য ॥ কলিক পেনটা তবে তোমার সেরে গেছে ?

সন্ধ্যা ॥ তোমার এ প্রশ্নের এখন আর কোনো মানে হয় না। আমি সেরে গেছি কি মরেছি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানো একটা হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না কি ?

সূর্য ॥ কেন ?

সন্ধ্যা। পরস্ত্রীর জন্যে এই দরদ তোমার নিজের স্ত্রী সইবেন না। এর চেয়ে আর একটু বাড়াবাড়ি হলে এ-স্ত্রীও তোমার যাবে।

সূর্য ॥ সব স্ত্রী-ই তোমার মত নয়।

সন্ধ্যা ॥ জানি না। নিজের কথাটাই জানি। আমাকে লুকিয়ে রমলাকে অত দরদ দেখিয়েছিলে, সেটা আমি সইতে পারিনি একথা সত্য। তাও যতদূর সহ্য করা সম্ভব, করেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে, আমার কলিক পেনের চেয়ে রমলার ব্লাড-প্রেসারটাই তোমার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ালো, তখনই তোমার ঐ ব্যভিচারটা আর সইতে পারলাম না। সেটা যে ব্যভিচার সেকথা শুধু আমি বলিনি, আদালতে রমলার স্বামীও হলফ করেই বলেছিলেন।

সূর্য ॥ রমেনটা মানুষ নাকি ? একটা ব্রুট। স্ত্রীর চিকিৎসা দূরে থাক, তাকে মার ধোর ক'রে তার গয়না ছিনিয়ে নিয়ে খেতো। পাশের ফ্ল্যাটে এই অঘটন রাতের পর রাত ঘটছিলো—সইতে পারিনি সেটা। আর তুমিও আমাকে তাই সইতে পারলে না। যাক্ গে সে কথা। কিন্তু একি, তুমি অমন করছো যে !

সন্ধ্যা ॥ (যন্ত্রণায় বিবর্ণ হইয়া) আমার সেই কলিক পেনটা—উঃ ! আঃ !

সূর্য ॥ (পকেট হইতে পিল জাতীয় একটা ওষুধের ফাইল বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি পিল লইয়া) হাঁ করো তো—হাঁ করো—হাঁ করো—(সন্ধ্যা হাঁ করিলে পিলটি তাহার মুখে ফেলিয়া দিয়া) চিবিয়ে খাও—হ্যাঁ হ্যাঁ, গিলে ফেলো।··ব্যথাটা একটু কমেছে কি ? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে একটু কমেছে। কমতেই হবে। চন্দ্রা লিখেছে ওষুধটা ম্যাজিকের মত কাজ করে। মনে হচ্ছে কথাটা মিথ্যে নয়।···ব্যথাটা গেছে, কেমন ?

সন্ধ্যা ॥ (শান্তভাবে) অনেক ধন্যবাদ। চলি।

সূর্য ॥ ওষুধের শিশিটি নিয়ে যাও !

সন্ধ্যা ॥ না, থাক।

সূর্য ॥ চন্দ্রা লিখেছে, রাতে ঘুমোবার আগে রোজ একটা পিল খেতে। তবে নাকি কলিক্ পেন আর হবেই না।

সন্ধ্যা ॥ তুমি যে আজ আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছো, আমার জন্যে ওষুধ এনেছো, রমলা তা জানে ?

সূর্য ॥ নিশ্চয়।

সন্ধ্যা ॥ হুঁ।

সূর্য ॥ কি ভাবছো?

সন্ধ্যা ॥ আমি চলি।

সূর্য ॥ ওষুধটা নাও—নিয়ে যাও।

সন্ধ্যা ॥ না।

সূর্য ॥ না। কেন সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা ॥ একদিন আমি ছিলাম তোমার—তুমি ছিলে আমার। কিন্তু আজ আর তা নয়। এখানে যে আমাকে দয়া করতে এসেছো সেটাও রমলার দয়া।

সূর্য ॥ তুমি বলছো কি সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা ॥ কেন যেন কেবলি মনে হচ্ছে চুপি চুপি এসে চোরের মত যদি ঐ অমৃতটা আমার হাতে তুলে দিতে, আমি নিতাম।

সূর্য ॥ সে কি?

সন্ধ্যা ॥ হ্যাঁ, তবেই মনে হতো তোমার জীবনে আমি এখনো বেঁচে আছি। না-না, সব শেষ। আমি চললাম।

সূর্য ॥ সন্ধ্যা, শোনো—

সন্ধ্যা ॥ বলো।...কেন তুমি আমাকে এমন করে ডাকছো? কেন ভুলে যাচ্ছো, আর আমি তোমার নই, তোমার নই—। তুমি তোমার স্ত্রীকে জানিয়ে আমার জন্যে ওষুধ নিয়ে এসেছো। আমি আমার স্বামীকে গিয়ে বলছি, সে ওষুধ আমি নিইনি—নিইনি। (সন্ধ্যা চলিয়া গেল)

সূর্য। এরা যে সব কী, আজো বুঝলাম না।

যবনিকা

মধুরাংশচ, শারদীয়া সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

কুকুর-বেড়াল

বিখ্যাত এ্যাডভোকেট গম্ভীরানন্দ মিত্রের চেম্বার। শ্রীযুক্ত মিত্র একটি ফাইল পাঠরত। চেম্বারের পরদা সরাইয়া একটি মহিলা দেখা দিলেন।

মহিলা। আসতে পারি?

[মিত্র আসিতে ইঙ্গিত করিলে অতি আধুনিক একটি তরুণী উদভ্রান্তভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন]

তরুণী ॥ আমি বড় বিপন্ন শ্রীযুক্ত মিত্র! স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করতে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। আমি জানি এ বিষয়ে আপনার চেয়ে বড় উকিল আর নেই বললে হয়, কিন্তু তাতেই হয়েছে বিপদ। আমার স্বামীকেও দেখলাম আপনার এই চেম্বারের দিকে আসছেন। কিন্তু আমি এসেছি আগে। আশা করি আপনি আমাকেই সাহায্য করবেন। আমি আপনাকে আপনার পুরো ফি একশ টাকাই দেব।

[চেম্বারের দরজায় স্বামীর কণ্ঠও শোনা গেল]

স্বামী ॥ আসতে পারি স্যার?

[শ্রীযুক্ত মিত্র এই অনুমতি যাহাতে না দেন তাহার জন্য স্ত্রী হাত নাড়িয়া ব্যাকুল মিনতি জানাইলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত মিত্র তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।]

আসবো স্যার।

[অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। মিত্র অঙ্গুলি নির্দেশ তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। স্বামীটি স্ত্রীর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া চেয়ারে বেশ গ্যাট হইয়া বসিলেন]

স্ত্রী ॥ (স্বামীকে) তুমি ভেবেছ কি? তুমি এখানেও আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে নাকি?

স্বামী ॥ আমি জানি, শ্রীযুক্ত মিত্র বিবাহবিচ্ছেদের সবচেয়ে বড় উকিল! তুমি যে ওঁর কাছে এসে আমার নামে কতকগুলো মিথ্যে কথা লাগিয়ে ওঁর মন গলিয়ে দেবে—আমার বিরুদ্ধে ওঁর মন বিষিয়ে দেবে—এ আমি হতে দেব না।

স্ত্রী ॥ (মিত্রকে) আমি আগে এসেছি। আমি আপনাকে পুরো ফী দেব! আশা করি আপনি আমার কথাই শুনবেন শ্রীযুক্ত মিত্র।

মিত্র ॥ (মৃদু হাস্য।)

স্বামী ॥ (মিত্রকে) আমিও আপনাকে আপনার পুরো ফী একশ টাকাই দেব, আমার কথাও আপনাকে শুনতে হবে স্যার।

মিত্র ॥ (এবারও মৃদু হাস্য।)

স্ত্রী ॥ লোকটি কেমন জুলুমবাজ, আশা করি আপনি এতেই বুঝে গেছেন শ্রীযুক্ত মিত্র। দরকার হ'লে লোকটি খুনও করতে পারে, এও আপনাকে বলে রাখছি স্যার।

স্বামী ॥ বিনা দরকারেই তুমি আমাকে প্রায় খুন করেছো। কি বলবো স্যার, একটা জলন্ত চিমটা দিয়ে আমাকে পুড়িয়েছে।

স্ত্রী ॥ তুমি একটা জলন্ত সিগারেট আমার হাতের ওপর ঠেসে ধরেছিলে! তাই না আমি নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ঐ জলন্ত চিমটা দিয়ে তোমাকে ঠেভিয়ে আত্মরক্ষা করেছি। নইলে কি কেউ সাধ করে স্বামীর গায়ে হাত তোলে!

স্বামী ॥ স্যার আপনিই বুঝে দেখুন, কেউ কি সাধ করে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে? আদরের স্ত্রীর গায়ে? যখন দেখলাম, না, আর উপায় নেই, তখনি না আমি—

স্ত্রী ॥ উপায় ছিল না—একথা ধর্মতঃ বলতে পারো তুমি? ঐ বাঘা কুকুরটা তোমার না পুষলে কি কিছুতেই চলতো না?

স্বামী ॥ আমি তোমাকে বিয়ের আগে বলেছি, বিয়ের পরেও বলেছি, দেখ, আমি সব সইতে পারি কিন্তু বিড়ালের 'ম্যাঁও ম্যাঁও' ডাক সইতে পারিনা। তবু কিনা তুমি সেই বেড়ালই পুষলে—গণ্ডায় গণ্ডায়?

স্ত্রী ॥ লোকে হাতি পোষে, বানর পোষে, আর আমি স্ত্রী বলে আমার কি এটুকুও স্বাধীনতা নেই যে আমি একটা বেড়াল পুষবো? বেড়াল পুযেছি, বেশ করেছি।

স্বামী ॥ ঐ বেড়াল তাড়াতে আমিও বাঘা কুকুর পুষেছি—বেশ করেছি।

স্ত্রী ॥ বেশ করেছো? বেশ, আমিও তাই তোমাকে চাবির রিং ছুঁড়ে মেরে কোনো অন্যায় করিনি

স্বামী ॥ আর তাই আমিও তোমার গায়ে এক বালতি গরম জল ঢেলে দিয়ে কোনো অন্যায় করিনি।

স্ত্রী ॥ (মিত্রকে) আপনি শুনছেন স্যার?

মিত্র ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইলেন হ্যাঁ)।

স্বামী ॥ আশা করি আপনিও আমার কথাগুলোও শুনছেন।

মিত্র ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইলেন হ্যাঁ)।

স্ত্রী ॥ এই লোকটির এই সব অত্যাচারে আমাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছে তিন মাস।

স্বামী ॥ হ্যাঁ। নিজের খরচে নয়, আমার খরচে। আর তোমারও ঐসব অত্যাচারে আমাকেও হাসপাতালে থাকতে হয়েছে পুরো তিনমাস। তার খরচ তুমি দাওনি। সে খরচও বইতে হয়েছে আমাকে।

স্ত্রী ॥ এই তিনটি মাস হাসপাতালে পড়ে থাকায় আমার যে কি নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে, তা তুমি জানো?

স্বামী ॥ তোমার আবার কি নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে? নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে আমার। হাসপাতাল থেকে বাড়ি গিয়ে দেখি আমার বাঘা নেই। তার বকলসটা শুধু পড়ে আছে। বেচারি আমার শোকে তিলে তিলে কাঠ হয়ে মারা গেছে।

স্ত্রী ॥ আর আমার? আমার ক্ষতি হয়নি? হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে দেখি আমার ধাড়িটা গেছে পালিয়ে, বাচ্চাগুলো সঙ্গে নিয়ে। (ক্রন্দন)

স্বামী ॥ আর আমার বাঘাটা? তার লাশটা পর্যন্ত আমি দেখতে পেলাম না। (ফুঁপাইয়া ক্রন্দন)

স্ত্রী ॥ (ধরা গলায়) এ কি! পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি ভেউ ভেউ করে কাঁদছো? স্যার কি মনে করছেন বল তো? না না, শোনো, তুমি কেঁদো না! আমি সব সইতে পারি—তোমার কান্না সইতে পারিনা। তুমি কাঁদলে আমার কান্না পায়। তুমি কেঁদোনা। বেশ, বেড়াল আর আমি পুষবো না, পুষবো না।

স্বামী ॥ তুমি বিড়াল না পুষলে, আমারো কুকুর পোষার কোনো মানে হয় না। বেড়াল যদি না থাকে কুকুরও থাকবে না।

স্ত্রী ॥ তবে তো ঝগড়া-ঝাঁটির আর কোনো কারণই থাকে না। মিত্রকে) আপনি কি বলেন স্যার ?

মিত্র ॥ (মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন।)

স্বামী ॥ তবে তো বিবাহবিচ্ছেদের কথাই উটছে না। কি বলেন স্যার ?

মিত্র ॥ (মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন।)

স্ত্রী ॥ তাহ'লে আমরা আর এখানে কেন ? কি বল গো ?

স্বামী ॥ তা তো বটেই। চলো—বাড়ি চলো।

স্ত্রী ॥ (স্বামীকে হাসিমুখে) তাহলে এখন থেকে আমাদের—কুকুর-হীন জীবন—

স্বামী ॥ এবং বেড়াল-হীন জীবন, কেমন তাইতো ?

স্ত্রী ॥ নিশ্চয়! নিশ্চয়! এখন শুধু তুমি আর আমি।

স্বামী ॥ হ্যাঁ, আমি আর তুমি। কুকুর-বেড়াল ভুলে গিয়ে—

স্ত্রী ॥ একমন একপ্রাণ হয়ে—(অনুরাগ ভরে স্বামীর হাত ধরিতে গেলেন।)

স্বামী ॥ আঃ! দেখছো না, স্যার—

স্ত্রী ॥ ওঃ! (সংযত হইয়া) আচ্ছা স্যার, তাহলে আমরা আসি।

মিত্র ॥ (সস্মিত মুখে সম্মতি জানাইলেন)।

স্বামী ॥ চললাম স্যার।

[মিত্র সস্মিত মুখে সম্মতি জানাইলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নমস্কার করিয়া যাইতেছেন। এমন সময় শ্রীযুক্ত মিত্র টেবিলে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া হুংকার দিয়া হাত পাতিলেন। স্বামী-স্ত্রী চমকাইয়া উঠিলেন]

স্ত্রী ॥ ও! তাইতো! ফি! ১০০৲ টাকা! (পার্স খুলিয়া টেবিলের উপর ১০০৲ টাকা রাখিলেন)

স্বামী ॥ বটেই তো! (ম্যানি ব্যাগ হইতে ফি'র টাকা শ্রীযুক্ত মিত্রের সামনে রাখিলেন)।

উভয়ে ॥ [স্বামী ও স্ত্রীর মুখ বাঙলা পাঁচ-এর আকার ধারণ করিল] আচ্ছা চলি !

মিত্র ॥ [নোটগুলি গুণিতে লাগিলেন]

যবনিকা

নতুন খবর, শারদীয়া সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

চিত্রাঙ্গদা

ললিতা ॥ কতকাল পর কালিম্পং এলি। তুই আমাদের একেবারে ভুলেই গিয়েছিলি মিত্রা!

মিত্রা ॥ যদি ভুলেই যাবো, তবে এসেই তোকে ডেকে আনবো কেন ললিতা!

ললিতা ॥ অবাক হয়েছি তাতে। সত্যি এতটা আশা করিনি। তুই এখন জাঁদরেল একটা মিলিটারী অফিসারের বৌ। কত বদলে গেছিস্ তুই।

মিত্রা ॥ কি আবার বদলালাম?

ললিতা ॥ বদলাসনি? তোকে আগে যারা জানতো না, তাদের চোখে হয়তো ধরা পড়বে না সেটা। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখছি আমাদের সে মিত্রা আর নেই।

মিত্রা ॥ বদলাবার জন্যেই তো মানুষ! জীবনে কত ঢেউ আসছে। ঠিক থাকবো কি করে ললিতা? তুই আমার সাজ-সজ্জা দেখে হয়তো চমকে উঠেছিস।

ললিতা ॥ হ্যাঁ। তা চমকে গেছি। তুই না পরতিস খদ্দরের শাড়ী? একটা পান খেতেও কোনদিন দেখিনি তোকে। আজ দেখছি লিপ্স্টিক! আর এ পোশাক তোর বাবার সামনে বেরিয়েছিস নাকি?

মিত্রা ॥ কি করবো বল্! স্বামী যদি এই সবই চায়, স্ত্রীর উপায় কি? বিয়ে করিসনি বলেই স্বামী কি 'চিজ' বুঝিসনি আজও।

ললিতা ॥ আমি তোর বাবার কথা ভাবছি। একমাত্র সন্তান তোকে যে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছিলেন—তার লক্ষণ কিন্তু এবার তোর মাঝে দেখছি না—অন্ততঃ বেশভূষায় আর প্রসাধনে। তিনি কিছু বলেন নি?

মিত্রা ॥ ক্ষমা বাবার ভূষণ। আর তা ছাড়া, তিনি এখানে নেই। কালিম্পং থেকে গাংটকের পথে কোন্ এক খুব বড় তিব্বতী সাধু আশ্রম করেছেন, আজ মাস দুই বাবা সেই আশ্রমে গিয়ে পড়ে আছেন।

ললিতা ॥ তা, ভালোই হয়েছে।

মিত্রা ॥ হ্যাঁ, তা ভালোই হয়েছে। তুই ভাবছিস, বাবা আজ আমাকে দেখলে আঁতকে উঠতেন! কিন্তু আমার স্বামীটিকে দেখলে হয়তো তাঁর হার্ট ফেলই হ'তো।

ললিতা ॥ তিনিও এসেছেন নাকি? ক্যাপ্টেন সেন এখানে?

মিত্রা ॥ না, না, তোর ভয় নেই। এখনো তিনি আসেননি। তবে হ্যাঁ, আজ তাঁর আসবার কথা। এখনো কেন এসে পৌছুলেন না তাই ভাবছি। তিব্বতের লাসা কি এখান থেকে এতদূর!

ললিতা॥ ক্যাপ্টেন সেন তিব্বতে গেছেন ?

মিত্রা॥ হ্যাঁ, দিন পনেরো আগে কলিকাতা থেকে উড়ে গেছেন সেখানে। মিলিটারী ডিউটি। আজ তাঁর কালিম্পং আসবার কথা জীপে। আমি বলে দিয়েছিলাম—ফেরবার সময় কালিম্পংয়ে শ্বশুরবাড়িটা দেখে এসো। দেখেননি কোনোদিন—না শ্বশুর, না শ্বশুরবাড়ি।

ললিতা॥ তোর বরকে দেখতে খুব ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু তোর কথাতে ভয় পাচ্ছি যে। খুব ড্রিঙ্ক করেন বুঝি ?

মিত্রা॥ লোকটি ভারি আশ্চর্য। যতক্ষণ মনের আনন্দে আছে, এক ফোঁটাও মদ খাবে না সে। গ্লাসও ছোঁবে না। কিন্তু মনে যদি দুঃখ এলো তবে আর রক্ষে নেই।

ললিতা॥ তাই নাকি ? খুব ইণ্টারেস্টিং তো। তবে ভরসা এই, তাঁর দুঃখের কোনো কারণ হয়তো হয়ই না—তোর জন্যে।

মিত্রা॥ না, না, ললিতা। এ কথা বলা চলে না। জীবনটা কোনো ধরা-বাঁধা ছক নয়। একজন যাতে আনন্দ পায়, আর একজন পায় তাতে দুঃখ। তাছাড়া মানুষের রুচি হরদম বদলাচ্ছে। আজ যেটা ভালো লাগে কাল সেটা লাগে না।

ললিতা॥ আধুনিক সমাজ-জীবনে আমার মনে হয় এইটেই সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। আজ তোকে মনের কথা খুলে বলেছি মিত্রা। এই ভয়েই আমি বিয়ে করিনি এতদিন।

মিত্রা॥ তুই বেঁচে গেছিস ললিতা—তুই বেঁচে গেছিস। জীপের শব্দ শুনছিস কি ?

ললিতা॥ হ্যাঁ। নিশ্চয় ক্যাপ্টেন সেন।

মিত্রা॥ হয়তো।

ললিতা॥ আমি ভাই পালাই।

মিত্রা॥ কেন, পালাবি কেন ?

ললিতা॥ না না ভাই, আনন্দে আছেন কি দুঃখে আছেন, কে জানে ? কাল সকালে যদি আনন্দে থাকেন তবে খবর দিস। আসবো।

মিত্রা॥ এ কি ! পালিয়ে গেলি যে !

ক্যাপ্টেন সেন ॥ অল্পের জন্যে কলিশনটা হয়নি।...তুমিই তো চিত্রা ?

মিত্রা॥ আসুন—বসুন।

সেন॥ আশ্চর্য ! মিত্রা বলেছিলো বটে যে দেখলে ভুল হবে। না বলে দিলে সত্যিই ভুল হতো চিত্রা।

মিত্রা॥ আমরা যমজ বোন বলে এ ভুল অনেকেই করে। হ্যাঁ, জানেন ক্যাপ্টেন সেন, ঐ আমাদের বিপদ। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো ?

সেন॥ সে কষ্ট আমার সার্থক। এখন ভাবছি তোমার দিদি কেন তোমাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন এতদিন। হ্যাঁ, তা বলবো, নইলে কেন তোমাকে নেননি কলকাতায় আমার সামনে !

মিত্রা ॥ না, তা বললবেন না। তা যদি হতো তবে এবারও আপনাকে আসতে বলতেন না এখানে। দিদি জানেন, আপনার জন্যে তাঁর কোন ভয়ের কারণ নেই। আমার জন্যেও না। আরাম করে বসুন। (কলিংবেল টিপিতেই বাহাদুর ছুটিয়া আসিল) চা। আপনি ক'টায় ডিনার খান ক্যাপ্টেন সেন ?

সেন ॥ তোমার দিদির হুকুম 'Dinner at eight'! কিন্তু আজ কোনো নিয়মে বাঁধা পড়তে মন চাইছে না এখানে।

মিত্রা ॥ ডিনার রেডি করে গরম রেখো বাহাদুর। এখন চা।

[বাহাদুরের প্রস্থান]

দিদি লিখেছেন, 'দেখিস কোনো অযত্ন না হয়।' স্নান করবেন কি ? গরম জল রয়েছে।

সেন ॥ না, এই ঠাণ্ডায় স্নান না। ...তুমি মিত্রাকে দিদি বলো কেন চিত্রা ?

মিত্রা ॥ দিদি আমার চেয়ে এক ঘণ্টা আগে পৃথিবীর আলো দেখেছিলো ক্যাপ্টেন সেন! আর তাই হয়তো আমার চেয়ে ওর রূপের ছটাটা বেশি!

সেন ॥ Absurd! তুমি ওকে আজকাল দেখনি। আলোটা ফিকে হয়ে গেছে ওর! ও যেন অস্ত যাচ্ছে। তোমাকে দেখছি মূর্তিমতী উষা।

মিত্রা ॥ সন্ধ্যায় দেখছেন উষা? আপনি কবি না কি ক্যাপ্টেন সেন?

সেন ॥ এমনি একটি শ্যালিকা পেলে কে না কবি হয় চিত্রা? ভালো কথা, শ্বশুর মশাইকে দেখছি না তো? শুনেছি তিনি খুব বুড়ো।

মিত্রা। তিনি আজ কিছুদিন থেকে এখানে নেই। গ্যাংটকের পথে এক সাধুর আশ্রমে বাস করছেন।

সেন ॥ That's good। আশ্রমে থাকা ভালো। সরে থাকা ভালো। বাড়িতে আর কে আছে চিত্রা?

মিত্রা ॥ বাড়িতে আমি একা।

সেন ॥ That's awfully good! একা থাকায় যে কি আনন্দ কোনো ঝামেলা নেই। তুমি একা আছে চিত্রা? চমৎকার।

মিত্রা ॥ না না, একা নেই।

সেন ॥ ও, ঐ বাহাদুর রয়েছে। ওকেও মানুষ বলে ধরো নাকি?

মিত্রা ॥ না না, বাহাদুর ছাড়াও লোক রয়েছে এ বাড়িতে।

সেন ॥ কে?

মিত্রা ॥ আপনি ॥

সেন ॥ (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) আমি? আ . আমি তো তোমার আপনার লোক। নই কি?

মিত্রা ॥ আপনি দিদির লোক।

সেন। আমার গায়ে কিন্তু সেটা লেখা নেই।

মিত্রা ॥ কিন্তু মনে তো লেখা রয়েছে।

সেন ॥ সেটাও আর খুঁজে পাই না। বোধ হয় মুছে গেছে।

মিত্রা ॥ কিন্তু মুছেই বা যাবে কেন? জীবনের ঐ দলিলটা যেদিন রেজিস্ট্রী করেছিলেন, সেদিন, ওটা কোনোদিন মুছে যাবে এ কথা ছিলো না কিন্তু।

সেন ॥ তবে তোমাকে বলি চিত্রা। আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল তোমার ঐ দিদি। তাকে দেখেই আমি ভুলেছিলাম। ভেবেছিলাম, এই অ-সুরের জীবনে পেলাম আমি সুরের বীণা। বাজাতে গিয়ে দেখি বাজে না, বাজে না।

মিত্রা ॥ যন্ত্র যদি না বাজে সেটা যন্ত্রীরই দোষ। কারণ যন্ত্রটা সে দেখেই নিয়েছিলো হাতে। না না, নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ দেবেন না।

সেন ॥ তোমার সাথে কথায় পারবো বলে মনে হচ্ছে না চিত্রা। তাই এক কথাতেই বলা ভালো, তোমার দিদিটি মানুষ নয়। একটি স্ট্যাচু। তুমি তাকে ভেনাস বলো, আপত্তি করবো না আমি। শুধু বলবো, ভেনাসের স্ট্যাচু। ওতে প্রাণ নেই। যে প্রাণের স্পন্দন জলজ্বল করছে তোমার মধ্যে। আমি চাই জীবনের উদ্দামতা। কিন্তু ও হচ্ছে মৃত্যুর প্রশান্তি।

মিত্রা ॥ দিদি আমাকে লিখেছিল, আপনি একটা ঝড়। আপনাকে শান্ত করবার শক্তি পায় না সে। আর যা লিখেছিল তা বলতে আমি শিউরে উঠছি। (হাসিয়া) বলবো?

সেন ॥ তোমার ঐ হাসিটা খুব লোভনীয় মনে হচ্ছে। নিশ্চয় বলবে।

মিত্রা ॥ কিন্তু বলতে আমার ভয় হচ্ছে।

সেন ॥ কিন্তু তোমার চোখে দেখছি কৌতুক। বলো আর কি লিখেছে?

মিত্রা ॥ আঃ! হাতটা ছাড়ুন।

সেন ॥ না বললে ছাড়বো না।

মিত্রা ॥ লিখেছিলো, বিধাতা ওঁকে পাঠিয়েছিলেন তোর জন্য। আমার কাছে এসেছে ভুলে।

সেন ॥ (আবেগে) চিত্রা! তোমাকে আজ দেখা মাত্র এই একটি কথাই আমার বার বার মনে হচ্ছে চিত্রা!

মিত্রা ॥ কিন্তু দিদির চিঠিতে জেনেছি, আপনাকে জয় করবার আশা এখনো সে ছাড়েনি। আপনার জীবনের ঝড় যখন থেমে যাবে তখনই সে আপনাকে পাবে, এই আশায় সে বসে আছে!

সেন ॥ তবে তাকে বৈধব্যের জন্য অপেক্ষা করতে বলো চিত্রা। আর তুমি এসো আমার জীবনে। আমার জীবনের জীপে উঠে পড়ো চিত্রা।

মিত্রা ॥ কলঙ্কের ভয় রাখেন না আপনি?

সেন ॥ কলঙ্ক আছে বলেই না ঐ চাঁদ এত সুন্দর। সেই যৌবনই যৌবন যা কলঙ্কের ভয় রাখে না---যা বেপরোয়া।

মিত্রা ॥ মানি। কিন্তু বেপরোয়া জীবনে আমাদের দুজনের বাঁধন যদি

খসে যায়? যদি আমি ছুটে চলে যাই আর কোনোখানে? ভালো যদি লাগে আমার অন্য কোনো জীবন? সইতে পারবেন আপনি সেটা?

সেন ॥ হুঁ, বুঝেছি। তোমার দিদি বলেন একনিষ্ঠ প্রেমের কথা। কিন্তু চিত্রা, জীবনটা অনেক বড়ো। মানুষের মন, বড়ো তার চেয়েও। কোনো বন্ধনে বাধা পড়া মানেই জীবনটাকে ছোট করা। মনটাকে ছোট করা। তাই নয় কি চিত্রা?

মিত্রা ॥ হুঁ।

সেন ॥ চলো, আমারা বেরিয়ে পড়ি।

বাহাদুর ॥ চা।

সেন ॥ থাক্ চা। বাইরে উঠেছে জ্যোৎস্না। ঐ জানালা দিয়ে দেখ কাঞ্চনজঙ্ঘা। চলো বেরিয়ে পড়ি। তুমি ওভারকোটটা নাও। কী ভাবছো?

মিত্রা ॥ ভাবছি অনেক কিছু। ভাবছি দিদি আপনাকে পেলো না—পেলাম কিনা আমি। মনে পড়ছে আজ চিত্রাঙ্গদার কথা।

সেন ॥ চিত্রাঙ্গদা? সে আবার কে?

মিত্রা ॥ পুরাণের গল্প। সে ছিলো রাজকন্যা। সবই ছিল তার, কিন্তু ছিলো না তার রূপ—যা দিয়ে অর্জুনের মতো বীরকে জয় করতে পারে।

সেন ॥ চিত্রাঙ্গদা নাটকটা নিউ এম্পায়ারে দেখেছি। প্রেমের ডালি নিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। কিন্তু অর্জুন দিয়েছিলো তাড়িয়ে। দেবে না? অর্জুনও ছিলো মিলিটারী। তাকে জয় করতে হলে চাই রূপের উদ্দামতা। যা তোমার আছে।

মিত্রা ॥ পরে কিন্তু কঠোর তপস্যা করে, শিবের বরে, বিশ্বজয়ী অর্জুনকে জয় করবার রূপই পেয়েছিলো চিত্রাঙ্গদা।

সেন ॥ হ্যাঁ, আর তখনই অর্জুন তাকে বুকে তুলে নিয়েছিলো চিত্রা।

মিত্রা ॥ হ্যাঁ, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা তখন ভাবলো, যাকে অর্জুন বুকে নিলো সে তো আমি নই।

সেন ॥ কিন্তু নাটকটা বিশ টাকার টিকিট কিনে ফার্স্ট রো থেকে আমি পুরোপুরিই দেখেছি। শেষটায় অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার বিয়েই হয়েছিলো! একদিন আমাদেরও হবে। আমাদেরও হবে। আমি জীপটা বের করছি। তুমি এসো।

মিত্রা ॥ বাহাদুর?

বাহাদুর ॥ কী দিদিমণি?

মিত্রা ॥ দরজাটা বন্ধ করে দে।

বাহাদুর ॥ কেন সাহেব আর আসবেন না?

মিত্রা ॥ না।

* * * *

সেন ॥ এ কি, দরজা বন্ধ কেন? চিত্রা, চিত্রা, চিত্রা! দরজা বন্ধ কেন, দরজা খোল।

মিত্রা ॥ না। তুমি যাকে চাইছ সে আমি নই। আমি ছলনা। এ জয় আমার জয় নয়, পরাজয়। তুমি চলে যাও। তুমি চলে যাও।

চিত্রাঙ্গদা, প্রথমবর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

অ-মৃত

মেয়েটি ॥ এর পর আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।

ছেলেটি ॥ আমারও না।

মেয়েটি ॥ শুনি মরবার সময় শেষ নিঃশ্বাসে মানুষ যে কামনা করে পরজন্মে না কি তা পূর্ণ হয়। বিশ্বাস হয় তোমার?

ছেলেটি ॥ ওই একটি বিশ্বাসই আমার এখন আছে। আর সব গেছে।

মেয়েটি ॥ কী দোষ করেছি আমরা? দু'জন দু'জনকে ভালোবেসেছি, বিয়ে করতে চাইছি। সংসারের সমাজের এই তো নিয়ম।

ছেলেটি ॥ ব্যতিক্রম হচ্ছে শুধু আমাদের বেলায়। বাবা এত অবুঝ হবেন, এ আমি কখনো ভাবিনি ছায়া।

মেয়েটি ॥ আমার বাবাও যে এতো অবুঝ হবেন, এও তো আমি ভাবিনি আলো।

ছেলেটি ॥ বিয়েটা আমাদের হতো কিন্তু বিধাতার কী বিধান দেখো। পাশাপাশি বাড়িতে বাস করি। এতকাল আমাদের দুটি পরিবারে এত মিল-মিশ। তবু হঠাৎ এমন একটা লড়াই বেধে গেলো।

মেয়েটি ॥ তোমার বাবার নাকি ভেজাল ওষুধের ব্যবসা।

ছেলেটি ॥ বাবা বলেন, না। তিনি বলেন, এটা তোমার বাবার মিথ্যে রটনা। মিথ্যে একটা গোলযোগ সৃষ্টি করে পুলিশ বিভাগে তাঁর প্রমোশন নেবার চেষ্টা।

মেয়েটি ॥ বাবা আগে বেশ ছিলেন। পুলিসের এই দুর্নীতি দমন বিভাগে বদলী হবার পর থেকেই বাবার এখন সবাইকে সন্দেহ। আগে তো কতবার তোমাদের বাড়ি এসেছি, দু'জনে পালিয়ে গিয়ে কত সিনেমা থিয়েটার দেখেছি, বাবা কখনো দেখেও দেখেন নি। কিন্তু এখন তাঁর কড়া চোখ আমার উপর।

ছেলেটি ॥ আমার উপরেও। বাবার উপরে তো আছেই! বাবা বলেন, ও নগেনটা আমার শত্রু।

মেয়েটি ॥ আমার বাবা বলেন, মহেশটা সমাজের শত্রু।

ছেলেটি ॥ এ হলো গিয়ে রাজায় রাজায় লড়াই—আমরা দু'টি উলুখড়, মরছি আমরা।

মেয়েটি ॥ চুপ! কারা যেন এ দিকে আসছে। তোমার এ ঘরে আসবে না তো?

ছেলেটি ॥ দরজায় খিল আঁটা আছে। জানালাটাও বন্ধ করে দিচ্ছি।

[আস্তে আস্তে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল—উভয়ে উৎকর্ণ হইয়া বাহিরের কথা শুনিতে লাগিল।]

বাহিরে ছেলেটির বাবা ॥ না-না গিন্নি। নগেনকে আজ আমি মুখের উপর স্পষ্ট বলে দিয়েছি, ফের যদি সে আমার বাড়িতে আসে, তাকে গলা ধাক্কা দিকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবো। আর তোমাকেও বলে রাখছি, তার সেই ধিঙ্গি মেয়েটা যদি আবার এ বাড়িতে আসে, তাকে ধরে তার মাথা ন্যাড়া করে মাথায় ঘোল ঢেলে দেবো। আমার সে হতভাগাটা কোথায়? তাকেও আমিও আজ শেষ বার বলে দেবো সে যদি আবার ওই মেয়েটাকে বিয়ে কবতে চায়, তাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করবো। কোথায় গেলো হতভাগা?

বাহিরে ছেলেটির মা ॥ ঘরেই আছে।

বাহিরে ছেলেটির বাবা ॥ ঘরের দরজা বন্ধ কেন? খোল হতভাগা খোল।

বাহিরে ছেলেটির মা ॥ না না তুমি মারধোর কোরোনা।

বাহিরে ছেলেটির বাবা ॥ খবরদার গিন্নী! তুমি এতে এসো না। যা করবার আমিই করছি।

মেয়েটি ॥ না—না এরপর আর বাঁচা চলে না আলো।

ছেলেটি ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ ছায়া।

মেয়েটি ॥ তোমার সেই 'পটাসিয়াম সায়ানাইড' কোথায় আলো? বের করো। বের করো।

বাহিরে ছেলেটির বাবা ॥ একী! ঘরের ভিতর একটা মেয়ের গলা শুনছি। তবে সেই হারামজাদী।

বাহিরে ছেলেটির মা ॥ ওগো এবারটি মাপ কবো। এবারটি মাপ করো।

বাহিরে ছেলেটির বাবা ॥ খবরদার গিন্নী! তুমি এতে এসো না। খোল, খোল দরজা, নইলে দরজা আমি ভেঙে ফেলবো।

[দরজায় ক্রমাগত করাঘাত।]

মেয়েটি ॥ এই তোমার সেই পটাসিয়াম সায়নাইড?

ছেলেটি ॥ হ্যাঁ ছায়া। মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনে চলে যাবো জীবনের পরপারে।

মেয়েটি ॥ এসো আমার পাশে এসে বসো। দরজা ভাঙবার আগেই যেন—

ছেলেটি ॥ বিধাতা, পরজন্মে যেন আমাদের বিয়ে হয় নিষ্কণ্টকে।

মেয়েটি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, মরবার সময় শেষ নিঃশ্বাসে এই কামনা নিয়েই আমরা মরছি। পূর্ণ হয় যেন আমাদের কামনা পরজন্মে।

[ছেলেটি এবং মেয়েটি পরস্পরের বাঁ হাতে উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া ডান হাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড মুখে দিলো। দরজায় প্রবল করাঘাত।]

মেয়েটি ॥ আলো, আমার আলো।

ছেলেটি ॥ ছায়া, আমার ছায়া।

মেয়েটি ॥ আমরা কী এখনো বেঁচে আছি?

ছেলেটি ॥ বোধ হয় না।

[দরজা ভাঙিয়া গিয়াছে। ছেলের বাপ এবং মা এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।]

ছেলেটির বাবা ॥ এ কি!

ছেলেটির মা ॥ এ কি, ওদের কি হয়েছে।

ছেলেটি ॥ আমরা বিষ খেয়েছি। পটাসিয়াম সায়ানাইড।

ছেলেটির বাবা ॥ পটাসিয়াম সায়ানাইড! আরে হতভাগা পেলি কোথায়?

ছেলেটি ॥ তোমার কারখানায়।

ছেলেটির মা ॥ সর্বনাশ।

ছেলেটির বাবা ॥ আঃ থামো গিন্নি। পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েছে বলে সর্বনাশ নয়। ওটা যে ভেজাল, কথাটা নগেন জানলে সর্বনাশ। ওঠো বাবা ওঠো, ওঠো ওঠো মা ওঠো। একটা গাড়ি নিয়ে সোজা চলে যাও দু'জনে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে। কাজটা সেরে এসো। শুধু একটা মিনতি মা, নগেনটা যেন না জানে আমার কারখানার পটাসিয়াম সায়ানাইডও ভেজাল।

মেয়েটি ॥ আমরা তবে মরিনি?

ছেলেটির বাবা ॥ না না মা মরনি। কিন্তু আমাকে তোমরা মেরোনা মনে রেখো মা, তুমিও এখন আমাদের 'পার্টনার'।

মধুরাংশচ, শারদীয়া সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৬৬

গোপালের মা

[শহরতলীর একটি বস্তিতে নন্দলালের ঘর। বেপরোয়া লোক বলিয়া এ অঞ্চলে তাহাকে সকলে সমীহ করে। চুরি অথবা চোরাই মালের কারবার তাহার ব্যাবসা। তাহার সংসার বলিতে একমাত্র যশোদা নাম্নী একটি রমণী। রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। নন্দলাল তখনো ঘরে ফিরে নাই। যশোদা একটি রূপার নাড়ু-গোপালের মূর্তি হাতে লইয়া তাহাকে আদর করিতেছে ও আপন মনে গাহিতেছে।]

যশোদা ॥ "গোপাল নাকি যাবে দূর বনে।
তবে আমি না জীব পরানে ॥
গোপাল যাবে বাথানে,—কী শুনিলাম শ্রবণে
যাদু মোর নয়নের তারা।
কোরে থাকিতে কতো চমকি' চমকি' উঠি,
নয়ন-নিমিখে হই হারা ॥"

[দরজায় করাঘাত]

যশোদা ॥ কে ?

পুরুষকণ্ঠ ॥ [বাহির হইতে] খুলে দে।

[যশোদা দরজা খুলিয়া দিল। নন্দলাল তাহার দৈনিক কাজ কর্ম অন্তে ঘরে প্রবেশ করিল এবং কথা বলিতে বলিতে জামা ঝুলি ইত্যাদি খুলিয়া রাখিল।]

নন্দলাল ॥ বাইরের কোনো বাজে লোক আমার খোঁজে এসেছিলো ?

যশোদা ॥ না তো !

নন্দ ॥ খাবার টাবার কিছু করেছিস ? না তোর গোপাল নিয়েই মেতে ছিলি সারাদিন ?

যশোদা ॥ ছেলে নিয়ে তো ঘর করনি কোনদিন ; করলে একথা মুখ দিয়ে বেরোতো না তোমার। বাড়ীর বউ ছেলে নিয়েও মাতে আবার ঘরের কাজও করে। ওমা, তা না হ'লে চলে নাকি ? এসো খেতে বসো।

নন্দ ॥ না রে, আজ আর কিছু খাবোনা। বাইরের রেস্তোরাঁতে খুব গিলে এসেছি। তুই খেয়ে নে যশোদা।

যশোদা ॥ আমাকে না খাইয়ে ছেড়েছে নাকি আমার এই গোপাল ?

নন্দ ॥ মানে ?

যশোদা ॥ আজ দুধ কিনে ক্ষীর, সর, ননী তৈরী করেছিলাম ঘরে। আমার গোপাল সে ভোগ কিছুতেই খাবেনা আমি না খেলে।

নন্দ ॥ তুই কী বলছিস যশোদা, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

যশোদা ॥ আমি জানি, তুমি একথা বলবে। কিন্তু কি করে তোমাকে বোঝাবো আমার কথা মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়।

নন্দ ॥ শোন যশোদা, আজ তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরী কাজের কথা আছে। ঠাণ্ডা মাথায় কথাগুলো শোন। মল্লিকদের বাড়ির মন্দির থেকে ওই বিগ্রহটা সরিয়েছি মঙ্গলে মঙ্গলে আট, বুধে নয়, আজ বেস্পতি, পুরো দশ দিন। এই ঠাকুর চুরিতে গোটা পাড়ায় কী সোরগোল পড়েছে জানিস তো? পুলিশ হন্যে হয়ে চোর খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাল বুধবার গেছে, কালতক আমাকে কেউ সন্দেহ করেনি। গোপালের হার গলিয়ে যা পেয়েছি তা দিয়ে বাজার দেনা শোধ করেছি। এখনো হাতে বেশ কিছু আছে।

যশোদা ॥ ওগো যা আছে তা দিয়ে আমার গোপালের জন্য আর একটি হার গড়িয়ে দাওনা।

নন্দ ॥ নিকুচি করেছে তোর হারের। বাজার দেনা শোধ করতেই বিপদ এসে গেছে। আজ রেস্তোরাঁতে বসে খাচ্ছি, এমন সময় এ পাড়ার সেই টিকটিকি পুলিশটা আমার পাশে বসে চা খেতে খেতে আমায় শুধোয়,—"কি হে নন্দলাল, আজ কাল দেখছি বেশ কিছু কামাচ্ছো। দেনা টেনা সব শোধ করেছো"—এই বলে কী রকম বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকালো। চা টা আর আমি শেষ করতে পারলাম না যশোদা। আমতা আমতা করে কী যে জবাব দিলাম মনেও পড়ছে না ছাই। আমার মনে হচ্ছে যশোদা, লোকটা তক্কে তক্কে আছে। হয়তো আজ রাতেই দল বল নিয়ে আমার ঘর খানাতল্লাসী করবে!

যশোদা ॥ এ্যঁা! খানাতল্লাসী করবে? আমার গোপাল কেড়ে নেবে?

নন্দ ॥ তা নয়তো কি? তোর ওই গোপালের জন্য এখন দু'জনের হাতেই দড়ি পড়বে। তখনই বললাম ওরে ওটাকে পুকুরে ফেলে দি'—দিলি নাতো? এখন?

যশোদা ॥ কেন দেবো? দশ বছর তোর সঙ্গে ঘর করছি। কোনো গোপালইতো আমার কোলে আসেনি। কতো তাবিজকবচ, কতো পূজামানত, ঠাকুর দেবতার পায়ে কতো মাথাখোঁড়া, কিছুতে কিছু হ'ল না। আর সে যে হয়নি, আমার কোলে এই গোপাল আসবেন বলেই হয়নি। একে আমি ছেড়ে দেবো? ছেড়ে দিতে পারি?

নন্দ ॥ তো ধরেই রাখো। পুলিশ এসে আমাদের ধরুক।

যশোদা ॥ তার চেয়ে চলো না কেন আমরা পালাই? এই রাতে। এখনি।

[সঙ্গে সঙ্গে শয্যায় শয়ান গোপালকে বুকে তুলিয়া লইল]

নন্দ ॥ এ না হলে লোকে বলে স্ত্রী বুদ্ধি? বাইরে গিয়ে দেখে আয় আমরা হয়তো এতক্ষণ নজরবন্দী। পুলিশ হয়তো এ পাড়াটা সদলবলে ঘিরে ফেলেছে। না—না, এখনো হয়তো বাঁচার পথ আছে, মূর্তিটা আমার হাতে দে।

যশোদা ॥ কী করবে শুনি ?

নন্দ ॥ ওটাকে আমি ভাঙবো।

যশোদা ॥ [আর্তনাদে] এঁ্যা ?

নন্দ ॥ এখনো যা সময় আছে, পারবো আমি এটাকে চুরমার করে ফেলতে।

যশোদা ॥ না—না, ওগো না।

[সভয়ে পিছাইয়া গেল]

নন্দ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ চুরমার করে ফেলতে পারলেই চুরির কোনো প্রমাণ থাকবে না। আমরা বেঁচে যাবো। তুই দে, ওটা আমার হাতে দে।

[যশোদার দিকে রুদ্র মূর্তিতে অগ্রসর হইল]

যশোদা ॥ না না, আমার গোপাল ঘুমাচ্ছে। তুমি ও সব কথা বলো না! ও জেগে উঠবে।

নন্দ ॥ কী বিপদ! নিজের বিপদ বুঝছিস না? ওই পুতুলটাই আজ তোর বড়ো হল ?

যশোদা ॥ পুতুল কাকে বলছো তুমি ? আমার গোপালকে পুতুল বলছো ?

[নন্দলাল বাহিরে লোকজনের কথাবার্তা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল]

নন্দ ॥ বাইরে তাদের গলা পাচ্ছি। গায়ের আওয়াজ শুনছি। তোর উনুন এখনো জ্বলছে দেখছি, ওটাকে ওই উনুনে—

[রুদ্রমূর্তিতে যশোদার নিকট হইতে বিগ্রহটি ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা। যশোদা চীৎকার করিয়া উঠিল।]

যশোদা ॥ কে কোথায় আছো ? খুন ! খুন ! আমার গোপালকে খুন করছে ! বাঁচাও, কে কোথায় আছো— শিগ্‌গীর এসো, আমার গোপালকে বাঁচাও।

[দরজা ভাঙিয়া পুলিশসহ একজন অফিসারের প্রবেশ। নন্দলাল শান্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যশোদা তাহার গোপালকে লইয়া অফিসারের সামনে ছুটিয়া আসিল।]

যশোদা ॥ এই নাও আমার গোপাল। ওকে বাঁচাও! ওকে বাঁচাও।

উজ্জ্বল ভারত, শারদীয়া সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৬৬

সুনয়নী

রূপক নাট্য

—কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

—আমাদেরই মতো আর কোনো হতভাগা হয়তো আসছে।

—আমাদেরই মতো ও বেচারীও হয়তো কতো আশা নিয়ে এই দুর্গম স্থানে এসে পৌঁছেছে।

—কিন্তু ও যে আমাদেরই মতো অন্ধ তা তোমরা কি করে ভাবছো?

—নইলে এখানে কেউ আসে?

—হ্যাঁ, এই দুর্গম পথ ধরে—ভিক্ষে করতে করতে—

—প্রাণের মায়া ছেড়ে, পাহাড়ী পথে হোঁচট খেতে খেতে?

—লোকের হাত-পা ধরে পথের সন্ধান জানতে জানতে?

—শুধু অন্ধ লোকই এভাবে এখানে আসবে চোখ ফিরে পাবে এই আশায়।

—হ্যাঁ তা ঠিকই বলছো। যাদের চোখ আছে তারা কখনো এ কষ্ট সহ্য করবে না।

—তাদের দায় পড়েছে!

—কাজেই যার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি অন্ধ না হয়ে সে যায় না

—তোমাদের অনুমান মিথ্যে নয়। আমি অন্ধ।

—মেয়েছেলে!

—হ্যাঁ, আমি মেয়েছেলে। তোমরা বলতে পারো এ আমি কোথায় এসেছি?

—তুমি কোথায় যাবে বলে বেরিয়েছিলে গো?

—এটা কি সূর্যসাধুর গুপ্ত গুহা?

—তোমরা আর কেউ কথা বোলো না। এ মেয়েটির সঙ্গে আমাকে আলাপ করতে দাও।

—কেন? তুমি বা একাই আলাপ করবে কেন?

—এই ভ্যাখো, আর কেউ আলাপ করবে না আমি কি তাই বলছি? আগে আমাকে আলাপ করতে দাও—মানে মেয়েটিকে বাজিয়ে দেখতে দাও।

—বাজিয়ে দেখার আবার কি আছে?

—হ্যাঁ, বরং তবলা বাজিও। কিন্তু বাবা, মেয়েছেলে বাজিও না।

—কী বিপদ, তোমরা থামবে? বাজিয়ে দেখার নেই? ও বলছে বটে অন্ধ, কিন্তু ও যে অন্ধ তার কী প্রমাণ তোমরা পেয়েছো?

[নিস্তব্ধতা]

—আমি অন্ধ আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছেনা ?

—বিশ্বাস ? খানিকটা বিশ্বাস হচ্ছে এই জন্যে যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার আশাতে এক শুধু অন্ধই এখানে আসবে, এতো দুঃখকষ্ট সয়ে।

—কেন, আমি যে অন্ধ আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না ?

—নাঃ, এরপর আর কোনো সন্দেহ নেই।

—কিন্তু আমার সন্দেহ তো এখনো যাচ্ছে না। আমি কি সত্যি সত্যিই সূর্যসাধুর গুপ্ত গুহায় আসতে পেরেছি।

—হ্যাঁ, তা পেরেছো।

—ও, তবে তোমরাও সবাই অন্ধ।

—কি করে বুঝলে ?

—আমি শুনে এসেছি যে, অন্ধ ছাড়া এখানে কেউ আসেনা। আসতে পারেনা।

—শুনছো ? আর কি শুনছো ?

—শুনেছি, এখানে এই গুপ্ত গুহায় যে সাধুটি থাকেন, তার নাম সূর্যসাধু।

—ঠিকই শুনছো।

—আর কি শুনছো ?

—শুনেছি, চন্দ্রগ্রহণের রাতে তিনি আবির্ভূত হন তাঁর এই গুপ্ত গুহায়।

—হ্যাঁ, আমরাও তাই শুনেছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরাও তো তাই জীবনপণ করে এখানে এসেছি।

—হ্যাঁ, তাঁর দয়ায় দৃষ্টি ফিরে পাবো এই আশাতেই এতো দুঃখকষ্ট সয়েও এখানে পড়ে আছি।

—কিন্তু শুনেছি প্রতি চন্দ্রগ্রহণে তিনি একটিমাত্র অন্ধকেই দৃষ্টিদান করেন। এ কথা কি সত্যি ?

[নিস্তব্ধতা]

—আপনারা চুপ করে রইলেন যে ? বলুন না, একথা কি সত্যি ?

—হ্যাঁ, আমরাও তাই শুনেছি।

—আপনারা ঠিক কি শুনছেন বলুন না ?

—চন্দ্রগ্রহণের রাতে সূর্যসাধু কোনো একটি অন্ধকে দান করেন দিব্যদৃষ্টি।

—আমি জেনে এসেছি আজই সেই চন্দ্রগ্রহণের রাত।

—এ্যাঁ ?

—তাই নাকি ?

—আজ চন্দ্রগ্রহণ ?

—ওগো মেয়ে শুনছো ? আজই যে চন্দ্রগ্রহণ এ তমি কি করে জানলে ?

—যাত্রীরা সব অলকনন্দায় গ্রহণের স্নান করতে এসেছে যে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তবেই আজই। আমরাও মনে মনে আঁচ করছিলাম—আজকালের মধ্যেই গ্রহণ লাগবে। কিন্তু কখন যে ওঠে সূর্য আর কখন যে

যায় অস্ত···সে নিয়েও আমাদের মধ্যে এতো মতভেদ যে দিনক্ষণের খেই ফেলেছি আমরা হারিয়ে।

—ভাগ্যিস তুমি মেয়ে এসেছিলে! তাই সঠিক জানতে পারছি আজই সেই চন্দ্রগ্রহণ। আ—দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ আজ।

—আশা-নিরাশার লড়াইও হবে আজ শেষ।

—আমাদের মধ্যে কেউ একজন আজ সূর্যসাধুর কৃপায় লাভ করবে দিব্যদৃষ্টি।

—কিন্তু কে সেই ভাগ্যবান?

—অথবা কে সেই ভাগ্যবতী?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ মেয়েটিও যখন সময় মতো এসে পড়েছে, সাধুর দয়া কে লাভ করবে প্রশ্নটা আবো জটিল হয়ে উঠছে।

—তা হোক। সূর্যসাধু শুনেছি অন্তর্যামী। দৃষ্টি ফিরে পাওয়া যার সব-চেয়ে বেশী দরকার তিনি সেটা জানেন। হ্যাঁ, তাকেই করবেন কৃপা। এ বিশ্বাস আমার আছে।

—কিন্তু তোমরা জানো না দৃষ্টি ফিরে পাওয়া আমার কতো দরকার।

—আমার সব কাহিনী শুনলে সে দরকার যে আমারই সবচেয়ে বেশী এ তোমরাই বলবে।

—কার কি কাহিনী সে তো আমরা সবাই জানি।

—হ্যাঁ, নতুন করে পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর লাভ কি?

—কিন্তু নতুন লোক এখানে একজন এসেছে। ঐ মেয়েটি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর কোনো কথাই তো আমরা জানিনা।

—আমিও আপনাদের কোনো কাহিনীই জানিনা। তাতে হয়েছে কি? চোখ হাড়িয়ে কার কতটা দুঃখ শুনে কি সুখ?

—না না। এতো দুঃখের কথা শুনেছি আর এতো দুঃখ পেয়েছি যে দুঃখের কথা আর শুনতে ভালো লাগেনা—ভালো লাগেনা আমার। তুমি মেয়ে কোনো আনন্দের কথা শোনাতে পারো আমাদের? কি নামে তোমাকে আমরা ডাকবো বলো না।

—নাম ছিলো আমার সুনয়নী। ডাকবেন আমাকে ঐ নামে, আপনারা?

—না না। ওতে তোমাকে আঘাত করাই হবে, মেয়ে।

—না না, তোমাকে ব্যথা দিতে চাইনা আমরা।

—আমাদের এই জীবনের অন্ধকার আকাশে তুমি যেন শুকতারাটি হয়ে জ্বলছো। বাইরের চোখে তোমাকে দেখতে পারছি না সত্যি কিন্তু মনের চোখে আমি তোমায় দেখছি।

—এমনি সব কষ্ট কল্পনা আমি সইতে পারিনা। শুকতারা না হাতী। কালো কুৎসিতই বোধ করি হবে ওই মেয়েটা। যৌবনও হয়তো গেছে। তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা আমার ভালো লাগছে না।

—না না, দাঁড়াও না। বলো না মেয়ে কতো তোমার বয়স ?

—না না, এসব প্রশ্নের কোনো মানে হয়না। পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি।

—না না, আমরা তোমার বয়স জানতে চাইনে মেয়ে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা ধরে নিচ্ছি চির-যৌবনবতী ঐ শুকতারা তুমি।

—হায় হায়, শুকতারা আমি দেখিনি। জন্ম থেকেই অন্ধ আমি।

—আচ্ছা এখন দিন না রাত ?

—ও হ্যাঁ, তাই তো ঐ মেয়েটি এসে আমাদের আসল প্রশ্নটাই ঘুরিয়ে দিয়েছে।

—কি প্রশ্ন ?

—চন্দ্রগ্রহণের আর কতো বাকী ? এটা দিন না রাত ?

—তাই তো, যে জন্য আমাদের এখানে আসা, সেই কথাটাই আমরা ভুলে গিয়েছি।

—সূর্যসাধুর কথাই ভুলে গিয়েছি।

—তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। আশানিরাশার লড়াই থেকে ক্ষণিকের মুক্তি পেয়েছিলাম আমরা।

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন একটা মধুর স্বপ্ন দেখছিলাম আমরা। স্বপ্নটা ভেঙে গেলো। চন্দ্রগ্রহণের কথা চুলোয় যাক। এখন খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

—ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো হে। দারুণ ক্ষিদে বোধ হচ্ছে।

—আমারও।

—আমারও।

—কিন্তু শুনুন, খেতে হলে এখনই খেতে হবে। গ্রহণ লাগলে তো আর খাওয়া চলবে না।

—যা বলেছো। কিন্তু খাবার তো সেই ফলমূল। যেতে হবে গুহার বাইরে। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে হবে ফলের গাছ। যাবে ?

—না না না ! লগ্ন পেরিয়ে যাবে ! গ্রহণের লগ্ন পেরিয়ে যাবে !

—হ্যাঁ হ্যাঁ, একথা খুবই ঠিক। কিন্তু পেটে কিছু না দিলেও তো চলছে না আমার। বেশী ক্ষিদে পেলেই আমার ওঠে শূলবেদনা। এখন আমি কোথায় পাই খাবার ?

—বেশ কিছু খাবার ছিলো আমার ভিক্ষের ঝুলিতে। অলকনন্দায় স্নান করতে যাচ্ছিল যে যাত্রীদল তারা দিয়েছিলো আমাকে। কতো রকম সব ভালো খাবার। সেইসঙ্গে ভিক্ষেও মিলেছে বেশ কিছু টাকাপয়সা।

—বা-বা-বা ! তারই কিছু খাবার ভিক্ষে দাও না আমাকে। দাও না গো।

—আমাকেও দয়া করো গো মেয়ে। খেতে না পেলে ওর হয় শূলবেদনা আর আমার শুরু হয় বমি।

—তবে শোনো মেয়ে, আমার কথাও শোনো। খিদের জ্বালা সইতে পারি না বলেই আমার হতভাগী মা আমাকে শিশুকালেই দিয়েছিলো বিক্রি করে ভিখিরীদের এক দালালের কাছে। ওষুধ দিয়ে তারাই আমার চোখ দুটির মাথা খেয়েছে। অন্ধ ভিখিরী বেশী ভিক্ষে পায় জানোতো?

—নাঃ শূলবেদনাটা আর চাপতে পারছি না।

—সর সর। আমার গা গুলোচ্ছে। আমি বমি করবো।

—ওগো মেয়ে, দাওনা তোমার ভিক্ষের ঝুলিটা আমাদের ভিক্ষে।

—আমার ভিক্ষের ঝুলিটা রেখে এসেছি গুহায় ঢুকবার দরজায়। ভেতরে ওটা আনবার নিয়ম নেই বলেই শুনেছি যে।

—তুমি ঠিকই শুনেছো।

—বেশ, আমরা গুহার দরজাতেই যাচ্ছি।

—যাচ্ছেন যান। না বলবো না। কিন্তু গ্রহণ যদি এখুনি লেগে যায় তখন?

—আমরা এই যাবো আর আসবো।

—দেখবেন গ্রহণ লাগলে যেন আর কিছু খাবেন না।

—তাইতো, গ্রহণ কখন লাগবে তা জানবো কি করে?

—এখনি যে লাগেনি, তাই বা কে বললে?

—না না। লাগেনি, গ্রহণ লাগেনি। অলকনন্দার যাত্রীরা আমায় বলেছে গ্রহণ লাগলেই তারা শাঁক বাজাবে।

—বাঁচালে মেয়ে, বাঁচালে। চলো চলো, সবাই চলো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর দেরী কোরো না। কখন শাঁক বেজে উঠবে কে জানে বাবা।

* * *

—মনে হচ্ছে কে যেন রয়ে গেছে।

—হ্যাঁ আমি।

—কে আপনি?

—সেই অন্ধ। যার শুকতারা তুমি।

—আপনার বুঝি ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই?

—ক্ষুধা নেই। কিন্তু তৃষ্ণা আছে।

—কথাটা কেমন হেঁয়ালীর মতো শোনাচ্ছে।

—কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যটাই তোমাকে আমি বলেছি সুনয়নী।

—আপনি না একটু আগে বলেছিলেন সুনয়নী বললে আমাকে আঘাতই করা হবে।

—তখন এই কথাটাই বড়ো বেশী মনে হয়েছিলো যার নয়ন দুটি গেছে,

তাকেই বলছি সুনয়নী। কিন্তু এখন যে একথা কিছুতেই মনে করতে পারছি না যে তোমার নয়ন নেই। আমার মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কী অপরূপ তোমার চোখ দুটি।

—যে চোখ দুটি আমার একেবারেই নেই।

—তুমি ভুল করছো সুনয়নী। দেহে যে দুটি চোখ থাকে সেই চোখ দুটি মানুষের একমাত্র চোখ নয়। মানুষের সত্যিকার চোখ থাকে মনে। আমি তোমার সেই চোখ দুটির কথাই বলছি সুনয়নী।

—কিন্তু তার পরিচয়ই বা আপনি পেলেন কোথায়? এ সব আপনার মনগড়া কথা। এ আপনার কষ্ট কল্পনা।

—ভিক্ষুক হয়েও ক্ষুধার্তকে ভিক্ষা দিয়েছে কে? আমি না তুমি?

—ও। কিন্তু তাতে আমার মহত্বটা কি? ভিক্ষের ঝুলিটা আমার একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই সেটা ওদের দিতে আমার এতটুকু বাধেনি। কিন্তু আপনাকে তো আমি কিছুই দিইনি। তবে কেন এই গুণগান?

—ক্ষুধার্ত নই বলেই আমি যাইনি। তৃষ্ণার্ত বলেই আমি রয়ে গেছি।

—কিসের তৃষ্ণা আপনার?

—রূপের।

—আপনি না অন্ধ?

—হ্যাঁ। অন্ধ বলেই আমার তৃষ্ণার শেষ নেই। আমার বাসনা, আমার কামনা, আমার কল্পনা আমার মনের চোখের সামনে এতোকাল গড়ে তুলেছে যে অনুপমা নারী, আমার সেই অরূপরতন প্রিয়া মনে হচ্ছে আজ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—জীবনে এই প্রথম শুনছি সেইসব কথা যা শোনবার জন্য সব নারী জন্ম থেকেই তপস্যা করে। কিন্তু জেনে রাখো অন্ধ, আজ যদি তুমি চোখ পাও ফিরে, ফিরেও তাকাবে না আমার দিকে।

—তাই, তুমিও শুনে অবাক হবে নারী, চোখ আমি চাই না।

—সে কি!

—হ্যাঁ সুনয়নী। হ্যাঁ।

—চোখ তুমি ফিরে চাওনা?

—না। চাই না। তোমাকে দেখবো না বলেই চাই না।

—তবে কেন এই কৃচ্ছ্রসাধন করে এসেছিলে এখানে?

—এসেছিলাম দিব্যদৃষ্টি লাভের আশায়। আশা আমার অসার্থক হয়নি প্রিয়া। আমি চলে যাচ্ছি।

—চলে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ। যাচ্ছি। আমি যা চেয়েছিলাম, আমি তা পেয়েছি।

—কি তুমি পেয়েছ তুমিই জানো। কিন্তু আমি? আমি কি করবো?

—তুমি কি করবে সে জানো তুমি। আমি জানি না।

—দাঁড়াও। সেই কথাটা কি তুমি আর একবার আমাকে শোনাবে যা আমার এই বাইশটি শীতের জীবনে প্রথম দিয়েছে বসন্তের দোলা।

—শুধু একবার কেন, চিরদিন বলবো, চিরকাল বলবো, বারবার বলবো।

—আজ মনে হচ্ছে আমি সেই নারী, অন্ধ হলেও যে ছিলো সম্রাজ্ঞী! [হাসিয়া] ইতিহাসের পাতায় আছে নাকি এমন কোনো নারী ?

—জানি না।

—ইতিহাস কতোটুকু জানে ? জানে না যে সে নারী আমি। চলো।

—সে কি ? তুমি চলে যাবে ? দিব্যদৃষ্টির শুভলগ্ন যে এসে গেছে। এখনি যদি গ্রহণের শাঁখ বেজে ওঠে, এই গুপ্ত গুহায় থাকছো একাকী তুমি। সূর্যসাধুর বরে তোমারই হবে জয়। না না তুমি থাকো। যেতে দাও আমাকে।

—দিব্যদৃষ্টি আমি পেয়ে গেছি। দেখছি তুমি বৃদ্ধ নও। তুমি প্রৌঢ় নও। জরাজীর্ণ অন্ধও তুমি নয়। ছিন্নবসন ভিক্ষুকও নও তুমি।

—তবে ? কে আমি ?

—তুমি সম্রাট। আমার সম্রাট। চলো, চলো। শাঁখ বাজবার আগে ডেকে দিয়ে যাই যারা অন্ধ।

—তুমি আমি তবে অন্ধ নই !

—না। না। না।

[অদূরে শঙ্খধ্বনি]

—কিন্তু ঐ যে শাঁখ বাজছে সুনয়নী।

—হ্যাঁ, বাজছে। তোমার আমার নবজীবনের জয়ধ্বনি শুনছি।

—শাঁখ বাজছে। চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে শুরু।

—শুরু হলে শাঁখ বাজে, শেষ হলেও বাজে। ওদের হ'ল শুরু, আমাদের হ'ল শেষ। হ্যাঁ চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে আমাদের।

—এ গুহা থেকে তবে বেরিয়ে পড়ো সুনয়নী। বাইরের জীবনজ্যোৎস্না আমাদের ডাকছে।

—আমার হাত ধরো সম্রাট। অলকানন্দায় আমরাও করবো স্নান।

—হ্যাঁ. মুক্তিস্নান। সূর্যসাধু আমাদের প্রণাম নিয়ো।

—সূর্যসাধু, আমাদের এই দুঃখের জীবনে এই সুখের আলো যেন অস্ত যায় না কখনো।

[গুহাটি দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া প্রস্থান। পশ্চাৎপটে শঙ্খধ্বনিরত এক জ্যোতির্ময় পুরুষের বরাভয় মূর্তির আভাস। ধীরে যবনিকা নামিতে লাগিল]।

বেতার জগৎ, শারদীয়া সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

মন্মথ রায়

মন্মথ রায় শিল্পসম্মত একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক এবং শ্রেষ্ঠ লেখক। আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি অসংখ্য একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার একাঙ্কিকা-গুলি চারখানি সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যথা—'একাঙ্কিকা', 'নব একাঙ্ক' 'ফকিরের পাথর' ও 'বিচিত্র একাঙ্ক'। 'একাঙ্কিকা'য় প্রকাশিত নাটিকাগুলির তুলনা বাংলা সাহিত্যে তো নাই-ই, এমন কি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটকা-বলীর সহিত ইহারা সমতুল্য একথা সাহসের সহিত বলা চলে। বইখানির মধ্যে কয়েকটা চোখ ঝলসানো রত্ন ইতস্তত পড়িয়া আছে, ইহাদের দীপ্ত প্রাখর্য আমাদের বিচার করিবার, তুলনা করিবার ক্ষমতা হরণ করিয়া ফেলে। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে এক একটা নাটিকা পড়িবার পরে উত্তেজিত মনের মধ্যে অসংখ্য সুরের ঝঙ্কার ক্রমাগত উত্থিত হইতে থাকে। গীতি কবিতার ন্যায় ইহাদের অভ্যন্তরস্থ প্রভাব আমাদের মনের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী অনুরণন সৃষ্টি করিয়া চলে।...,

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান
অজিতকুমার ঘোষ, ডি.লিট্ রচিত
"বাংলা নাটকের ইতিহাস"
১৩৬৮

মন্মথ রায় বাংলা সাহিত্যে আধুনিক একাঙ্ক নাটকের জন্মদাতা। যে সকল গুণে নাটক যথার্থ একাঙ্ক নাটকের রসোত্তীর্ণ হইয়া থাকে, প্রথম হইতেই তাঁহার রচনায় সেই গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে একাঙ্ক নাটক রচয়িতা রূপেই মন্মথ রায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আবির্ভূত হন। ১৯২৩ সনে যখন তাঁহার প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' প্রকাশিত হয়, তখনই তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক বীরবল বা প্রমথ চৌধুরী তাঁহার সেই প্রচেষ্টার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ১৯২৩ সনের ২৪শে ডিসেম্বর ষ্টার থিয়েটারে তাঁহার সেই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। তদবধি তাঁহার একাঙ্ক নাটক রচনা অবিরাম অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক কিংবা দশক সমাজ যখন এই বিশিষ্ট সাহিত্যরূপটি সম্পর্কে সচেতন হইতে পারে নাই, তখন হইতেই তিনি বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়া ইহার একটি ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। আজ বাংলা একাঙ্ক নাটক যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, তাহার মূলে তাঁহার এই অপরিসীম দানের কথা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না।...,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যাচার্য
আশুতোষ ভট্টাচার্য, পি.এইচ. ডি. রচিত
"বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস"
১৩৬৮

"বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম শিল্পসম্মত একাঙ্ক নাটকের ধারা প্রবর্তন করেন। শুধু প্রবর্তয়িতা নন, তিনিই একাঙ্ক নাটকের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা।"

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য এবং
ডঃ অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত
'একাঙ্ক সঞ্চয়ন' (প্রথম সংস্করণ, ২৬ পৃষ্ঠা)

"বাংলায় One-act play জাতীয় রচনা ছিল না বললেই চলে। এইক্ষেত্রে মন্মথ রায়ের কৃতিত্ব অসীম। তিনি এ বিষয়ে পথিকৃৎ ও বটে, আবার অদ্যাবধি অজেয়ও বটে। বর্তমান প্রচলিত একাঙ্কিকা নামটিও তাঁরই দেওয়া।"

নারায়ণ চৌধুরী
শনিবারের চিঠি ॥ অগ্রহায়ণ ঃ ১৩৬২ ॥

—"তিনি (মন্মথ রায়) বাংলায় একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক।"

ভারত কোষ (চতুর্থখণ্ড ১৮৮ পৃষ্ঠা)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

—"মন্মথ রায় আধুনিক বাংলা একাঙ্ক নাট্য সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান ঋত্বিক।"

অধ্যাপক দিলীপকুমার মিত্র রচিত
'একাঙ্ক নাটকের কথা'

*   *   *

এ ভাবে নবনাট্য আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করতে আর কেউ পেরেছেন বলে জানা নেই। বিশেষ করে আপনার 'আজব দেশ' তথাকথিত নব্য লেখকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় প্রগতিশীল নাটক কাকে বলে। 'আলো চাই—আরো আলো'-র কোন তুলনা নেই—অন্ততঃ এদেশের নাট্য-সাহিত্যে নেই। ...ঐতিহাসিক নাটকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আপনার 'অশোক'। আপনার নাটকেই দেখলাম—প্রকৃত নাটক ইতিহাসের একটা যুগকে ধরার চেষ্টা করে, তৎকালীন আচার ব্যবহার, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি প্রভৃতিকে প্রতিফলিত করে। ...আপনার 'টোটো পাড়া'—কি অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর!

উৎপল দত্ত

মন্মথ রায়

…এই মানুষটিই যখন নাটক লেখেন, জীবনের সমস্ত জটিলতা ও রহস্যের প্রতি কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর। যেন খনিগর্ভে প্রবেশ করে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান। রত্নের সন্ধান পেলে আনন্দে নেচে ওঠেন এবং তা কুড়িয়ে এনে দেন উপহার নাট্য রসিক-দের। আবার যেখানে অন্ধকার সেখানে বিষণ্ণ সুর বেজে ওঠে তাঁর বীণার তন্ত্রীতে, সন্ধানী আলো ফেলে দেখেন সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে যাবার পথ কোথায়? অন্ধকারে তিনি হারিয়ে যান না, মুক্তির পথ খোঁজেন। তাই যে "মুক্তির ডাক" দিয়ে তিনি নাট্যপথে যাত্রা শুরু করেছিলেন সেই মুক্তির ডাক তাঁর আজো থেমে যায়নি— মানুষের সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তির ডাক দিয়েই তিনি চলেছেন। দেশের, জাতির উত্থান পতনের সঙ্গে তাঁর নিজের-ও আত্মিক উত্থান পতন ঘটে। ভাবগত এই সাযুজ্যই মন্মথ নাট্যের বৈশিষ্ট্য। নিজের চিন্তাকে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দিগন্ত ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। তাই তাঁর নাট্যসাহিত্য বিপুল সম্ভারে সমৃদ্ধ!……

নাট্য রচনায় মন্মথ রায় সর্বত্রগামী। পূর্ণাঙ্গ, ক্ষুদ্র নাটিকা, একাঙ্ক—কোন্ দিকে তাঁর লেখনি না চলেছে! শিশু নাট্য রচনায়ও তাঁর পারঙ্গমতা অস্বীকার করার উপায় নেই। ট্রাজেডি, ট্রাজি-কমেডি কমেডি, সিরিয়াস কমেডি, লাইট কমেডি, স্যাটা প্রভৃতি আধুনিক রূপকগুলির সবই তাঁর কলম থেকে এসেছে, বিষয়বস্তু বা ভাবে কোথাও বিদেশী নাটকের অনুকরণ, অনুসরণ বা প্রভাব নেই। তাঁর সমগ্র নাটকই জাতীয়। পুরাণ, ইতিহাস, সমাজ যা থেকেই তিনি নাটকীয় উপাদান নিয়েছেন তা একান্ত ভাবে দেশীয়। রসদের জন্যে তাঁকে বিদেশের দিকে তাকাতে হয়নি। …তা বলে তিনি বিশ্ববোধ রহিত এমন কথাও বলা যায় না। তাঁর পঞ্চাশোত্তর সামাজিক নাটকগুলি বিশ্ববোধের সঙ্গে সমীকৃত।

'মধুপর্ণী' ভাদ্র ১৩৮২ — **নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**

* * *

…এ কথা সত্য শ্রীরায়ই প্রথম সচেতন ভাবে একাঙ্ক রচনা করেছেন, এবং একাঙ্ক নাট্যপ্রভাব তাঁরই সৃষ্টি। কেবলমাত্র কয়েকটি একাঙ্ক নাটক রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। শতাধিক একাঙ্ক তিনি রচনা করেছেন, এবং এখনও করে চলেছেন। এমন কোন বিষয় নেই, যা তিনি স্পর্শ করেন নি। এমন কোন কর্ম নেই, যা তিনি চিন্তা করেন নি। দেড় ঘণ্টার একাঙ্ক থেকে পাঁচ মিনিটের ক্ষুদ্র নাটক রচনায় তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণ। তিনি যেমন জানেন গভীর হতে, তেমনি জানেন লঘু হতে। কাব্যিক রসে তাঁর সৃষ্টিকে রসায়িত করবার ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ত। ভাষার কারুকার্যে তিনি দক্ষ কারিগর। ভাবের ব্যঞ্জনায় তিনি ডুবুরি।

…সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের নাট্য সাধনায় তিনি সর্ব সময়ই যুগোপযোগী। তিনি সেকালের, একালের এবং ভাবীকালেরও বটে।

…রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র সকলের প্রভাব সত্ত্বেও শ্রীরায় স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সর্ববিধ চেতনায় তিনি সমৃদ্ধ। মন্মথ রায় কেবলমাত্র একজন লেখক নন, একজন সৃজনশীল বিরাট প্রতিভা।

'মধুপর্ণী', ভাদ্র ১৩৮২ — নাট্যকার কিরণ মৈত্র

* * *

সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় এক একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আছে। তা হোল চলমান স্রোতের গতি পরিবর্তন। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস কবিতা ছোট গল্পে যেমন এই গতি পরিবর্তনের ঐতিহাসিক মুহূর্ত আছে, তেমনি রয়েছে বাংলা নাট্য সাহিত্যেও। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্ন" যেমন বাংলা নাট্য প্রবাহের এক একটি বাঁক ফেরা, ঠিক তেমনি ঐতিহাসিক ব্যাপার মন্মথ রায়ের "মুক্তির ডাক"। বস্তুতঃ "মুক্তির ডাক তৎকালীন বহমান নাটস্রোতের মধ্যে আর একটি শাখা প্রবাহিত করানো যা' পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে সবচাইতে বেগবান, বিচিত্রমুখী এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত।…

আমার মতে, এ এক দুঃসাহসিক প্রয়াস। কারণ বাংলা নাট্যমঞ্চে তখন পূর্ণাঙ্গ নাটকেরই জয়ধ্বনি। তৎকালীন নাট্যকারগণ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় তৎপর। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে মন্মথ রায়, একাঙ্ক নাটকে মনস্ক। একক তিনি। নিঃসঙ্গ তিনি। তবু অকুতোভয়। বাংলা নাট্যসাহিত্যে একের পর এক সংযোজন করে চললেন একাঙ্ক নাট্য সম্পদ।

…তখন কিন্তু এর ভবিষ্যৎ কেউ অনুমান করতে পারেন নি। সম্ভবত, আমার ধারণা, স্বয়ং মন্মথ রায়ও ভাবতে পারেন নি যে তাঁর 'মুক্তির ডাক'ই বাংলা নাট্য মঞ্চ আর নাট্য সাহিত্যের এক সুবিশাল দিগন্তের উন্মোচন করে দেবে। যে বীজ অর্ধশতাব্দীকাল আগে ষ্টার রঙ্গমঞ্চের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে রোপিত হয়েছিল আজ তা বিশাল মহিরুহ। পঞ্চাশ বছর পরে, আজকের আমরা, যাঁরা তাঁর অনুবর্তী, যখন একাংক নাটক নিয়ে মঞ্চে দাঁড়াই, যখন প্রেক্ষাগৃহের গুণী দর্শকের করতালিতে সে একাঙ্ক অভিনন্দিত হয়, তখন দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায়শই ভুলে যাই যে এই করতালির পিছনে মন্মথ রায়ের অবদান কতোখানি। প্রথম পুরুষ মন্মথ রায় সেদিন অর্থের কথা না ভেবে, প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃক্পাত না করে, একক সাধনায় যে প্রদীপটি জ্বেলে রেখেছিলেন—পরবর্তী কালের আমরা সেই প্রদীপ থেকেই বাংলা নাট্যমঞ্চের দীপশিখা উজ্জ্বল রাখার ব্রতপালনে উদ্বুদ্ধ হই।…

'মধুপর্ণী', ভাদ্র ১৩৮২ — নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ